মুসলিম লিপিকলা

উৎপত্তি ও বিকাশ

আহমদ আলী

লিপিকলা হচ্ছে শিল্পকলার একটি মাধ্যম। এটি প্রাচীন সভ্য ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিচয়বাহী জাতিসমূহের অন্যতম নিদর্শন। দুনিয়ার ইতিহাসে মুসলমানরা হস্তলিপিশিল্পে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্থানের অধিকারী। বলতে গেলে এটি তাঁদের একান্ত নিজস্ব সম্পদ। মুসলমানদের আগে পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি শিল্প হিসেবে হস্তলিপির চর্চা করেনি। তারাই সর্বপ্রথম লিপিশিল্পকে জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে এবং অন্যান্য শিল্পের ওপর প্রাধান্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পবিজ্ঞানরূপে একে সাজিয়ে তুলেছে। একসময় এর রূপ, সৌন্দর্য, স্বচ্ছতা ও মর্যাদার প্রশংসা বিশ্বের শিল্পের ইতিহাসে সর্বসাধারণের মুখে মুখে ফিরছিল। আশ্চর্যের বিষয়, এর সাংস্কৃতিক বিকাশ এমনভাবে বর্ধিত হয় যে, একসময় এটা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরও প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। কিন্তু অনুতাপের ব্যাপার হলো, এ শিল্পবিদ্যা আজ চরম অবহেলার শিকার। তা সত্ত্বেও এ শিল্প ইতিহাসের বিভিন্ন চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে এখনো তার চিরন্তন, সক্রিয় ও প্রভাবশালী উপস্থিতি বজায় রেখেছে। গ্রন্থটিতে লিপিশিল্পের উৎপত্তি, আরবি লিপিকলার উদ্ভব, প্রকরণ, বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের নানা দেশে এর বিস্তার লাভ—প্রভৃতি বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থের নানা জায়গায় এ কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নান্দনিকতা আনতে হলে মুসলিম ক্যালিগ্রাফিকে বিবেচনায় আনার প্রয়োজন রয়েছে। মুসলিম ক্যালিগ্রাফি আমাদের সাংস্কৃতিক বিকাশে যেমন অতীতে অবদান রেখেছিল, আজও আবার তা রাখতে পারে।

ড. আহমদ আলী ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলাধীন পশ্চিম কলাউজান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগ থেকে বি এ (অনার্স) ও মাস্টার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জনসহ পিএইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি সৌদি আরবের রিয়াদস্থ কিং সাউদ ইউনিভার্সিটি থেকে আরবি ভাষার শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর উচ্চতর ডিপ্লোমা অর্জন করেন।

কর্মজীবনের শুরুতে তিনি চুনতী হাকীমিয়া আলিয়া মদ্রাসার মুহাদ্দিস ও উপাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৯৬ সালে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রফেসর হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা *ইসলামী আইন ও বিচার*-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক।

তিনি দেশবিদেশে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে গবেষণাপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। ইতোমধ্যে তাঁর পনেরোটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো : *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, *খলীফাতু রাসূলিল্লাহ আবূ বাকর আস-সিদ্দীক*, *ইসলামে অপরাধের শাস্তি*, *তাযকিয়াতুন নাফ্স*, *বিদ'আত* (১ম-৪র্থ খণ্ড), *ইসমাতুল আম্বিয়া*, *ইসলামে বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা*, *ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাক ও সাজসজ্জা* প্রভৃতি। তাছাড়া আরবি ভাষা ও সাহিত্য, লিপিকলা, ইসলামের ইতিহাস, জীবনদর্শন, আইন ও সমাজ ব্যবস্থার ওপর তাঁর লিখিত পঞ্চাশোধিক গবেষণাপ্রবন্ধ দেশবিদেশের বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

মুসলিম লিপিকলা : উৎপত্তি ও বিকাশ

আহমদ আলী

বাংলা একাডেমি

www.pathagar.com

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনা
অর্থায়ন : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কর্মসূচি পরিচালক : মোবারক হোসেন
অর্থবছর : ২০১৬-২০১৭ ॥ প্রকাশনা : ৫০

মুসলিম লিপিকলা : উৎপত্তি ও বিকাশ

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪/জুন ২০১৭

বাএ ৫৬৪১

[অর্থবছর ২০১৬-২০১৭ : অপাআস বিভাগ : ৭]

মুদ্রণ সংখ্যা : ৫০০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক ও আন্তর্জাতিক সংযোগ বিভাগ

প্রকাশক
ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক ও আন্তর্জাতিক সংযোগ বিভাগ
বাংলা একাডেমি ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
ড. আমিনুর রহমান সুলতান
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

মূল্য : ছয়শত টাকা মাত্র

MUSLIM LIPIKALA : UTPATTI O BIKASH [Muslim Calligraphy : Origin and Development] by Ahmad Ali. Published by Dr. Muhammad Mizanur Rahman, Director (in-Charge), Translation, Textbook and International Relations Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First Published : June 2017. Price : Taka 600.00 Only

ISBN 984-07-5650-8

www.pathagar.com

উৎসর্গ

সে-সকল লিপিশিল্পীর উদ্দেশ্যে
যাঁদের উদ্যোগে হস্তলিপি এক উচ্চশ্রেণির শিল্পবিদ্যার আসন লাভ করে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

আধুনিক হস্তকলা এক রুচিশীল স্বীকৃত বিজ্ঞান। বর্তমানে যান্ত্রিক সভ্যতার বিস্ময়কর যুগেও এ শিল্প আলাদা বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য নিয়ে বেঁচে আছে। হস্তশিল্পে এখনও অবাক করা নিপুণ কাজ হচ্ছে; যদিও তা সীমিত এবং সর্বত্র সমাদৃত নয়।

লিপিকলা হচ্ছে শিল্পকলার একটি মাধ্যম। এটি প্রাচীন সভ্য ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিচয়বাহী জাতিসমূহের অন্যতম নিদর্শন। আরবিতে লিপিকলাকে খত্ত[১] এবং ইংরেজিতে Calligraphy[২] বলা হয়। সুন্দর দৃষ্টিনন্দন হাতের লেখাকে লিপিকলা (Calligraphy) বলা হয়। সচেতনভাবে জ্যামিতিক এবং অলংকরণ নিয়মনীতি মেনে এ কলার বিস্তার ঘটে। ভাষা ও অক্ষরের অন্তর্নিহিত দিকটি এখানে উল্লেখযোগ্য। লিপিকলা যখন একাধারে ভাষার বাহ্যিক রূপ, অন্তঃস্থিত ভাব এবং দৃশ্যমান শিল্পসুষমায় মণ্ডিত হয়ে রচিত হয় এবং দর্শকদের মুগ্ধ-বিস্ময়ে অভিভূত করে অবচেতন মনে দোলা দিয়ে যায় তখন তা সত্যিকার ক্যালিগ্রাফি হয়ে ওঠে।

লিপিশিল্পী যখন শিল্পকর্ম করেন, তাঁর দৃষ্টি এর ভাষাগত দিক, বক্তব্য ও অক্ষরের বৈশিষ্ট্য, সর্বোপরি এর শৈল্পিক দিকটির ওপর নিবদ্ধ রাখতে হয়। শিল্পকর্ম যাতে জীবনের সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং এর মাধ্যমে জীবনের অর্থ প্রকাশ পায়, সেভাবে এর কম্পোজিশন ও রঙের বিন্যাস করতে হয়।

আরব লিপিশিল্পীগণ তাঁদের শিল্পকর্মে জ্যামিতিক ফর্মকে অঙ্গাঙ্গিভাবে গ্রহণ করেছেন। এজন্য হরফের প্রকাশভঙ্গি বহুমাত্রিকতা লাভ করেছে। আরবি ভাষা একটি প্রতিষ্ঠিত ভাষা, যেজন্য এর একটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব লিপিশিল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। ভাষার প্রতি ভালোবাসাও একটি প্রধান কারণ। সাধারণ জনগণের মধ্যে ক্যালিগ্রাফিক ফর্ম ছাড়াও শুধুমাত্র দেখতে সুন্দর হাতের লেখাও বিপুল উৎসাহে সমাদৃত হয়ে থাকে।

এ কথা বলা প্রয়োজন, আরবি লিপিশিল্প প্রাথমিক পর্যায়ে ডায়াক্রিটিক্যাল চিহ্নসহ জ্যামিতিক বিধি মেনে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়েছে। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ও পরে এর ব্যবহার হয়েছে। কুরআন সংকলনে আরবি লিপিশিল্পের ব্যবহার যথেষ্ট শ্রমসাধ্য ও অধ্যবসায় সহকারে করতে হতো। স্বল্পসংখ্যক কাতিব (লেখক) এ কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও প্রেরণায় আরবি লিপিরীতি উন্নয়নের সোপানে পা রাখে এবং তা ক্রমশ মুসলিম লিপিকলায় রূপ নিতে থাকে।

দুনিয়ার ইতিহাসে মুসলমানরা হস্তলিপিশিল্পে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্থানের অধিকারী। বলতে গেলে এটি তাঁদের একান্ত নিজস্ব সম্পদ। মুসলমানদের হাতেই এটা এক উচ্চশ্রেণির শিল্পবিদ্যার আসন লাভ করে। বিশিষ্ট লিপিগবেষক জিয়াউদ্দীন বলেন,

www.pathagar.com

"মুসলমানরা যে সকল শিল্পের চর্চা করতেন, তন্মধ্যে হস্তলিপিই ছিল সর্বাপেক্ষা পরিমার্জিত ও সুষমামণ্ডিত।"[৩]

ইসলামে জীবজন্তুর ছবি এবং ভাস্কর্য নির্মাণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকায় মুসলমানরা হস্তলিপির প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ করে। অধিকন্তু এই বিষয়ে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উৎসাহ প্রদান ছিল এই শিল্পের বিকাশে অত্যন্ত সহায়ক। তদুপরি আরবি বর্ণগুলো সমান্তরাল এবং লম্ব প্রকৃতির। তাই তাকে প্রয়োজনবোধে সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন করে অলংকরণের উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা যায়। উদ্ভিদীয় ও জ্যামিতিক পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে আরবি বর্ণমালা দিয়ে যে-কোনোভাবে নকশা করা যায়। আরবি বর্ণমালার উল্লম্ব দণ্ড এবং অনুভূমিক ও বক্রাকৃতি রেখা বর্ধিত ও হ্রাস করে শিল্পীগণ অলংকরণের পরিমণ্ডলে সৌন্দর্যের এক মনোরম ছন্দ সৃষ্টি করেন। উপরন্তু, আরবি অক্ষরের অনুভূমিক ও অর্ধবৃত্তাকৃতি রেখা দ্বারা অলংকরণের একেকটি ইউনিটের জন্য বর্গাকৃতি পরিসর, বৃত্তাকার, ত্রিভুজাকার ও ডিম্বাকার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে শিল্পীগণ অলংকরণ প্রক্রিয়ায় গতি ও প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন এবং দর্শকদের নিকট সাজসজ্জাকে উপভোগ্য করে উপস্থাপন করেন। অলংকরণের প্রয়োজনে সৃষ্ট হস্তলিখনশিল্পের সারিতে এক সজীব প্রাণ-স্পন্দন লক্ষ করা যায়। কাজেই কেবল লিখনশিল্পের কার্যকারিতা হিসেবে আরবি হস্তলিখনশিল্প বিকাশ লাভ করেনি; বরং অলংকরণ ও সাজসজ্জার উপকরণ হিসেবে তা সমাদৃত হয়েছে।[৪] ইসলামি সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলে খ্যাত আব্বাসীয় খিলাফতে অসংখ্য হস্তলিপির স্টাইল বা রীতির উদ্ভব হয়, যা বর্তমানে বিলীন হয়ে গেছে। এই যুগে আরবি লিপিমালার সকল শৈল্পিক প্রয়োজনীয়তা ও মাধুর্যের চরম বিকাশ ঘটে। আরবি হস্তলিখন পদ্ধতির প্রকারভেদ এবং রসোত্তীর্ণ শিল্পমাধ্যম হিসেবে এর ব্যবহার দেখে অবাক হতে হয়।

মুসলিম লিপিকলা বলতে মূলত আরবি লিপিকলাকেই বোঝানো হয়। মুসলমানরা বিশ্বের বহু ভাষায় কথা বলে; কিন্তু আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় মুসলমানদের শিল্প হিসেবে হস্তলিপির চর্চার কথা তেমন জানা যায় না। এ পর্যন্ত যে সমস্ত লিপিশিল্পের কথা জানা যায় তন্মধ্যে আরবি লিপিশিল্প ছাড়া চীন ও জাপানের লিপিশিল্পই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত দেশ দুটিতে ছবি আঁকা শুরু করতে হয় ক্যালিগ্রাফি দিয়ে। তবে আরবি ছাড়া অন্য কোনো দেশের বর্ণমালা এত সুন্দর করে আঁকা সম্ভবপর হয় না।

উল্লেখ্য যে, আরবদের আগে পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি শিল্প হিসেবে হস্তলিপির চর্চা করেনি। বলতে গেলে, তারাই লিপিশিল্পকে জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে এবং অন্যান্য শিল্পের ওপর একে প্রাধান্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পবিজ্ঞানরূপে একে সাজিয়ে তুলেছে। তাদের এ লিপিশিল্পকে 'আর্ট অব হেভেন' বলা হয়। এর দৃষ্টিনন্দন কারুকার্য ও নিপুণ আঁচড় এ উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছে। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন,

> Calligraphy is perhaps the only Arab art which today has Christian and Moslem representatives in Constantinople, Cairo, Beirut and Damascus whose productions excel in elegance and beauty of any masterpieces that the ancients ever produced.

www.pathagar.com

—"লিপিশিল্প সম্ভবত আরবদের একমাত্র শিল্প, যা আজও কনস্টান্টিনোপল, কায়রো, বৈরুত ও দামিশকে খ্রিষ্টান ও মুসলিম লিপিকারগণ চর্চা করে থাকেন, যা সৌন্দর্যের দিক দিয়ে প্রাচীনদের প্রবর্তিত যে-কোনো শিল্পের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে।"[৫]

তবে এই শিল্পের উৎপত্তি ও প্রাথমিক পর্যায়ের বিকাশ যদিও আরবদের হাতে শুরু হয়; কিন্তু এর পূর্ণবিকাশ ও উৎকর্ষ সাধিত হয় পারস্যবাসীদের দ্বারা।[৬] বলতে গেলে, তাদের হাতেই এ শিল্প ইতিহাসের বিভিন্ন চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে এখনো তার চিরন্তন, সক্রিয় ও প্রভাবশালী উপস্থিতি বজায় রেখেছে।

আশ্চর্যের বিষয়, এর সাংস্কৃতিক বিকাশ এমনভাবে বর্ধিত হয় যে, উমাইয়া শাসনামল থেকে শুরু করে আব্বাসীয় শাসনামলে এটা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। আরবি ক্যালিগ্রাফির শিল্প-সুষমায় মুগ্ধ হয়ে মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসসংক্রান্ত আরবি বাণী অমুসলিম শাসক ও শিল্পানুরাগীরা তাদের মুদ্রা ও স্থাপত্যে উপস্থাপন করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ৮ম শতাব্দীর মরিসাস খ্রিষ্টান শাসক আফ্‌ফা (৭৫৭-৭৯৬ খ্রি.) তাঁর মুদ্রায় কুফি লিখনপদ্ধতিতে অলংকরণ বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল রেখে মুসলমানদের কালিমা উৎকীর্ণ করেন। খ্রিষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে ব্রোঞ্জ নির্মিত একটি আইরিশ ক্রুসের মধ্যস্থলে কুফি লিখনপদ্ধতিতে 'বিসমিল্লাহ' উৎকীর্ণ হয়েছে। আরবি 'অ্যারাবেস্ক' ম্যাজিকের মতোই ইউরোপে প্রভাব ফেলেছে। ইতালি, স্পেন এবং ফ্রান্সের গির্জাসমাধির অলংকরণে সাবলীল লিপিকলা মোটিফ হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে।[৭] স্কট উল্লেখ করেন, খ্রিষ্টানদের অজান্তেই কুফি লিপিশৈলীর মাধ্যমে কুরআনের বাণী গির্জার প্রাচীরে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। যেমন সেন্ট পিটারের প্রসিদ্ধ গির্জার সুউচ্চ ফটকে আরবি লিপির কালিমা শোভিত বাণী খোদাই করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা ধর্মীয় কোনো চেতনার প্রতিফলন নয়; এটা আরবি লিপির এমন এক শৈল্পিক অভিব্যক্তি, যা শিল্পীকে নিজের অজান্তেই আন্দোলিত করেছে।[৮] চতুর্দশ শতাব্দীর রেনেসাঁ চিত্রকর জিওট্টো (Giotto) ও ভেনিজিওনোর চিত্রকর্মে কুফি রীতিতে আরবি নকশা পাওয়া যায়। এমনকি বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিল্পী পল ক্লি, যিনি বহুদিন তিউনিসে অবস্থান করেন, তাঁর 'হারবার ইন ব্লুম' (Harbour in Bloom) শীর্ষক চিত্রে 'মুহাম্মদ' শব্দটি কুফি রীতিতে অঙ্কিত করেন। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, আরবি লিপিকলার সাংস্কৃতিক বিকাশ অন্যান্য লিপিকলার চাইতে উৎকৃষ্ট বা নয়নাভিরাম না হলে বিভিন্ন অমুসলিম দেশে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের স্থাপত্যে অলংকরণ প্রক্রিয়ায় আরবি লিপিকলা এত মর্যাদাপূর্ণ স্থান পেত না।

আরবি লিপিকলার উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি যে বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হলোঃ পবিত্র কুরআন, ধর্মীয় চেতনা ও বিধিনিষেধ শিল্পীদের এককভাবে লিপিকলার চর্চায় আত্মনিয়োগে সাহায্য করে। মুসলমানগণ প্রাথমিককালে কুরআন সংরক্ষণের তাগিদেই পাথর, চামড়া, কাঠের টুকরো, হাড় ইত্যাদির উপর কুরআনের বিভিন্ন আয়াত খোদাই করে রাখতেন। এর কিছুকাল পরে কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করা হয় এবং তার অনুলিপি প্রণয়ন করা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। পবিত্র কুরআনের তাগিদেই তাঁদের লেখা যথাসম্ভব সুন্দর করা হতো। এভাবে আরবি লিপি দ্রুত মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারিত হতে থাকে।

www.pathagar.com

খ্রিষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের পৃষ্ঠাগুলো লিপিকারগণ এমন অসামান্য দক্ষতা, জ্ঞান ও ধর্মীয় অনুভূতি সহকারে বিভিন্ন ধরনের অপূর্ব নকশা দ্বারা অলংকৃত করেন যে, সেগুলো আজ পর্যন্ত বিমূর্ত শিল্পকলার ইতিহাসে সর্বোত্তম কৃতিত্ব হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে।[৯] প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. হামিদুল্লাহ বলেন, "... কুরআন সংরক্ষণ প্রচেষ্টা থেকেই ক্যালিগ্রাফি বা সুন্দর হস্তলিখন এবং বাঁধাই শিল্পের সূত্রপাত ঘটেছে।"[১০] তদুপরি এই আরবি হস্তলিপিই মুসলিম বিশ্বের হস্তবিদ্যার উন্নয়নে আদর্শ হয়ে গৃহীত হয়। সুখের বিষয়, আজ চীনের পশ্চিমাঞ্চল থেকে উত্তর আফ্রিকার উপকূল পর্যন্ত তথা সমগ্র মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় আরবি ভাষা ও আরবি লিপির বহুল প্রচলন রয়েছে।[১১] প্রাচীন ভাষাগুলোর মধ্যে ল্যাটিন অক্ষরের পরেই আরবি অক্ষরে সবচেয়ে বেশি লেখা হয়ে থাকে। মুসলিম খলিফাদের আমলে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে আনাতোলিয়া ও সিরিয়া থেকে গ্রিক অক্ষর, উত্তর আফ্রিকা থেকে ল্যাটিন অক্ষর এবং বসনিয়া থেকে সেরেলিক অক্ষরের ব্যবহার উঠিয়ে দিয়ে আরবি অক্ষর নিজের প্রভাব বিস্তার করে। ফলে আজ ঐসব দেশের ভাষাগুলো লিখতে আরবি বর্ণ ব্যবহার করা হচ্ছে। এ সমস্ত কারণে বর্তমানে সেমিটিক গোষ্ঠীর ভাষাগুলো ছাড়াও ফারসি, উর্দু, মালয়, সোমালি, সুদানি, পশতু, মালাগাছি প্রভৃতি বহু অসেমিটিক ভাষা আরবি বর্ণে লেখা হয়।

এটা সর্বজনবিদিত যে, বিভিন্ন মুসলিম শিল্পের মাঝে লিপিশিল্পের এত গুরুত্বের কারণ হচ্ছে, এই শিল্পের উৎপত্তি হয়েছে কুরআনমজিদের কোলে। ফলে মুসলিম হস্তলিপিশিল্পের প্রতিটি স্তরে ওহির স্বচ্ছ ঝরনাধারা থেকে উৎসারিত আত্মিক দ্যোতনা অনিবার্য অনুষঙ্গ হয়ে আছে। এ কারণেই এই পবিত্র শিল্পের ঘনিষ্ঠ সর্ম্পক রয়েছে শিল্পীর আত্মিক পরিশুদ্ধি, চেতনার পবিত্রতা ও বিবেকের চিরন্তনতার সাথে। এই শিল্প তার দর্শকদের এই বার্তা পৌছে দেয় যে, চেহারার সামনে থেকে পর্দা অপসারিত করো এবং আল্লাহর কালাম তথা আল-কুরআনের জ্ঞানের ও আধ্যাত্মিক চেতনার গভীরে, রহস্যের অতলান্তে অবগাহন করো, উপলব্ধি করো।

হস্তলিপিশিল্পে মুসলমানরা যে এক বর্ণাঢ্য জৌলুস সৃষ্টি করেছিল, তা আজ স্তিমিত। বর্তমান ইরান এ ক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে আছে বলা যায়। সেখানকার লিপিশিল্পের রূপ, সৌন্দর্য, স্বচ্ছতা ও মর্যাদার প্রশংসা আজ বিশ্বের শিল্পের ইতিহাসে সর্বসাধারণের মুখে মুখে ফিরছে। আমরাও কি এই লুপ্তপ্রায় গৌরব ফিরিয়ে আনতে এগিয়ে আসতে পারি না? ইতিহাসে মুসলিম ক্যালিগ্রাফির সাংস্কৃতিক বিকাশের এক গৌরবময় অধ্যায় আমাদের সামনে রয়েছে। এর প্রত্যেকটি দিক ও বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন। আমাদের এর গৌরবময় অধ্যায় সামনে রেখে এগোতে হবে। আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নান্দনিকতা আনতে হলে মুসলিম ক্যালিগ্রাফিকে বিবেচনায় আনার প্রয়োজন রয়েছে। মুসলিম ক্যালিগ্রাফি আমাদের সাংস্কৃতিক বিকাশে যেমন অতীতে অবদান রেখেছিল, আজও আবার তা রাখতে পারে।

১ 'খত্ত' : এর মূল অর্থ হলো মাটিতে অঙ্কিত বা খোদিত রেখা অথবা লাঠি কিংবা অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বালুর উপর অঙ্কিত রেখা। প্রথম প্রথম এ শব্দটি কবর খনন অর্থে

www.pathagar.com

ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীকালে এটি 'রেখা টেনে রাস্তা ও গলির সীমানা নির্ধারণ' অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। অবশেষে এটি স্কেলের সাহায্যে কাগজ বা চামড়ার উপর অঙ্কিত রেখা অর্থে এবং পুস্তকের ছত্রের অর্থে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে তা যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত সড়ক, নৌপথ, টেলিগ্রাফ লাইন, টেলিফোন লাইন, আকাশ পথ—এ সকল অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া বর্তমানে শব্দটি লিপিকলা অর্থাৎ লিখনপদ্ধতি এবং বর্ণের বিভিন্ন আকৃতি বা রূপ অর্থে মৌলিকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

২ Calligraphy : গ্রিক শব্দ Kallos এবং Graphein শব্দ দুটির মিলিত রূপ 'Kalligraphia' থেকে ইংরেজি 'Calligraphy' শব্দের উৎপত্তি হয়। এর অর্থ 'সুন্দর লেখা'।

৩ জিয়াউদ্দীন, মুহাম্মদ, *মুসলিম লিপিকলা*, (অনুবাদঃ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান), ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ ১।

৪ ইয়াকুব আলী, ড. এ.কে.এম., *মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প*, ঢাকাঃ অনন্যা প্রকাশনী, ২০০১, পৃ ৩৪১।

৫ Hitti, Philip.K., *History of the Arabs*, London: Macmillan.1968, p 424.

৬ জিয়াউদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২।

৭ মাহমুদুল হাসান, ড. সৈয়দ, *মুসলিম লিপিকলা*, ঢাকাঃ ছাত্রবন্ধু পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫, পৃ ১১; ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৪২।

৮ Scott, S. P., *History of the Moorish Empire in Europe*, vol.111, ch. 29th.

৯ *An Introduction to Persian Art*, 1930, p 102.

১০ হামিদুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ, *Introduction to Islam*, (অনু : মুহাম্মদ লুতফুল হক) ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৫, পৃ ২৪১।

১১ নুরুল আমীন, মুহাম্মদ, "লিপিকলায় মুসলমানদের অবদান", *অগ্রপথিক*, ইফাবা, ১৪ বর্ষ ২সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯, পৃ ১৪৫।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় ১-২২

লিপিশিল্পের উৎপত্তি ১

ভাবদ্যোতক লিখনপদ্ধতি ৫

ক. মূল চিত্র ও প্রতিকৃতির সাহায্যে লেখার প্রচলন ৫

খ. প্রতীক ও সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে লেখার প্রচলন ৬

ধ্বন্যাত্মক লিখনপদ্ধতি ৭

ক. শব্দচিত্রের সাহায্যে লেখার প্রচলন ৭

খ. বর্ণের সাহায্যে লেখার প্রচলন ৮

বর্ণমালার উৎপত্তি ৮

লেখার লাইন ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায় ২৩-৪৮

আরবি লিখনশিল্পের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মত ২৩

১. আলাহ তা'আলা কর্তৃক নির্দেশিত ২৩

২. মুসনাদ লিখনরীতি ২৫

৩. জাজম বা হিরি লিখনরীতি ২৮

৪. অ্যারামাইক লিপি ৩০

৫. নাবাতি ও সিরিয়ক লিপিদ্বয়ের সমন্বিত রূপ ৩২

৬. নাবাতি লিপি ৩৩

আরবি বর্ণসমূহের উদ্ভবের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া ৪৩

আরবি ভাষার বিশিষ্ট বর্ণসমূহ ৪৪

তৃতীয় অধ্যায় ৪৯-৭৪

আরবি লিখনশিল্পের প্রসার ৪৯

ইসলাম-পূর্ব লিপিচর্চা ৪৯

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় লিপিচর্চা ৫১

-পবিত্র কুরআন লিপিবদ্ধকরণ ৫৮

-কুরআনের লিখনপদ্ধতি ৬২

বিভিন্ন দেশে আরবি ভাষা ও লিখনশিল্পের প্রচলন ৬৫

চতুর্থ অধ্যায় ৭৫-১৩৯

আরবি লিখনশিল্পের বিকাশ ও পরিপূর্ণতা ৭৫

উমাইয়া যুগে আরবি লিখনশিল্পের বিকাশ ৭৫

www.pathagar.com

- ইজাম ৭৬
- তাশকিল ৮১
- আরবি বর্ণমালার ক্রমবিন্যাস ৮৪
- নতুন নতুন লেখার পত্র উদ্ভব ৮৫
- বড়ো বড়ো ক্যালিগ্রাফার ও হস্তলিপিবিশারদের জন্ম ৮৫
আব্বাসীয় যুগে আরবি লিখনশিল্পের বিকাশ ৮৭
- আব্বাসীয় যুগে বিভিন্ন আরব রাজ্যে আরবি লিখনশিল্পের ব্যবহার ৯১
- অনারবি ভাষায় আরবি বর্ণমালার ব্যবহার ৯২

বিভিন্ন আরবি লিখনশৈলী ৯৬
-আল আকলামুস সিত্তা ৯৬
১. সুলুস ৯৬
২. সুলুসে জলি ৯৮
৩. সুলুসাইন ১০১
৪. তুমার ১০৩
৫. মুখতাসারুত তুমার ১০৩
৬. নিসফ ১০৪
৭. মুহাক্কক ১০৪
৮. রিকা ১০৬
৯. তাওকি (ইজাযা) ১০৮
১০. রায়হানি ১১০
১১. নাসখ ১১১
১২. সুম্বুল ১১৫
১৩. মুসান্না বা আয়নালি ১১৫
১৪. গুবার ১১৬
১৫. আল-মানসূর ১১৬
১৬. আল-হুর ১১৭
১৭. তাজ ১১৭
১৮. গুলজার, তাউস ১১৮
১৯. সাক্কি বা লারজা ১১৯
২০. মুসালসাল ১১৯
আরবি বর্ণসমূহের ক্যালিগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য ১২০
আরবি হরফসমূহের আকৃতি ও যূথবদ্ধতা ১২৮
অলংকরণ মোটিফ হিসেবে আরবি লিখনশিল্পের ব্যবহার ১২৯

পঞ্চম অধ্যায় ১৪০-১৫৭

কুফি লিপিশৈলী ১৪০
কুফি লিপিরীতির উৎপত্তি ও বিকাশ ১৪০
কুফি লিপিরীতি ১৪৪

www.pathagar.com

কুফি লিপিরীতির বিভিন্ন প্রকরণ ১৪৪
অলংকরণ মোটিফ হিসেবে কুফি লিপির বিচিত্র ব্যবহার ১৪৭

ষষ্ঠ অধ্যায় **১৫৮-১৭৮**
তুগরা লিপিশৈলি ১৫৮
তুগরার পরিচয় ১৫৮
তুগরার উৎপত্তি ও বিকাশ ১৫৯
মামলুকীয় তুগরার লিখনরীতি ১৬২
বাংলার তুগরা লিখনশৈলী ১৬৪
অটোমান তুর্কি তুগরার লিখনশৈলী ১৭১
তুগরা লিপির সাধারণ বৈশিষ্ট্য ১৭৫
আধুনিক যুগে তুগরার ব্যবহার ১৭৬

সপ্তম অধ্যায় **১৭৯-২১৪**
পারস্যে আরবি লিপির প্রচলন ১৭৯
ভূমিকা ১৭৯
ফারসি লিপিকলার উৎপত্তির পটভূমি ১৮১
-কীলকাকৃতি লিখনরীতি ১৮১
-পাহলভি লিপি ১৮৩
-যন্দ লিপি ১৮৫
আরবদের পারস্য বিজয় ও আরবি ভাষা চর্চা ১৮৬
আধুনিক ফারসির অভ্যুদয় ও আরবি লিপির চর্চা ১৮৬
ফারসি লিপিকলার অভ্যুদয় ১৮৭
কুফি লিপিশৈলীর অনুশীলন ও পারসীয় কুফিরীতির উদ্ভব ১৮৭
প্রধান প্রধান ফারসি লিপিশৈলী ১৯০
ক. তালিক লিপিশৈলী ১৯০
খ. নাস্তালিক লিপিশৈলী ১৯৪
গ. শিকাস্তা ও শিকাস্তা আমিয ২০৫
ফারসি বা ইরানীয় ভাষাসমূহে আরবি বর্ণমালার ব্যবহার ২০৮
১. আধুনিক ফারসি ২০৮
২. আফগানী বা পশতু ভাষা ২০৯
৩. কুর্দি ভাষা ২১১
৪. বেলুচি ভাষা ২১১

অষ্টম অধ্যায় **২১৫-২৩০**
মাগরিবে আরবি লিপির প্রচলন ২১৫
মাগরিবি লিপির ধারাসমূহ ২১৬
ক. কায়রোয়ানি লিপিরীতি ২১৬
খ. আন্দালুসি লিপিরীতি ২১৬

www.pathagar.com

গ. ফেজি লিপিরীতি ২১৮
ঘ. সুদানি লিপিরীতি ২১৮
বর্তমানে প্রচলিত মাগরিবি লিপিরীতিসমূহ ২১৯
ক. তিউনিসি লিপিরীতি ২১৯
খ. আলজেরীয় লিপিরীতি ২১৯
গ. ফেজি লিপিরীতি ২১৯
ঘ. সুদানি লিপিরীতি ২১৯
আরবি বর্ণমালায় লিখিত মাগরিবের ভাষাসমূহ ২২০
ক. বার্বারি সিলহি ভাষা ২২০
খ. বার্বারি বা কাবাইলি ভাষা ২২০
গ. নুবি ভাষা ২২২
ঘ. হাওসি ভাষা ২২৪
ঙ. সাওয়াহিলি ভাষা ২২৫
চ. মালাগাছি ভাষা ২২৫
ছ. হাবশি ভাষাসমূহ ২২৭

নবম অধ্যায় ২৩১-২৪৪
তুর্কিস্তানে আরবি লিপির প্রচলন ২৩১
আরবি লিপির বিশিষ্ট তুর্কি ধারাসমূহ ২৩৩
ক. রুক'আ ২৩৩
খ. দিওয়ানি ২৩৪
গ. দিওয়ানে জলি ২৩৫
ঘ. সিয়াকত ২৩৬
তুর্কি ভাষাসমূহে আরবি বর্ণমালার ব্যবহার ২৩৭
ক. অটোমান তুর্কি ২৩৭
খ. কাজানি তুর্কি বা তাতারি ভাষা ২৩৯
গ. কারামি তুর্কি ২৩৯
ঘ. নুগাই বা কারাস তুর্কি ২৩৯
ঙ. আজারি তুর্কি ২৩৯
চ. দাগিস্তানি তুর্কি ২৪০
ছ. চেরকেসীয় ভাষা ২৪১
জ. আম্মুরগীয় বা কিরগিজীয় তুর্কি ২৪১
ঝ. জাগাতাই তুর্কি ২৪১
ঞ. তিক্কি তুর্কি ২৪২
ট. উজবেক তুর্কি ২৪২
ঠ. কাশগড় তুর্কি ২৪২

দশম অধ্যায় ২৪৫-২৫৯
ভারত ও দূর প্রাচ্যে আরবি লিপির প্রচলন ২৪৫
বিহারি লিপিরীতি ২৪৫
কাশ্মিরি লিপিশিল্প ২৪৮

www.pathagar.com

ভারতীয় ভাষাসমূহে আরবি বর্ণমালা ও লিখনরীতির ব্যবহার ২৫০
ক. উর্দু ভাষা ২৫০
খ. দখনি ভাষা ২৫১
গ. কাশ্মিরি ভাষা ২৫১
ঘ. সিন্ধি ভাষা ২৫১
ঙ. জাতকি ভাষা ২৫২
চ. মালকি বা মালয় ভাষা ২৫২
ছ. জাভি বা পেগন ভাষা ২৫৩
ফিলিপাইনে আরবি লিপির ব্যবহার ২৫৫
চীনে আরবি লিপির প্রচলন ২৫৬

একাদশ অধ্যায় ২৬০-২৭১
ইউরোপে আরবি লিপির প্রচলন ২৬০
স্পেনে আরবি লিপির প্রচলন ২৬০
ইউরোপের অন্যান্য দেশে আরবি লিপির প্রচলন ২৬২
ইউরোপের ভাষাসমূহে আরবি বর্ণমালার ব্যবহার ২৬৮
ক. আলজামিয়াডু ভাষা ২৬৮
খ. আলজামিয়া-পর্তুগিজ ভাষা ২৬৮
গ. হল্যান্ড ভাষা ২৬৯
ঘ. স্লাভিক ভাষা ২৬৯

দ্বাদশ অধ্যায় ২৭২-২৭৯
লিপিকলার বিকাশ ও সংরক্ষণে ধর্মের প্রভাব ২৭২
আরবি লিপিরীতির প্রভাবে যেসব লিপিরীতি বিলুপ্ত হয়ে যায় ২৭৫

ত্রয়োদশ অধ্যায় ২৮০-২৯৮
প্রসিদ্ধ লিপিকারগণ ২৮০
শ্রেষ্ঠ লিপিশিল্পীগণ ২৮০
ক. ইবনু মুকলা ২৮০
খ. ইবনুল বাওয়াব ২৮৩
গ. ইয়াকুত আল-মুস্তাসিমি ২৮৪
বিশিষ্ট লিপিকারগণ ২৮৬
ক. উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগের প্রসিদ্ধ লিপিকারগণ ২৮৬
খ. উমাইয়া ও আব্বাসীয় পরবর্তী যুগের প্রসিদ্ধ লিপিকারগণ ২৮৮
গ. প্রসিদ্ধ অটোমান তুর্কি লিপিকারগণ ২৮৯
ঘ. পারস্যের প্রসিদ্ধ লিপিকারগণ ২৯২
ঙ. মোগল আমলে ভারতের প্রসিদ্ধ মুসলিম লিপিশিল্পীগণ ২৯৩
চ. আধুনিক মিসরের প্রসিদ্ধ লিপিকারগণ ২৯৩

www.pathagar.com

ছ. আধুনিক দামিশকের প্রসিদ্ধ লিপিকারগণ ২৯৪
জ. আধুনিক ইরাকের প্রসিদ্ধ লিপিকারগণ ২৯৫
ঝ. আধুনিক লেবাননের প্রসিদ্ধ লিপিকারগণ ২৯৫
ঞ. বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ আরবি লিপিশিল্পীগণ ২৯৫

চতুর্দশ অধ্যায় ২৯৯-৩০৪
আরবদের লেখার প্রাচীন পত্রসমূহ ২৯৯
ক. পশুচর্ম ২৯৯
খ. বস্ত্র ৩০০
গ. বড়ো পাথর ও সাদা হালকা পাথর ৩০০
ঘ. হাড় ৩০১
ঙ. কাষ্ঠখণ্ড ৩০১
চ. খেজুর গাছের শুষ্ক ডালপালা ৩০১
ছ. পোড়া মাটি ৩০১
জ. ধাতব দ্রব্য ৩০১
ঝ. প্যাপিরাস ৩০১
ঞ. কাগজ ৩০২

উপসংহার ৩০৫
গ্রন্থপঞ্জি ৩০৬-৩১২

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়
লিপিশিল্পের উৎপত্তি

আদিকালে পৃথিবীতে মানুষ লিখতে পড়তে জানত না। তাদের না ছিল কাগজ-কালি, না ছিল কোনো অক্ষর বা বর্ণমালা। সেই নিরক্ষর যুগে তারা স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তার সাহায্যে পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান করত। সময়ের গতি পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের বিবেকবুদ্ধি বিকাশ লাভ করতে থাকে। এক পর্যায়ে এসে তারা নিজেদের মনোভাব ও চিন্তাধারা এবং মুখের ভাষা স্থান-কালের ব্যবধান অতিক্রম করে অনুপস্থিত, অজ্ঞাত ও অনাগত উদ্দিষ্ট জনের নিকট পৌঁছানোর কথা চিন্তা করে। তাছাড়া তারা বিভিন্ন তাগিদে নিজেদের ক্রিয়াকলাপ, লেনদেন ও কথাবার্তা সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রয়োজনীয়তাও প্রকটভাবে অনুভব করে। এর ফলে সভ্য সমাজে ক্রমে লিপির উদ্ভব হয়। কিন্তু অসভ্য সমাজে তা হয়নি। কেননা অন্তরের যে প্রয়োজনে মানুষের প্রকাশ-বেদনা অনুভূত হয় সে প্রয়োজন তাদের ছিল না। তদুপরি ভাষাকে স্থায়িত্ব দেওয়ার আবশ্যকতা অসভ্য জীবনে অননুভূত।[১]

কখন ও কীভাবে লিপির উদ্ভব ঘটেছিল তা সঠিক করে বলা কঠিন। কারণ এ ব্যাপারে বর্তমানে যেসব প্রামাণ্য উৎস ও তথ্য পাওয়া যায় সেগুলো থেকে আমরা লিপির উদ্ভব সম্পর্কে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি না। প্রাচীন লিপির বিভিন্ন প্রামাণ্য সূত্র পর্যালোচনা করে ধারণা করা হয় যে, আদিম স্তরে চিত্রাঙ্কন-প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছিল। দশ-বারো হাজার বছরেরও বেশি আগেকার মানুষ কোনো ঘটনা বা বস্তুকে স্থায়ীভাবে স্মরণ করে রাখার জন্য গুহার দেয়ালে বা প্রস্তর ফলকে চিত্র খোদাই করে রাখত। তখন তারা চিত্র অঙ্কনের জন্য আবিষ্কার করেছিল কয়লা, পাথর ও পাতার নির্যাস থেকে তৈরি জিনিসপত্র। প্রাচীন প্রস্তর যুগের[২] অনেক গুহাচিত্র দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আজও স্বমহিমায় বিদ্যমান।[৩] এ গুহাচিত্রগুলোই ছিল লিপি আবিষ্কারের প্রথম উদ্যোগ। আধুনিককালে অনুন্নত সমাজেও এ পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের এ রকম স্মারক আলেখ্য পদ্ধতি সুবিদিত।[৪]

অনেক প্রাচীন আরব ঐতিহাসিকের মতে, লিপিশিল্প আল্লাহরই নির্দেশিত একটি শিল্প। তিনি হয়তো তাঁর কোনো নবিকে বা কোনো বিশেষ বান্দাকে লেখার বর্ণ, পদ্ধতি ও কলাকৌশল শিক্ষা বা নির্দেশনা দান করেছিলেন। কাব আল-আহবার (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> হজরত আদম (আ.)ই সর্বপ্রথম আরবি, সিরিয়ক ও অন্যান্য সকল ধরনের লিখনপদ্ধতি অনুসরণ করে লিখেছেন। তিনি তাঁর মৃত্যুর তিনশত বৎসর পূর্বে সব ধরনের লেখা

www.pathagar.com

> মাটিতে লিখে পুড়িয়ে নেন। হজরত নুহ (আ.)-এর মহাপ্লাবনের পূর্ব পর্যন্ত এ লেখাগুলো কোনো একস্থানে সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু নুহ (আ.)-এর এ প্লাবন সব লেখাকে স্রোতের সাথে বয়ে নিয়ে বিভিন্ন জাতির মাঝে ছড়িয়ে দেয়। পরে প্রত্যেকটি জাতি এক এক ধরনের লিখনরীতি অনুসরণ করে লিখতে থাকে। আরবি লিপি হজরত ইসমাইল (আ.)-এর হস্তগত হয়েছিল।[৫]

কারো কারো মতে, হজরত ইদরিস (আ.)ই সর্বপ্রথম লেখার প্রথা চালু করেন।[৬] হজরত আবু যার্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "হজরত ইদরিস (আ.)ই সর্বপ্রথম কলমের সাহায্যে লিখেন।"[৭] এ ছাড়া অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে,

> হজরত ইদরিস (আ.)ই সর্বপ্রথম পুস্তকাদি পাঠ করেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিকট ৭টি সহিফা নাজিল করেন। তদুপরি তিনিই সর্বপ্রথম কাপড় সেলাই করেন এবং তা পরিধান করেন।[৮]

এ সমস্ত বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে ইব্‌ন ফারিস (রাহ.) ও অন্যান্য আরব ঐতিহাসিক বলেন, আল্লাহ তা'আলার শিক্ষা বা নির্দেশনায় সর্বপ্রথম লেখার সূত্রপাত হয়, চাই তা পরিপূর্ণ আকারে হোক বা আংশিকভাবে। তাঁরা পবিত্র কুরআন-এর ১. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ . (অর্থাৎ যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।)[৯] ও ২. ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (অর্থাৎ নূন, শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের, যা তারা লিপিবদ্ধ করে।)[১০] প্রভৃতি আয়াত দ্বারাও প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা হজরত আদম (আ.) বা অন্য কোনো নবিকে লেখার শিক্ষা দান করেছেন।[১১] কারো কারো মতে وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (অর্থাৎ আর তিনি আদম (আ.)কে সমস্ত বস্তুসামগ্রীর নাম শিখালেন।)[১২] আয়াতের মধ্যে বর্ণমালার জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত।[১৩] বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ সুয়ুতি (রাহ.)ও ইব্‌ন ফারিস ও অন্যান্য ঐতিহাসিকের উপর্যুক্ত মতকে সমর্থন করতে গিয়ে বলেন, হজরত ইবনু আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা أَوَّلُ كِتَابٍ أُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ أَبُوجَاد. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা উর্ধ্বলোক থেকে সর্বপ্রথম যে গ্রন্থটি নাজিল করেন, তা হলো أبوجاد অর্থাৎ বর্ণমালাসংক্রান্ত গ্রন্থ তাঁদের মতকে জোরালোভাবে সমর্থন করে।[১৪] ভারতেও আর্যদের মাঝে এ ধারণা প্রচলিত ছিল যে, সে দেশের সুপ্রাচীন লিপি 'ব্রাহ্মী' স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই সৃষ্টি করেছেন।[১৫] চীনা দেশের পরিব্রাজক উয়ান চুয়াঙ[১৬] লিখেছেন যে, ভারতবর্ষের বর্ণমালার বর্ণ বা অক্ষর তৈরি করেছেন ব্রহ্মা নিজে এবং তা অপরিবর্তিত রূপেই আজ পর্যন্ত চলে এসেছে।[১৭] প্রাচীন মিসরীয়দেরও ধারণা তাদের 'হায়ারোগ্লিফ্‌স' লিপি স্রষ্টার তৈরি।

প্রাচীন আরব ও অন্যান্য ঐতিহাসিকের উপর্যুক্ত মতটি মেনে নেওয়া কঠিন। কারণ জ্ঞান ও যুক্তিসম্মত ব্যাপার হলো—লিপিশিল্প মানব সভ্যতার একটি বড়ো নিদর্শন। মানুষই তা নিজস্ব প্রয়োজনে উদ্ভাবন করেছিল। প্রথম প্রথম তা জটিল, অপূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিপূর্ণ ছিল। মানব সভ্যতার বিকাশের পাশাপাশি তা উন্নতির ক্রমধারায় বর্তমান অবস্থায় পৌঁছে। দ্বিতীয়ত, তাঁদের দলিলগুলোও অত্যন্ত জোরালো ও স্পষ্ট নয়। তাই অনেক ঐতিহাসিক ও গবেষক এ মতের কঠোর সমালোচনা করেছেন।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ইবনু খালদুন (রাহ.) বলেন,

> এই শিল্পকর্ম নগর জীবনের স্বরূপ এবং এর জনসমাজের অনিবার্য ফলশ্রুতি। এর সম্ভাবনা মানুষের মধ্যে শিক্ষার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়। জনবসতি ও সভ্যতার ক্রমানুপাতে তাদের পরিপূর্ণতা বিধায়ক চরিত্রের ঔৎসুক্য ও চাহিদায় তা বিকশিত হয়। এজন্যই নগর জীবনে লিপির সৌন্দর্য অধিকতর বিকশিত হয়ে থাকে। অন্য দিকে আমরা অধিকাংশ প্রান্তরবাসীকে দেখতে পাই, তারা লিখতে ও পড়তে জানে না। তাদের মধ্যে যারা লিখতে-পড়তে জানে তাদের লিপি ও পাঠ ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে।[১৮]

লেখার উৎপত্তি সম্পর্কে পুরাকালে বিভিন্ন জাতির মাঝে নানা ধরনের মত ও ধারণা প্রচলিত ছিল। যেমন :

১. খ্রিষ্টানরা ধারণা করত যে, 'সিমর্‌স' নামক এক ফেরেশতা আদম (আ.)কে সিরিয়ক লিখনপদ্ধতির শিক্ষা দান করেছিলেন, যা আজও তাদের মাঝে প্রচলিত রয়েছে।[১৯]

২. পারসিকদের ধারণা ছিল যে, জমশিদ ইবন উঁজাহানই সর্বপ্রথম ফারসি রীতিতে লেখার ধারা শুরু করে। তাদের কথা হলো—সে যখন পৃথিবীর রাজত্ব লাভ করে এবং মানুষ ও দানব সকলেই তার অনুগত হয়ে যায়, উপরন্তু ইবলিসও তার বাধ্য হয়ে পড়ে তখন সে ইবলিসকে তার মনের কথা বাহ্য জগতে প্রকাশ করার নির্দেশ দেয়। এ পর্যায়ে ইবলিস তাকে লেখার শিক্ষা দান করে।[২০]

৩. ইহুদিদের ধারণা ছিল, আবির ইবন শালিখ সর্বপ্রথম হিব্রু রীতি অনুযায়ী লেখার সূত্রপাত করেন। পরে তাঁর জাতির লোকেরাও তাঁর প্রণীত রীতি অনুযায়ী লিখতে শুরু করে।[২১]

৪. গ্রিকবাসীদের ধারণা হলো যে, প্রাচীনকালে গ্রিকবাসীরা লিখনশিল্প সম্পর্কে অবগত ছিল না। একদা ঘটনাক্রমে মিসর থেকে দুজন লোক তাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়। তাদের একজনের নাম কিমাস এবং অন্যজনের নাম আগনুর। তারা ১৬টি বর্ণ সম্পর্কে জ্ঞান রাখত। গ্রিকবাসীরা তাদের নিকট থেকে প্রথমে সেই ১৬টি বর্ণ লেখার শিক্ষা লাভ করে। পরবর্তীকালে তাদের একজন আরো ৪টি বর্ণ উদ্ভাবন করে। গ্রিকবাসীরা তাদের নিকট থেকে এ ৪টি বর্ণেরও শিক্ষা লাভ করে। অতঃপর সমুনিদস নামক এক গ্রিকবাসী এ বর্ণগুলোর সাথে আরো ৪টি বর্ণ যোগ করে। এভাবে বর্ণের সংখ্যা ২৪-এ গিয়ে উপনীত হয়।[২২]

৫. ব্যাবিলনীয়দের ধারণা, মারডুক পুত্র দেবতা নেবো (Nebo) এবং রোমান দেবতা মার্কারি তাদেরকে বর্ণমালা উপহার দিয়েছে।[২৩]

৬. চীনাদের বিশ্বাস, তাদের চার চক্ষুওয়ালা ড্রাগন দেবতা স্যাং-চিয়েন (T` san chien) তাদের চীনা লিপি শিক্ষা দিয়েছেন।[২৪]

উপর্যুক্ত মত ও ধারণাগুলো অত্যন্ত দুর্বল ও অমূলক। কারণ এগুলোর স্বপক্ষে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকগণ এগুলো কোনো ধরনের বাছ-বিচার ছাড়াই কেবল জনশ্রুতি ও উপাখ্যান থেকে গ্রহণ করেছেন।

www.pathagar.com

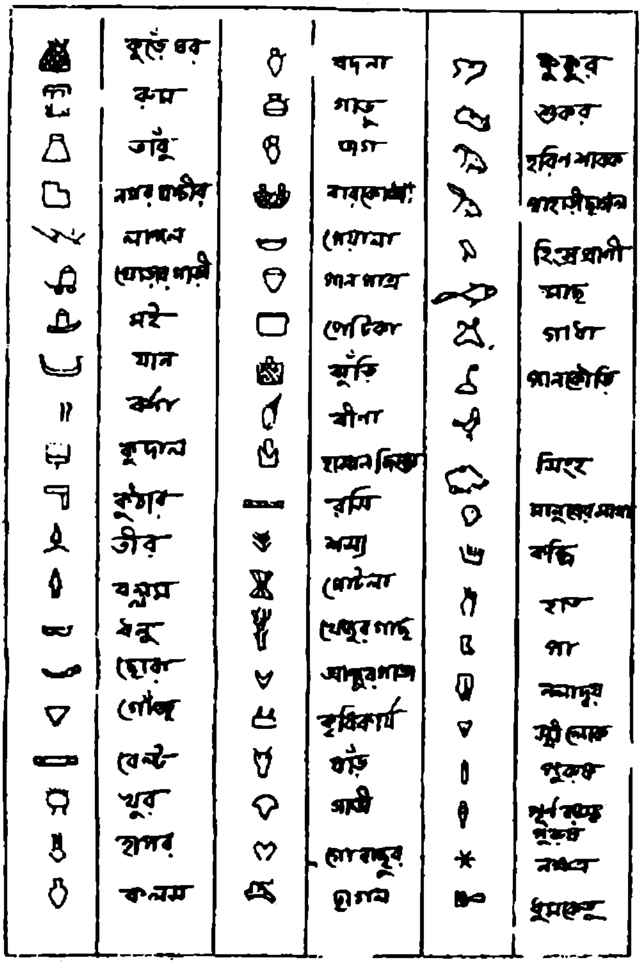

চিত্র-১: সুমেরীয়দের ব্যবহৃত চিত্র ও প্রতিকৃতির নমুনা

কারো কারো মতে, প্রস্তর যুগের শেষদিকে খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দের শেষভাগ ও ৩০০০ অব্দের প্রথমভাগে সুমেরীয়দের[২৫] হাতেই সর্বপ্রথম লিপিশিল্পের উদ্ভব ঘটে। তারা কাঠের তৈরি অতি সূক্ষ্ম অগ্রভাগবিশিষ্ট ত্রিকোণাকৃতির কলম দ্বারা নরম মাটির ট্যাবলেটে বিভিন্ন জীবজন্তুর চিত্র ও বস্তুর আকৃতি অঙ্কন করে মনের ভাব ও অনুভূতি প্রকাশ করত (দ্র. চিত্র-১)। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এটি একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। তাদের অনুসৃত লিখনরীতিটি 'কীলাকৃতি লিখনরীতি' (Cuneiform) নামে অভিহিত ছিল। এটি খ্রিষ্টপূর্ব ৫০ অব্দ পর্যন্ত যতদিন কীলকাকৃতি লিখনরীতির ব্যবহার প্রচলিত ছিল ততদিন চালু ছিল।[২৬]

www.pathagar.com

আধুনিক গবেষকদের মতে, লিপিশিল্প বর্তমানের নিপুণ শৈল্পিক অবস্থায় পৌঁছার পূর্বে চারটি প্রধান প্রধান সোপান অতিক্রম করে। এ সোপানগুলোকে প্রধান দু ভাগে ভাগ করা যায়।

এক. ভাবদ্যোতক লিখনপদ্ধতি(Idiogram)
দুই. ধ্বন্যাত্মক (Onamatopoetic) লিখনপদ্ধতি

এক. ভাবদ্যোতক লিখনপদ্ধতি (Idiogram)

এ রীতিতে ধ্বনি বা শব্দের পরিবর্তে নয়; কেবল ভাব ও মর্মের পরিবর্তে চিত্র ও চিহ্নসমূহ ব্যবহার করা হয় বলে একে 'ভাবদ্যোতক পদ্ধতি' নামে অভিহিত করা হয়। বিভিন্ন ভাষায় এ রীতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তন্মধ্যে প্রাচীন মিসর ও চীনের ভাষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন প্রামাণ্য উৎস ও প্রাপ্ত তথ্য থেকে বোঝা যায়, এটিই হলো পৃথিবীর প্রাচীনতম লিখনপদ্ধতি। উল্লেখ্য যে, এ পদ্ধতিটি পর পর দুটি ধাপ অতিক্রম করে। যথা :

ক. মূল চিত্র ও প্রতিকৃতির সাহায্যে লেখার প্রচলন

শুরুতে লোকেরা বর্ণ ও শব্দের পরিবর্তে জীব-জন্তু ও বস্তুর প্রকৃত চিত্র ও প্রতিকৃতি ব্যবহার করে লিখত। কেউ সিংহ বোঝাতে চাইলে সে একটি সিংহের প্রতিকৃতি অঙ্কন করত। এভাবে কেউ কোনো গাছ বোঝাতে চাইলে সে তার অভীষ্ট গাছের চিত্র আঁকত এবং কেউ শিকারের উদ্দেশ্যে যাত্রার কথা বোঝাতে চাইলে সে বর্শা হাতে শিকার তাড়ানোরত অবস্থায় কোনো ব্যক্তির চিত্র অঙ্কন করত। লিপিবিজ্ঞানীগণ লেখার এ পদ্ধতিকে 'চিত্রলিপি' (Picto-graphy) হিসেবে অভিহিত করেন।[২৭] এ লিপিচিত্র প্রধান প্রধান চারটি লিখনপদ্ধতিতে প্রকাশ লাভ করে। যথা-

১. মিসরের হায়ারোগ্লিফ্স (hieroglyphs) লিখনপদ্ধতি। মিসরের প্রাচীন অধিবাসীরা জীবজন্তু ও বস্তুর প্রতিকৃতি ও চিত্র ব্যবহার করে লেখার কাজ চালাত। প্রাচীন মিসরের এ চিত্রলিপিকে হায়ারোগ্লিফ্স অর্থাৎ 'পবিত্র লিখন' নামে অভিহিত করা হতো।

২. চৈনিক লিখনপদ্ধতি। এটি ২১৪টি মূলচিত্রের ওপর ভর করে গড়ে উঠেছিল। তন্মধ্যে প্রত্যেকটি চিত্রই ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করত। তাই চিত্রগুলোর সাথে সংযোজনকৃত রেখা ও তার প্রকৃতি থেকেই অভীষ্ট বিষয় নির্ধারণ করা হতো।

৩. অ্যাসুরিয়ান লিখনপদ্ধতি। এটি আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার/ চার হাজার বছর পূর্বে উদ্ভব হয়। পরে এ লিখনরীতিটি কীলকাকৃতি লিখনরীতি (Cuneiform)-এর রূপ পরিগ্রহ করে।

৪. হায়ছি (hythi) লিখনপদ্ধতি। এটি শামের প্রাচীন হায়ছি জনপদের লোকেরা ব্যবহার করত, যা পরবর্তীকালে ককেসাস অঞ্চল থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।[২৮]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ চিত্রলিপিটি মনোভাব প্রকাশের জন্য একটি অতি কষ্টকর পদ্ধতি ছিল। কারণ, প্রথমত এ পদ্ধতিতে মনোভাব প্রকাশের জন্য অজস্র চিত্র অঙ্কনের প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়ত বহু মনস্তাত্ত্বিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিক বিষয় চিত্রের সাহায্যে বোঝানো সম্ভব ছিল না।

www.pathagar.com

খ. প্রতীক ও সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে লেখার প্রচলন

চিত্রলিপির উপর্যুক্ত ত্রুটি ও অসুবিধার কারণে পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে জীবজন্তু ও বস্তুর মূল আকৃতি ও চিত্রের পরিবর্তে প্রতীক ও সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে লেখার কাজ শুরু হয়। এ পর্যায়ে লোকেরা বিভিন্ন প্রাণী, বস্তু ও বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য প্রতীক ও সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবহার করত। তখন কেউ নিজের বিষণ্ন অবস্থার কথা প্রকাশ করতে ইচ্ছে করলে সে ঝুলন্ত চুলের চিত্র এঁকে তা বোঝাত। এভাবে কেউ লেখার কথা প্রকাশ করতে চাইলে সে কলম ও দোয়াতের চিত্র অঙ্কন করত। তদ্রূপ তারা ব্যক্তির স্থূল দেহের চিত্র অঙ্কন করে তার বিত্তবান হওয়ার এবং সূর্যের চিত্র অঙ্কন করে দিনের দিকে ইঙ্গিত করত (দ্র. চিত্র-২)। এ লিখনপদ্ধতিকে লিপিবিজ্ঞানীগণ 'সাংকেতিক চিহ্নের লিখনপদ্ধতি' নামে অভিহিত করেন।[২৯]

চিত্র-২: সাংকেতিক চিহ্নে হায়ারোগ্লিফ্‌স লিপি

এ পদ্ধতিও পৃথিবীর অনেক দেশের লিখনপদ্ধতিতে প্রকাশ লাভ করে। যথা :

১. মিসরের হায়ারোগ্লিফ্‌স লিখনপদ্ধতি: চিত্রলিপির পর এতে সাংকেতিক চিহ্ন নির্ভর লিখনরীতির প্রচলন শুরু হয়। এতে অযৌগিক ও যৌগিক দু ধরনের সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হতো। যেমন এ রীতিতে সূর্যের চিত্র (একটি বৃত্ত ও তার মাঝখানে একটি বিন্দু) এঁকে দিন বোঝানো হতো এবং একটি তারকা ও এর ওপর ঢালুভাবে একটি চাঁদের চিত্র (মধ্যভাগে সামান্য স্ফীত ধনুক) এঁকে মাস বোঝানো হতো। এ লিপিতে প্রায় ২৫০০-এর মতো সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবহার ছিল।[৩০] আরবি লিখনপদ্ধতির মতো সাধারণত ডান দিক থেকে বাম দিকে এ সাংকেতিক চিহ্নগুলো সাজিয়ে লেখার কাজ সমাধা করা হতো।[৩১]

২. চৈনিক লিখনপদ্ধতি: এতেও বহুলভাবে সাংকেতিক চিহ্নের অনুপ্রবেশ ঘটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, এতে মানবতা বোঝানোর জন্য আরবি সংখ্যা "٨"-এর আদলে দুটি রেখা টানা হতো। এতে কমপক্ষে ৪৫০০ সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবহার রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এ রীতির সাহায্যে যদিও চিত্রনির্ভর নয়—এ ধরনের অনেক চিন্তাধারা ও মনোভাব প্রকাশ করা যায় এবং পর পর বিভিন্ন নিদর্শন ও চিহ্নের সমন্বয়ে কোনো

www.pathagar.com

কোনো ঘটনা পুরোপুরি বর্ণনা করা যায়; তথাপি এটিও চিত্রলিপির মতো একটি জটিল লিখনরীতি। কারণ প্রথমত, মানুষের ভাব ও চিন্তার কোনো শেষ নেই। অথচ সাংকেতিক চিহ্নের সংখ্যা যতই হোক না কেন তার একটি পরিসীমা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, প্রচুর সংখ্যক চিহ্নের ব্যবহারের ফলে এর শিক্ষা-দীক্ষা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আমরা দেখতে পাই, চীন দেশের অনেক যুবক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাদের যৌবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শেষ করেও চৈনিক লিখনরীতি পরিপূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে পারে না। তৃতীয়ত, এ ধরনের চিহ্নাদির সাহায্যে কোনো ভাব বা বক্তব্যকে অতি জোরালো বা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। কারণ মানুষের মনের যাবতীয় চিন্তা-চেতনা, মুখের সকল কথা-বার্তা ও তাদের সকল গতিবিধি সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে যথাযথরূপে প্রকাশ করা বাস্তবিকই দুরূহ ব্যাপার। তদুপরি দেখা যায়, এতে একটি ভাব প্রকাশ করার জন্য একাধিক চিত্র পাওয়া যায় না। অথচ বিভিন্ন ভাষায় প্রায়শ একটি ভাব ও মর্ম বোঝানোর জন্য একাধিক শব্দ পাওয়া যায়। তাই এ অবস্থায় এ ধরনের লিখনরীতি সন্দেহ ও দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[৩২]

দুই. ধ্বন্যাত্মক (Onamatopoetic) লিখনপদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে ভাব ও মর্মের পরিবর্তে নয়; কেবল প্রত্যেকটি ধ্বনির জন্যই পৃথক পৃথক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় বলে একে 'ধন্যাত্মক লিখনপদ্ধতি' নামে অভিহিত করা হয়। অনেক প্রাচীন ভাষায় এ লিখনপদ্ধতির ব্যবহার দেখা যায় এবং এটিই বর্তমানে প্রায় সকল সভ্য জাতির লিখনরীতি হিসেবে প্রচলিত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ পদ্ধতিও পর পর দুটি ধারা অতিক্রম করে পূর্ণতা লাভ করে।

ক. শব্দচিত্রের সাহায্যে লেখার প্রচলন

এ পদ্ধতিতে শব্দগুলোকে প্রথমে বিভিন্ন অংশে (Syllable) ভাগ করা হয়। অতঃপর শব্দের শুধু প্রথম অংশের চিত্র অঙ্কন করা হয় এবং এ অংশকেই পুরো নামে উচ্চারণ করা হয়। যেমন কেউ যদি يدرس শব্দ বোঝাতে চাইত, তখন সে শব্দটির প্রথম অংশ يد -এর দিকে ইঙ্গিত করার জন্য يد (হাত)-এর চিত্র অঙ্কন করত। অথচ তা দ্বারা হাত বোঝানো তার উদ্দেশ্য নয়; বরং يدرس শব্দের দিকে ইঙ্গিত করাই উদ্দেশ্য। এ ধরনের লিখনরীতিকে 'শব্দলিপি'(Phonogram) নামে অভিহিত করা হয়। আর একেই বর্ণ সৃষ্টির প্রথম সোপান হিসেবে গণ্য করা হয়।[৩৩]

পৃথিবীর বিভিন্ন লিখনরীতিতে এর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তন্মধ্যে হায়ারোগ্লিফ্স ও কিউনিফর্ম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হায়ারোগ্লিফ্সে সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবহার শেষে এর প্রকাশ ঘটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এ পর্যায়ে এসে এতে ওষ্ঠপুটের চিত্র অঙ্কন করে যে কোনো শব্দের را অংশের দিকে ইঙ্গিত করা হতো। তদ্রূপ কিউনিফর্মে হাতের চিত্র অঙ্কন করে যে কোনো শব্দের سو অংশের দিকে ইঙ্গিত করা হতো। এ রীতিতে মানুষের চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি ও কথাবার্তা- শব্দ কি বাক্য বা পৃষ্ঠার আকারে ব্যক্ত করা যদিও উপরিউক্ত রীতিসমূহের তুলনায় অনেকটা সহজ; তথাপি তাও একটি জটিল লিখনপদ্ধতি। তদুপরি এ রীতিতে ব্যবহৃত শব্দের শত শত চিত্র মুখস্থ রাখার প্রয়োজন পড়ে।

www.pathagar.com

খ. বর্ণের সাহায্যে লেখার প্রচলন

এ পর্যায়ে শব্দচিত্রের রেখা সংক্ষিপ্ত ও সাংকেতিক হয়ে আদলে দাঁড়াল এবং শব্দলিপিটি সমগ্র ধ্বনিসমষ্টিকে না বুঝিয়ে শুধু আদ্যধ্বনি নির্দেশ করতে লাগল। এ ব্যাপারকে বলে শীর্ষনির্দেশ (Acrology)। আদ্যধ্বনি নির্দেশের ফলে শব্দলিপির পরিণাম হলো অক্ষরলিপি (Syllabic Script)। যেমন প্রাচীন মিসরে যা ভাব লিপিরূপে বোঝাত ষাঁড় [আহোম] এবং শব্দলিপিরূপে [আহোম] এ ধ্বনিসমষ্টি, তা অক্ষর লিপিরূপে শুধু [আ] অক্ষরটিকে বোঝাতে লাগল। এ অক্ষর লিপি পরবর্তী পর্যায়ে ধ্বনিলিপি (Alphabetic Script) তে রূপান্তরিত হয়। যেমন প্রাচীন মিসরে সিংহীর [লাবোই] ছবি শব্দ লিপিতে হলো [লাবোই] এ ধ্বনিসমষ্টির দ্যোতক, অক্ষর লিপিতে হলো [লা] এ আদ্য অক্ষরে (Syllable-এর প্রতীক), এবং সবশেষে ধ্বনিলিপিতে [ল্] এ একক ধ্বনিচিহ্ন বা বর্ণ (Letter)।[৩৪] এ অবস্থায় এসেই লিখন শিল্প চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়, যা পরে ক্রমশ উন্নত থেকে উন্নততর হতে থাকে। এ রীতির সাহায্যে মানুষ বর্ণের পাশে বর্ণ বসিয়ে শব্দ ও বাক্য তৈরি করে তাদের যাবতীয় চিন্তা-চেতনা, কথাবার্তা ও গতিবিধি তথা সকল কিছুই সহজভাবে লিখতে সক্ষম হয়। এ লিখনরীতিকে 'বর্ণলিপি' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

বর্ণমালার উৎপত্তি

ইতঃপূর্বে লিখনশিল্পের প্রাথমিক স্তর চিত্রলিপি থেকে শুরু করে চূড়ান্ত স্তর বর্ণলিপি পর্যন্ত ক্রমবিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। আধুনিক গবেষক ও ঐতিহাসিকগণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রাপ্ত গুহা, পাথর, সমাধিস্থল ও দেয়ালগাত্র প্রভৃতিতে উৎকীর্ণ চিত্র ও নকশাসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই উক্ত মতে পৌঁছেছেন। তবে এ বিষয়ে আজও তাদের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় যে, বর্ণমালার মূল ভিত্তি কোনটি এবং তা কোথায় সর্বপ্রথম উৎপত্তি লাভ করে?

কারো কারো মতে সুমেরীয়রা খ্রিষ্টপূর্ব ৩২০০ সালে মেসোপটেমিয়ায় সাংকেতিক চিহ্নের লিখনপদ্ধতি ও ধ্বন্যাত্মক লিখনপদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কীলকাকৃতির বর্ণমালা উদ্ভাবন করে। ঠিক সে সময়ে মিসরীয়রাও মিসরে ধ্বন্যাত্মক লিখনপদ্ধতির দুটি ধারাই চর্চা করত এবং ক্রমে উভয় ধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে হায়ারোগ্লিফ্স বর্ণমালা উদ্ভাবন করে।[৩৫]

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হায়ারোগ্লিফ্স ও কীলকাকৃতির চিহ্নসমূহ প্রথম পর্যায়ে ধ্বন্যাত্মক বা বর্ণাত্মক ছিল না; ভাবদ্যোতক ছিল। অর্থাৎ উভয় রীতিতে ব্যবহৃত চিহ্নগুলো বস্তুর প্রকৃত চিত্র ও সাংকেতিক চিহ্নের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল। এগুলোর অধিকাংশই ধ্বনির পরিবর্তে নয়, বরং ভাবের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতো। তদুপরি রীতি দুটিতে ব্যবহৃত ধ্বন্যাত্মক চিত্রগুলোও বর্ণাকৃতির ছিল না, যা পৃথক পৃথক ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করে; বরং সেগুলো ছিল শব্দাংশের চিত্র, যা দুই বা ততোধিক ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করে। তবে হায়ারোগ্লিফ্সে এ ধরনের কয়েকটি চিত্রও পরিলক্ষিত হয়, যেগুলো পৃথক পৃথক ধ্বনির ইঙ্গিত বহন করে। যেমন এতে ওষ্ঠদ্বয়ের চিত্র '(◌)' দ্বারা 'র' ধ্বনির দিকে ইঙ্গিত করা হতো, যেমন আরবিতে ر বর্ণ দ্বারা 'র' ধ্বনির দিকে ইঙ্গিত করা হয়।

হায়ারোগ্লিফ্স বর্ণমালায় এ ধরনের ২৪টি চিত্র রয়েছে, যা তাদের ব্যবহৃত সবকটি ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করে।[৩৬] ঐতিহাসিক মায়ার্স বলেন,

> Perhaps the greatest achievment of the Egyptians was the working out of a system of writing. More than four thousand years before Christ they had developed a very curious and complex system, which was partly picture writing and partly alphabetic.
>
> –সম্ভবত প্রাচীন মিসরীয়দের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে এক প্রকার লিখনপদ্ধতির প্রচলন। যিশুখ্রিষ্টের জন্মের ৪ হাজারের অধিক বছর পূর্বে তারা আংশিকভাবে ছবির সাহায্যে এবং আংশিকভাবে অক্ষরের সাহায্যে এক প্রকার কৌতূহলোদ্দীপক ও জটিল লিখনপদ্ধতি প্রবর্তন করেছিল।[৩৭]

উল্লেখ্য যে, মেসোপটেমিয়া[৩৮] ও মিসরের লিপি চিহ্নসমূহ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার পেছনে উভয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক অবস্থার বিরাট ভূমিকা রয়েছে। মেসোপটেমিয়ার বাঁশ, কঞ্চি ও নলের সাহায্যে নরম মৃত্তিকা ফলকে লেখার কাজ সমাধা করা হতো। এ জন্যই সেখানে লেখাগুলো কীলকাকৃতির বা কৌণিকাকৃতির রূপ ধারণ করত (চিত্র. দ্র-৩)। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই লিপির নাম রেখেছেন Cuneiform (কীলকাকার)। এতে প্রাথমিক পর্যায়ে ত্রিকোণাকৃতির ছবি সাংকেতিক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ক্রমান্বয়ে সরলীকরণের মাধ্যমে সাধারণ প্রাকৃতিক বস্তু কীলকাকৃতির চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হয়ে লেখার কাজ সম্পন্ন হতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, এতে মানুষের মাথা, হাত, পা, কুঁড়ে ঘর, মানুষ প্রভৃতি ত্রিকোণাকৃতির পরিসর সৃষ্টি করে সাংকেতিক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।[৩৯] এ পদ্ধতিতে সাংকেতিক চিহ্নগুলো প্রত্যেকটি পৃথক পৃথকভাবে ব্যবহৃত হতো এবং প্রথম প্রথম সেগুলো ওপর থেকে নিচের দিকে সাজিয়ে, পরবর্তীকালে সাধারণত ডান দিক থেকে বাম দিকে সাজিয়ে লেখা হতো। এ লিখনরীতি মেসোপটেমিয়া থেকে ক্রমান্বয়ে আর্মেনিয়া, পারস্য ও ফিলিস্তিন প্রভৃতি এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল।[৪০] এ রীতির বহু প্রাচীন ও বিচিত্র লেখা অ্যাসিরিয়া, ব্যাবিলন ও ইরান প্রভৃতি স্থানে পাওয়া গেছে।[৪১] ইরানের প্রসিদ্ধ সম্রাট দারিউস (Darius) বেহিস্তানের পর্বত গাত্রে নিজের জীবন বৃত্তান্ত এই লিপির সাহায্যে তিন তিনটি ভাষায় খোদাই করে রেখে গেছেন। উল্লেখ্য যে, এ লিখনপদ্ধতি খ্রিষ্টপূর্ব সহস্রাব্দ শেষ হওয়ার পূর্বেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।[৪২]

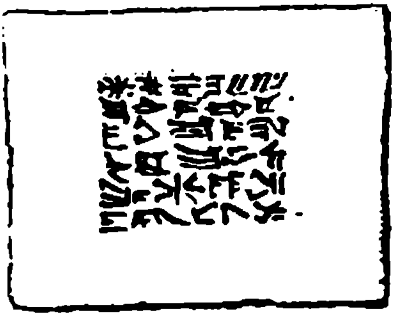

চিত্র-৩ : কীলকাকৃতি লেখার নমুনা
এতে বাদশাহ বুখত নসরের নাম ও উপাধি উৎকীর্ণ করা হয়

www.pathagar.com

মিসরে লেখার পত্র হিসেবে ব্যবহার করা হতো প্যাপিরাস[৪৩] নামক এক ধরনের খাগড়া। এগুলো মিসরের জলাশয়, ডোবা ও পুকুর প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। এতে লেখার ধরন কৌণিক বা কীলকারের রূপ ধারণ করার পরিবর্তে সহজ রূপ পরিগ্রহ করত। এ লিখনরীতি হায়ারোগ্লিফ্স নামে পরিচিত। হায়ারোগ্লিফ্স অর্থ পবিত্র। ধর্মীয় পুস্তকাদি এ লিপিরীতিতে লেখা হতো বলে একে এ নামে অভিহিত করা হয়।[৪৪]

প্রকৃতপক্ষে হায়ারোগ্লিফ্স নিরেট চিত্রলিপির চাইতে অনেক উন্নত ছিল। কারণ, তা ভাবাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক লিখনরীতিদ্বয়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল। এতে বস্তুর প্রকৃত চিত্র ও সাংকেতিক চিহ্নের পাশাপাশি শব্দাংশের চিত্র এবং বর্ণ চিহ্নও ব্যবহার করা হতো।[৪৫] এ লিখনরীতি ধর্মীয় গ্রন্থাদি এবং সরকারি চিঠিপত্র ও রেজিস্টার প্রভৃতি লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতো। এতে চিত্র ও চিহ্নগুলো আরবি লিখনপদ্ধতির মতো সাধারণত ডান দিক থেকে বাম দিকে সাজিয়ে লেখার কাজ সম্পন্ন করা হতো।[৪৬] মিসরে এ রীতি ছাড়াও আরো দু ধরনের লিখনরীতি প্রচলিত ছিল। এক. হায়ার‍্যাটিক্স (Hieraticks) : এর চিত্র ও চিহ্নগুলো হায়ারোগ্লিফ্সের তুলনায় অধিকতর সহজ ছিল বটে; তবে সেগুলো তার মতো সুশ্রী ও সুন্দর ছিল না। এটি কেবল মিসরের বিশিষ্ট শ্রেণির লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। দুই. ডায়ামেটিক্স (Diemoticks): এটি হায়ার‍্যাটিক্সের তুলনায় আরো অধিক সহজ-সরল ছিল। সর্বসাধারণের মাঝে এটি প্রচলিত ছিল। তারা পত্র যোগাযোগ, বাণিজ্যিক লেনদেন ও দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড লেখার ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করত (দ্র. চিত্র-৪, ৫ ও ৬)।[৪৭]

১. হায়ারোগ্লিফ্স বর্ণমালা
২. হায়ার‍্যাটিক্স বর্ণমালা
৩. ডায়ামেটিক্স বর্ণমালা

চিত্র-৪

চিত্র- ৫: হায়ার‍্যাটিক্স লিপি

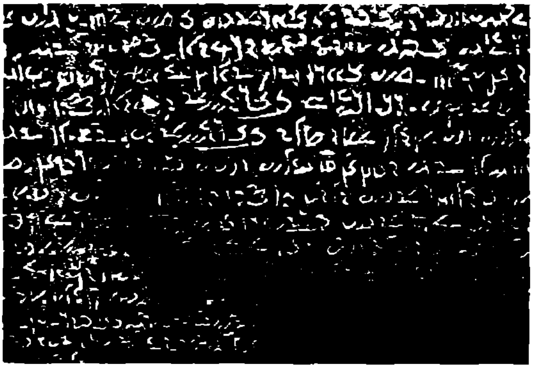

চিত্র-৬: ডায়ামেটিক্স লিপি

অনেক লিপিবিজ্ঞানীর মতে, হায়ারোগ্লিফ্‌সই হলো সকল প্রকারের বর্ণমালার মূল উৎস। তা থেকেই পৃথিবীতে প্রচলিত সকল প্রকারের বর্ণমালা উৎপত্তি লাভ করে। সর্বপ্রথম খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ থেকে ১৫০০-এর মধ্যে সিনাই তীরের সেমিটিক[৪৮] অধিবাসীরা হায়ারোগ্লিফ্‌সের পরিণত রূপ সম্পর্কে অবগত হয় এবং তারাই এর পথ ধরে সর্বপ্রথম বর্ণলিপি আবিষ্কার করে।[৪৯] তারা কোনো প্রাণী বা বস্তুর চিত্রকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে প্রথমাংশ গ্রহণ করত এবং তাকেই ঐ প্রাণী বা বস্তুর নামে অভিহিত করত। যেমন প্রথম বর্ণ 'আলিফ'-এর অর্থ ষাঁড়। হায়ারোগ্লিফ্‌সে এর জন্য ষাঁড়ের চিত্র অঙ্কন করা হতো। আর সিনাই তীরের অধিবাসীরা এর জন্য শুধু ষাঁড়ের মাথা অঙ্কন করত। তদ্রূপ দ্বিতীয় বর্ণ 'বা'-এর অর্থ ঘর। হায়ারোগ্লিফ্‌সে এর জন্য ঘরের চিত্র অঙ্কন করা হতো। আর সিনাই তীরের অধিবাসীরা এর জন্য শুধু ঘরের সম্মুখ ভাগের চিত্র অঙ্কন করত। এভাবে তারা ২২টি বর্ণ উদ্ভাবন করে, যা 'সিনাই তীরের বর্ণমালা' নামে পরিচিত ছিল। সিনাই তীরের সারাবিত আল-খাদিমে প্রাপ্ত খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৫০ সালের

www.pathagar.com

একটি প্রাচীন শিলালিপি এ কথার জোরালো সাক্ষ্য বহন করে যে, এটি (অর্থাৎ সিনাই তীরের বর্ণমালা) হায়ারোগ্লিফ্‌স থেকে উদ্ভূত। এটি হায়ারোগ্লিফ্‌স ও ফিনিশীয়[৫০] লিখনপদ্ধতির মধ্যবর্তী একটি পর্যায়, যা ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে গেছে।

সিনাইয়ে যে বর্ণমালা উৎপত্তি হয়েছিল তা কালক্রমে স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে পূর্ব দিকে বিস্তার লাভ করে সিরিয়া ও আরবদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং খ্রিষ্টপূর্ব ১২শ শতাব্দীতে তা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহৃত হতে থাকে। উল্লেখ্য যে, এ সকল অঞ্চলের প্রত্যেক প্রকারের বর্ণমালার মূল উৎস ছিল এই 'সিনাই তীরের বর্ণমালা'। তবে ইরাক ও মিসরে এর প্রচলন হয়নি। কারণ তখন ইরাকে কিউনিফর্ম ও মিসরে হায়ারোগ্লিফ্‌স লিখনপদ্ধতিচালু ছিল। দীর্ঘ কালপরিক্রমায় বর্ণমালার প্রাচীনতম এই সিনীয় রূপটি বদলে যায় এবং এর প্রণেতাদের প্রদত্ত নামগুলোও পরিবর্তিত হয়ে অন্য নাম ধারণ করে।[৫১]

অধিকাংশ আধুনিক গবেষকের মতে, বাণিজ্যপরায়ণ ফিনিশীয়রাই সর্বপ্রথম বর্ণমালা আবিষ্কার করে। প্রাচীনকালে ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন বন্দরে তাদের ব্যাবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়েছিল এবং বিভিন্ন জাতির লোকদের সাথে তাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ফলে তারা নিজেদের লেনদেন ও বহির্বাণিজ্যের তাগিদেই বর্ণমালা আবিষ্কার করেছিল। তাদের বর্ণমালা দ্রুতগতিতে লিখতে পারা যেত। তদুপরি তা অধিকতর অনায়াসসাধ্য, সহজ ও পরিপূর্ণ ছিল (দ্র.চিত্র-৭)। দক্ষিণ সিরিয়ার লাযিকিয়া (atakia)য় প্রাপ্ত রাসু শাম্মারার[৫২] শিলালিপিগুলো এ কথার জোরালো প্রমাণ বহন করে যে, ফিনিশীয় বর্ণমালাই হলো পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন বর্ণমালা। তবে সিনাইয়ের সারাবিত আল-খাদিমে প্রাপ্ত শিলালিপি দ্বারা বোঝা যায় যে, ফিনিশীয় বর্ণমালা ও হায়ারোগ্লিফ্‌সের চিত্রলিপির মাঝে একটি যোগসূত্র রয়েছে।[৫৩] তাই কেউ কেউ মনে করেন, ফিনিশিয়ার অধিবাসীরা হায়ারোগ্লিফ্‌সের চিত্রগুলোকেই কাট-ছাঁট করে বর্ণমালা উদ্ভাবন করেছিল।[৫৪] অন্য কারো মতে– ফিনিশীয়রা হায়ারোগ্লিফ্‌সের বেশ কয়েকটি বর্ণাত্মক চিত্রের সাথে সাদৃশ্য বজায় রেখে তাদের বর্ণলিপি আবিষ্কার করেছিল। তাদের মতে–ফিনিশীয়রা তাদের ২২টি বর্ণের মধ্যে ১৩টি বর্ণ হায়ারোগ্লিফ্‌স থেকে গ্রহণ করেছিল।[৫৫] আর কোনো কোনো গবেষকের মতে–ফিনিশীয়রা সিনাই তীরের বর্ণগুলোকে অধিকতর উন্নত ও মার্জিত রূপ দান করে ফিনিশীয় বর্ণমালা উদ্ভাবন করেছিল।[৫৬]

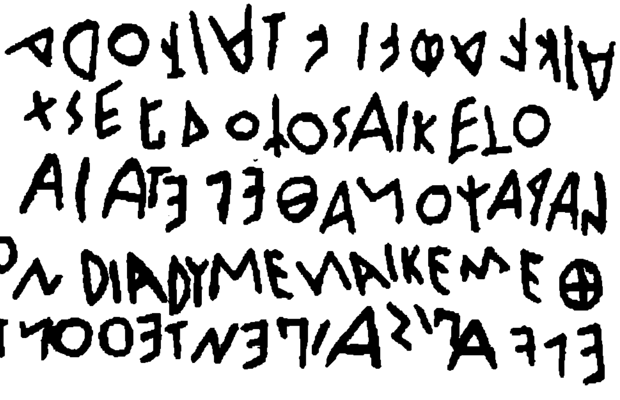

চিত্র-৭: ফিনিশীয় লিপি। এটি খ্রিষ্টপূর্ব ১১শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, ফিনিশীয়দের সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাচীন ভাষাভাষী ও জাতির যোগাযোগ ও সম্পর্ক থাকার কারণে তারাই সর্বপ্রথম চিত্রলিপি থেকে বর্ণমালা উদ্ভাবনের চিন্তাভাবনা শুরু করেছিল। তারা মিসর ও মেসোপটেমিয়ায় ব্যবহৃত স্থূল চিত্র ও সাংকেতিক চিহ্নাদির দীর্ঘকাল ধরে অনুশীলন করেছিল। এ সুবাদে তারা কালক্রমে বিভিন্ন উৎস থেকে নির্দিষ্ট কতিপয় বর্ণ সৃষ্টি করে বর্ণমালাভিত্তিক লেখার কাজ শুরু করে। হায়ারোগ্লিফ্সে ও কিউনিফর্মে যেখানে শত শত চিত্র ও চিহ্নের ব্যবহার ছিল, সে ক্ষেত্রে তারা লেখা ও শিক্ষাদানের সুবিধার্থে সেগুলোকে কমিয়ে কেবল ২২টি বর্ণের মধ্যে নিয়ে আসে। তারা বর্ণের চিহ্ন উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে বর্ণের বিশেষ্য রূপটি যে অর্থে ব্যবহৃত হতো তার চিত্রের প্রতি লক্ষ রাখত। যেমন 'আইন' বর্ণটির জন্য তারা ঝর্ণার প্রতি লক্ষ রেখে চিহ্ন নির্ধারণ করেছে। তাদের ভাষায় 'আইন' অর্থ ছিল ঝর্ণা। তদ্রূপ 'বা' বর্ণের জন্য ঘরের চিত্রের প্রতি লক্ষ রেখেই তার চিহ্ন নির্ধারণ করেছে। কারণ তাদের ভাষায় 'বা' অর্থ ছিল ঘর। এভাবে তারা অন্যান্য বর্ণের চিত্রগুলোও আবিষ্কার করেছিল।[৫৭]

চিত্র-৮: রাসু শাম্মারার বর্ণমালা। এটি সিরিয়ার লাযিকিয়া (atakia)-য় আবিষ্কার করা হয়।

www.pathagar.com

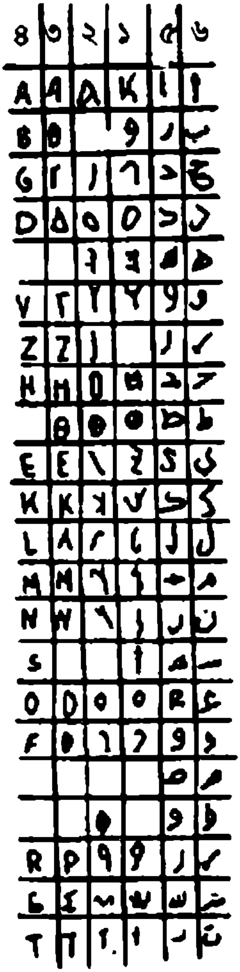

১. বাইব্লসের বর্ণমালা
২. খ্রিষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীতে ব্যবহৃত বাইব্লসের বর্ণমালা
৩. গ্রিক বর্ণমালা
৪.ল্যাটিন বর্ণমালা
৫.কুফি বর্ণমালা
৬. সুলুস বর্ণমালা

চিত্র-৯ : বাইব্লসের বর্ণমালা ও তা থেকে উৎপন্ন বর্ণমালাগুলোর তুলনা

উক্ত ফিনিশীয় বর্ণমালা ক্রমে আরো উৎকর্ষ লাভ করতে থাকে। সম্প্রতি রাসু শাম্মারায় এর বিকাশকালের একটি উন্নত শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, যা বর্তমানে দামিশ্‌ক জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। এটি প্রাচ্যবিদ M. Cloude Schaeffer ১৯৪৮ সালে আবিষ্কার করেন। এটি খুব সম্ভব খ্রিষ্টপূর্ব ১৪শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। এতে প্রাচীন সিরীয়-আরবদের অনুসৃত বর্ণগুলোসহ মোট ৩০টি বর্ণ রয়েছে (দ্র. চিত্র-৮)। কোনো কোনো গবেষক এগুলোকে ২৯টি হিসেবেও গণনা করেছেন। এর কারণ হলো, এতে সিনের দুটি ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি রয়েছে। তাই কেউ সিনের এ দুটি

www.pathagar.com

আকৃতিকে একটি বর্ণ হিসেবে, আর কেউ দুটি বর্ণ হিসেবে গণ্য করেছে।[৫৮] কারো কারো মতে—এ বর্ণগুলো কীলকাকৃতির বর্ণমালা থেকে উদ্ভূত। আর কারো মত হলো—এ বর্ণগুলোতে হায়ারোগ্লিফ্স ও কিউনিফর্ম উভয় প্রকার লিপির প্রভাব রয়েছে। কারণ, এগুলোতে লেখার বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির দিক থেকে কিউনিফর্মের প্রভাব এবং এর স্বরবর্ণগুলোর আকৃতি তৈরির ক্ষেত্রে হায়ারোগ্লিফ্সের প্রভাব লক্ষ করা যায়।[৫৯]

এ ছাড়া বাইব্লস[৬০] (Byblos)-এও একটি উন্নত শিলালিপি পাওয়া যায়। এটি বাইব্লসের বাদশাহ ইশুআলের পিতা আহিরাম (Ahiram)-এর সমাধিগাত্রে খ্রিষ্টপূর্ব ১৩শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ করা হয়। প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞানী P. Montet ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে এটি আবিষ্কার করেন। এই লিপির বর্ণগুলোকে আজ পর্যন্ত আরবি ও ল্যাটিন বর্ণমালার প্রাথমিক উৎস হিসেবে গণ্য করা হয় (দ্র. চিত্র-৯)।[৬১]

লিপির উৎপত্তি সম্পর্কে বহু মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ফিনিশীয়রা নানা জাতির সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ রক্ষা ও দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানোর সুবাদে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন জাতির মধ্যে তাদের বর্ণলিপির প্রচার ও প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়। অধিকাংশ সেমিটিক ভাষায় বর্ণমালার নামসমূহ এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, এগুলো ফিনিশীয় বর্ণমালা থেকে উদ্ভূত। কারণ, আরবি ও অন্যান্য সেমিটিক বর্ণের নাম ফিনিশীয় বর্ণগুলোর নামের মতোই। তদুপরি এ ফিনিশীয় বর্ণমালা থেকেই প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ বর্ণমালা উৎপত্তি লাভ করে।[৬২]

ফিনিশীয় বর্ণমালা থেকে অ্যারামাইক[৬৩] বর্ণমালা উৎপত্তি লাভ করে। অ্যারামাইক বর্ণমালা প্রথম অবস্থায় প্রায় ঠিক ফিনিশীয় বর্ণমালার মতোই ছিল। তবে পরবর্তীকালে তাতে বেশ পরিবর্তন সাধিত হয়। অ্যারামাইক বর্ণমালা থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত ইন্ডো-ব্যাক্টরিয়েন (Indo-Bactrien) বা খরোষ্ঠী[৬৪] বর্ণমালার উৎপত্তি হয়।[৬৫] তদ্রূপ নাবাতিরাও[৬৬] অ্যারামাইকদের নিকট থেকে বর্ণমালার শিক্ষা অর্জন করেছিল। তদুপরি নাবাতিদের সাথে ইয়েমেনবাসীদের যোগাযোগ ও মেলামেশা ছিল। এ সুবাদে ইয়েমেনবাসীরা নাবাতিদের নিকট থেকে অ্যারামাইক বর্ণমালার জ্ঞান লাভ করেছিল। তদুপরি তারা এগুলোতে কিছু পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করেছিল। উপরন্তু, এগুলোর সাথে আরো কয়েকটি বর্ণও তারা যোগ করেছিল। তাদের নতুন বর্ণগুলো হলো : ث خ ذ ض ظ غ। এগুলোকে একত্রে ثخذ ضظغ বলা হয়। এ বর্ণগুলো روادف নামে পরিচিত। এটিই ছিল তখনকার সময়ের জন্য একটি পরিপূর্ণ সর্বাধুনিক বর্ণমালা। একে সেবিঈন, হিমিয়রেটিক, মুসনাদিয়ন ও দক্ষিণ আরবের বর্ণমালা প্রভৃতি নামেও অভিহিত করা হয়। পরবর্তীকালে এ বর্ণমালা থেকে সকল ইথিও-সেমিটিক বর্ণমালার উৎপত্তি হয়।

এভাবে ফিনিশীয় বর্ণমালা থেকে প্রাচীন হিব্রু বর্ণমালা[৬৭] উৎপত্তি লাভ করে। অতঃপর প্রাচীন হিব্রু বর্ণমালা থেকে আধুনিক হিব্রু বর্ণমালার সৃষ্টি হয়। ফরাসি ভাষায় এটি Hebreu carre নামে পরিচিত। ব্যাবিলন থেকে ইহুদিদের নির্বাসনের পর থেকে আজ পর্যন্ত এ বর্ণমালাই কোনো ধরনের পরিবর্তন ছাড়া ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অনুরূপভাবে ফিনিশীয় বর্ণমালা থেকে তাদমুরিয়ন বা পামেরিয়ন[৬৮] বর্ণমালা উৎপত্তি লাভ করে। এর বর্ণগুলো আধুনিক হিব্রু বর্ণগুলোর সাথে অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ। অতঃপর ফিনিশীয় বর্ণমালা, মতান্তরে অ্যারামাইক বর্ণমালা থেকে সিরিয়ক বর্ণমালা

www.pathagar.com

জন্ম লাভ করে। আর এ সিরিয়ক বর্ণমালা[৬৯] থেকেই যাবতীয় মোগলিয়ন ও মানশুরিয়ন লিপির উৎপত্তি হয়। আরবরা নাবাতি ও সিরিয়ক—এ দু বর্ণমালার মাঝে অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে আরবি বর্ণমালার জন্ম দেয়। কিন্তু অধিকাংশ আধুনিক গবেষকের মতে, আরবি বর্ণমালা কেবল নাবাতি বর্ণমালা থেকেই উৎপত্তি লাভ করে। পরবর্তীকালে আরবি বর্ণমালা থেকে উর্দু ও আধুনিক ফারসি লিপির উদ্ভব হয়।

অনুরূপভাবে খ্রিষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দী নাগাদ ফিনিশীয় বর্ণমালা থেকে গ্রিক বর্ণমালা উৎপত্তি লাভ করে, যা প্রথমে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লিখে যেতে হতো। পরবর্তীকালে বাঁ দিক থেকে ডানে লেখার নিয়ম চালু হয়েছে, যার ফলে কোনো কোনো বর্ণের রূপ বদলে গেছে।[৭০] এ সমস্ত রদবদল হতে হতে গ্রিক অক্ষর থেকে প্রাচীন ল্যাটিন অক্ষর সৃষ্টি হয়। অতঃপর গ্রিক ও ল্যাটিন বর্ণমালা থেকে বর্তমানে ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত সব কটি বর্ণমালা উৎপত্তি লাভ করে (দ্র. চিত্র-১০)।[৭১]

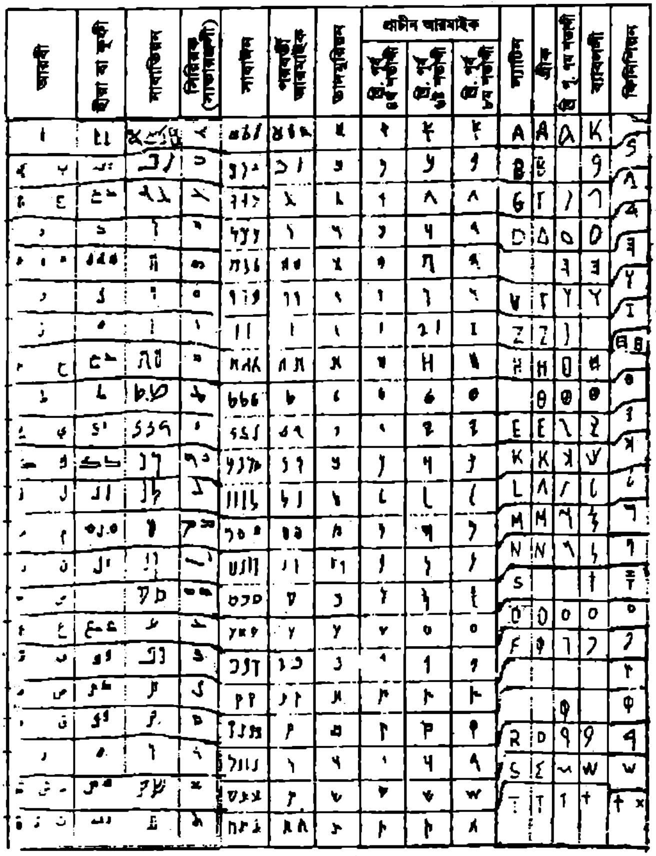

চিত্র-১০: ফিনিশীয় বর্ণমালা থেকে বিভিন্ন বর্ণমালার উৎপত্তি

www.pathagar.com

Dr. D. Deringer-এর মতে—আরবি, ফিনিশিয়ন, হিব্রু, অ্যারামাইক, সুরয়ানি প্রভৃতি বর্ণমালা মূল সেমিটিক (Proto Semitic) বর্ণমালা থেকে উদ্ভূত। পাশ্চাত্য লিপিবিদগণ অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন যে, গ্রিক, ইংরেজি প্রভৃতি ইউরোপীয় বর্ণমালার উৎপত্তিও সে মূল সেমিটিক বর্ণমালা থেকে।[৭২] কেউ কেউ প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, ভারতের প্রাচীনতম খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লিপি দুটিও এ সেমিটিক লিপি থেকে উদ্ভূত হয়েছে।[৭৩] নিম্নে Dr. D. Deringer-এর মতের ভিত্তিতে মূল সেমিটিক বর্ণমালার বংশাবলি নিম্নে অংকিত ছকে প্রদর্শিত হলো (দ্র.চিত্র-১১)।

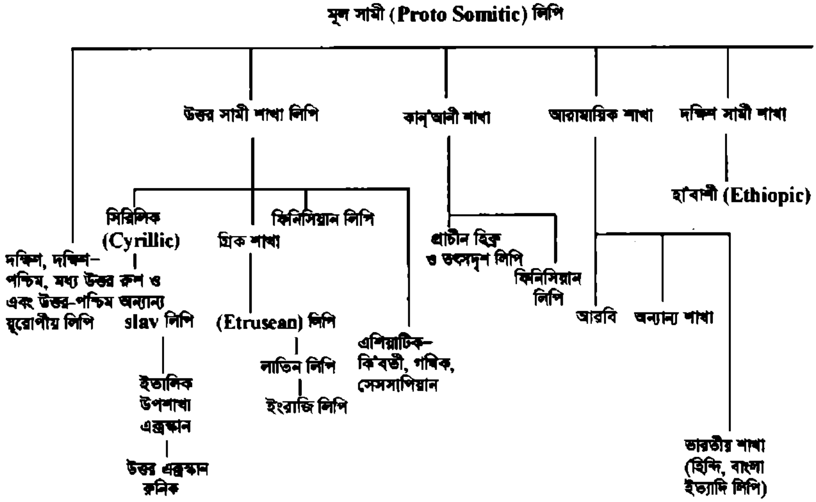

চিত্র-১১: মূল সেমিটিক বর্ণমালার বংশাবলি

লেখার লাইন

লিপিশিল্পে উন্নতির ছোঁয়া লাগার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পুরাকালে লেখার সুনির্দিষ্ট কোনো লাইন ছিল না। এজন্য সে সময়ে লোকেরা যখন যেভাবে সুযোগ হতো সেভাবেই লেখার কাজ সমাধা করে নিত, নির্দিষ্ট কোনো লাইনের ধারা মেনে চলত না। যেমন প্রাচীন গ্রিকরা কখনো বাম দিক থেকে ডান দিকে, কখনো ডান দিক থেকে বাম দিকে, আবার কখনো উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে লিখত।[৭৪]

যখন বিভিন্ন দেশ ও জাতিতে লিপিশিল্পের উন্নতি সাধিত হয় এবং বিভিন্ন নিয়মকানুন প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখন প্রত্যেকটি জাতি লেখার গতি-প্রকৃতি ও ধারার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করতে শুরু করে। যেমন চীনারা উল্লম্ব (vertical) ভাবে উপর থেকে নিচে এবং ডান দিক থেকে বাম দিকে করে লিখত। এ কারণে তাদের লিপিকে مشجر (figured with designs of plants) বলা হয়। তাদের এ ধরনের লেখার পেছনে মূল কারণ ছিল তাদের একটি বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাস। তারা মনে করত, ঈশ্বর উর্ধ্বাকাশে থাকেন। তাই প্রত্যেকটি

www.pathagar.com

কাজ ও বিষয়ের সূত্রপাত উপরের দিক থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ কারণে তারা উপরের দিক থেকে নিচের দিকে করে লিখতে থাকে।

ইউরোপীয়রা বাম দিক থেকে ডান দিকে করে লিখে। এর কারণ হলো, শরীরের বাম পার্শ্বে অবস্থিত হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত সঞ্চালন শুরু হয়। অনেকের মতে, হৃৎপিণ্ডই হলো জ্ঞানবুদ্ধির উৎসস্থল। তাই লেখার সূত্রপাতও সে জ্ঞানবুদ্ধির উৎসমূলের দিক থেকে হওয়া উচিত, যা থেকে হাতের আঙুল সাহায্য গ্রহণ করে। এজন্য তারা বাম দিক থেকে ডান দিকে লিখতে থাকে।

সেমিটিক জাতিগুলো, বিশেষ করে আরব ও সিরিয়করা ডান দিক থেকে বাম দিকে করে লিখে। কেননা মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক চাহিদা হলো, মানুষ প্রত্যেকটি কাজ কেবল তার ডান হাত দিয়ে সম্পন্ন করবে, যেমন সে এক দিক থেকে অন্য দিকে ফেরার সময় কেবল ডান পা দিয়ে ফিরে থাকে। এ কারণে তারা ডান দিক থেকে বাম দিকে করে লিখতে থাকে।[৭৫]

আধুনিক আরবি লিপিও সর্বত্র প্রাচীন ধারা অনুসরণ করে অনুভূমিক (horizontal) রেখায় ডান দিক থেকে বাম দিকে করে লিপিবদ্ধ করা হয়। তবে ড. বশারা যালযাল উল্লেখ করেছেন, কোনো কোনো জাতি যেমন সোমালীয়রা আরবি লিপি উল্লম্বভাবে উপরের দিক থেকে নিচের দিকে করে লিপিবদ্ধ করে এবং পড়ার সময় ডান দিক থেকে বাম দিকে পড়ে।[৭৬] এটি অবশ্যই একটি বিরল বর্ণনা।

তথ্যসূত্র

১ সেন, শ্রী সুকুমার, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, কলিকাতাঃ ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৭১, পৃ ১৪।

২ প্রাচীন প্রস্তরযুগঃ যে যুগে মানুষ প্রস্তর দ্বারা হননাদি করত এবং ধাতুর ব্যবহার জানত না। এ যুগ আজ থেকে ৬ লক্ষ বছর পূর্বে আরম্ভ হয়েছিল এবং তা ১০ হাজার বছর পূর্বে শেষ হয়েছিল।

৩ জার্মানির নিয়াণ্ডার্থাল ও ফ্রান্সের ক্রোম্যাগনন মানুষের যেসব গুহাচিত্র এখনও অক্ষুণ্ন রয়েছে, তার সময়কাল খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০০ বছর বলে মনে করা হয়।

৪ কোনো ঘটনার বা বিষয়ের স্মারক হিসেবে চিত্রাঙ্কন ছাড়া অন্য পদ্ধতিও কোনো কোনো দেশে প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে কোনো বিশেষ কর্তব্য স্মরণে রাখার জন্য মেয়েদের আঁচলে ও পুরুষদের কোঁচার খুঁটে গিঁট দেওয়া এখনো অজানা নয়। দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু দেশের প্রাচীন অধিবাসীরা রেড ইন্ডিয়ানদের মতো নানা রঙের দড়ির গুছিতে গিঁট বেঁধে বিশেষ বিষয় ও ঘটনা নথিভুক্ত করত। এ পদ্ধতির নাম কুইপু (Quipu) অর্থাৎ গ্রন্থিলিখন (সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৪-১৫)।

৫ সুয়ুতি, জালালুদ্দীন আবদুর রহমান, *আল-মুযহির ফি ইলমিল লুগাতি ওয়া আনওয়া'ইহা*, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তা.বি., খ ২, পৃ ৩৪১; কালকাশান্দি, আবুল আব্বাস আহমদ, *সুবহুল আ'শা*, কায়রোঃ আল-মাতবা'আতুল আমীরিয়্যা, ১৯১৬, খ ৩, পৃ ৬।

৬ তাশ কুবরি যাদাহ, আহমদ ইবনু মুস্তাফা, *মিফতাহ আস-সা'আদাহ ওয়া মিসবাহুস সিয়াদাহ*, হায়দ্রাবাদঃ মাতবা'আতু দায়িরাতিল মা'আরিফ আল-উসমানিয়্যা, ১৯৮০, খ ১, পৃ ৭৯।

www.pathagar.com

৭ সুয়ুতি, *প্রাগুক্ত*, খ ২, পৃ ৩৪৩।

৮ জাওয়াদ আলী, *আল-মুফাস্সল ফি তারীখিল আরব কাবলাল ইসলাম*, বৈরুতঃ দারুল ইলম, ১৯৭১, খ ৮, পৃ ১৯৭-১৯৮।

৯ আল-কুরআন, ৬:৪-৫।

১০ আল-কুরআন, ৬৮:১।

১১ সুয়ুতি, *প্রাগুক্ত*, খ ২, পৃ ৩৪৩।

১২ আল-কুরআন, ২:৩১।

১৩ তাশ কুবরি যাদাহ, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ৭৯।

১৪ সুয়ুতি, *প্রাগুক্ত*, খ ২,পৃ ৩৪৩।

১৫ হিরাচাঁদ ওঝা, গৌরী শংকর, *প্রাচীন ভারতীয় লিপিমালা*, (অনু. ও সম্পা.: অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্র নাথ মজুমদার), ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ ১।

১৬ উয়ান চুয়াঙ একজন বিখ্যাত পর্যটক ছিলেন। তিনি ৬২৯ খ্রি. থেকে ৬৪৯ খ্রি. পর্যন্ত ভারত সফর করেছেন।

১৭ হিরাচাঁদ ওঝা, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৩-১৪।

১৮ ইবনু খালদূন, আবদুর রহমান, *আল-মুকাদ্দামাহ*, (অনু.:গোলাম সামদানী কোরায়শী), ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮১, খ ২, পৃ ৭৩।

১৯ ইবনুন নাদীম, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, *আল-ফিহরিস্ত*, বৈরূতঃ মাতবা'আতুল খয়্যাত, ১৯৭২, পৃ ১৩।

২০ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৪।

২১ *প্রাগুক্ত।*

২২ *প্রাগুক্ত।*

২৩ হাসান আলীম, বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, *সাহিত্য সেমিনার স্মারক গ্রন্থ ২০০৮*, বি.আই.সি. ঢাকা, পৃ ২৯।

২৪ *প্রাগুক্ত।*

২৫ সুমেরীয়রা এশিয়ার পশ্চিমে টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিসের উর্বর উপত্যকায় বসবাস করত। প্রাচীনকালে তারা এক উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিল। তারাই সেমিটিকদেরকে বাড়িঘর ও চাষাবাদের কাজকর্ম শিখিয়েছিল এবং লেখার জ্ঞান দান করেছিল। সেমিটিক ও তাদের সংমিশ্রণে যে জাতি জন্ম নিয়েছিল ইতিহাসে তারা বাবিলি বা ব্যাবিলনিয়ন নামে খ্যাত।

২৬ রিফা'ঈ, বিলাল, *আল-খাত্তুল আরবি : তারীখুহু ওয়া হাদিরুহু*, বৈরুতঃ দারু ইবন কাছীর, দামিশক, ১৯৯০, পৃ ১৩।

২৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৬।

২৮ জাব্বুরি, মাহমুদ শুকুর, *আল-মাদরাসাতুল বাগদাদিয়্যাতু ফিল খাত্তিল আরবি*, বাগদাদ, ২০০১, খ ১, পৃ ২০-১; আফিফি, ফাওযি সালিম, *নাশআতু ওয়া তাতাওয়ারুল কিতাবাতিল খাত্তিয়া*, পৃ ১৪।

২৯ ইরানি, আবদুল মুহাম্মদ খান, *পয়দায়েশে খাত্ত ও খাত্তাতাঁ*, তিহরান, ১৩৪৬হি., পৃ ১২।

৩০ ওয়াফি, ড. আলী, আবদুল ওয়াহিদ, *ইলমুল লুগাহ*, কায়রোঃ মাকতাবাতু নাহদাতি মিসর, ১৯৬২, পৃ ২৪৬।

৩১ *Encyclopedia Britannica*, London: William Benton, vol. 11, P.-547.

www.pathagar.com

৩২ ওয়াফি, *ইলমুল লুগাহ*, পৃ ২৪৬।
৩৩ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৭।
৩৪ সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৫।
৩৫ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৮।
৩৬ ওয়াফি, *ইলমুল লুগাহ*, পৃ ৩৫।
৩৭ চৌধুরী, হাসান আলী, *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরি, ২০০৪, খ ১, পৃ ১৮ (Myers লিখিত' A Short History of Ancient Medieval and Modern Times' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত)।
৩৮ মেসোপটেমিয়া গ্রিক শব্দের ইংরেজি রূপ। এর অর্থ 'নদীঘেরা ভূমি'। প্রাচীন গ্রিসরা মেসোপটেমিয়া বলতে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী উর্বর ভূ-ভাগকে বোঝাত। প্রাচীনকালে মেসোপটেমিয়ার উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল ব্যাবলনিয়া নামে অভিহিত হয়। এর দক্ষিণাঞ্চল বা নিম্নভাগ ছিল অত্যন্ত উর্বর এবং সেখানে নানা ধরনের গাছগাছড়া ও শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। এখানে প্রাচীনকালে সুমেরীয়, অ্যাসিরীয়, ব্যাবিলনীয় ও ক্যালডীয় সভ্যতার উদ্ভব ঘটে।
৩৯ *Encyclopedia Britannica,* vol. -6, p. -867.
৪০ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৯।
৪১ কোনো কোনো গবেষকের মতে, ভারতবর্ষের প্রাচীনতম লিপি-ব্রাহ্মীও অ্যাসিরিয়ার কিউনিফর্ম থেকে উৎপন্ন। তবে অধিকাংশ গবেষকের মতে এ মতটি সঠিক নয়। কারণ, উভয় লিপির মধ্যে কোনো ধরনের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় না। ব্রাহ্মী বর্ণাত্মক ও অধিকতর সরল। আর কিউনিফর্ম প্রাথমিক অবস্থায় সর্বতোভাবে ভাবদ্যোতক বা চিত্রাত্মক ছিল। পরবর্তীকালে ইরানিরা তার বর্ণাত্মক রূপ দিয়ে থাকলেও চলতি কলমে ঐসব লেখা যেত না। তার প্রত্যেকটি অক্ষর তীরের ফলকের মতো চিহ্নের সাথে মিলিত হয়ে তৈরি এই কিউনিফর্ম-চীনা লিপির ন্যায় চিত্রলিপির মতো। তদুপরি তার লেখা সরল নয়; বিকট। (হিরাচাঁদ ওঝা, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৮)।
৪২ সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৬।
৪৩ প্যাপিরাস – বরুই বা শরকাণ্ডা জাতীয় তৃণ। এই তৃণ চার হাত পরিমাণ উঁচু হয়। এটার ডাঁটা বা কন্দ ত্রিধারা বা ত্রিকোণ। প্রথমে ঐ ডাঁটাগুলো ৪.৫ থেকে ৯.৫ ইঞ্চি পর্যন্ত টুকরা করা হয়। এর ছাল অথবা ডাঁটা থেকে অল্প চওড়া পাত বা পাট বের করে কোনো আঠালো দ্রব্যের সাহায্যে উক্ত পাত একখানা অপর খানার সাথে সেঁটে দিয়ে লেখার উপযোগী পত্র তৈরি করা হতো। এ পত্র প্রথমে উল্লিখিতভাবে জুড়ে শুকিয়ে নিয়ে হাতির দাঁত কিংবা শঙ্খের সাহায্যে ডলে ঘষে মসৃণ করা হতো এবং সমান করা হতো। এর পর এর ওপরে লেখা যেতো। এভাবে তৈরি পত্রকে ইউরোপীয়রা প্যাপিরাস বলত। উক্ত পত্রের ওপরে বিভিন্ন পুস্তক, চিঠি এবং প্রয়োজনীয় দলিলও লেখা হতো।
৪৪ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৯।
৪৫ ওয়াফি, *ইলমুল লুগাহ*, পৃ ২৪৭।
৪৬ *Encyclopedia Britannica,* vol. -11, p. -547
৪৭ ইরানি, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬-১৭।
৪৮ সেমিটিক : হজরত নুহ (আ.)-এর পুত্র সামের বংশধরগণ সেমিটিক নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

৪৯ আবু সিক্কিন, আবদুল হামিদ, *ফিকহুল লুগাহ*, কায়রোঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৯৮১, পৃ ১১৩।

৫০ ফিনিশিয়া : এশিয়ার উত্তর পশ্চিমে 'সিরিয়া' নামক দেশকে প্রাচীনকালে গ্রিক (ইউনানি) ও রোমানগণ 'ফিনিশিয়া' বলত। তাওরাতের বর্ণনা অনুযায়ী ফিনিশীয়রা হামের বংশধর। এরা আফ্রিকা থেকে আগমন করেছিল। প্রাচীনকালে তারা উচ্চস্তরের ব্যবসায়ী ছিল। ভূমধ্যসাগরের নানা বন্দরে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। তারাই ইউরোপীয়দের লেখা শিখিয়েছে এবং ইউরোপের প্রাচীন ও বর্তমান লিপি উভয়ই তাদের লিপি থেকে উৎপন্ন।

৫১ জাওয়াদ আলী, *প্রাগুক্ত*, খ ৮, পৃ ১৪৭; Hitti, *op.cit.*, p. 70-1.

৫২ রাসু শাম্মারা : লাযিকিয়্যা বা atakia-র নিকট অবস্থিত একটি আরব গ্রাম।

৫৩ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৯।

৫৪ *আদ-দিরাসাত আল-আদাবিয়্যা*, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৬০, পৃ ৪৪।

৫৫ ওয়াফি, *ইলমুল লুগাহ*, পৃ ৩৬।

৫৬ Hitti, *op.cit.*, p. 71

৫৭ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২২।

৫৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ ২৩।

৫৯ জাওয়াদ আলী, *প্রাগুক্ত*, খ ৮, পৃ ১৪৯।

৬০ বাইব্লস : ফিনিশীয়দের একটি প্রসিদ্ধ নগরের নাম।

৬১ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২৩।

৬২ ওয়াফি, *ফিকহুল লুগাহ*, কায়রোঃ দারু নাহদাতি মিসর, ১৯৭৩, পৃ ৩৫।

৬৩ অ্যারামাইক – অ্যারাম দেশীয়। প্রাচীন গ্রিকগণ টাইগ্রিস নদীর নিম্নাঞ্চলকে অ্যারাম নামে অভিহিত করত। এ কারণে এ অঞ্চলের অধিবাসীদেরকেও অ্যারামী বলা হতো। অ্যারামীরা সামের বংশধর। এরা আরবদেশ থেকে আগমন করেছিল। অতঃপর খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ সালের পরবর্তী এক সময়ে তারা সিরিয়ায় আগমন করেছিল। এজন্য তাদেরকে সিরিয়নও বলা হয়েছে।

৬৪ খরোষ্ঠী : ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের প্রাচীন ভাষা ও লিপিবিশেষ।

৬৫ বার্ণেলের মতে–ভারতবর্ষের প্রাচীনতম লিপি ও আর্য লিপির মূল ব্রাহ্মী লিপি ফিনিশীয় অক্ষর থেকে উৎপন্ন অ্যারামাইক অক্ষর থেকে উদ্ভূত হয়েছে (হিরাচাঁদ ওঝা, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৫)। উল্লেখ্য যে, এ ব্রাহ্মী লিপি থেকেই প্রাচীন ভারতবর্ষের নাগরি, শারদা, টাকরি, গুরুমুখী, কৈথি, বাংলা, মৈথিল, উড়িয়া, গুজরাটি, মোড়ি (মারাঠি), তেলেগু, কানাড়ি, গ্রন্থ, মালয়ালম, তুলু ও তামিল প্রভৃতি লিপি উদ্ভূত হয়।

৬৬ নাবাতিরা হজরত ইসমাইল (আ.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র নবায়ুতের বংশধর। ঐতিহাসিকগণ নবায়ুতকে সাধারণত নাবিত বলে উল্লেখ করেছেন। হজরত ইসমাইল (আ.)-এর মৃত্যুর পর নাবিত কাবা ঘরের মুতাওয়াল্লি ছিলেন। নাবাতিরা হিজাযের অধিবাসী ছিল। পরবর্তীকালে তারা সিরিয়া-ইরাক সীমান্তে হিজরত করে। প্রাচীনকালে তারা একটি উন্নত সভ্যতার অধিকারী হয়।

৬৭ প্রাচীন হিব্রু বর্ণমালা খ্রিষ্টপূর্ব ১৩শ শতাব্দী থেকে তথা হিব্রু ভাষার উৎপত্তিকাল থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীকাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এগুলোর আকৃতি প্রাচীন ফিনিশীয় বর্ণমালার আকৃতি থেকে বেশি তফাত ছিল না। হিব্রুরা ইসরাইলি জাতি। তারা খ্রিষ্টপূর্ব

www.pathagar.com

১৫০০ ও ১২০০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ে দক্ষিণ সিরিয়া ও প্যালাস্টাইনে বাস করেছিল এবং সেখানেই তাদের হিব্রু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

৬৮ তাদমুরিয়ন বা পামেরিয়ন – তাদমুর বা পামেরিয়ায় ব্যবহৃত বর্ণমালা। বর্তমান সিরিয়ার বিশাল অংশ জুড়ে বিস্তৃত একটি প্রাচীন রাজ্যকে ইউরোপীয়রা পামেরিয়া (Palmeria) নামে আখ্যায়িত করত। তবে স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট তা তাদমুর নামে পরিচিত ছিল।

৬৯ 'সিরিয়ক বর্ণমালা' প্রাচীনকালের বহুল প্রচলিত ও অধিকতর সমৃদ্ধ একটি বর্ণমালা। এটি খ্রিষ্টানদের জাতীয় ও ধর্মীয় বর্ণমালার মর্যাদা লাভ করেছিল। তাদের সাহিত্য ও ধর্মীয় পুস্তকাদি এ অক্ষরেই লেখা হতো এবং তা ইসলামের আবির্ভাবের বহুকাল পরেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।

৭০ ফিনিশীয় বর্ণমালার হে, বাব, কাফ এবং রেশ বর্ণ চারটি থেকে থেকে জাত গ্রিক এপসিলন, বাও, বাপ্পা এবং র্হো বর্ণচারটির রূপ পাল্টে গেছে। পরবর্তীকালে বাও (বাব) বর্ণের প্রচলন *উঠে* গেছে। (হিরাচাঁদ ওঝা, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৫৩)।

৭১ ওয়াফি, *ফিকহুল লুগাহ*, পৃ ৩৬-৩৭, *ইলমুল লুগাহ*, পৃ ২৪৭-২৪৮; হিরাচাঁদ ওঝা, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৭।

৭২ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রবন্ধঃ আরবি বর্ণমালা, ঢাকাঃ ইফাবা, খ ২, পৃ ৪৩৪

৭৩ ব্রাহ্মী বাম থেকে ডান দিকে এবং খরোষ্ঠী ডান থেকে বাম দিকে লেখা হতো। খরোষ্ঠী সেমিটিক লিপি থেকে উদ্ভূত। ব্রাহ্মীর উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ব্যুলার (Buehler) প্রভৃতি পণ্ডিতের মতে, এটাও মূলত সেমিটিক (সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৭)।

৭৪ উবাদাহ, আবদুল ফাত্তাহ, *ইনতিশারুল খাত্তিল আরবি ফিল আলামিশ শারকি ওয়াল গারবি*, মিসরঃ মাতবা'আ হিন্দিয়া বিল-মুসিকি, ১৯১৫, পৃ ২৯।

৭৫ কালকাশান্দি, *প্রাগুক্ত*, খ ৩, পৃ ২১।

৭৬ যালযাল, বাশারাহ, *তানভীরুল আযহান ফি ইলমি হায়াতিল হাইওয়ান ওয়াল ইনসান*, পৃ ২৩৮।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরবি লিখনশিল্পের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মত

পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মতো আরবরাও নিজেদের মনোভাব ও চিন্তাধারা প্রকাশ করার জন্য প্রাচীনকাল থেকেই লিখনপদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। তবে তারা স্মৃতি-শক্তির ওপর বেশিরভাগ নির্ভর করত। তারা কবিতা, অসিয়ত (অন্তিম উপদেশ), খুতবা (বক্তৃতা), প্রাচীন উপাখ্যান ও কুলজি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ও চিত্তবিনোদনের বিষয়াদি কেবল শুনেই যুগ যুগ ধরে মুখস্থ করে রাখত। লেখালেখির প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল নিতান্ত অল্প। তা সত্ত্বেও ইসলাম পূর্বকালে হিরার মুনযিরি ও লাখমিদের মধ্যে এবং সিরিয়ার গাস্‌সানিদের মধ্যে লেখার প্রচলন ছিল। তদনুরূপ মক্কার কুরাইশ, মদিনার আওস, খযরজ ও ইহুদি, তায়িফের সকিফদের মধ্যে এবং উত্তর আরবের দাওমতুল জন্দলেও লেখার প্রচলন ছিল।[১]

আরবদের মধ্যে লেখার সূত্রপাত কখন এবং কীভাবে হলো তা নিয়ে প্রাচীন ও আধুনিক গবেষক ও লিপিবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। নিচে এ মতগুলোর ওপর একটি পর্যালোচনা বিবৃত হলো–

১. আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্দেশিত

অনেক প্রাচীন আরব গবেষকের মতে, আরবি লিপি আল্লাহরই নির্দেশিত একটি শিল্পকর্ম। তিনি হয়তো তাঁর কোনো নবিকে বা বিশেষ কোনো বান্দাকে লেখার শিক্ষা বা নির্দেশনা দান করেছিলেন। হজরত আবু যার্‌র গিফারি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহ রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ, প্রত্যেক নবিকেই তো প্রেরণ করা হয়েছিল। তাই এখন জানার বিষয় হলো, তাঁদেরকে কোন জিনিস দ্বারা প্রেরণ করা হয়েছিল? রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, তাঁদেরকে এক একটি কিতাব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ, হজরত আদম (আ.)-এর ওপর কোন কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, আলিফ, বা, তা, ছা, জিম...। আমি বললাম, রাসুলুল্লাহ, অক্ষর কয়টি? তিনি বললেন, ২৯টি। আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমি গুনে আটাশটি পেলাম। এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ (সা.) এভাবে রাগান্বিত হলেন যে, তাঁর আঁখিযুগল রক্তিমাভ হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন, আবু যার্‌র, সে সত্তার কসম যিনি আমাকে সত্য সহকারে নবি হিসেবে প্রেরণ করেছেন! আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.)-এর ওপর ২৯টি বর্ণই নাজিল করেছেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ, সেখানে লাম-আলিফও রয়েছে। তিনি বললেন,

লাম-আলিফও একটি বর্ণ। আল্লাহ তা'আলা সত্তর হাজার ফেরেশতা যোগে একটি সহীফার মাধ্যমে তা নাজিল করেছেন। অতএব, যে লাম-আলিফের বিরোধিতা করে, সে আদম (আ.)-এর ওপর অবতীর্ণ কিতাবের সাথে কুফরি করল। আর যে

www.pathagar.com

> লাম-আলিফকে গণনা করল না, সে আমার দায়মুক্ত এবং আমিও তার দায়মুক্ত। উপরন্তু, যে এ ২৯টি বর্ণের প্রতি বিশ্বাস রাখবে না সে জাহান্নাম থেকে কখনো বের হতে পারবে না।[২]

এই রিওয়ায়াত থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, এতে আরবি বর্ণগুলোই উদ্দেশ্য। কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.) আবু যার্র (রা.)-এর প্রশ্নের জবাবে আলিফ, বা, তা, ছা, জিম ...প্রভৃতি বর্ণের কথা উল্লেখ করেছেন এবং উক্ত বর্ণগুলোর মধ্যে লাম-আলিফ শামিল থাকার বিষয়টি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখ্য যে, লাম-আলিফ আরবি বর্ণমালা ছাড়া অন্য কোথাও নেই। অতএব এ রিওয়ায়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হজরত আদম (আ.)-এর ওপর আরবি বর্ণমালা নাজিল করা হয়েছিল। কাব আল-আহবার [মৃ.৬৫২ খ্রি.] (রা.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতও এ মত সমর্থন করে। তিনি বলেন,

> হজরত আদম (আ.)ই সর্বপ্রথম আরবি, সিরিয়ক ও অন্যান্য সকল ধরনের লিখনপদ্ধতি অনুসরণ করে লিখেছেন। তিনি তাঁর মৃত্যুর তিনশত বৎসর পূর্বে সব ধরনের লেখা মাটিতে লিখে পুড়িয়ে নেন। হজরত নুহ (আ.)-এর মহাপ্লাবনের পূর্ব পর্যন্ত এ লেখাগুলো কোনো এক স্থানে সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু নুহ (আ.)-এর এ প্লাবন সব লেখাকে স্রোতের সাথে বয়ে নিয়ে বিভিন্ন জাতির মাঝে ছড়িয়ে দেয়। পরে প্রত্যেকটি জাতি এক এক ধরনের লিখনরীতি অনুসরণ করে লিখতে থাকে। আরবি লিপি হজরত ইসমাইল (আ.)-এর হস্তগত হয়েছিল।[৩]

আদম (আ.)-এর পর তাঁর পুত্র হজরত শিষ (আ.) আরবি লিপির উৎকর্ষ সাধন করেন।[৪] অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, আরবি বর্ণগুলো হুদ (আ.)-এর ওপর অবতীর্ণ করা হয়।[৫] এ দু ধরনের রিওয়ায়াতের মধ্যে বাহ্যত বিরোধ পরিলক্ষিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কারণ, এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, বর্ণগুলো প্রথমবার হজরত আদম (আ.)-এর ওপর অবতরণ করা হয়েছিল। পরে আরেকবার হজরত হুদ (আ.)-এর ওপর অবতরণ করা হয়। হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সর্বপ্রথম যিনি আরবি লিখনরীতিতে লেখেন তিনি হলেন হজরত ইসমাইল (আ.)।[৬] এ রিওয়ায়াতটিও উপর্যুক্ত মতের সমর্থন করে। কারণ, এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা হজরত ইসমাইল (আ.)-কে ওহির সাহায্যে আরবি লিখনরীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন।

এ মতটি অত্যন্ত দুর্বল। কারণ প্রথমত, এ মতটি জ্ঞান ও যুক্তিসম্মত নয়। কেননা জ্ঞান ও যুক্তিসম্মত ব্যাপার হলো—লিপিশিল্প মানব সভ্যতার একটি বড়ো নিদর্শন। মানুষই তা নিজস্ব প্রয়োজনে উদ্ভাবন করেছিল। প্রথম প্রথম তা জটিল, অপূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিপূর্ণ ছিল। মানব সভ্যতার বিকাশের পাশাপাশি তা উন্নতি লাভ করতে করতে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী ইবন খালদুন (রাহ.) বলেন,

> এই শিল্পকর্ম নগর জীবনের স্বরূপ এবং এর জনসমাজের অনিবার্য ফলশ্রুতি। এর সম্ভাবনা মানুষের মধ্যে শিক্ষার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়। জনবসতি ও সভ্যতার ক্রমানুপাতে তাদের পরিপূর্ণতা বিধায়ক চরিত্রের ঔৎসুক্য ও চাহিদায় তা বিকশিত হয়। এজন্যই নগর জীবনে লিপির সৌন্দর্য অধিকতর বিকশিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে আমরা অধিকাংশ প্রান্তরবাসীকে দেখতে পাই, তারা লিখতে ও পড়তে জানে না। তাদের মধ্যে যারা লিখতে-পড়তে জানে, তাদের লিপি ও পাঠ ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে।[৭]

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, এ মতের দলিলগুলো অত্যন্ত জোরালো ও সুস্পষ্ট নয়। তদুপরি বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে জানা যায়, আরবরা অতি প্রাচীনকাল থেকে ব্যবসায়ী জাতি হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। তারা নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে আরব উপদ্বীপের সীমানা পেরিয়ে ইয়েমেন ও সিরিয়ায় নিয়মিত আসা-যাওয়া করত। বিশেষত কুরাইশদের সাথে সিরিয়ার নাবাতি ও গাসসানিদের, হিরার মুনযির ও লাখ্মিদের এবং ইয়েমেনের দক্ষিণ আরবদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। এ সুবাদে তারা তাদের নিকট থেকে সভ্যতার অনেক নিদর্শনও গ্রহণ করেছিল।[৮] তাই খুব সম্ভব তারা তাদের নিকট থেকে লিখনশিল্পের জ্ঞানও অর্জন করেছিল।

২. মুসনাদ লিখনরীতি

কোনো কোনো গবেষকের মতে, ইসলাম-পূর্বকালে আরবরা ইয়েমেনের হিময়ারীয়দের অনুসৃত লিখনরীতি অবলম্বন করে লিখত। হিময়ারীয়দের লিখনরীতিকে তাদের দিকে সম্বন্ধ করে 'হিময়ারি লিখনরীতি' নামে অভিহিত করা হতো। তবে তা 'মুসনাদ' লিখনরীতি নামে সমধিক পরিচিত ছিল। মুসনাদ অর্থ হেলানো, ঠেসানো। এ রীতির বর্ণগুলো বিভিন্ন প্রাচীর গাত্রে খুঁটি দিয়ে হেলানো হতো বলে একে এ নামে অভিহিত করা হতো।[৯]

উল্লেখ্য, মুসনাদ লিখনরীতি ফিনিশীয়[১০] লিখনরীতি থেকে উদ্ভূত। বিভিন্ন দিক থেকে ফিনিশীয় রীতির সাথে এর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে এর সুন্দর বিন্যাস প্রক্রিয়া এবং অধিকাংশ শব্দের জ্যামিতিক আকৃতি তাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। অধিকাংশ সময় তা ডান দিক থেকে বাম দিকে সোজাসুজিভাবে লিপিবদ্ধ করা হতো। তবে কখনো সর্পিল রীতিতেও লেখা হতো অর্থাৎ প্রথম লাইন ডান দিক থেকে বাম দিকে, দ্বিতীয় লাইন বাম দিক থেকে ডান দিকে, আবার তৃতীয় লাইন ডান দিক থেকে বাম দিকে এবং চতুর্থ লাইন বাম দিক থেকে ডান দিকে করে লেখা হতো। এতে ২৯টি বর্ণ ছিল। প্রত্যেকটি বর্ণ এক একটি স্বরের সাংকেতিক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তবে এতে প্রাচীন সেমিটিক লিখনরীতিসমূহের মতো দীর্ঘ কিংবা হ্রস্বস্বরসমূহের জন্য কোনো সাংকেতিক চিহ্ন ছিল না। এজন্যই প্রাচীন ইয়েমেনের ভাষাসমূহের শব্দাবলির বাচনভঙ্গি সুনিশ্চিতভাবে জানতে পারা যায় না। এ ভাষাগুলোর নিদর্শনাদি কেবল উপর্যুক্ত রীতিতে লিখিত চিত্রলিপিগুলোর সূত্রেই পাওয়া যায়। আর এতে দীর্ঘ বা হ্রস্বস্বরের জন্য কোনো বর্ণ না থাকায় প্রত্যেকটি শব্দ কয়েকভাবে উচ্চারণ করার সম্ভাবনা থাকে।[১১] আমরা ১নং চিত্রে মুসনাদ রীতির একটি নমুনা দেখতে পাই।

অনেকের মতে এই লিখনরীতিই হলো আরবি লিখনরীতির মূল। এ রীতি থেকে আরবি লিখনরীতির উৎপত্তি হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ১ম ও ২য় শতাব্দীতে সাবা ও হিময়ারীয়দের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি উত্তর আরবে বিস্তৃতি লাভ করার সুবাদে তাদের ব্যবহৃত লিখনরীতিও সেসব এলাকায় প্রসার লাভ করেছিল। বিশেষ করে সাবা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাগণ দক্ষিণ আরব থেকে এসে নজদের উত্তরে উপনিবেশ স্থাপন করার ফলে উত্তর আরবে এ লিখনরীতির বেশ প্রসার ঘটেছিল।[১২] ইসলামের শুরুতেও

www.pathagar.com

ইয়েমেনের কিছু লোক দীর্ঘদিন ধরে এ লিখনরীতি অনুসরণ করে লিখত। তবে যে রীতি অনুসরণ করে কুরআন লিপিবদ্ধ করা হতো তারা তাও জানত। তবে তারা মুসনাদ রীতি থেকে পার্থক্য করার জন্য তাকে 'আরবি লিখনপদ্ধতি' নামে আখ্যায়িত করত।[১৩]

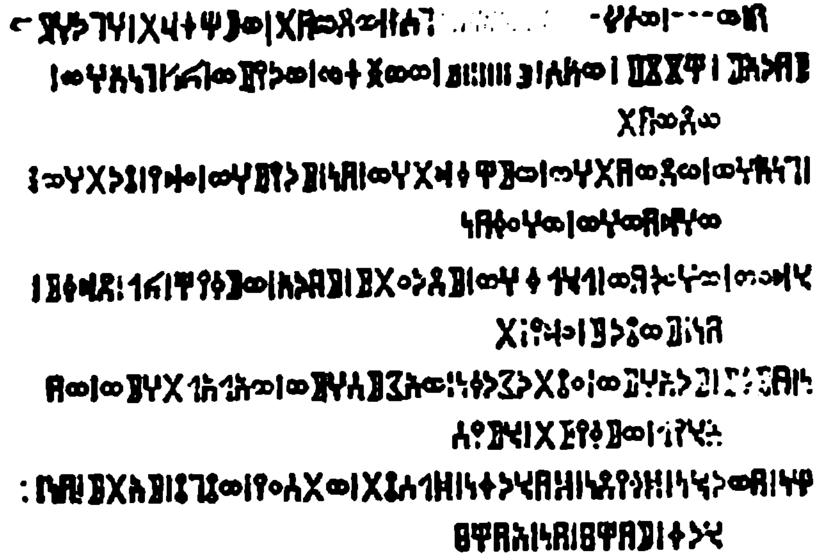

চিত্র-১: মুসনাদ লিপি

সম্প্রতি প্রাচ্যবিদগণ হিজাজের উচ্চভূমিতে বেশ কিছু শিলালিপি উদ্ধার করেছেন। প্রাচীন ইয়েমেনি-আরবির শিলালিপিগুলোর সাথে এগুলোর বেশ মিল রয়েছে। তদুপরি এগুলোর ভাষাও মু'আল্লাকা ও কুরআনের ভাষার নিকটবর্তী। এজন্যই অনেকে মনে করেন, আরবি লিপি উপর্যুক্ত মুসনাদ রীতি থেকে উদ্ভূত এবং তার একটি শাখা। এ শিলালিপিগুলো হলো–

ক . লিহ্য়ানি শিলালিপিসমূহ

এ শিলালিপিগুলোকে লিহ্য়ান গোত্রের দিকে সম্বন্ধ করে 'লিহ্য়ানি শিলালিপি' নামে অভিহিত করা হয়। এ শিলালিপির অধিকাংশই উত্তর হিজাজের উচ্চভূমি থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। এ শিলালিপিগুলোকে দু' ভাগে ভাগ করা যায়। অতি প্রাচীন শিলালিপি এবং পরবর্তীকালের শিলালিপি। কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে শিলালিপিগুলোর উৎকীর্ণের তারিখ জানা যায় না। যতটুকু অনুমান করা যায়, তার মধ্যে প্রাচীনতম শিলালিপিটি খ্রিষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর পরে এবং কনিষ্ঠ শিলালিপিটি খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর আগে উৎকীর্ণ করা হয়। এগুলোর অধিকাংশে লিহ্য়ান গোত্রের বাদশাহদের নাম, উপাধি ও স্তুতিবাদ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ রয়েছে। এগুলো লেখার ধরন মুসনাদ রীতি থেকে উদ্ভূত এবং ডান দিক থেকে বাম দিকে সোজাসুজিভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।

www.pathagar.com

খ. সামুদি শিলালিপিসমূহ

কাওমে সামুদের দিকে সম্বন্ধ করে এগুলোকে 'সামুদি শিলালিপি' নামে অভিহিত করা হয়। পবিত্র কুরআনের কয়েক জায়গায় তাদের ও তাদের বাসস্থানের আলোচনা রয়েছে। মধ্য আরব ও উত্তর আরবের বিভিন্ন জায়গায় এ শিলালিপিগুলোর অধিকাংশই আবিষ্কার করা হয়। আরবদের ধারণা, এ এলাকাগুলোতে কাওমে সামুদের বসবাস ছিল। এ শিলালিপিগুলো বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে বিভিন্ন প্রকারের। মনে করা হয়, এগুলো খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী ও খ্রিষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে উৎকীর্ণ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, এ শিলালিপিগুলোর লেখার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য প্রায় লিহ্য়ানি শিলালিপিগুলোর লেখার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের মতোই। লিহ্য়ানি শিলালিপিগুলোর মতো এগুলোর লেখার ধরন ও রীতিও মুসনাদ রীতি থেকে গৃহীত। তবে এগুলো সৌন্দর্য ও সুশৃঙ্খল বিন্যাস প্রক্রিয়ার দিক থেকে লিহ্য়ানি লিখনরীতির চাইতে অনেকখানি অপরিপক্ক। তদুপরি লেখার ধারাও সর্বদা একই অবস্থায় থাকে না। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপর থেকে নিচের দিকে করে লেখার কাজ সম্পন্ন করা হয়।

গ. সাফাভিয়া শিলালিপিসমূহ

'সাফা' এলাকার সঙ্গে সম্বন্ধ করে এ শিলালিপিগুলোকে 'সাফাভিয়া শিলালিপি' নামে অভিহিত করা হয়। এ শিলালিপিগুলো হুরান নগরীর অন্তর্গত লাজাতের পূর্বে অবস্থিত সাফা এলাকার বিভিন্ন উপত্যকা ও দ্রুজ পর্বতের মাঝামাঝি পাথুরে ভূমিতে আবিষ্কৃত হয়। এগুলো খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময়ে উৎকীর্ণ করা হয়। এগুলোর লেখার ধরন ও রীতি অনেকাংশে লিহ্য়ানি রীতির মতোই। তবে এগুলোতে লেখার ধারা বিভিন্ন ধরনের। কখনো ডান দিক থেকে বাম দিকে, আবার কখনো বাম দিক থেকে ডান দিকে।[১৪]

উপর্যুক্ত তিন ধরনের শিলালিপি প্রায় নয় শতাব্দীকাল ধরে আরব দেশে প্রচলিত লেখার প্রতিনিধিত্ব করে। এগুলোতে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এগুলোর ভাষা ও উচ্চারণ প্রচলিত আরবি ভাষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু গরমিলও রয়েছে। তন্মধ্যে নির্দিষ্টসূচক অব্যয় (حرف التعريف)-এর ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ। আরবিতে নির্দিষ্টসূচক অব্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় 'ال' আর শিলালিপিগুলোতে কান'আনি ও প্রাচীন হিব্রুর মতোই নির্দিষ্টসূচক অব্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে 'هاء'। তাছাড়া দক্ষিণ আরবের মুঈনিয়্যাহ, সাবিইয়্যাহ, কাতবানিয়্যাহ ও হিময়ারিয়্যাহ প্রভৃতি মুসনাদ রীতির লিখনরীতিসমূহে নির্দিষ্টসূচক অব্যয় হিসেবে শব্দের শেষে নুন ব্যবহার করা হয়।[১৫]

এ মতটিও বিভিন্ন কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত, ইয়েমেনের হিময়ারি লিপিসমূহের সাথে উত্তর আরবের লিপিসমূহের কোনো সুস্পষ্ট সম্পর্ক দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত, হিময়ারি শিলালিপিসমূহ কেবল মাদয়ান এলাকায় আবিষ্কৃত হয়েছে। এমনকি ইয়েমেনের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তৃতির সময়ও অন্য কোথাও এ রীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। উপরন্তু, মাদয়ান, সাফা, লিহ্য়ান ও সামুদ গোত্রগুলোর মাঝেও এর

www.pathagar.com

প্রচলন কেবল ইয়েমেনের রাজনৈতিক প্রভাবের কারণেই ছিল। যখনই সেসব এলাকায় তাদের প্রভাব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, তখন সাথে সাথেই সেসব এলাকায় তাদের লিখনরীতিও পরিত্যক্ত হয় গিয়েছিল।[১৬] তৃতীয়ত, আপাতদৃষ্টিতে জানা যায় নাবাতিরা[১৭] ইসলাম-পূর্বকালে আরবদের সাথে মিশে গিয়েছিল এবং দৈনন্দিন জীবনে তারা ভাষা হিসেবে আরবিকে গ্রহণ করেছিল। উপরন্তু আরবের লোকেরা লিহ্য়ানি, সামুদি ও সাফাভি প্রভৃতি লিপি ছেড়ে নাবাতিদের লিপি গ্রহণ করেছিল এবং সেই লিপির মাধ্যমেই নিজেদের যাবতীয় লেখার কাজ সম্পন্ন করত। চতুর্থত, যেসব রিওয়ায়াত দ্বারা বোঝা যায়, মক্কাবাসীরা ইয়েমেনিদের নিকট থেকে লেখার যে জ্ঞান অর্জন করেছিল সেগুলো অত্যন্ত দুর্বল ও বিরল বর্ণনা। এর বিপরীত যে রিওয়ায়াতগুলো দ্বারা জানা যায়, মক্কাবাসীরা হিরাবাসী বা নাবাতিদের নিকট থেকে প্রত্যক্ষভাবে যে লেখার জ্ঞান অর্জন করেছিল সেগুলো অধিকতর প্রসিদ্ধ ও শক্তিশালী।[১৮]

এ ক্ষেত্রে আশ্চর্যের বিষয় হলো, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কালকাশান্দি ইবনু হিশামের সূত্রে বর্ণনা করেন, "যিনি সর্বপ্রথম আরবিতে লিখেন তিনি হলেন হিময়ার ইবনু সাবা। তাঁকে স্বপ্নেই লিখনপদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হয়।" অথচ ইয়েমেনবাসীরা তাঁর জন্মের অনেক আগে থেকেই মুসনাদ রীতি অনুসরণ করে লিখত। অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী এ মুসনাদ রীতির প্রবর্তক হলেন হজরত হুদ (আ.)। তাই তাঁর সঙ্গে إسناد সম্বন্ধ করে এ লিখনরীতিকে مسند (মুসনাদ) নামে অভিহিত করা হয়। তাছাড়া উপর্যুক্ত বর্ণনাটি ইতঃপূর্বে বর্ণিত রিওয়ায়াত – "আরবি লিখনরীতি হজরত হুদ (আ.)-এর ওপর নাজিল করা হয়"-এরও সুস্পষ্ট পরিপন্থি।[১৯]

৩. জাজম বা হিরি লিখনরীতি

কোনো কোনো গবেষকের মতে, 'খত্তুল জাজম' (জাজম লিখনরীতি)ই হলো আরবি লিপি রীতির মূল। কেননা ইসলাম-পূর্বকালে আরব দেশে দু ধরনের লিখনরীতি প্রচলিত ছিল। ১. জাজম ও ২. মুসনাদ। সেখানে তৃতীয় অন্য কোনো লিখনরীতির অস্তিত্ব দেখা যায় না। জাজম হলো– উত্তর আরবের মক্কা, মদিনা ও ইরাক-আরব প্রভৃতির অঞ্চলের অধিবাসীদের লিখনরীতি। আর মুসনাদ ছিল দক্ষিণ আরব ও আরবের অবশিষ্ট এলাকার অধিবাসীদের লিখনরীতি।[২০]

'খত্তুল জাজম'কে এ নামে অভিহিত করার কারণ হচ্ছে : 'জাজম' অর্থ কর্তন করা। বর্ণিত রয়েছে মুরামির ইবন মুর্‌রা 'মুসনাদ রীতি' থেকে এ রীতি কর্তন তথা উদ্ভাবন করেন বলে একে **'খত্তুল জাজম'** বলা হয়।[২১]

তাঁদের মতে, ইরাক-আরবের লোকজন অনেক আগ থেকে লেখার চর্চা করত। তাছাড়া সেখানে গির্জা ও আশ্রমের পাশে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন মাদ্রাসাও ছিল। আর মক্কাবাসী এবং ইরাক-আরবের লোকজন, বিশেষ করে হিরাবাসীদের মাঝে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক ছিল। মক্কার ব্যবসায়ীগণ তাঁদের পণ্য দ্রব্যাদি নিয়ে হিরায় আসত এবং সেখানে দীর্ঘদিন অবস্থান করত। তাই খুব সম্ভব তাঁরা বা তাঁদের কেউ হিরা বা আম্বারবাসীদের নিকট থেকে লেখার পদ্ধতি শিখেছিলেন।[২২]

www.pathagar.com

কোনো কোনো প্রাচ্যবিদের মতেও, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাতিবে ওহিগণ 'জাজম রীতি' তথা হিরাবাসীদের অনুসৃত লিখনরীতি থেকে গৃহীত পদ্ধতি অনুসরণ করে লিখতেন। তাঁদের মতে, মক্কাবাসীগণ বাণিজ্যিক সম্পর্কের সুবাদে হিরাবাসীদের নিকট থেকে লেখার রীতি আয়ত্ত করেছিলেন।[২৩]

ঐতিহাসিক বালাজুরি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন, সর্বপ্রথম (তাঈ গোত্রের শাখা) বাওলানের[২৪] তিনজন লোক আরবি বর্ণসমূহ উদ্ভাবন করেন। তাঁরা হলেন : মুরামির ইবন মুর্‌রাহ, আসলাম ইবন সুদ্‌রাহ ও আমির ইবন জুদ্‌রাহ। তাঁরা আম্বার[২৫] নগরীতে এসে মিলিত হন এবং এখানেই তাঁরা (সিরিয়ার বর্ণমালার মডেল অনুকরণ করে) যৌথভাবে বিচ্ছিন্ন ও যুগ্ম দ্বিবিধ অবস্থায় আরবি বর্ণগুলো উদ্ভাবন করেন। মুরামির বর্ণগুলোর আকৃতি তৈরি করেন, আসলাম বর্ণগুলোর বিচ্ছিন্ন ও যৌগিক রূপ নির্ণয় করেন এবং আমির নুকতা আবিষ্কার করেন। তাঁদের নিকট থেকে আম্বারবাসীরা আরবি বর্ণমালার জ্ঞান অর্জন করে। আম্বারবাসীদের নিকট থেকে হিরা ও সমগ্র ইরাক-আরবের অধিবাসীরা আরবি বর্ণমালার জ্ঞান অর্জন করে। ইত্যবসরে দাওমতুল জন্দলের শাসক একুয়েডর ইবন আবদুল মালিকের ভাই বিশ্‌র ইব্‌ন আবদুল মালিক আল-কিন্দি হিরায় এসে কিছুদিন অবস্থান করেন। হিরায় অবস্থানকালে তিনিও হিরাবাসীদের নিকট থেকে আরবি বর্ণমালার জ্ঞান অর্জন করেন। উল্লেখ্য, ইরাকে ব্যবসার সুবাদে বিশরের সাথে হার্‌ব ইবন উমাইয়ার সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সুবাদে হার্‌ব তাঁর নিকট থেকে লেখার জ্ঞান অর্জন করেন। অতঃপর বিশ্‌র কোনো এক প্রয়োজনে তাঁর সাথে মক্কায় আগমন করেন এবং হারবের কন্যা সাহবার সাথে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। এখানে তাঁর নিকট থেকে একদল মক্কাবাসী লেখা শেখেন। তাঁদের মধ্যে সুফ্‌ইয়ান ইবন উমাইয়া ইব্‌ন আবদ শামস ও আবু কায়স ইব্‌ন আবদ মানাফ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতঃপর বিশ্‌র ও আবু কায়স ব্যবসার প্রয়োজনে তায়িফে আগমন করেন। তাঁদের সাথে গায়লান ইবন সালামা আস-সকফিও ছিলেন। তিনিও ইতঃপূর্বে তাঁদের নিকট থেকে লেখার জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁদের নিকট থেকে তায়িফের বেশ কিছু লোক লেখা শিখেন। অতঃপর বিশ্‌র মিশরে গমন করলে সেখানেও বেশ কিছু লোক তাঁর নিকট থেকে লেখার পদ্ধতি শিখে নেন। তিনি সিরিয়ায় যান। সেখানেও বেশ কিছু লোক তার নিকট থেকে লেখার জ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ করেন। এভাবে উপর্যুক্ত তিনজন তাঈ গোত্রের লোকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষসূত্রে ইরাক, হিজাজ, মিসর ও সিরিয়ায় অসংখ্য লোক লেখার জ্ঞান অর্জন করেন।[২৬]

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, জনৈক ব্যক্তি হজরত ইবনু আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কুরাইশগণ হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়ত লাভের পূর্বে কাদের নিকট আরবি লিপির জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, অথচ আপনারা কখনো সম্মিলিতভাবে, আবার কখনো বিচ্ছিন্নভাবে জীবন যাপন করতেন? তিনি বললেন, আমরা হার্‌ব ইবন উমাইয়া থেকে শিখেছি। লোকটি আবার বলল, হার্‌ব কার নিকট থেকে শিখেছিলেন? তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ ইবন জাদ'আন থেকে। পুনরায় লোকটি জিজ্ঞেস করল, আব্দুল্লাহ ইবন জাদ'আন কার নিকট থেকে শিখেছেন? তিনি বললেন, আম্বারবাসীদের

www.pathagar.com

নিকট থেকে। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, আম্বারবাসীরা কাদের নিকট থেকে শিখেছে? তিনি বললেন, তারা হিরাবাসীদের নিকট থেকে। লোকটি ফিরে আবার প্রশ্ন করল, তারা কাদের নিকট থেকে শিখল? তিনি বললেন, ইয়েমেনের কিন্দা গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে, যিনি তাদের কাছে আগমন করেছিলেন। লোকটি বলল, উক্ত আগন্তুক ব্যক্তিটি কার নিকট থেকে শিখলেন? তিনি বললেন, হজরত হুদ (আ.)-এর কাতিবে ওহি খাফলজান ইবনু ওয়াহামের নিকট থেকে শিখেছিলেন।[২৭]

উপর্যুক্ত রিওয়ায়াতসমূহ থেকে জানা যায়, আরবি লিপি হিরায় উদ্ভাবিত হয়েছে এবং সেখান থেকে খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগেই মক্কা ও হিজাজে অনুপ্রবেশ করেছিল। বাস্তব ব্যাপার যা-ই হোক, উপর্যুক্ত রিওয়ায়াতসমূহ যথেষ্ট সন্দেহপূর্ণ। যদি বিশুদ্ধও হয়, তাহলে খুব সম্ভব তারা নাবাতিদের থেকে শেখা লেখাকে হয়তো নতুনভাবে উদ্ভাবন করেছিল অথবা তাকে বিকশিত করেছিল। কেননা হিজাজে যেসব শিলালিপি ও নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে এরূপ ধারণার সমর্থন পাওয়া যায় না; বরং হিজাজসহ বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপি ও নিদর্শন দ্বারা এ তথ্য জানা যায় যে, অ্যারামাইক লিপি নাবাতি লিপির এবং নাবাতি লিপি আরবি লিপির আকৃতি গ্রহণ করেছে। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, ইসলামের আবির্ভাবের কিছুকাল আগে হিরায় সুরয়ানি সংস্কৃতির জয়জয়কার অবস্থা ছিল। তখন হিরার অধিবাসীরা সিরিয়ক রীতিতে লেখার কাজ সম্পন্ন করত। এমতাবস্থায় এটা ধারণা করা যায় না যে, হিরার অধিবাসীরা 'সিরিয়ক রীতি' থেকে আরবি লিপি উদ্ভাবন করেছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের বর্ণনায় এ ধরনের ধারণা করার ভিত্তি এরূপ হতে পারে যে, যেহেতু কুফি লিপি কুফায় প্রচলিত এবং কুফায় উন্নতিপ্রাপ্ত হয়েছে, এ কারণে তাঁরা ভেবে থাকবেন যে, সেই পরিবেশেই আরবি লিপি অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং তা হিরায় প্রতিপালিত হয়েছে।[২৮]

এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতটি একটি রূপকথা ও উপাখ্যান বলে মনে হয়। বর্ণিত রয়েছে, একদা তাসম গোত্রের أبجد (আবজদ), هوز (হাওয়ায), حطي (হুত্তি), كلمن (কালিমন), سعفص (সা'ফাস) ও قرشت (কারাশাত) নামের ছয়জন ব্যক্তি আদনান ইবনু উদ্দের নিকট মিলিত হয়ে নিজেদের নামানুসারে আরবি বর্ণমালা উদ্ভাবন করেন। উপরন্তু তাঁরা তাঁদের নামের মধ্যে উল্লেখ নেই এই ধরনের আরো ছয়টি বর্ণকে সেগুলোর সাথে যোগ করলেন। এগুলো হলো– ثخذ ضظغ। তাঁরা এ বর্ণগুলোর নাম রাখলেন روادف।[২৯]

৪. অ্যারামাইক[৩০] লিপি:

কোনো কোনো গবেষকের মতে, আরবি লিপি সরাসরি অ্যারামাইক বা সিরিয়ক লিখন-রীতি থেকে উদ্ভূত হয়।[৩১] উল্লেখ্য যে, অ্যারাম বংশোদ্ভূত সিরিয়করা অ্যারামীয় লিখন-রীতির বিকাশ সাধন করে দুটি লিখনপদ্ধতি উদ্ভাবন করে। এগুলো হলো–

১. প্রাচীন রীতি, যা অবলম্বন করে তারা ইঞ্জিল ও ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থসমূহ লিপিবদ্ধ করত। এ রীতির বর্ণগুলো ছিল খাড়া ও চতুষ্কোণবিশিষ্ট। এটি 'সতরঞ্জলি খত' নামে পরিচিত।[৩২]

www.pathagar.com

২. সহজ রীতি। এর বর্ণগুলো ছিল ধনুকাকৃতির মতো গোলাকার। এটিই মূলত নাসখ রীতি।

আরবরা এ দুটি রীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিল এবং উক্ত রীতি দুটির অনুকরণেই লেখার কাজ চালাত। তারা সহজ গোলাকার রীতিটিকে 'নাসখি' এবং অপরটিকে 'কুফি' নামে অভিহিত করত।[৩৩]

এর প্রমাণ হলো– আরবি বর্ণমালার প্রাচীন বিন্যাস আবজদ, হাওয়াজ ... প্রভৃতি বর্ণের ক্রমানুসারে সাজানো ছিল। আর এ বিন্যাসটি অ্যারামাইক ভাষায়ও পাওয়া যায়। তাছাড়া অ্যারামাইক আবজদি বর্ণমালার হিসাবের সূত্রও আরবিতে অনুসৃত হয়। এভাবে আরবি ভাষা লেখার ক্ষেত্রে অ্যারামাইকদের অনেক রীতি হুবহু অনুসরণ করা হয়। যেমন শব্দের অন্তর্গত বর্ণগুলোর পরস্পর মিলন ও বিচ্ছিন্ন করার নিয়ম এবং رحمان ، مساكين ، يتامى ، مساجد ، كتاب ، إبراهيم ، إسحاق ، إسماعيل প্রভৃতি শব্দের মাঝখানে অবস্থিত আলিফ বিলুপ্ত করার নিয়ম আরবিতেও মানা হয়। উপর্যুক্ত শব্দগুলো কুরআন শরিফে আলিফ ছাড়াই লিপিবদ্ধ করা হয়। এভাবে সিরিয়ক ভাষায় فاعل ও تفاعل –এর আলিফ বিলুপ্ত করা হয়। তদ্রূপ আরবিতেও এগুলোর আলিফ বিলুপ্ত করা হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে بارك-এর স্থলে برك লেখা হয়। এভাবে সিরিয়ক লিখনরীতিতে جمع متكلم (বহু বচন উত্তম পুরুষ)-এর نا-এর আলিফও বিলুপ্ত করা হয় । যেমন : أرسلناك ، اصطفيناه ও بشرناه –এর স্থলে أرسلنك ، اصطفينه ও بشرنه লেখা হয়। পবিত্র মুসহাফেও এ শব্দগুলো এভাবেই লিপিবদ্ধ করা হয়। সিরিয়ক লিখনরীতিতে جمع مؤنث سالم–এর আলিফকে বিলুপ্ত করা হয়। যেমন: طيبات ও صدقات -এর পরিবতে طيبت ও صدقت লেখা হয়। তদ্রূপ আরবিতেও جمع مؤنث سالم–এর আলিফকে বিলুপ্ত করে লেখা হয়। এভাবে كافرين ও شاهد –এর পরিবর্তে كفرين ও شهد লিপিবদ্ধ করাও এ জাতীয় অনুসরণ। এভাবে সিরিয়ক লিখনরীতিতে ياء متكلم -কেও বিলুপ্ত করা হয়। তদ্রূপ প্রাচীন আরবি লিখনরীতিতেও তা বিলুপ্ত করা হতো। যেমন يا ربي –এর স্থলে يرب লেখা হয়।[৩৪]

এ মতটিও দুর্বল। কেননা আরবরা সরাসরি অ্যারামিদের নিকট থেকে লেখার জ্ঞান অর্জন করেছিল, এ ধরনের কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তদুপরি হিজাজে যেসব শিলালিপি ও নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে এরূপ ধারণার সমর্থন পাওয়া যায় না; বরং হিজাজসহ বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপি ও নিদর্শন দ্বারা এ তথ্য জানা যায় যে, নাবাতিরাই অ্যারামাইক লিপির জ্ঞান অর্জন করেছিল এবং এ অ্যারামাইক লিপি থেকেই তারা নিজেদের নাবাতি লিপির রূপ উদ্ভাবন করেছিল। পরবর্তীকালে এ নাবাতি লিপিই কালক্রমে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে আরবি লিপির আকৃতি গ্রহণ করেছে।

তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আরবি লিপি সিরিয়ক লিখনপদ্ধতি দ্বারা বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। তবে তা এতটুকু নয় যে, সামগ্রিক বিচারে তাকে সিরিয়ক লিপি থেকে উদ্ভূত বলা যায়। এটা অনস্বীকার্য যে, এ দুই লিপিরীতির মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে সাদৃশ্য রয়েছে। তবে এ সাদৃশ্যগুলো ভিন্ন প্রেক্ষাপটে তৈরি হয়েছে। আর তা হলো

www.pathagar.com

উভয় লিপি একই উৎসমূল থেকে উদ্ভূত হয়েছে। নিম্নের লাইন দুটিতে আরবি ও সিরিয়ক লিপিগুলোর তুলনা করলে স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে যে, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের কারণ হলো দুটিই একই উৎসমূল থেকে উদ্ভূত হওয়া।[৩৫]

আরবি লিপি 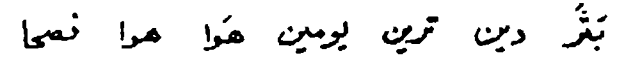

সিরিয়ক লিপিরীতি 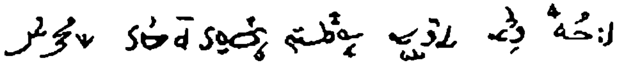

৫. নাবাতি ও সিরিয়ক লিপিদ্বয়ের সমন্বিত রূপ

জুরজি যায়দান ও আরো কিছু আধুনিক গবেষকের মতে—নাবাতি ও সিরিয়ক (সতরঞ্জলি) লিপিদ্বয়ের সমন্বিত রূপ হলো আরবি লিপি। হিজাজবাসীরা ইসলাম পূর্বকালে লিখন শিল্প সম্পর্কে অবহিত ছিল না। অথচ তাদের উত্তর ও দক্ষিণে এমন অনেক জাতির বসবাস ছিল যারা লেখাপড়া জানত। তাদের মধ্যে ইয়েমেনের হিময়ারিরা এবং উত্তরে নাবাতিরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য যে, হিময়ারিরা মুসনাদ রীতি অনুযায়ী লিখত এবং নাবাতিরা নাবাতি বর্ণমালা অনুসরণ করে লিখত। লিখনশিল্প সম্পর্কে হিজাজিদের অজ্ঞতার কারণ হলো : তাদের অধিকাংশই স্বভাবগতভাবে ছিল বেদুঈন চরিত্রের। সভ্যতার ছোঁয়া তাদের স্পর্শ করেনি। আর লিখন শিল্প হচ্ছে সভ্যতার একটি নিদর্শন। তবে ইসলামের আবির্ভাবের সামান্য পূর্বকালে হিজাজিরা প্রায় সময় বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ইরাক ও সিরিয়ায় সফরে আসত। এ সুবাদে তারা সেখানকার সভ্যতার নিদর্শনগুলোর সাথে ক্রমে পরিচিত হয়ে ওঠে এবং এরই ধারাবাহিকতায় এক পর্যায়ে তাদের নিকট থেকে লেখার শিক্ষা অর্জন করে। এভাবেই তাদের কেউ নাবাতি লিখনপদ্ধতি, কেউ হিব্রু লিখনরীতি[৩৬], আবার কেউ সিরিয়ক লিখনরীতি অনুযায়ী লিখতে শুরু করে।[৩৭] তবে তন্মধ্যে কেবল নাবাতি ও সিরিয়ক লিখনরীতি দুটিই কেবল ইসলাম পরবর্তীকালেও ব্যবহৃত হতে থাকে। পরে নাবাতি লিখনপদ্ধতি থেকে 'নাসখি' এবং সিরিয়ক লিখনপদ্ধতি থেকে 'কুফি লিখনপদ্ধতি' উৎপত্তি লাভ করে। এ কুফি লিখনপদ্ধতিকে কুফা নগরীর দিকে সম্বন্ধ করে কুফি পদ্ধতি বলা হয়। ইসলাম পূর্বকালে কুফা নগরী প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে তাকে 'হিরি পদ্ধতি' নামে অভিহিত করা হতো। হিরা ইসলাম পূর্বকালে ইরাক-আরবের একটি নগর ছিল। মুসলমানগণ এর পার্শ্বে কুফা নগরী নিমার্ণ করেন।

ইরাকে সিরিয়করা সিরিয়ক লিখনশিল্পের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে লিখত। তন্মধ্যে সতরঞ্জলি ছিল একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। তারা নিজেদের পবিত্র ধর্মীয় পুস্তকাদি এ পদ্ধতি অবলম্বন করে লিখত। আরবরা ইসলাম পূর্বকালে এ পদ্ধতি তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিল এবং এ পদ্ধতি থেকে কুফিরীতির উদ্ভব হয়। এ দুটি পদ্ধতি আজও প্রায় একই ধরনের রয়েছে।

মোট কথা, আরবরা সিরিয়ার সাথে ব্যবসার সুবাদে হুরান নগরীর অধিবাসীদের নিকট থেকে নাবাতি লিখনপদ্ধতি এবং হিজরতের সামান্যকাল পূর্বে ইরাকের অধিবাসীদের থেকে কুফি লিখনপদ্ধতিতে লেখার শিক্ষা লাভ করে। অনেকের মতে—আরবরা উভয় পদ্ধতি একই সাথে ব্যবহার করত। কুরআন ও অন্যান্য ধর্মীয়

www.pathagar.com

বিষয় লেখার কাজে কুফি পদ্ধতির অনুসরণ করা হতো। যেমন সিরিয়করা তাদের ধর্মীয় পুস্তকাদি লেখার জন্য সতরঞ্জলি পদ্ধতি অনুসরণ করত। তাছাড়া অন্যান্য কাজের জন্য নাবাতি লিখনপদ্ধতি অনুসরণ করা হতো। বর্ণের অবয়ব ছাড়াও কুফি পদ্ধতি সতরঞ্জলি পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত হওয়ার অন্য একটি প্রমাণ হলো : কুফি পদ্ধতিতে যখন কোনো হরফে মাদ্দ শব্দের মাঝখানে আসে তখন তা বিলুপ্ত করা হয়। যেমন كتاب-এর পরিবর্তে كتب এবং ظالمين -এর পরিবর্তে ظلمين লেখা হয়। সিরিয়ক লিখনপদ্ধতিতেও এ রীতি অনুসরণ করা হয়। ইসলামের প্রাথমিককালে, আর কুরআন শরিফ লেখার ক্ষেত্রে বর্তমানেও এ রীতি বহুলভাবে প্রচলিত রয়েছে।[৩৮]

এ মতটি অন্যান্য মতের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী। কারণ এটা অসম্ভব নয় যে, মক্কাবাসীরা হিরা ও আম্বারবাসীদের ব্যবহৃত সুরয়ানি-সতরঞ্জলি পদ্ধতি থেকে কুফিরীতি উদ্ভাবন করেছিল। কেননা এ দুটি পদ্ধতির লেখার মধ্যে অনেক মিল দেখা যায়। উল্লেখ্য যে, কুফি পদ্ধতি হিরি পদ্ধতি থেকে গৃহীত। আর হিরাবাসীরা জাজম রীতি অনুসরণ করে লিখত। আর জাজম রীতি সতরঞ্জলি থেকে গৃহীত। এভাবে এটাও অসম্ভব নয় যে, মক্কাবাসীরা তাদের গোলায়িত লেখার পদ্ধতি– 'নাসখি কলম' হুরান বা পেট্রার অধিবাসীদের নিকট থেকে শিখেছিল। কারণ মক্কাবাসীদের সাথে উপর্যুক্ত এলাকা দুটিতে বসবাসকারী নাবাতিদের সুসম্পর্ক ছিল।[৩৯]

৬. নাবাতি লিপি

অনেক আধুনিক আরব গবেষক ও অধিকাংশ প্রাচ্যবিদের মতে, আরবি লিপি খোদ হিজাজেই উন্নতি লাভ করেছে। বাণিজ্যিক প্রয়োজন ও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে হিজাজের অধিবাসীরা প্রথমত মুসনাদ লিপি গ্রহণ করেছিল। এ লিপি কালক্রমে লিহ্য়ানি, সামুদি ও সাফাভি লিপিতে পরিবর্তিত হয়। ইরাক-সিরিয়া সীমান্তে নাবাতিরা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। তারা খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যের পত্তন করেন এবং তা বহু দিন ধরে টিকে ছিল। নাবাতিরা মূলত আরব ছিল। তারা দৈনন্দিন জীবনে আরবি ভাষায় ভাবের আদান-প্রদান করলেও আরবি বর্ণমালা ও লিখনরীতি উদ্ভাবিত না হওয়ার কারণে তারা উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিবেশী অ্যারামীয়দের গোলায়িত লিখনপদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করত। তারা ক্রমে অ্যারামি লিপির উৎকর্ষ সাধন করে, যা পরবর্তীকালে নাবাতি লিখনশৈলীতে পরিবর্তিত হয়। ১০৫ খ্রিষ্টাব্দে তাদের সাম্রাজ্য স্বাধীনতা হারিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের একটি অঙ্গ প্রদেশে পরিণত হয়। এ সময় তারা সমগ্র আরব দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তাদের সাথে সাথে আরবের সর্বত্র নাবাতি লিপিও বিস্তার লাভ করতে থাকে। সে সময় হিজাজের লোকেরা মুসনাদ লিপি পরিত্যাগ করে নাবাতি লিপির[৪০] সাহায্য গ্রহণ করত। প্রায় দু' শতাব্দী কাল ধরে চর্চা ও অনুশীলনের পর বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে এ লিপি আরবি লিপিতে পরিবর্তিত হয় এবং তা একটি স্বতন্ত্র লিপি হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করে।[৪১] আরবি লিপিবিশারদ রিফা'ঈ বলেন, নাবাতি লিপি খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগের মধ্যেই আরবদেশে বিস্তার লাভ করেছিল। আর ঐ সময়েই সেখানে নাবাতি লিপি ক্রমে তার নাবাতি রূপ ত্যাগ করে সাবলীল আরবি লিখনশৈলীতে রূপান্তরিত হয়।[৪২]

www.pathagar.com

প্রবল ধারণা করা হয় যে, নিম্নের দুটি পথের যে-কোনো একটি পথ বেয়ে লিপি শিল্প আরব দেশে প্রবেশ করেছিল।

১. হুরান নগরী থেকে মধ্য ফোরাতের উপত্যকায়—যেখানে হিরা এবং নাবাতিদের আবাসস্থল ছিল সেখানে—বিস্তার লাভ করে। অতঃপর দাওমতুল জন্দল হয়ে মক্কা ও তায়িফে প্রসার লাভ করে।
২. নাবাতিদের আবাসস্থল পেট্রা (Petra) থেকে সিরিয়ার উলায় পৌঁছে। অতঃপর ক্রমে উত্তর আরবে বিস্তার লাভ করে মদিনা ও মক্কায় পৌঁছে।[৪৩]

এ মতের শক্তিশালী প্রমাণ হচ্ছে, খ্রিষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর শেষভাগে মদিনায় নাবাতিদের পণ্য মেলা বসত। এ থেকে জানা যায়, নাবাতি অঞ্চল ও হিজাজের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। তদুপরি আরবের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফর উভয় এলাকার মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[৪৪] ড. খলিল ইয়াহয়া নামি বলেন:

> হিজাজিরা নাবাতি ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে তাদের লিপিরীতি গ্রহণ করেছিল। হয়তো ব্যবসার উদ্দেশ্যে নাবাতিদের হিজাজে গমনের সুবাদে অথবা সিরিয়ায় গমনাগমনের পথে নাবাতিদের সাথে হিজাজিদের সংশ্রব লাভের সুবাদে তা সম্ভব হয়ে উঠে।[৪৫]

তদুপরি নাবাতিদের পরিণত লিপিরীতির আকৃতি আরবি লিপির প্রাথমিক আকৃতির অতি কাছাকাছি। আরবি লিপির মতো এ রীতিতেও একটি বর্ণ অন্য বর্ণের সাথে মিলিত হয়ে লিখিত হয় এবং এতে কোনো কোনো বর্ণ শব্দের শুরুতে বা মধ্যভাগে যে আকৃতি ধারণ করে তা শব্দের শেষে ব্যবহৃত আকৃতির চাইতে ভিন্ন হয়ে থাকে।[৪৬] ড. খলীল ইয়াহয়া নামি নাবাতি লিপির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যা আরবি লিপির বৈশিষ্ট্যাবলির সাথে মিলে যায়। এ বৈশিষ্ট্যগুলো হলো[৪৭]:

১.অক্ষরসমূহের গ্রন্থন

নাবাতি লিপিতে শব্দসমূহের পৃথক পৃথক ইউনিট তৈরির জন্য শব্দের অন্তর্গত বর্ণগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করে লেখা হতো। ب ر শব্দটি সর্বদা সংযুক্ত অবস্থায় লিপিবদ্ধ করা হতো, যখন অন্যান্য অক্ষর পরস্পর সংযুক্ত করার নিয়ম খুব কমই প্রচলিত ছিল। নাবাতি লিপির বিকাশকালের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিটি দুই বর্ণবিশিষ্ট শব্দের বর্ণ দুটিকে সংযুক্ত করে লেখা হতো। আর তৃতীয় পর্যায়ে সব ধরনের শব্দের বর্ণগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করে লেখা হয়, তাতে বর্ণের সংখ্যা যা-ই হোক না কেন। বর্ণগুলোকে পরস্পর সংযুক্তকরণ ও মিলানোর ক্ষেত্রে চারটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো। এগুলো হলো–

ক. الإسناد (to lean on), এ পদ্ধতিতে প্রথম অক্ষরকে পরবর্তী অক্ষরের কোমরে স্থাপন করা হয়। যেমন ب ر-এর ক্ষেত্রে بر.
খ. الربط (linking), এ পদ্ধতিতে প্রথম অক্ষরকে পরবর্তী অক্ষরের মাথার সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। যেমন ب ر -এর ক্ষেত্রে بر.

www.pathagar.com

গ. المزج (mixing), এ পদ্ধতিতে দু'টি অক্ষরকে একই ছাঁচের মধ্যে ফেলা হয়। বর্তমানে এ পদ্ধতিটি শুধু ل ও ا -এর ক্ষেত্রে অবশিষ্ট রয়েছে। যেমন-لا

ঘ. النظم (stringing), এ পদ্ধতিতে অক্ষরগুলোকে একটি রেখার ওপরে রেখে পরস্পর সন্নিবেশিত করা হয়। যেমন ر د ب ع -এর জন্য كبدر

২. যতি চিহ্ন (ওয়াক্ফের চিহ্ন)

নাবাতি লিপিতে যতি চিহ্নের ব্যবহার দেখা যায়। এ উদ্দেশ্যে তাতে শব্দান্তে কিছু বর্ণ ব্যবহার করা হতো। এর জন্য তারা চারটি পদ্ধতি অনুসরণ করত। তন্মধ্যে বর্ণকে দীর্ঘায়িত করে লেখার পদ্ধতিটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- ب , ف ও ق প্রভৃতি বর্ণের মধ্যে কোনো বর্ণ যদি শব্দের শেষে আসত, তাহলে তা দীর্ঘ করে লেখা হতো।

৩. নুকতার ব্যবহার

প্রাচীন আরবি লিপির মতো নাবাতি লিপিতেও সম-আকৃতির বর্ণগুলোকে পার্থক্য করার জন্য নুকতার ব্যবহারের প্রচলন ছিল না।[৪৮]

৪. স্ত্রীবাচক গোলাকার

নাবাতি লিপিতে গোলাকার ة -এর পরিবর্তে লম্বা ت -এর প্রচলন ছিল। আরবিতেও ইসলামের প্রাথমিককালে স্ত্রীবাচক ة -কে লম্বা ت যোগে লিপিবদ্ধ করা হতো।

৫. স্বরবর্ণ (حروف علت)

নাবাতি লিপিতে স্বরবর্ণগুলো প্রায়শ বিলুপ্ত করা হতো। তারা জবরের পরবর্তী আলিফ (ا)-কে (কখনো হামযাকেও), পেশের পরবর্তী ওয়াও (و)-কে এবং জেরের পরবর্তী ইয়া (ي)-কে বিলোপ করে দিত। এ রীতিটি হজরত উসমান (রা.) কর্তৃক প্রবর্তিত কুরআনের লিখনরীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এতে এ স্বরবর্ণগুলোর ব্যবহার পরিহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ الرحمان-কে الرحمن , النبيين -কে النبين এবং يلوون -কে يلون লিপিবদ্ধ করা হয়।

৬. اسم معرب (Declinable Noun)

নাবাতি লিপিতে নির্দিষ্টসূচক اسم معرب -এর শেষে و বৃদ্ধি করা হতো। আরবিতে এ রীতি শুধু عمرو -এর বেলায় বহাল রাখা হয়েছে। আর তার কারণ যতদূর সম্ভব এটা হতে পারে যে, আরবিতে عمر নামে আরো একটি নামসূচক শব্দ রয়েছে তা থেকে পৃথক করা। উল্লেখ্য যে, এটি হলো مبني (Indeclinable Noun) ।

৭. অসংযুক্ত অক্ষরসমূহ

নাবাতি লিপিতে ز ر و ذ د ا প্রভৃতি বর্ণগুলোকে বাম দিকের বর্ণের সাথে জড়ানো হয় না। তবে ডান দিকের বর্ণের সাথে সংযুক্ত করে লিপিবদ্ধ করা হয়।

ইসলামের প্রাথমিককালে লিখিত আরবি লিপিসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নাবাতি লিপির এসব বৈশিষ্ট্য আরবি লিপিতেও সমানভাবে পাওয়া যায়। আরবি

www.pathagar.com

লিপিতেও শব্দসমূহের পৃথক পৃথক ইউনিট তৈরি করা হয়। د ذ و ر ز । প্রভৃতি অক্ষর ছাড়া শব্দের অন্যান্য অক্ষর ডানে-বামে দুই দিকেই পরস্পর সংযুক্ত থাকে। উপর্যুক্ত অক্ষরগুলো কেবল ডান দিকের সাথে যুক্ত হয়ে লিখিত হয়। এতে অক্ষরসমূহের সংযুক্ত করার নিয়ম সাধারণত নাবাতি লিপিরীতির মতোই। তবে ধারাবাহিক বিন্যাস প্রক্রিয়ার মধ্যে কিছুটা তারতম্য রয়েছে। তাছাড়া অক্ষরগুলোকে সংযুক্ত করার অন্য একটি নিয়মও আরবিতে প্রচলিত রয়েছে। তা হলো—পরবর্তী অক্ষরের মাথা পূর্ববর্তী অক্ষরের লেজের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়। এ কারণে দ্বিতীয় অক্ষরটি রেখার নিচে চলে যায়। এ নিয়মটি ر, ن ও ي -এর মধ্যে স্পষ্টভাবে অনুসৃত হতে দেখা যায়। আরবিতে অধিকাংশ অক্ষর শুরুতে কিংবা মাঝখানে আসলে যে আকৃতি ধারণ করে, শেষে আসলে তার সে আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে হয়তো তার শেষাংশকে দীর্ঘায়িত করা হয়, আবার কোনো কোনো অক্ষরের আকৃতি পুরোই বদলে যায়। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, নাবাতি লিপিতেও এ নিয়ম প্রচলিত ছিল। তদুপরি এতে নুকতা ও হরকতের ব্যবহার ছিল না। ইসলামের প্রাথমিককালের আরবি লিপিতেও নুকতা ও হরকতের ব্যবহার পরিহার করা হয়। তাছাড়া তখন আরবিতেও নাবাতি লিপির মতো স্ত্রীবাচক ة -কে লম্বা ت যোগে লিপিবদ্ধ করা হতো। নির্দিষ্টসূচক اسم معرب -এর শেষে و বৃদ্ধি করার যে নিয়ম নাবাতিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, স্পষ্টত বোঝা যায়, আরবরা তাও নাবাতিদের থেকেই গ্রহণ করেছে।

তাছাড়া আরব দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সম্প্রতি উদ্ধারকৃত বিভিন্ন শিলালিপি উপর্যুক্ত মতের পক্ষে জোরালো সাক্ষ্য বহন করে। এ শিলালিপিগুলোর ভাষা বর্তমানে প্রচলিত কুরআনের আরবি ভাষা থেকে খুব একটা ভিন্ন নয়। উপরন্তু, এগুলোতে বর্ণসমূহের পরস্পর মিলিত রূপের ব্যবহার দেখা যায়। তদুপরি এগুলো (প্রাচীনতম আরবি লিপিরীতি বিশেষত কুফিরীতির সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ) নাবাতিদের পরিণত লিপিরীতির অনুকরণে লিপিবদ্ধ করা হয়। নিম্নে এ ধরনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিলালিপির বিবরণ প্রদত্ত হলো–

ক. উম্মুল জিমাল শিলালিপি-১

এটি খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে উৎকীর্ণ করা হয়। এটি সিরিয়ার দার'আ জেলার অন্তর্গত বুসরা-শামের দক্ষিণে অবস্থিত উম্মুল জিমাল নামক স্থানে পাওয়া যায়। এতে কিছু কিছু বর্ণ পরস্পর সংযুক্ত নয়। আবার কিছু কিছু বর্ণ কুফিরীতির মতো একটির সাথে অপরটি সংযুক্ত। এটি অ্যারামাইক লিখনরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়, যা নাবাতি লিখনরীতির সাথে অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ। এ কারণে লিপিবিজ্ঞানী Litman ও Starcky প্রমুখ এ লিখনরীতিকে নাবাতি লিখনরীতি হিসেবে গণনা করেছেন। আরব দেশে উদ্ধারকৃত শিলালিপিসমূহের মধ্যে এ শিলালিপিটি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। কারণ, এটি আরবের রাজা-বাদশাহ কর্তৃক নাবাতি রীতি ব্যবহারের সূত্রপাতের সময় সম্পর্কে ইঙ্গিত বহন করে।[৪১]

www.pathagar.com

এর মূল ভাষ্য (text) হলো :

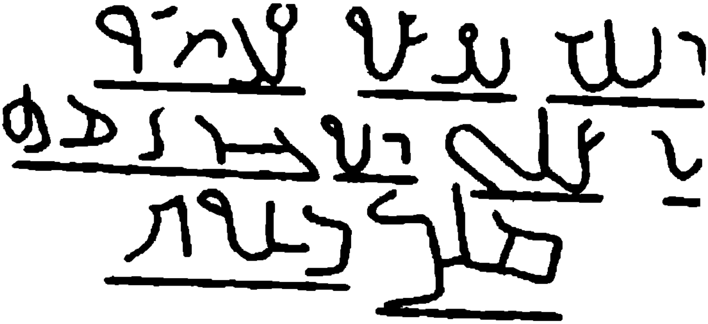

চিত্র- ২

আরবি অক্ষরে এর রূপ হলো :

دنه نفشو فهرو بر سلي ربو جذيمة ملك تنوخ

هذا قبر فهر بن سلي مري جذيمة ملك تنوخ

এতে নিম্নে দাগ দেওয়া প্রত্যেকটি অংশই এক একটি শব্দ এবং প্রত্যেকটির নিচে তার আরবি প্রতিশব্দ উল্লেখ করা হয়েছে ।

খ. নাম্মারা শিলালিপি

এটি ফরাসি প্রাচ্যবিদ ডাস্‌সু (Dussaud) ও ম্যাকলি ১৯০১ সালে আবিষ্কার করেন। এটি নাম্মারা থেকে এক মাইল দূরে অবস্থিত একটি এলাকায় পাওয়া যায়। নাম্মারা হলো সাফার দক্ষিণে দামিশকের অনতিদূরে রোমানদের একটি ছোট প্রাসাদ। তাঁরা হিরার বাদশাহ ইমরাউল কায়স ইবন উমর (মৃ. ৭ কাসলূল, ২২৩ সাল / ৩২৭ খ্রি.)-এর সমাধিগাত্র থেকে এটি উদ্ধার করেন। এটি নাবাতি লিপিরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়। এতে বর্ণগুলো পরস্পর সংযুক্ত এবং খ্রিষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে প্রচলিত প্রাচীন আদনানি ভাষায় লিখিত। উত্তর আরবের ভাষায় লিখিত শিলালিপিসমূহের মধ্যে একে প্রাচীনতম শিলালিপি হিসেবে গণ্য করা হয়।[৫০]

এর মূল ভাষ্য হলো :

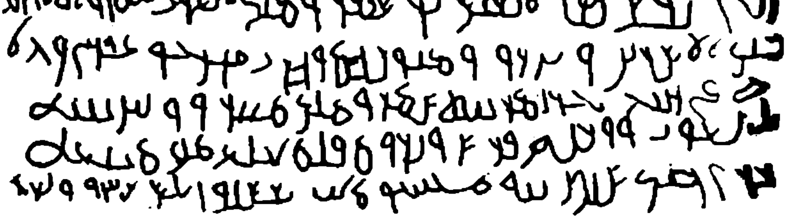

চিত্র-৩

www.pathagar.com

আরবি অক্ষরে এর রূপ হলো :

تي نفس مر القيس بر عمرو ملك العرب كله ذو أسر التاج
و ملك الأسدين و نزرو و ملوكهم و هرب مذحجو عكدي و جا
يزحي في حبج نجران مدينة شمر و ملك معدو و نزل بنيه
الشعوب و وكلهن فرسو لروم فلم يلغ ملك مبلغه
عكدي هلك سنة ২২৩ يوم ৭ بكسلول بلسعد ذو ولده .

আরবিতে এর অনুবাদ হলো :

১– هذا قبر (نفس أي قبر في العربية البائدة) امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي نال عقد التاج ،

২ – و ملك قبيلتي الأسد و نزار و ملوكهم و هزم مذحجا بقوته و جاء

৩ – باندفاع في مشارف نجران مدينة شمر و ملك معدا و استعمل بنيه على القبائل كلهم

৪ – الشعوب و وكله الفرس و الروم فلم يبلغ ملك مبلغه

৫ – في القوة ' هلك سنة ২২৩ يوم ৭ كسلول (كانون الأول) ليسعد الذين ولدهم .

উল্লেখ্য যে, প্রথম লাইনে 'ذو' শব্দটি 'الذي' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আরবের তাঈ ও অন্যান্য কয়েকটি গোত্র একে উক্ত অর্থে বহুলভাবে ব্যবহার করে থাকে। তদ্রূপ এতে أسر শব্দকে عصب ও عقد অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এ অর্থটিও আরবি অভিধানে পাওয়া যায়। তদুপরি এতে تاج শব্দের মধ্যবর্তী আলিফকে বিলুপ্ত করা হয়। এ রীতিও আরবদের নিকট তখনকার সময়ে প্রচলিত ছিল। এতে بر (অর্থ : ابن) ছাড়া অন্য কোনো নতুন শব্দ নেই। এটি একটি অ্যারামি ভাষার শব্দ।

দ্বিতীয় লাইনে নাবাতি লিপিতে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী نزرو ও مذحجو-এর শেষে واو যুক্ত করা হয়। এ রীতিতে নির্দিষ্টসূচক নাম-বিশেষ্যের শেষে واو যুক্ত করার নিয়ম প্রচলিত ছিল। তাছাড়া এতে عكدي শব্দটি সম্ভবত عكديا ছিল। এর আলিফকে বিলুপ্ত করে عكدي করা হয়। العكد শব্দের অর্থ হলো القوة (অর্থাৎ শক্তি) আর الأسدين দ্বারা বনু আসাদের দুই গোত্র উদ্দেশ্য।

তৃতীয় লাইনে يزحي শব্দটি زحي –এর বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালীন রূপ। এর অর্থ হলো دفع অর্থাৎ দ্রুত গতিতে গমন করা। আর حبج অর্থ مشارف (উঁচু ভূমি) বা حدود (সীমান্ত অঞ্চল)। شمر হলো হিময়ারীয়দের জনৈক রাজা। و نزل بنيه الشعوب -এর অর্থ : সে তার ছেলেদেরকে বিভিন্ন জাতির শাসক হিসেবে নিয়োগ করল।

চতুর্থ লাইনে وكلهن শব্দের মধ্যে ه যমির (সর্বনাম)-এর পরে فعل - এর সাথে তাগিদের নুন বৃদ্ধি করা হয়। এমতাবস্থায় তার আরবি রূপ দাঁড়াবে: وكله الفرس و الروم অর্থাৎ পারসিক ও রোমানরা তাকে কার্য নির্বাহকারী নিয়োগ করল।

www.pathagar.com

পঞ্চম লাইনে بلسعد ذو ولده -এর অর্থ হলো: ليسعد ولده অর্থাৎ তার ছেলে সুখী হোক।

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, এ শিলালিপিটি আরবি ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়। কেননা প্রথমত, এতে অ্যারামাইক শব্দ 'بر' ছাড়া অন্য কোনো অনারবি শব্দ নেই। দ্বিতীয়ত, এতে নির্দিষ্টসূচক অব্যয় 'ال' –এর ব্যবহার দেখা যায়। তদুপরি পূর্ববর্তী উম্মুল জিমালের শিলালিপির সাথে একে তুলনা করা হলে বোঝা যায় যে, পরবর্তীকালে আরবি লিপিরীতি ক্রমশ অনেক বিকাশ লাভ করেছে।

গ. যাবদ শিলালিপি

আলেপ্পোর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত যাবদের বিরাণ ভূমিতে একটি গির্জায় স্থাপিত প্রস্তর ফলকের ওপর এ শিলালিপিটি আবিষ্কার করা হয়। এটি ৫১২ কিংবা ৫১৩ খ্রিষ্টাব্দে উৎকীর্ণ। এটি এক সাথে তিন ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়। এগুলো হলো: গ্রিক, সিরিয়াক ও প্রাচীন আরবি। আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো: আরবি ভাষা ও তার লিখনরীতি। এতে আরবি শব্দ ইলাহ এবং প্রচুর আরবি নাম রয়েছে। ধারণা করা হয় যে, এগুলো যারা গির্জাটি নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিল তাদেরই নাম। এটি নাবাতিদের 'পরিণত লিখনরীতি' অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়। উপরন্তু, এটি আরবি লিপির প্রাচীনতম স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে। তদুপরি এর সাথে ইসলামি কুফিরীতির বিরাট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।[৫১]

এর মূল ভাষ্য হলো:

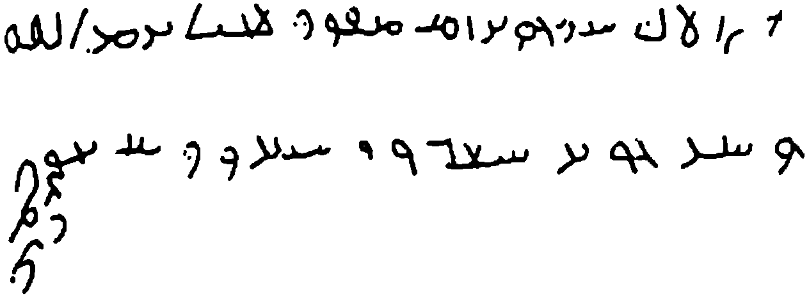

চিত্র-৪

আরবি অক্ষরে এর রূপ হলো :

بس م الاله سرحو برامت منفو و هني بر مر القيس [৫২]
و سرحو بر سعدو و سترو شريحو بتميمي

আরবিতে এর অনুবাদ হলো :

بسم الإله سرحو ابن امت منفو و هني ابن امرئ القيس
و سرحو ابن سعد و ستر و شريح أتموا

ঘ. হাররান শিলালিপি

হুরান নগরীর উত্তরে হাররানের লাজায় একটি গির্জার দরজার ওপরে স্থাপিত একটি প্রস্তর ফলকে প্রাচ্যবিদরা এটি আবিষ্কার করেন। এটি ৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দে উৎকীর্ণ। লিপিবিজ্ঞানীদের মতে—এটি কিন্দার কোনো এক বাদশাহ্ কর্তৃক লিখিত। তিনি প্রস্তর ফলকটি পোপ ইউহোন্নার উদ্দেশ্যে নির্মিত গির্জা উদ্বোধন করার পর তার দরজার ওপর স্থাপন করেন। এটি গ্রিক ও প্রাচীন আরবি দুটি ভাষায় লিখিত। আমাদের প্রতিপাদ্য হলো : তার আরবি ভাষা ও এর লিখনরীতি। ভাষাগত দিক থেকে এর বিরাট মূল্য রয়েছে। কেননা এর ভাষা অল্প কয়েকটি বিষয় ছাড়া প্রায় সকল ক্ষেত্রে প্রচলিত আরবি ভাষা তথা কুরআনের ভাষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এতে নাবাতিদের উপভাষার সামান্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তা সত্ত্বেও উপর্যুক্ত শিলালিপিগুলোর তুলনায় তার ভাষা কুরআনের ভাষার অধিকতর কাছাকাছি। এটিও যাবদ শিলালিপির মতো নাবাতিদের 'পরিণত লিখনরীতি' অনুযায়ী লিখিত। তার মতো এটিও আরবি লিপির প্রাচীনতম স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে। তবে এটি তার তুলনায় আরবি লিপি, বিশেষ করে প্রাচীন নাসখি রীতির অধিকতর নিকটবর্তী। এজন্য যাঁরা আরবি লিপিরীতি সম্পর্কে ভালোভাবে অভিজ্ঞ, তাঁদের পক্ষে এর লেখা ও মর্ম উদঘাটন করা বেশি কষ্টসাধ্য নয়।

এর মূল ভাষ্য হলো :

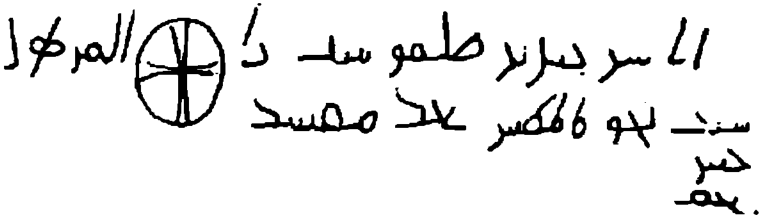

চিত্র-৫

আরবি অক্ষরে এর রূপ হলো:

أنا شرحبيل بر ظالم بنيت ذا المرطول

سنت ৪৬৩ بعد مفسد

خيبر

بعم

আরবিতে এর অনুবাদ হলো:

[৫৩]أنا شرحبيل بر ظالم بنيت هذه الكنيسة سنة ৪৬৩ بعد مفسد (انهيار) خيبر بعام

ঙ. উম্মুল জিমাল শিলালিপি-২

আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত আরবি শিলালিপিসমূহের মধ্যে একেই সর্বাধুনিক শিলালিপি হিসেবে গণ্য করা হয়। এর উৎকীর্ণের তারিখ জানা যায় না। তবে প্রাচ্যবিদদের মধ্যে যাঁরা একে নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁদের মতে—এটি খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ

www.pathagar.com

উৎকীর্ণ করা হয়। যেহেতু এর ভাষা কুরআনের ভাষার অতি নিকটবর্তী, তাই ভাষা ও লিখনরীতি উভয় দিক থেকে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এটি নাবাতি ভাষায় প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও নাবাতি ও অ্যারামীয় প্রভাব থেকে অনেকাংশে মুক্ত বর্তমানে প্রচলিত আরবি ভাষার সাথে প্রায় সর্বতোভাবে মিলসম্পন্ন। তদ্রূপ এটি নাবাতিদের সর্বশেষ লিখনরীতি অনুযায়ী লিখিত হওয়া সত্ত্বেও নাবাতি প্রভাব থেকে অনেকটা মুক্ত আরবি লিখনরীতির প্রায় কাছাকাছি।[৫৪]

এর মূল ভাষ্য হলোঃ

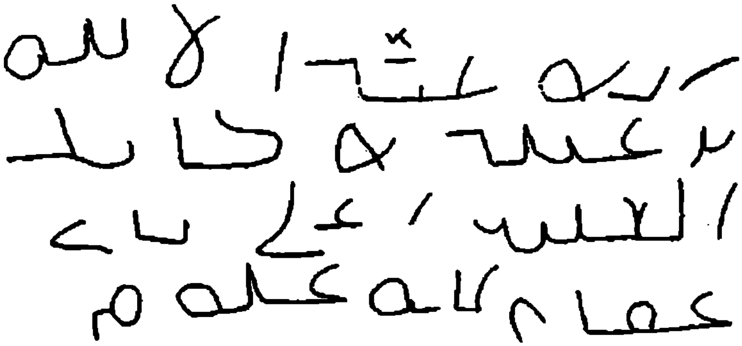

চিত্র-৬

আরবি অক্ষরে এর রূপ হলো :

الله غفر لأليه

بن عبيدة كاتب

الخليد اعلى بن

عمري كتب عنه

ه يقرؤه .

উপর্যুক্ত শিলালিপিগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, এগুলো ২৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে উৎকীর্ণ করা হয় এবং আরবি শিলালিপিগুলোর সাথে এগুলোর বিরাট সাদৃশ্য সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তদুপরি এগুলো নাবাতিদের আবাসভূমি কিংবা তাদের প্রভাবান্বিত এলাকাসমূহে আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাড়া খুলাফা-ই-রাশিদুনের যুগে প্যাপিরাসের ওপর লিখিত কতগুলো আরবি দস্তাবেজ হস্তগত হয়েছে। এসব দস্তাবেজ নাবাতি লিপিরীতিতে লিখিত। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, নাবাতি লিপিই হলো আরবি লিপির মূল এবং আরবি লিপি হলো নাবাতি লিপির উন্নত সংস্করণ।

অপর পৃষ্ঠার চিত্রে (চিত্র-৭) ইরাক, শাম ও আরবদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধারকৃত শিলালিপিসমূহের আলোকে নাবাতিদের পরিণত লিপিরীতি এবং আরবি লিপিরীতির কিছু নমুনা পাশাপাশি উপস্থাপন করা হলো। এতে দেখা যায়, উভয় রীতির

www.pathagar.com

লেখার মধ্যে বড়োই সাদৃশ্য রয়েছে, যা থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা খুবই সহজ যে, নাবাতি লিপির সাথে আরবি লিপির সুদৃঢ় ঘনিষ্ঠতা রয়েছে এবং তা থেকেই প্রাচীন আরবি লিপি উদ্ভূত হয়েছে।

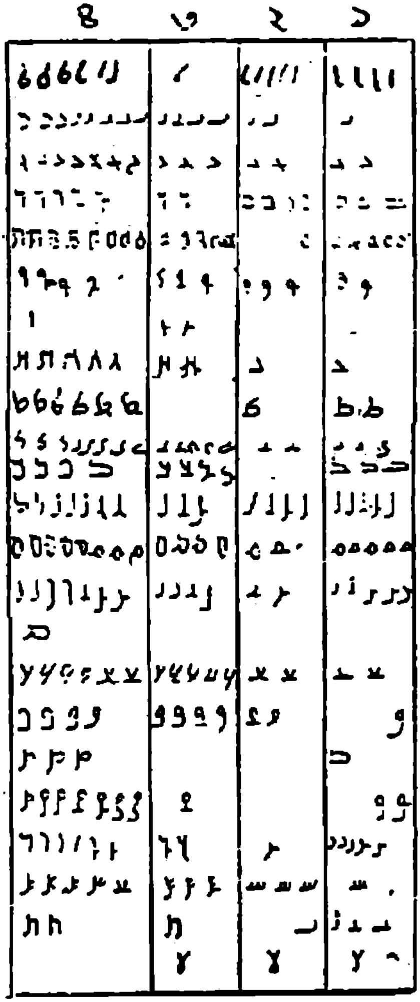

চিত্র-৭

চিত্রটিতে ১নং কলাম হিজরি ১ম শতাব্দীতে ব্যবহৃত আরবি বর্ণসমূহের, ২নং কলাম যাবদ ও হাররান শিলালিপিদ্বয়ে ব্যবহৃত বর্ণসমূহের এবং ৩য় ও ৪র্থ কলাম নাম্মারা ও পেট্রা শিলালিপিগুলোতে ব্যবহৃত বর্ণসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে।

www.pathagar.com

অতএব, প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, পাণ্ডুলিপি ও শিলালিপি প্রভৃতির আলোকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, আরবি লিপির আদি উৎস হলো 'প্রাচীন মিসরীয় লিপি', দ্বিতীয় উৎস হলো 'ফিনিশীয় লিপি' ও তৃতীয় উৎস হলো 'অ্যারামাইক লিপি', যা ফিনিশীয় লিপিরীতি থেকে উদ্ভূত হয়, আর এ অ্যারামাইক লিপিরীতি থেকে উদ্ভূত হয় 'মুসনাদ লিপিরীতি' ও 'নাবাতি লিপিরীতি', অতঃপর 'নাবাতি লিপি'ই কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে 'আরবি লিপি'তে পরিণত হয় এবং আরবের মূর্তিপূজার পরিবেশেই খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমদিকে চূড়ান্ত আকৃতি লাভ করে। তবে নাবাতিদের লিখনপদ্ধতি থেকেই আরবি লিপির উদ্ভব, হিজাজে তার অনুপ্রবেশ ও লোকদের মাঝে তার প্রসার প্রভৃতি সম্পর্কে অকাট্য মত প্রকাশের জন্য প্রাপ্ত শিলালিপি ও নিদর্শনগুলো পর্যাপ্ত নয়। তবে আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে প্রত্নতত্ত্ববিদ ও গবেষকগণ জাহিলি যুগের এবং ইসলামের প্রাথমিককালের উৎকীর্ণ আরবি লিপির বেশ কিছু নিদর্শন উদ্ধার করতে সক্ষম হবেন, যার ফলে বর্তমানে প্রচলিত আরবি লিপির উৎপত্তি ও উৎসমূল সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।

আরবি বর্ণসমূহের উদ্ভবের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া

এখানে আরবি বর্ণসমূহের মধ্যে প্রত্যেকটির উদ্ভব ও ধারাবাহিক পরিবর্তন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই এখানে কেবল কয়েকটি বর্ণের আকৃতি এবং বিভিন্ন লিপিতে সেগুলোর ধারাবাহিক পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো, যা থেকে বোঝা যায়, কীভাবে আরবি বর্ণগুলো প্রাচীন লিপিসমূহ থেকে পর পর পরিবর্তিত হয়ে স্বতন্ত্র পরিচয় ধারণ করেছিল। উদাহরণস্বরূপ طاء বর্ণটির আকৃতি ফিনিশীয়দের নিকট ছিল এরূপ +। অ্যারামিরা এর বৃত্তের ভিতরের দুটি পরস্পর ভেদকারী দুটি রেখার একটিকে বিলুপ্ত করে এবং তার ওপরের অংশটি কেটে তাতে কিছুটা পরিবর্তন আনয়ন করে। তাদের নিকট বর্ণটির আকৃতি দাঁড়ায় এরূপ ᗜ। এরপর বর্ণটি সিরিয়কদের নিকট এসে আরো কিছু পরিবর্তিত হয়ে এরূপ ~৩ আকৃতি ধারণ করে। আর এ আকৃতিটিই হিরি ও নাবাতি লিপিতে অনুসৃত হয়েছে; তবে লিপি দুটিতে তার আকৃতি কিছুটা বক্রাকার রূপ ধারণ করেছে। লিপি দুটিতে এর আকৃতি হলো ط অতঃপর আরবরা বর্ণটি গ্রহণ করে ط এভাবে তার আকৃতি নির্ধারণ করে। طاء -এর মতো ميم -এর আকৃতিও ফিনিশীয়দের নিকট এরূপ ៷ ছিল। অ্যারামিরা তাকে কিছুটা কাটছাঁট করলে তার আকৃতি দাঁড়ায় এভাবে ᒣ। অতঃপর সিরিয়করা তার আকৃতিতে কিছুটা সংযোজন ও বিয়োজন করলে তার আকৃতি দাঁড়ায় এরূপ ℘। এরপর তা কুফি ও নাবাতি লিপিতে এসে এভাবে ـo, ◊ পরিণত হয়। সর্বশেষ আরবিতে এসে তার রূপ দাঁড়ায় এভাবে م, ـم।

তদ্রূপ نون -এর আকৃতিও ফিনিশীয়দের নিকট এরূপ ᒧ ছিল। অ্যারামিরা তাকে কিছুটা সংক্ষেপ করলে তার আকৃতি দাঁড়ায় এভাবে ៷। অতঃপর সিরিয়করা তার আকৃতিতে কিছুটা পরিবর্তন আনয়ন করলে তার আকৃতি দাঁড়ায় এরূপ ﺭ। এরপর তা কুফি ও নাবাতি লিপিতে এসে এভাবে পরিণত হয় J7। তা থেকেই আরবরা তাদের ن বর্ণটির আকৃতি গ্রহণ করে। হিজরি ১ম শতাব্দী পর্যন্ত এটি এভাবে ﺭ ব্যবহৃত হতো।

www.pathagar.com

নিম্নের চিত্রে (দ্র. চিত্র-৮) আমরা رحمن শব্দটিতে হিজরি ১ম শতাব্দীতে ব্যবহৃত ن -এর আকৃতি দেখতে পাই। এভাবে অবশিষ্ট বর্ণগুলোও ধারাবাহিকভাবে পর পর পরিবর্তিত হয়ে আরবি রূপ ধারণ করে।

(بسم الله الرحمن الرحيم)

চিত্র-৮

উল্লেখ্য, আরবি লিপির প্রাচীনতম নিদর্শনসমূহের মধ্যেও ক্রমবিকাশের একটি নতুন উপকরণ পরিলক্ষিত হয়। তা হলো, পরবর্তী লিপিকারগণ পূর্ববর্তী লিপিকারদের মতো প্রতিটি বর্ণকে পৃথক পৃথক করে না লিখে দ্রুত লিখনের প্রয়োজনে বর্ণের পূর্ণাঙ্গ অপূর্ণাঙ্গ—দুটি আকৃতি উদ্ভাবনপূর্বক অপূর্ণাঙ্গ আকৃতির বর্ণগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করে লিখতেন এবং পরস্পর সন্নিহিত দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক শব্দের শেষ বর্ণকে তার পূর্ণাঙ্গ আকৃতিতে লিখতেন।

আরবি ভাষার বিশিষ্ট বর্ণসমূহ

আরবি লিপিতে প্রাচ্যের অন্যান্য ভাষার বর্ণগুলোর চাইতে ভিন্ন ছয়টি বর্ণ রয়েছে। এগুলো হলো : ث, خ, ذ, ض, ظ ও غ। এগুলো একত্রে 'ثخذ ضظغ' নামে পরিচিত। আরবি ভাষার প্রকৃতি অনুযায়ী এগুলো অস্তিত্ব লাভ করে। অন্যান্য ভাষায় এ বর্ণগুলোর উচ্চারণের নির্দিষ্ট কোনো স্থান নেই। তাই অন্যান্য ভাষায় এ বর্ণগুলো উচ্চারণ করতে গেলে কয়েকটি বর্ণের সংমিশ্রণ যোগে উচ্চারিত হতে দেখা যায়।

www.pathagar.com

তদুপরি তন্মধ্যে ' ض' বর্ণটির অস্তিত্ব কেবল আরবি ভাষায় দেখা যায়। আর এ বিশেষত্বের কারণে আরব কিংবা আরবি ভাষাভাষীদেরকে -'الناطقون بالضاد' (অর্থাৎ ض উচ্চারণকারী) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী انا افصح من نطق بالضاد (অর্থাৎ আমি ض উচ্চারণকারী তথা আরবদের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধভাষী ব্যক্তি।)[৫৫] -এর মধ্যে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, মুসলিম জাহানের বিভিন্ন প্রান্তে যে ভাষাসমূহ আরবি বর্ণমালা যোগে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাতে প্রবিষ্ট আরবি শব্দাবলি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত ৬টি বর্ণের ব্যবহার সচরাচর প্রচলন লাভ করেনি। এ কারণেই সেসব দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই কোনো আরবি বচন পড়তে গেলে এসব বর্ণ পূর্ণ বিশুদ্ধরূপে উচ্চারণ করতে পারে না; বরং তারা এগুলো উচ্চারণ করতে গেলে অন্য বর্ণের উচ্চারণের সাথে মিলিয়ে ফেলে। যেমন ط বা ض -এর উচ্চারণের সময় তাদের অনেক কষ্ট করতে হয়। ط বর্ণটি ت ও ط -এর মধ্যবর্তী স্থান থেকে বের হয় এবং ض মোটা গলায় জোরে উচ্চারিত ز - এর মতো উচ্চারিত হয়। এভাবে অন্যান্য বর্ণের বেলায়ও তাদের কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। যেহেতু এ বর্ণগুলো তাদের ভাষায় নেই, সেহেতু তারা তাদের ভাষার প্রকৃতি অনুযায়ী অন্য কয়েকটি বর্ণ ব্যবহার করে থাকে, যেগুলোর ব্যবহার আরবি ভাষায় নেই।[৫৬]

তথ্যসূত্র

১ আল-মুনজ্জিদ, সালাহুদ্দীন, *দিরাসাতুন ফি তারীখিল খাত্তিল আরবি মুনযু বিদায়াতিহি ইলা নিহায়াতিল 'আছরিল উমাভি*, বৈরূত : দারুল কিতাবিল জাদীদ, ১৯৩২, পৃ ২৩।

২ কালকাশান্দি, *প্রাগুক্ত*, খ ৩, পৃ ৭-৮।

৩ কালকাশান্দি, *প্রাগুক্ত*, খ ৩, পৃ ৬; ইবনুন নাদীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪; সুয়ূতি, *আল-মুযহির*, খ ২, পৃ ৩৪১।

৪ Qadi Ahmad, *Gulistan-i-Hunr* (eng. tran. Entitled: Calligraphers and Painters, T. Minorsky), Washington: Freer Gallery of Art, 1959), p 52.

৫ তাশ কুবরি যাদাহ, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ৭৯।

৬ তাশ কুবরি যাদাহ, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ৭৯; কালকাশান্দি, *প্রাগুক্ত*, খ ৩, পৃ ১৩; ইবনু আব্দ রাব্বিহি, *আল-ইকদুল ফরীদ*, খ ৩, পৃ ৩।
বর্ণিত আছে, তিনি চৌদ্দ বৎসর বয়সে আরবি বর্ণমালায় লেখার পদ্ধতি চালু করেছিলেন। (আল-কুরতুবি, আবূ উমর ইউসুফ, *আল-কাস্দ ওয়াল উমাম*, কায়রো: মাকতাব আল-কুদসি, ১৩৫০হি., পৃ ১৭)।

৭ ইব্‌ন খালদুন, *প্রাগুক্ত*, খ ২, পৃ ৭৩।

৮ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩১।

৯ ওয়াফি, *ইলমুল লুগাহ*, পৃ ৭৮।

১০ ফিনিশীয়: ফিনিশিয়নদের ব্যবহৃত লিখনরীতি 'ফিনিশীয় লিখনরীতি' নামে পরিচিত। অধিকাংশ আধুনিক গবেষকের মতে—তারাই সর্বপ্রথম বাণিজ্যিক লেনদেন ও বহির্বাণিজ্যের তাগিদে বর্ণমালা আবিষ্কার করেছিল। পরবর্তীকালে তাদের ব্যবহৃত বর্ণমালা থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালা উৎপত্তি লাভ করে।

www.pathagar.com

১১ ওয়াফি, *ইলমুল লুগাহ*, পৃ ৭৮-৭৯।
১২ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩১।
১৩ জাওয়াদ আলী, *প্রাগুক্ত*, খ ৮, পৃ ১৫৪।
১৪ ওয়াফি, *ইলমুল লুগাহ*, পৃ ১০০-১০১।
১৫ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৯;
আযহারি, ড. মুকতাদা হাসান, *আরবি সাহিত্যের ইতিহাস*, (সম্পা: ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান), রাজশাহী : মুহাম্মদী সাহিত্য সংস্থা, ১৯৮৫, খ ১, পৃ ২৭
১৬ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩২।
১৭ নাবাতি : হজরত ইসমাইল (আ.)-এর জ্যেষ্ঠপুত্র নাবিত বা নাবাতুহের বংশধরেরা নাবাতি নামে পরিচিতি। নাবাতিরা হিজাজের অধিবাসী ছিল। পরবর্তীকালে তারা সিরিয়া-ইরাক সীমান্তে হিজরত করেছিল এবং সেখানেই তাদের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তাদের সভ্যতা এককালে যথেষ্ট উন্নত ছিল। এখনও তাদের রাজধানী পেট্রায় যে ধ্বংসাবশেষ রয়েছে তা থেকে তাদের শান-শওকতের ধারণা করা যায়।
১৮ জাওয়াদ আলী, *প্রাগুক্ত*, খ ৮, পৃ ১৬৮।
১৯ কালকাশান্দী, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ১৩।
২০ জাওয়াদ আলী, *প্রাগুক্ত*, খ ৮, পৃ ১৫৬।
উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ আরবের 'মুসনাদ লিখনরীতি' উত্তরের 'জাজম রীতি' উদ্ভবের প্রায় ১২শ বছর পূর্বে অস্তিত্ব লাভ করেছিল। (Abbott, Nabia, *Rise of the North Arabic Script*, Shicago University, Shicago, 1939, P. 2)।
২১ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৫।
এ মতটি সঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে ড. খলীল ইয়াহয়া নামি বলেন : বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে জানা যায়, উত্তর আরবের লোকদের নিকট 'মুসনাদ লিখনরীতি'র কোনো না কোনো পদ্ধতি চালু ছিল। তবে এ রিওয়ায়াতগুলো নিকট-অতীতে ব্যবহৃত আরবি লিপির বেলায় প্রযোজ্য নয়; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলো 'মুসনাদ' থেকে উদ্ভূত সামুদি, সাবাঈ ও লিহয়ানি লিপিসমূহের বেলায় প্রযোজ্য। (নামি, ড. খলীল ইয়াহয়া, আসলুল খাত্তিল আরবি ওয়া তাতাওয়ারুহু ইলা মা কাবলাল ইসলাম, *মাজাল্লাতু কুল্লিয়াতিল আদাব*, আল-জামি'আতুল মিসরিয়্যা, ১৯৩৫, খ ৩, সংখ্যা ১, পৃ ৩-৪)
নিম্নের লাইন দুটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে তাতে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

আরবি লিপি :

মুসনাদ লিপি: 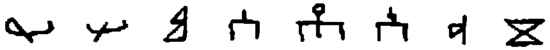

লিপিবিজ্ঞানী Abbott 'মুসনাদ' থেকে জাজম লিপিরীতির উদ্ভব প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে, 'জাজম' সরাসরি 'মুসনাদ' থেকে উদ্ভূত নয়। তিনি বলেন, জাজম শব্দটি আরবিতে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন قلم جزم বলতে সমানভাবে চাঁচা কলমকে বোঝানো হয়। আর এ ধরনের চাঁচা কলম দ্বারা অঙ্কিত চিত্রগুলো সুচালো ক্ষুদ্র কঞ্চির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। এ কারণে তিনি আরবি শব্দ جزم -কে সিরিয়ক শব্দ N^1N^3 (চাঁচা বা সুচালো কঞ্চি) থেকে উদ্ভূত বলে মনে করেন। তিনি আরো বলেন, جزم উপর্যুক্ত সিরিয়ক শব্দ থেকে উদ্ভূত হওয়ার পেছনে আর একটি প্রমাণ হলো শক্ত ও

www.pathagar.com

সুচালো অগ্রভাগের দিক থেকে চাঁচা কষ্কিও সতরঞ্জলি লিপি ও কুফি লিপির উল্লম্ব রেখাসমূহের সাথে যথেষ্ট মিল রাখে। (Abbott, *op.cit.*, p.8).

২২ জাওয়াদ আলী, *প্রাগুক্ত*, খ ৮, পৃ ১৬৯।

২৩ *প্রাগুক্ত*, খ ৮, পৃ ১৭০।

২৪ বাওলান : তাঈ গোত্রের পূর্বপুরুষ গুসাইন ইবন আমার ইবন গাওছের বংশধররা বাওলান নামে পরিচিত ছিল। (আন-নুওয়াইরি, *নিহায়াতুল আরাব*, পৃ ১৭৩)।

২৫ আম্বার : বাগদাদের পশ্চিমে ইউফ্রেটিস নদীর উপকূলবর্তী নগরী। (আল-হামাভি, *মু'জামুল বুলদান*, খ ২, পৃ ৩৭৬)।

২৬ কালকাশান্দি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ৪২১; ইবনুন নাদীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪-৫; সুয়ুতি, *আল-মুযহির*, খ ২, পৃ ৩৪৬।

২৭ আযহারি, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২৯।

২৮ সুয়ুতি, *আল-মুযহির*, খ ২, পৃ ৩৪৯ ।

২৯ কালকাশান্দি, *প্রাগুক্ত*, খ ৩, পৃ ৯; ইবনুন নাদীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪ ।

৩০ অ্যারামাইক = অ্যারাম দেশীয়। প্রাচীন গ্রিকগণ টাইগ্রিস নদীর নিম্নাঞ্চলকে অ্যারাম নামে অভিহিত করত। এ কারণে এ অঞ্চলের অধিবাসীদেরকেও অ্যারামি বলা হতো। অ্যারামীরা হলো সামের বংশধর। তারা আরব দেশের উত্তর-পূর্ব দিকে বসবাস করত। খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ সালের পরবর্তী এক সময়ে তারা সিরিয়ায় আগমন করেছিল। এজন্য তাদেরকে সিরিয়নও বলা হয়। এখান থেকে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ইরাক ও ফিলিস্তিন, এমনকি প্রাচীন তাদমুরিয়ান ও আম্বাদের রাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। এসব অঞ্চলের সাহিত্যে, কথাবার্তায় ও লেখায় তথা সর্বক্ষেত্রে অ্যারামাইক ভাষা একচেটিয়া ব্যবহৃত হতো। তদ্রূপ তাদের লিখনরীতিও এসব অঞ্চলে প্রবলভাবে বিস্তার লাভ করেছিল।

৩১ Siman, Khalil, *Linguistics in the Middle Ages*, Lieden: A.J. Brill, 1968, P. 9.

৩২ সতরঞ্জলি লিপি: কথিত আছে যে, খ্রিষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর শুরুতে বুলাস ইবন আরকা বা আতকা আর-রাহাভি এটি উদ্ভাবন করেন। এরপর লোকদের মাঝে তা বিস্তার লাভ করে।

৩৩ *আদ-দিরাসাতুল আদাবিয়্যা*, আল-জামি'আতুল লুবনানিয়া, ১৯৬০, বর্ষ:২, সংখ্যা: ১, পৃ ৭৬।

৩৪ *প্রাগুক্ত।*

৩৫ নামি, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪।

৩৬ হিব্রু লিপি : এটি ফিনিশীয় লিপি থেকে উদ্ভূত। এতে ২২টি বর্ণ রয়েছে। প্রত্যেকটি বর্ণ এক একটি স্বরের প্রতীক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি ডান দিক থেকে বাম দিকে এবং এর বর্ণগুলো পৃথক পৃথকভাবে লেখা হয়। তবে আলিফ ও লাম বর্ণসমূহ সংযুক্ত অবস্থায় লিপিবদ্ধ করা হয়। এটি চারটি পর্বে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে।

ক. প্রথম পর্বে এর বর্ণগুলো প্রায় ফিনিশীয় বর্ণগুলোর মতোই ছিল। এ পর্বের লিপিকে প্রাচীন হিব্রু নামে অভিহিত করা হয়।

খ দ্বিতীয় পর্বে হিব্রু ভাষা অ্যারামিয় ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে হিব্রু লিপিরীতিতেও অ্যারামাইক লিপির প্রভাব পড়ে। এর ফলে নতুন এক প্রকারের লিখনরীতি উদ্ভূত হয়। এটি আধুনিক হিব্রু বা আয়তকার হিব্রু নামে পরিচিত।

গ. খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর দিকে এতে দীর্ঘস্বরের প্রতীক চিহ্ন হিসেবে আলিফ, হা, ওয়াও ও ইয়া প্রভৃতি বর্ণ ব্যবহৃত হয়।

ঘ. সর্বশেষ এতে হ্রস্বস্বরের দিকে ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য হরকতের নিয়ম চালু করা হয়।

www.pathagar.com

৩৭ উবাদাহ্, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৭।

৩৮ যায়দান, জুরজি, *তারীখুদ তামাদ্দুনিল ইসলামি*, (বৈরুত : দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৬৭), খ ৩, পৃ ৫৮-৫৯।

৩৯ জাওয়াদ আলী, *প্রাগুক্ত*, খ ৮, পৃ ১৭২।

৪০ এখানে 'নাবাতি লিপি' বলতে নাবাতিদের পরিণত লিপিকে বোঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, নাবাতিরা লিখনশিল্পে পর পর তিনটি অধ্যায় অতিক্রম করে এবং সর্বশেষ অধ্যায়ে তাদের লিখনরীতি পরিণত অবস্থায় পৌঁছে। এ অধ্যায়গুলো হলোঃ

ক. অ্যারামাইক অধ্যায়ঃ এ অধ্যায়ে তারা অ্যারামাইক চৌকা বর্ণগুলোর ওপর নির্ভর করত।

খ নাবাতি অধ্যায়ঃ এ অধ্যায়ে তারা অ্যারামাইক বর্ণগুলো থেকে নিজেদের বর্ণগুলো উদ্ভাবন করে।

গ. পরিণত অধ্যায়ঃ এ অধ্যায়ে নাবাতি বর্ণসমূহের আকৃতি গোলাকার রূপ ধারণ করে, যদিও এতে সামান্য চতুষ্কোণ আকৃতির প্রভাব অবশিষ্ট থেকে গেছে। এটিই নাবাতিদের পরিণত লিখনরীতি।

৪১ আযহারি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ২৯-৩০; ইয়াকুব আলী, *মুসলিম মুদ্রা*..., পৃ ৩০২।

৪২ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৭।

৪৩ *প্রাগুক্ত*।

৪৪ *প্রাগুক্ত*।

৪৫ নামি, *প্রাগুক্ত*, খ ৩, সংখ্যা ১, পৃ ১০২।

৪৬ জাওয়াদ আলী, *প্রাগুক্ত*, খ ৮, পৃ ১৭৪।

৪৭ নামি, *প্রাগুক্ত*, ৮৫-৮৮; তাওকান, ফাওয়ায আহমদ, আরবি রাসমুল খাত্ত কা আগায আওর ইরতিকা, (অনু.: গোলাম হায়দর আসী), *ফিক্‌র ওয়া নাযার*, ইসলামাবাদঃ ইদারায়ে তাহকীকাতে ইসলামি, খ ৭, সংখ্যা-১০, এপ্রিল ১৯৭০, পৃ ৭৭০-২।

৪৮ তবে অনেকেই এ মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তাঁদের মতে, আরবিতে নুকতা ও হরকতের ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। এ সম্পর্কে যথা স্থানে বিশদ আলোচনা করা হবে, ইনশা' আল্লাহ।

৪৯ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪০।

৫০ ওয়াফি, *ইলমুল লুগাহ*, পৃ ১০৪।

৫১ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১০৫।

৫২ এটি শিলালিপির ভগ্নাংশ। ধারণা করা হয় যে, এটি بس এবং এর অবশিষ্ট বর্ণ হলো م। এমতাবস্থায় পূর্ণ বাক্যটি হবেঃ بسم الاله ; কিন্তু Latman এর ভগ্নাংশকে بنص এবং অবশিষ্ট বর্ণটিকে راء ধরে ' بنصر الاله ' পড়েছেন ।

৫৩ ওয়াফি, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১০৬।

৫৪ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪৬।

৫৫ বিশিষ্ট মুফাসসির ইবনু কাছির (রাহ.) হাদিসটিকে ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করেছেন। (ইবনু কাছির, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম*, খ ১,পৃ ৩১)।

৫৬ এ বর্ণগুলো আকৃতিগত দিক থেকে আরবি; কিন্তু উচ্চারণগত দিক থেকে আরবি নয়। তারা এগুলো লেখার ক্ষেত্রে সম-আকৃতির বর্ণগুলো থেকে পৃথক করার জন্য বর্ণের ওপরে বা নিচে বিন্দু বা কোনো চিহ্ন বসিয়ে থাকে ('উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২৬)।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়
আরবি লিখনশিল্পের প্রসার

ইসলাম-পূর্ব লিপিচর্চা

জাহিলি যুগে সর্বসাধারণের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন বেশ একটা ছিল না; বরং অতি নগণ্য সংখ্যক লোক লেখাপড়া জানত। এ কারণেই সমসাময়িককালে আরব জাতি একটি أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ -'নিরক্ষর জাতি' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। ইসলামের আবির্ভাবকালে পবিত্র কুরআনেও তাদেরকে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ -" তিনি সে মহান সত্তা, যিনি নিরক্ষরদের মাঝে তাদের মধ্য থেকে একজন রাসুল পাঠিয়েছেন।"[১] এ আয়াত থেকে জানা যায়, আরবরা অধিকাংশই ছিল নিরক্ষর, লেখাপড়া জানত না। এতদ্‌সত্ত্বেও আরবদেশের বেশ কিছু জায়গায় কিছু লোক রীতিমতো লেখার কাজ চালিয়ে যেত। সাতটি সর্বস্বীকৃত কবিতা, যাকে 'সাব'আ মু'আল্লাকা' (সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা) বলা হয়, শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পেয়ে মিসরীয় ক্ষৌমবস্ত্রে স্বর্ণাক্ষরে লিখে কাবা শরিফের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছিল।[২] এগুলো জাহিলি যুগের আরবি লিপির অনুপম নিদর্শন। তাছাড়া এ যুগে দলিল, অঙ্গীকারনামা, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র এবং ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থাদি প্রভৃতিতেও লিপির বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ করা যায়।[৩] জাহিলি যুগের লেখকদের মধ্যে বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করেন :

১. আমর ইবন জুরারাহ। সমসাময়িককালে তিনি 'কাতিব' নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।
২. গায়লান ইবনু সালামা ইবন মা'তাব। তিনি তায়িফ যুদ্ধের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[৪]

জাহিলি যুগে আরবদের মধ্যে তায়িফবাসীরা, বিশেষ করে সকিফ গোত্রের লোকেরা লিপিচর্চার ক্ষেত্রে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিল। এ কারণেই হজরত উমর (রা.) কুরাইশ ও সকিফ গোত্রের লোকদেরকে পবিত্র মুসহাফের লেখক হিসেবে নিয়োজিত করেন। তদুপরি হজরত উসমান (রা.) বলেন, اجْعَلُوا الْمُمْلِيَ مِنْ هُذَيْلٍ، وَالْكَاتِبَ مِنْ ثَقِيفٍ. - "তোমরা হুযাইল গোত্রের লোকদের থেকে লিপিনির্দেশক (Dictator) এবং সকিফ গোত্রের লোকদের থেকে কাতিব (writer) নিয়োগ করো।"[৫]

লিপিচর্চার ক্ষেত্রে মদিনার আওস ও খযরজ গোত্রদ্বয়েরও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাদের মধ্যেও বেশ কয়েকজন প্রসিদ্ধ লেখক ছিল। তাছাড়া মদিনার ইহুদিদের মাঝেও লিখনশিল্প কমবেশি প্রচলন লাভ করেছিল।

যতটুকু জানা যায়, আরব দেশে জাহিলি যুগে দু ধরনের লিখনপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এক. বক্রাকার লিপি। প্রাচীন আরবের এরূপ বক্রাকার রীতির দৃষ্টান্ত দেখা যাবে

www.pathagar.com

অপেক্ষাকৃত নরম উপাদান যেমন: চামড়া, তালপাতা, পার্চমেন্ট ও প্যাপিরাস প্রভৃতিতে। দুই. শিলালিপি বা স্মারকলিপি। এ লিপি অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের ছিল। এটি শিরঃকোণবিশিষ্ট ছিল। এর দৃষ্টান্ত দেখা যাবে শক্ত উপাদানে যেমন: উটের হাড়, বিশেষ করে ঘাড়ের চওড়া অংশ ও পাঁজর, মৃৎপাত্র, সমান্তরাল সাদা পাথর, কাঠ এবং ধাতব পাত্রে। সমগ্র আরব দেশে শিলালিপির বহুল প্রচলন থেকে ধারণা করা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকে এই রীতির বহুল ব্যবহার ছিল।[৬]

ইসলামের প্রাথমিককালে যখন রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কায় ছিলেন তখন কুরাইশদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি লেখক হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

১. হজরত আবু বকর (রা.)
২. হজরত উমর (রা.)
৩. হজরত উসমান (রা.)
৪. হজরত আলী (রা.)
৫. হজরত তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা.)
৬. হজরত আবু উবায়দা আল-জার্‌রাহ (রা.)
৭. আবু সুফ্‌ইয়ান ইবন হার্‌ব ইবন উমাইয়া (রা.)
৮. হজরত মু'আভিয়া (রা.)
৯. হজরত ইয়াযিদ ইবন আবি সুফ্‌ইয়ান (রা.)
১০. আবু হুযায়ফা ইবন উতবা ইবন রাবিয়া
১১. হাতিব ইবন উমর আল-আমিরি
১২. আবু সালামা ইবন আবদুল আসাদ আল-মাখযুমি
১৩. আবান ইবন সা'ঈদ ইবনিল 'আস
১৪. খালিদ ইবন সা'ঈদ ইবনিল 'আস
১৫. আবদুল্লাহ ইবন সা'ঈদ ইবন আবূ সারহ আল-আমিরি
১৬. হুয়াইতাব ইবন আবদুল উযযা
১৭. জুহাইম ইবনুস সালত ইবন মাখরামা
১৮. যুবাইর ইবনুল আওয়াম
১৯. ওয়ারাকা ইবন নাওফাল
২০. আলা ইবনুল খাদরামি (তিনি কুরাইশের মিত্র ছিলেন।)

কুরাইশদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মহিলাও জাহিলি যুগের নিরক্ষর সমাজে লেখালেখির কাজে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন–

১. শিফা বিন্‌ত আবদুল্লাহ আল-আদাওয়াইয়াহ (রা.)। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে তাঁর স্ত্রী হাফসা (রা.)-কে লেখার জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন।
২. উম্মু কুলছুম বিন্‌ত উকবা
৩. আয়িশা বিন্‌ত সাদ
৪. কারিমা বিন্‌তুল মিকদাদ[৭]

www.pathagar.com

রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে যে সময় মদিনায় হিজরত করে আসেন, তখন সেখানেও বেশ কয়েকজন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন–

১. সা'ঈদ ইবনু যুরারাহ
২. সা'দ ইবন উবাদাহ
৩. মুনযির ইবনু আমার
৪. উবাই ইবনু কাব
৫. যায়দ ইবনু সাবিত (তিনি হিব্রু ভাষাও লিখতে পারতেন।)
৬. রাফি ইবনু মালিক
৭. উসাইদ ইবনু হুদাইর
৮. মা'আন ইবনু আদি
৯. আবু আবস ইবনু কাছির
১০. আওস ইবনুল খাওলি
১১. বশির ইবনু সাদ
১২. সাদ ইবন রবি
১৩. আবদুল্লাহ ইবন আবুল মাছানিক[৮]

পরবর্তীকালে তাঁদের থেকে অনেক লোকই হস্তলিখনের জ্ঞান অর্জন করে। যতদূর বোঝা যায়, মক্কার আগেই মদিনায় লেখার চর্চা শুরু হয়েছিল। আর এখান থেকে মুসলমানদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় লেখার শিক্ষা ও প্রচলন বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৯]

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় লিপিচর্চা

ইসলামের অভ্যুদয়ের পর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ থেকেই আরবি হস্তলিপি বিশেষ মাত্রা পেতে শুরু করে। আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর যে ওহি নাজিল করেন তাতে তিনি মুসলমানদেরকে পড়ালেখা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন, নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন,

(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) .

-পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।[১০]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা কলমের নামে শপথ করেছেন। তিনি বলেন, (ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ) -"নুন, শপথ সে কলমের এবং সে বিষয়ের, যা তারা লিপিবদ্ধ করে।"[১১] এ থেকে কলমের অপরিসীম গুরুত্বের কথা বোঝা যায়। তদুপরি কলমই হলো আল্লাহ তা'আলার সর্বপ্রথম সৃষ্টি। হজরত ইবুন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ. -" সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা কলমকেই সৃষ্টি করেছেন।"[১২]

স্মতর্ব্য যে, ইসলামপূর্ব সময়ে চিত্রকলা ও ভাস্কর্য শিল্প খুব মানসম্পন্ন পর্যায়ে পৌঁছেছিল। কিন্তু ইসলাম যেহেতু বিষয় দুটির প্রতি কোনোরূপ উৎসাহ দেখায়নি, তাই যে সমস্ত শিল্পী চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে দক্ষতা অর্জন করেছিল, তারা ইসলাম পরবর্তী সময়ে লিপিশিল্পের উন্নয়নে শ্রম দিতে শুরু করে। ফলে তাঁদের নিষ্ঠা ও একাগ্রতায়

www.pathagar.com

অচিরেই লিপিশিল্পের চমৎকার ধারাসমূহের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে পবিত্র কুরআনের ভাষা আরবি হওয়ায় এবং কুরআন সংরক্ষণের জন্য একে লিপিবদ্ধ করে রাখা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মুসলমানগণ কুরআন মজিদ লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে যেরূপ অনুরাগ ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। এ কারণে ইসলামের সাথে সাথে অতি দ্রুত আরবি হস্তলিপির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ক্রমশ তাতে বিভিন্ন উৎকর্ষ সাধিত হতে থাকে।

রাসুলুল্লাহ (সা.)ই হলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি ব্যাপকভাবে আরবি লিপির প্রসারের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছেন। তিনি নিরক্ষর আরবদের মধ্যে হস্তলিপির প্রসার ও ব্যাপক প্রচলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পবিত্র মদিনা নগরীতে মসজিদে নববি নির্মাণের পরপরই রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে একটি শিক্ষাগারে পরিণত করেন। এখানে তিনি আবদুল্লাহ ইবনু সা'ঈদ ইবনুল আসি (রা.)-কে লেখা শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত করেন।[১৩] তিনি ছিলেন যথেষ্ট সুন্দর হস্তাক্ষরের অধিকারী। তদুপরি রাসুলুল্লাহ (সা.) মসজিদে নববিতে বদরের অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন যুদ্ধবন্দিদের মুসলিম বালকদেরকে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে মুক্তিদানের সুব্যবস্থা করেন।[১৪] এ থেকে বোঝা যায়, রাসুলুল্লাহ (সা.) শিক্ষার্থীদের অক্ষরজ্ঞান শিক্ষাদানের পাশাপাশি সুন্দর হস্তাক্ষরের প্রতি যথেষ্ট লক্ষ রেখেছেন। তিনি বলেছেন, الْخَطُّ الْحَسَنُ يَزِيدُ الْحَقَّ وُضُوحًا. -"সুন্দর হস্তলিপি সত্যের উজ্জ্বলতাকে বাড়িয়ে দেয়।"[১৫] তাঁর আমলে মদিনায় নির্মিত অন্য নয়টি মসজিদেও মসজিদে নববির আদলে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[১৬] রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবিগণের মধ্যে যাঁরা লেখাপড়া জানতেন তাঁদেরকে কুরআন শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করতেন। সাথে সাথে বহু লিপিশিল্পীকেও এ দায়িত্ব দিয়ে পাঠাতেন, যাতে তাঁরা মাদ্রাসা নির্মাণ করে একে সম্প্রসারণ করতে পারে। বর্ণিত আছে যে, হজরত মা'আয ইবনু জাবাল (রা.) লেখা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁর আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের নিকট একের পর এক কাতিবদের পাঠাতেন।[১৭]

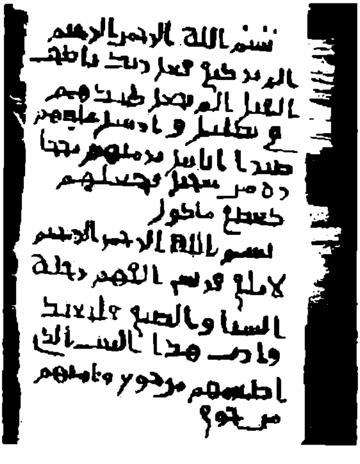

চিত্র-১: খেজুরের ছালে সুরা কুরাইশ ও ফিল

www.pathagar.com

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে ওহি অবতীর্ণ হলে তিনি নির্দেশ দিতেন সেগুলোকে লিখিত আকারে সংরক্ষণ করতে। এই উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকজন সাহাবিকে নিজের কাতিব হিসেবেও নিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা পবিত্র কুরআনের বাণীসমূহ চামড়া, পাথর, হাড় ও খেজুরের ডাল-পালা প্রভৃতি পত্রে লিখে রাখতেন। (দ্র. চিত্র-১

পবিত্র কুরআনের লিখিত এই অংশগুলো আরবি লিপিকলার প্রাথমিক পর্যায়ের এক অনুপম নিদর্শন। তাছাড়া রাসুলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ ও গোত্র প্রধানদের কাছে ইসলামের দাওয়াত জানিয়ে যেসব পত্র প্রেরণ করতেন তা-ও তাঁরা লিখতেন। নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাতিবদের সংখ্যা ছিল ৪৩।[১৮] তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো–

১. হজরত আবু বকর (রা.)
২. হজরত উমর (রা.)
৩. হজরত উসমান (রা.)
৪. হজরত আলী (রা.)
৫. হজরত আবু সুফ্ইয়ান (রা.)
৬. হজরত মু'আভিয়া (রা.)
৭. হজরত ইয়াযিদ ইবন আবি সুফ্ইয়ান (রা.)
৮. সা'ঈদ ইবনুল আস (রা.)
৯. হজরত আবান ইবনু সা'ঈদ (রা.)
১০. হজরত খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.)
১১. হজরত যায়দ ইবনু সাবিত (রা.)। বেশির ভাগ ওহি লেখার কাজ সম্পন্ন করতেন বলে তিনি 'كاتب رسول الله (ص)' (রাসুলুল্লাহ [সা.]-এর লেখক) নামে সুপরিচিত ছিলেন।
১২. হজরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.)
১৩. হজরত তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা.)
১৪. হজরত সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস
১৫. হজরত আমির ইবনু ফুহায়রা (রা.)
১৬. হজরত আবদুল্লাহ ইবনুল আরকাম (রা.)। রাজা-বাদশাহ ও অন্যান্য নৃপতির নিকট রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রেরিত অধিকাংশ চিঠি তিনিই লিখতেন।
১৭. হজরত আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রা.)
১৮. হজরত আবদুল্লাহ ইবন সাদ ইবন আবু সারহ (রা.)। মক্কার কুরাইশদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম কুরআন লিপিবদ্ধ করেন। তবে তিনি ইসলাম গ্রহণের পর একবার ধর্মচ্যুত হয়ে গিয়েছিলেন। পরে আবার মক্কা বিজয়ের সময় ফিরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।
১৯. হজরত উবাই ইবনু কাব (রা.)। মদিনার আনসারদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম কুরআন লিপিবদ্ধ করেন।
২০. হজরত সাবিত ইবনু কায়স (রা.)

www.pathagar.com

২১. হজরত হানযালা ইবনুর রাবি (রা.)
২২. হজরত শুরাহবিল ইবনু হাসানাহ (রা.)
২৩. হজরত আলা আল-হাদরামি (রা.)
২৪. হজরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা.)
২৫. হজরত আমার ইবনুল আস (রা.)
২৬. হজরত মুগিরা ইবনু শুবা (রা.)
২৭. হজরত মুয়াইকিব ইবন আবু ফাতিমা আদ-দাওসি (রা.)
২৮. হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.)
২৯. হজরত হুয়াইতাব ইবনু আবদুল উয্যাহ আল-আমিরি (রা.)
৩০. হজরত মা'আয ইবন জাবাল (রা.)
৩১. হজরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) প্রমুখ।

তবে তাঁদের মধ্যে যাঁরা প্রায় সময় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে থেকে লেখালেখির কাজ বেশি আঞ্জাম দিয়েছেন তাঁরা হলেন যায়দ ইবনু সাবিত (রা.), উবাই ইবনু কাব (রা.), মা'আয ইবনু জাবাল (রা.) ও হজরত মু'আভিয়া (রা.) প্রমুখ।[১৯]

রাসুলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন দেশের শাসনকর্তা ও গোত্রপ্রধানদের নিকট ইসলামের দাওয়াত জানিয়ে যেসব চিঠিপত্র লিখে পাঠান এগুলো নিঃসন্দেহে আরবি লিপির উৎকর্ষের পরিচয় বহন করে। তাঁর এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ চিঠিগুলো হলো–

১. রোম সম্রাট হিরোক্লিয়াসের নিকট প্রেরিত চিঠি। এটি রাসুলুল্লাহ (সা.) হজরত দাহ্য়াতুল কালবি (রা.)-এর মাধ্যমে পাঠান।
২. পারস্য সম্রাট পারভেজের নিকট প্রেরিত চিঠি। এটি তিনি হজরত আবদুল্লাহ ইবনু হুযায়ফা আস-সাহমি (রা.)-এর মাধ্যমে পাঠান।
৩. হাবশার বাদশাহ আসহামাহ নাজ্জাশি (রা.)–এর কাছে প্রেরিত চিঠি। এটি তিনি হজরত আমর ইবনু উমাইয়া আদ-দামরি (রা.)-এর মাধ্যমে পাঠান।
৪. মিসরের বাদশাহ মুকাওকিস মিনা ইবনু জুরাইজের কাছে প্রেরিত চিঠি। এটি তিনি হজরত হাতিব ইবন আবি বালতা'আহ (রা.)-এর মাধ্যমে পাঠান।
৫. বাহরাইনের বাদশাহ মুনজির ইবনু সাভির কাছে প্রেরিত চিঠি। এটি তিনি হজরত আলা ইবনুল হাদরামি (রা.)-এর মাধ্যমে পাঠান।
৬. উমানের বাদশাহ জায়ফার ও আবদ প্রমুখের কাছে প্রেরিত চিঠি। এটি তিনি হজরত 'আম্‌র ইবনুল আস (রা.)-এর মাধ্যমে পাঠান।
৭. ইয়ামামার অধিপতি হাওযা ইবনু আলীর কাছে প্রেরিত চিঠি। এটি তিনি হজরত সালিত ইবন 'আম্‌র আল-'আমিরি (রা.)-এর মাধ্যমে পাঠান।
৮. বালকার বাদশাহ হারিস ইবনু শাম্মার আল-গাস্‌সানির কাছে প্রেরিত চিঠি। এটি তিনি হজরত শাজা ইবনু ওয়াহাব আল-আসাদি (রা.)-এর মাধ্যমে পাঠান।
৯. ইয়েমেনের বাদশাহ হারিস হিময়ারির কাছে প্রেরিত চিঠি। এটি তিনি মুহাজির ইবন উমাইয়া আল-মাখযুমি (রা.)-এর মাধ্যমে পাঠান।

www.pathagar.com

১০. আয়লার অধিপতি ইউহান্না ইবনু রুবার কাছে প্রেরিত চিঠি। এটি তিনি তাবুক যুদ্ধের সময় তাঁর কাছে পাঠান।[২০]

ড. হামিদুল্লাহ এ ধরনের চিঠিপত্রগুলো একত্রিত করেছেন। এ চিঠিপত্রগুলো 'مجموعة الوثائق السياسية' নামে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং বর্তমানে তা পাওয়া যায়। এ সংকলনে খুলাফা-ই-রাশিদুনের লিখিত চিঠিপত্রগুলো স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে ২৮১টি চিঠি এমন আছে যেগুলো রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সম্পৃক্ত। মিসরের বাদশাহ মুকাওকিসের প্রতি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রেরিত চিঠিখানা মিসরের প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে এখনো সংরক্ষিত রয়েছে।

নিম্নের চিত্রে (দ্র. চিত্র-২) আমরা বাহরাইনের বাদশাহ মুনজির ইবনু সাভির কাছে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রেরিত চিঠিটি দেখতে পাচ্ছি। এটি বর্তমানে দামিশকে সংরক্ষিত রয়েছে।

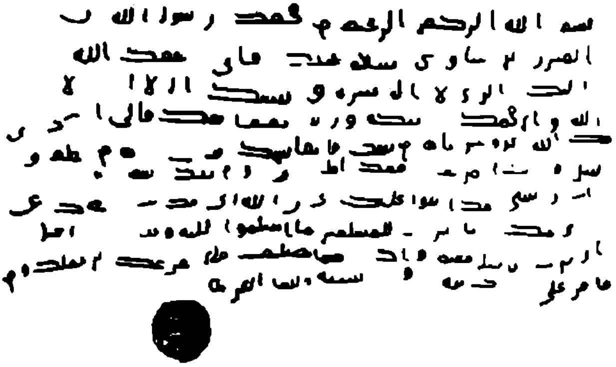

চিত্র-২

এর মূল ভাষ্য হলো–

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى
المنذر بن ساوي ، سلام عليك فإني أحمد الله
إليك الذي لا إله غيره ، و أشهد أن لا إله إلا
الله و أن محمدا عبده و رسوله ، أما بعد فإني أذكر
ك الله عز و جل فإنه من ينصح لنفسه و إنه من يطع ر
سلي و يتبع أمرهم فقد أطاعني و من نصح لهم فقد نصح لي
و أن رسلي قد أثنوا عليك خيرا لله و إني قد شفعتك في
قومك ، فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه ، و عفوت عن أهل
الذنوب فاقبل منهم ، و إنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك و من
أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليك الجزية .
محمد رسول الله

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআন ও চিঠিপত্র ছাড়া রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে সাহাবিদের মধ্যে যাঁরা লেখাপড়া জানতেন তাঁরা তাঁর অসংখ্য হাদিস, আদেশনামা ও দলিল-দস্তাবেজ লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। প্রথম পর্যায়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিপিবদ্ধ করতে সাহাবিদের নিষেধ করেছিলেন বটে; তবে তার কারণ ছিল প্রথমত, তখন এতে একটি অসুবিধা দেখা দেয়। তা হলো অনেক সাহাবি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট থেকে যা কিছুই শুনতে পেতেন তা সবই একইসাথে ও একই পত্রে লিখতে শুরু করেন।[২১] এর ফলে কুরআন ও হাদিস সংমিশ্রিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। আর এর পরিণাম কত যে ভয়াবহ তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। তদুপরি তখনো সাহাবিগণ কুরআনের বিশেষ বাকরীতি ও গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাবধারার সাথে এতটুকু পরিচিত হয়ে উঠেননি যে, প্রথম দৃষ্টিতে তাঁরা কুরআন ও হাদীসের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হবেন। দ্বিতীয়ত, তখন আরবদের মাঝে লেখাপড়া জানত এ ধরনের লোকদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। আবার মুসলমানদের মধ্যে তাদের সংখ্যা ছিল আরো কম। উপরন্তু, তখন লেখার কাজও ছিল অতি কষ্টসাধ্য। তাই এটি অত্যন্ত অসম্ভব ও অমানবিক ব্যাপার ছিল, যে কয়জন মুসলমান লিখতে জানতেন তাঁদেরকে রাসুলুল্লাহ (সা.) একই সাথে কুরআন ও হাদিস লিখতে বাধ্য করতেন। কিন্তু হিজরতের পরে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় মুসলমানদের মধ্যে বেশ কিছু লোক লেখাপড়ায় অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। এর ফলে হাদিস লেখার ক্ষেত্রে পূর্বের যে অসুবিধাগুলো ছিল তা দূর হয়ে যায়। এ অবস্থায় রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁদেরকে শুধু হাদিস লেখার সাধারণ অনুমতিই প্রদান করেননি; বরং ক্ষেত্র বিশেষে নির্দেশও প্রদান করেছেন।[২২] হজরত উমর ও আনাস (রা.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ-"তোমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে লিখে গ্রন্থাবদ্ধ করে নাও।"[২৩] এর ফলে আমরা দেখতে পাই, রাসুলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবিদের আমলে ব্যক্তিগত স্মারকগ্রন্থ হিসেবে অসংখ্য হাদিসগ্রন্থ রচিত হয়েছে।[২৪]

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পর তাঁর খলিফা ও সাহাবিগণ তাঁর পদাঙ্ক অনুকরণ করে হস্তলিপি প্রসারের জন্য এমন ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেন, যাতে দেখা যায়, অতি অল্প দিনের মধ্যে নিরক্ষর আরব জাতির মধ্যে এমন অসংখ্য লোক সৃষ্টি হয়, যারা লেখাপড়া জানত। তাঁদের মধ্যে জন্ম নেয় বিভিন্ন পর্যায়ের সুদক্ষ লেখক। দিওয়ান লেখক, পত্র লেখক ও মুসহাফ-লেখক প্রমুখ তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তদুপরি খলিফাগণ এবং অধিকাংশ সাহাবি প্রায় সকলেই লিখতে-পড়তে জানতেন। এভাবে আরবি লিপি ক্রমশ বিস্তার ও প্রসার লাভ করতে থাকে। তদুপরি তখন লিখনশিল্পীদের সামাজিক মর্যাদা অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। সে সময়ে আরবদের মধ্যে যারা লিখতে জানত এবং তীর চালনা ও সাঁতার কাটায় পারদর্শী ছিল তাদেরকে তারা كامل (Competent) নামে অভিহিত করত।[২৫] এ কারণেও লেখাপড়ার প্রতি তাদের আগ্রহ ও অনুরাগ বেড়ে যায় এবং পরস্পর প্রতিযোগিতা করে তারা লেখাপড়া শিখতে থাকে।

উল্লেখ্য যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর খলিফাদের আমলে পবিত্র কুরআন লেখার জন্য যে লিখনপদ্ধতি অনুসরণ করা হতো তা ছিল 'জাজম লিখনরীতি'।[২৬] এ লিপির কয়েকটি আঞ্চলিক রূপের কথা জানা যায়। আম্বার অঞ্চলে আম্বারি, হিরাতে হিরি, মক্কায় মক্কি ও মদিনায় মাদানি লিপি হিসেবে এটি প্রচলিত ছিল। মক্কা ও মদিনায়

www.pathagar.com

কুরআনের অনুলিপি তৈরি করার জন্য এ লিপিকে আদর্শ হিসেবে ধরা হয়েছিল। তবে পবিত্র মদিনা নগরীতে আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তিন ধরনের লিপি প্রচলিত ছিল। ১. মুদাওয়ার অর্থাৎ গোলাকার। ২. মুসাল্লাস অর্থাৎ ত্রিকোণাকৃতির ও ৩. তাঈম অর্থাৎ গোলাকার ও কৌণিক লিপির মিশ্রিত রূপ। এ তিনটি ধারাকে দুটি প্রধান ধারায় ভাগ করা হয়। ১. গোলাকার ধারা। এটা লিখতে সহজ। ও ২. কৌণিক ধারা। এটা মোটা কলমে লম্বপ্রধান রেখায় লিখতে হয়। প্রাথমিকভাবে মক্কা ও মদিনা শরিফে এ দুই ধারায় আরবি লিপিতে উন্নয়ন আসতে থাকে। এরপর কিছু ভিন্ন ধরনের লিপির উদ্ভব হয়। তন্মধ্যে 'মাইল' (slanting), 'মাস্ক' (extended) ও 'নাসখ' (inscriptional) উল্লেখযোগ্য (দ্র. চিত্র-৩ ও ৪)। প্রথম দুটি কৌণিক ধারার এবং শেষেরটি গোলাকার ধারার লিপি। হিজাজে যখন কুফি লিপি দ্রুত উন্নতি করেছে, তখন মাস্ক ও নাসখ মোটামুটি উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে; কিন্তু 'মাইল' লিপিটি তা পারেনি; বরং এটি কুফি লিপির স্থাপত্য ধারায় হারিয়ে যায়।[২৭]

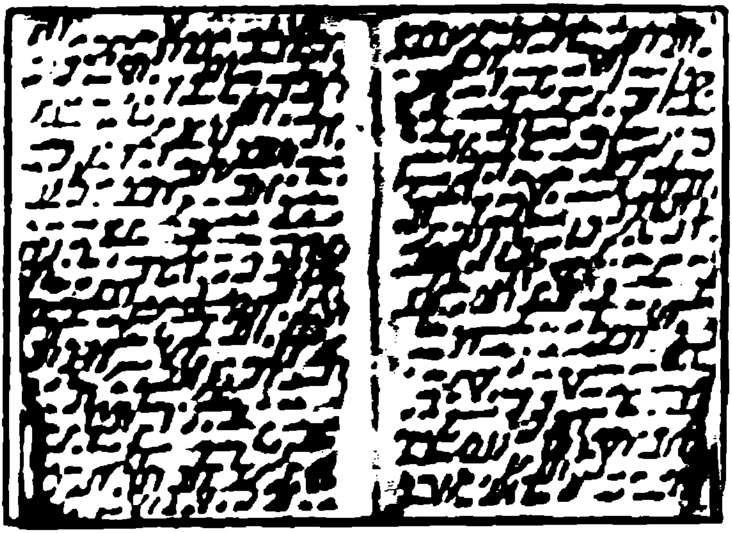

চিত্র-৩: মাইল লিপিতে লিখিত কুরআনের কপি, খ্রিষ্টীয় ৮ম শতাব্দী, মদিনা

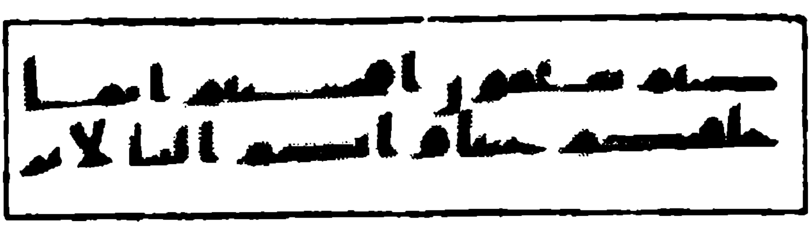

চিত্র-৪: মাস্ক লিপিতে লিখিত কুরআনের কপি, ৭০০-৭৫০ খ্রি.

www.pathagar.com

সাম্প্রতিককালে খুলাফা-ই- রাশিদুনের আমলে প্যাপিরাস (Papyrus)-এর ওপর লিখিত কতগুলো আরবি দস্তাবেজ হস্তগত হয়। এসব দস্তাবেজ নাবাতি[২৮] লিপিরীতিতে লিখিত। (দ্র. চিত্র- ৫) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে লিখিত যে-সকল লিপি ও পত্র হস্তগত হয়েছে, তাও নাবাতি লিপিরীতিতে লিখিত। কিন্তু ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরআন মজিদের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিসমূহ 'জাজম লিপিরীতি'তে লিখিত। এর মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তখনকার যুগে ধর্মীয় ও মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ অর্থাৎ কুরআন মজিদ শিল্প সৌন্দর্যমণ্ডিত ও সৌন্দর্য প্রকাশক লিপিরীতিতে লিখিত হতো। পক্ষান্তরে পার্থিব পত্রাদি ও গ্রন্থাবলি সে যুগে নাবাতি লিপিরীতিতে লিখিত হতো।[২৯]

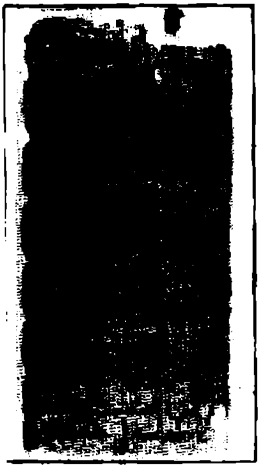

চিত্র-৫: খুলাফা-ই-রাশিদুনের আমলে লিখিত নাবাতি লিপির নমুনা, ৭০৯ খ্রি.

পবিত্র কুরআন লিপিবদ্ধকরণ

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মক্কায় পবিত্র কুরআন অবতরণের শুরু থেকেই তা লিখে রাখার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। হজরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা থেকে জানা যায় যে, তাঁর বোন ফাতিমা বিন্‌ত খাত্তাব (রা.)-এর ঘরে একটি পত্রে সুরা তোয়াহা লিপিবদ্ধ ছিল। তাঁকে ও তাঁর স্বামীকে হজরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা.) ঐ পত্র থেকে দেখে দেখে কুরআন পড়াতেন।[৩০] এ থেকে বোঝা যায়, শুধু সুরা তোয়াহাই নয়; বরং কুরআনের যেসব সুরা মক্কায় নাজিল হয়েছিল, তা সবই লিখিতাকারে মুসলমানদের কাছে সুরক্ষিত ছিল।[৩১] রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজেই কয়েকজন সাহাবিকে কুরআন লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, তাঁরা সকলেই ছিলেন প্রথম স্তরের সাহাবি। তাঁদের মধ্যে যায়দ ইবনু সাবিত (রা.), উবাই ইবনু কাব (রা.), মাআয ইবনু জাবাল (রা.), হজরত মুআভিয়া (রা.) ও খুলাফা রাশিদুন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে জানা যায়। তাঁর ওপর যখনই কোনো আয়াত বা সুরা অবতীর্ণ হতো তখনই তিনি ওহি লেখকদের কাউকে ডেকে তা লিখে রাখতে নির্দেশ দিতেন। এ সকল লেখক পশুচর্ম,

www.pathagar.com

পাথরের টুকরো, হাড় ও খেজুরের প্রশস্ত ছাল প্রভৃতির মধ্যে যখন যা পেতেন, তাতে তাঁরা নিজের জন্যও লিপিবদ্ধ করে রাখতেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-কেও লিখে দিতেন। এরপর রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রত্যেক আয়াতের ব্যাপারে লেখকগণকে বলে দিতেন যে, এ আয়াত অমুক সুরার প্রথমে বা শেষে যোগ করা হবে।[৩২] তাঁর নির্দেশে ওহি লেখকগণ একটি বিশেষ ধারা অনুসরণ করে রীতিমতো কুরআন সংকলনের কাজ করে যেতেন। এভাবে পবিত্র কুরআন তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন পত্রে সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ হয়। তবে তা এক জায়গায় সংগৃহীত ও সুবিন্যস্ত ছিল না। হজরত আলী (রা.) বলেন,

إِنَّ الْقُرْآنَ كَانَ مَجْمُوعًا مُؤَلَّفًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

—রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ে কুরআনের সংগৃহীত, সংকলিত ও লিখিত পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান ছিল।[৩৩]

হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধে[৩৪] বহু কারি ও হাফিজ শাহাদাত লাভ করার পর হজরত উমর (রা.)-এর পরামর্শক্রমে এবং হজরত আবু বকর (রা.)-এর নির্দেশক্রমে হজরত যায়দ ইবনু সাবিত (রা.) পুরো কুরআন লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থাবদ্ধ করেন। তিনি বিভিন্ন প্রকার পত্রে লিখিত কুরআন এবং হাফিজগণের সাহায্যে এ গ্রন্থ প্রস্তুত করেছিলেন। এটি ছিল সর্বজনস্বীকৃত সরকারি পাণ্ডুলিপি। এটি সবদিক থেকে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য ছিল। মূলত এ পাণ্ডুলিপিটি ছিল রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর সামনেই সংকলিত পাণ্ডুলিপির একটি নকল। হজরত আবু বকর (রা.)-এর জীবদ্দশায় পাণ্ডুলিপিটি তাঁর কাছে রক্ষিত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর পাণ্ডুলিপিটি হজরত উমর (রা.)-এর অধিকারে সংরক্ষিত থাকে। তাঁর মৃত্যুর পর এটি তাঁর কন্যা উম্মুল মুমিনীন হজরত হাফসা (রা.)-এর কাছে রক্ষিত থাকে।

হজরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে কারি ও হাফিজের সংখ্যা আরো অনেক কমে যায়। তাঁদের অনেকেই ইন্তেকাল করেছিলেন। সে-সময় হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) যুদ্ধ উপলক্ষ্যে আজারবাইজান গমন করেছিলেন। সেখানে তিনি ইরাক ও সিরিয়াবাসীদের কুরআন পাঠে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ করেন। পরে তিনি মদিনায় ফিরে এসে হজরত উসমান (রা.)-এর নিকট কুরআন পাঠের পার্থক্য ও বিভিন্ন অঞ্চলে আল-কুরআনের পাণ্ডুলিপিটির দুর্লভতা সম্পর্কে খলিফার আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হজরত উমর (রা.)-এর সময় কুরআনের মাত্র এক লক্ষ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়েছিল। সে সময় সৈন্যগণও কুরআনের পাণ্ডুলিপি সঙ্গে রাখতেন। অতএব বিপুল সংখ্যক মুসলমানের জন্য এই এক লক্ষ পাণ্ডুলিপি ছিল নিতান্তই অপ্রতুল।[৩৫] তদুপরি রাসুলুল্লাহ (সা.) ও আবু বকর (রা.)-এর সময় যাঁদের কাছে কয়েকটি সুরার সমন্বিত পাণ্ডুলিপি খণ্ড খণ্ড আকারে রক্ষিত ছিল, তাঁদের ব্যাপারেও ভয় ছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে এই খণ্ড খণ্ড অংশকেই হয়তো তাঁরা সম্পূর্ণ কুরআন বলে মনে করবে অথবা প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক কিরাতের অনুসরণ করবে। এমতাবস্থায় ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থের মতো কুরআনেও হয়তো পার্থক্য ও বিরোধ দেখা দেবে। এবম্বিধ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির কথা

www.pathagar.com

বিবেচনা করে কুরআনের আরো অধিক সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সরকারি তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করা এবং সেগুলোকে সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন মুসলিম দেশে প্রেরণ করা উচিত। অধিকন্তু, লিখনপদ্ধতির পার্থক্যের জন্য কিরাতে পার্থক্য হওয়ার যে আশংকা থাকে তাও দূরীভূত করা উচিত। হজরত উসমান (রা.) অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি উম্মুল মুমিনিন হজরত হাফসা (রা.)-এর কাছে রক্ষিত কুরআনের পাণ্ডুলিপিটি সংগ্রহ করেন এবং এর সাথে মিল রেখে হজরত যায়দ ইবন সাবিত (রা.), হজরত আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.), হজরত সা'ঈদ ইবনুল আস ও হজরত আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইবন হিশাম (রা.) প্রমুখ লেখককে পবিত্র কুরআনের অনুলিপি তৈরি করার কাজে নিয়োগ করেন। তাঁরা খলিফার নির্দেশ অনুযায়ী কুরআনের বেশ কয়েকটি অনুলিপি তৈরি করেন[৩৬] এবং নকলকৃত সকল পাণ্ডুলিপি সরকারিভাবে বিভিন্ন মুসলিম দেশে প্রেরণ করা হয়।[৩৭] বর্ণিত আছে, মক্কা, বসরা, কুফা ও সিরিয়ায় একটি করে কপি প্রেরণ করা হয় এবং মদিনায় দুটি কপি সংরক্ষণ করে রাখা হয়। একটি সর্বসাধারণের জন্য এবং অপরটি হজরত উসমান (রা.) নিজের কাছে সংরক্ষণ করেন।[৩৮] তাঁর কাছে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিটি 'মুসহাফে ইমাম' নামে অভিহিত করা হয়। এরপর তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আঞ্চলিক পরিভাষার মাধ্যমে পঠিত কুরআনের অনুলিপিসমূহকে বাতিল ঘোষণা করেন এবং জ্বালিয়ে ফেলার নির্দেশ দান করেন।[৩৯]

আমরা নিম্নের চিত্রে (দ্র. চিত্র-৬) একটি কপির অংশবিশেষ দেখতে পাচ্ছি। এটি ইস্তাম্বুলের টুবাকি জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। আর একটি কপি তাশখন্দে সংরক্ষিত রয়েছে।

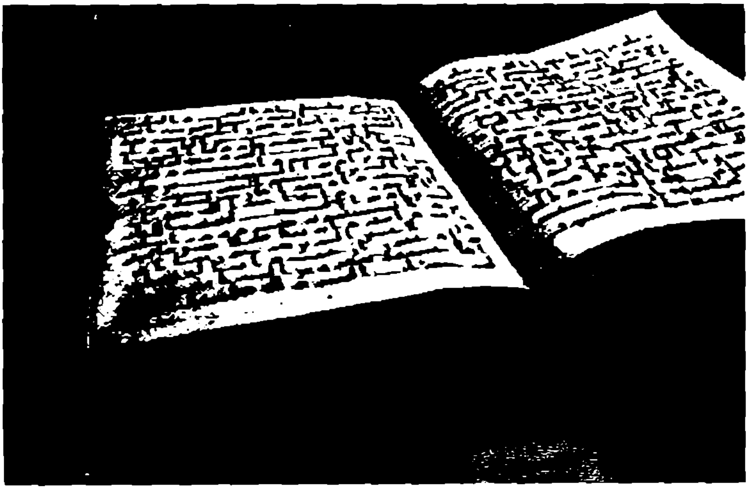

চিত্র-৬: মুসহাফে ইমাম উসমানের কাছে রক্ষিত পবিত্র কুরআনের পাণ্ডুলিপির একটি কপি। এটি ইস্তাম্বুলের টুবাকি জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

www.pathagar.com

চিত্র-৭ঃ মুসহাফে উসমানি, সুরা মারয়ামের একটি অংশ। হজরত উসমান (রা.)-এর নির্দেশে গ্রন্থাকারে সংকলিত কুরআন মজিদের একটি কপি কুফায় পাঠানো হয়েছিল। এ কপি বর্তমানে সমরকন্দের জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এর একটি ফটোগ্রাফ কপি জনসাধারণের দর্শনের জন্য তাশখন্দ লাইব্রেরিতে রাখা হয়েছে। উক্ত ছবিটি এ ফটোগ্রাফ কপি থেকে গৃহীত।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাথমিক পর্যায়ে পবিত্র কুরআন জাজম লিপির আঞ্চলিক প্রকরণ মক্কি ও মাদানি রীতিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। হিজরি দ্বিতীয় শতকের মক্কি অথবা মাদানি হস্তলিপির নমুনা কোনো কোনো গ্রন্থাগার ও জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে (দ্র. চিত্র-৮)। তবে ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে কুফা নগরী প্রতিষ্ঠার পর সমগ্র মুসলিম বিশ্বে কুরআন মজিদ লেখার জন্য কুফি লিখনপদ্ধতিই গৃহীত ও সমাদৃত হয়।

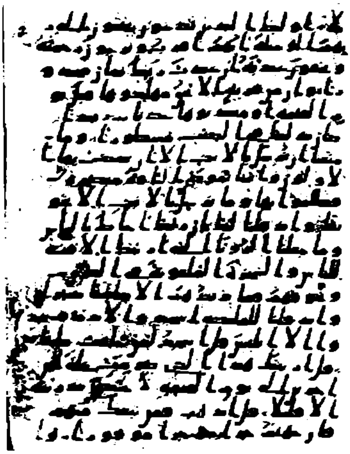

চিত্র-৮ঃ কুরআনের প্রাচীন লিপির নমুনা। এটি মক্কা বা মদিনায় হিজরি ২/ খ্রিষ্টীয় ৮ম শতকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

www.pathagar.com

কুরআনের লিখনপদ্ধতি

ইসলামের প্রাথমিককালে লেখার একটি বিশেষ পদ্ধতির প্রচলন ছিল। যেমন কোনো শব্দের অভ্যন্তরে আলিফ (ا) থাকলে সে আলিফ লেখা হতো না। বিশেষত আল-কুরআন লেখার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি বেশি অনুসৃত হয়। যেমন الكتاب শব্দটি الكتب রূপে এবং الظالمين শব্দটি الظلمين রূপে লেখা হতো।[৪০] তদুপরি চুক্তি, সন্ধিপত্র, পারস্পরিক লেনদেনের বিষয়সমূহ, জনসাধারণের সাথে পত্র যোগাযোগ ও বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাহদের নিকট লিখিত চিঠিপত্রেও এ লিখনপদ্ধতির অনুসরণ করা হতো। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন লিপিরীতির মতো আরবি লিখনপদ্ধতিতেও কালক্রমে বেশ কিছু পরিবর্তন ও সংযোজন দেখা দেয়। তবে আল-কুরআনের লিখনপদ্ধতি রাসুলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবিদের যুগে যা ছিল, যে পদ্ধতিতে ওহি লেখকগণ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সময় আল-কুরআন লিপিবদ্ধ করেছিলেন, পরবর্তীকালেও সে পদ্ধতি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বিদ্যমান থাকে। তাতে উল্লেখযোগ্য কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়নি। যেমন কুরআনের ربو শব্দটি و দিয়ে লিখতে হয়। و -এর পরিবর্তে আলিফ দিয়ে লেখা যাবে না। অথচ আলিফ দিয়ে (ربا) লেখাই হলো আরবি বানান রীতির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মূলত কুরআনের লিখনপদ্ধতি কিয়াসনির্ভর (analogical) কোনো বিষয় নয়; বরং বিষয়টি সম্পূর্ণ توقيفي (সাহেবে শরিয়ত কর্তৃক নির্দেশিত) ও سماعي (শ্রুতিনির্ভর)। উপরন্তু এ লিখনপদ্ধতি তাওয়াতুর (recurrence) ও ইজমা (Consensus) দ্বারা প্রমাণিত।[৪১] এটাও কুরআনের একটি মুজিযা। সাত কিরাতসহ সকল কিরাত এর অন্তর্ভুক্ত এবং তা প্রয়োগ করাও যায়। কুরআন লেখার পদ্ধতি ছিল এ ধরনের যে, যখন পবিত্র কুরআনের কোনো আয়াত বা সুরা নাজিল হতো, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) ওহি লেখকদের কাউকে ডেকে তা লেখাতেন এবং প্রতিটি শব্দের লিখনপদ্ধতি ওহি লেখককে ঠিক সেভাবে শিখিয়ে দিতেন যেভাবে তিনি ওহি জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে জানতে পারেন।[৪২] পরবর্তীকালে কুরআন লেখার ক্ষেত্রে সে লিখনপদ্ধতিই অত্যন্ত সর্তকতা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে অনুসৃত হয়।

এর পেছনে কারণ হলো, আল-কুরআনে কোনোরূপ রদবদল হয়েছে, এ ধরনের ন্যূনতম সন্দেহেরও অবকাশ যাতে না থাকে, সেজন্য এর শব্দ, উচ্চারণ, এমনকি একটি নুকতারও কোনোরূপ হেরফের করা হয় নাই এবং এর লিখনপদ্ধতিরও কোনোরূপ পরিবর্তন সাধন করা হয় নাই; বরং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সময় যেরূপ ছিল, এখনও সেরূপই রয়েছে। এ লক্ষ্যেই হজরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে তাঁরই নেতৃত্বে সাহাবা কিরামের ইজমার ভিত্তিতে উদ্ভাবিত হয় কুরআন লিখনপদ্ধতি, যা 'রসমে উসমানি' বা 'উসমানি লিখনপদ্ধতি' নামে খ্যাত। তখন থেকে আজ পর্যন্ত বিজ্ঞ আলিমগণের কেউ একমাত্র 'উসমানি লিখনপদ্ধতি' ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি যেমন বর্তমানে প্রচলিত আরবি লিখনপদ্ধতিতেও কুরআন লেখাকে জায়িয বলেননি।[৪৩]

কুরআনের লিখনপদ্ধতির ছয়টি বিধি

আল-কুরআন লেখার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ছয়টি নিয়ম মেনে চলা হয়। এ নিয়মগুলো লিপিবিশেষজ্ঞদের মতে 'ষটবিধি' নামে খ্যাত। এ নিয়মগুলো হলো: ১. حذف

www.pathagar.com

(বিলোপ), ২. زيادة (অতিরিক্ত), ৩. همزة (হামযা), ৪. بدل (পরিবর্তন), ৫. وصل (সংযুক্তকরণ) ও ৬. فصل (পৃথককরণ)। সংযুক্ত ও পৃথককরণের যে সকল নিয়ম রয়েছে, সেগুলো শব্দ ও মূলের সাথে সম্পর্কিত। তাছাড়া আল-কুরআনের এমন কিছু শব্দ রয়েছে, যেগুলো দু ভাবে পাঠ করা যায়। কোনো কোনো শব্দ দু ভাবে লিখিত হয়। এ দু পদ্ধতির যে কোনো এক পদ্ধতিতে পঠিত বা লিখিত হলেই যথেষ্ট। নিম্নে আল-কুরআনের উক্ত ছয়টি রীতির উদাহরণ দেওয়া হলো–

১. حذف (বিলোপ) পরিভাষাগত অর্থে শব্দের কোনো বর্ণ লিখনপদ্ধতিতে বর্জন করা, না লেখা। পবিত্র কুরআনের লিখনপদ্ধতিতে কোনো বর্ণের বিলোপ সাধনকে বিলুপ্তি বা হয্ফ বলা হয়। যেমন–কুরআনের আয়াত فيقول ربي أكرمن (৮৯: ১৫), فيقول ربي أهانن(৮৯:১৬) أجيب دعوة الداع إذا دعان (২: ১৮৬) প্রভৃতি আয়াতসমূহের أكرمن , أهانن এবং دعان -এর শেষ ي বিলোপ সাধন করা হয়েছে। داود শব্দের 'و', الليل শব্দের একটি 'ل' এবং بسم الله -এর ب -এর পরবর্তী আলিফ হযফ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে يمح الله الباطل (৪২:২৪) এবং يوم يدع الداع (৫৪:৬) আয়াতদ্বয়ের يمح এবং يدع -এর শেষ 'و' বিলোপ করা হয়েছে।[৪৪]

শব্দের শেষের ياء বিলোপ সাধনের উদাহরণগুলোর মধ্যে فاتقون,(২:৪০) فارهبون (২:৪১), و لا تكفرون (২:১৫২), و اخشون (৫:৩), فلا تنظرون (৭:১৯৫) উল্লেখযোগ্য। উক্ত শব্দসমূহের শেষস্থ ني -এর স্থলে 'ن' লেখা হয়েছে এবং 'ي' -কে হয্ফ করা হয়েছে।[৪৫]

২. زيادة (অতিরিক্ত) শব্দের লিখনে কোনো বর্ণের অতিরিক্ত সংযোজন। আল-কুরআনের লিখনপদ্ধতিতে কোনো কোনো স্থানে কিছু অতিরিক্ত বর্ণ রয়েছে। এগুলোর কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো–

ক. অতিরিক্ত আলিফ (ا) সংযোজন: او لأ اذبحنه (২৭:২১), و لأ اوضعوا (৯:৪৭), قواريراْ من فضة (৭৬:১৬), ثم إن مرجعهم لأ الى الجحيم (৩৭:৬৮), خللكم(৯:৪৭) إلى فرعون و ملائه (১১:৯৭) و لا تقولن لشائ إني فاعل ذلك غدا (১৮:২৩)। উক্ত আয়াতগুলোর বৃত্ত চিহ্নিত আলিফগুলো সাধারণভাবে প্রচলিত লিখনপদ্ধতির দৃষ্টিতে অতিরিক্ত।

খ. অতিরিক্ত (واو) সংযোজন: ساوٗريكم دار الفسق (৭:১৪৫) এবং ساوٗريكم ايتي (২১:৩৭) আয়াতদ্বয়ের বৃত্ত চিহ্নিত 'و' অতিরিক্ত।

গ. অতিরিক্ত (ي) সংযোজনের উদাহরণ ما يكون لي ان ابدله من تلقائي نفسي :(১০:১৫), و من آناي‌ء الليل فسبح (২০: ১৩০), او من ورائي حجاب (৪২:৫১), و السماء بنينها بايد (৫১: ৪৭)। উক্ত আয়াতসমূহের হামযার নিচের ' ي ' টি অতিরিক্ত। অনুরূপভাবে بايد শব্দের আল-কুরআনের লিখিত রূপ بايىد। এতেও একটি অতিরিক্ত 'ي' রয়েছে।[৪৬]

৩. بدل (পরিবর্তন, বিনিময়): এক বর্ণের পরিবর্তে অন্য বর্ণের লিখন। পবিত্র কুরআনের লিখনপদ্ধতিতে কোনো কোনো স্থানে এক বর্ণকে অন্য বর্ণ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। লিপিশাস্ত্রের ভাষায় একে 'বদল' বলা হয়। যেমন– সাধারণ লিখনপদ্ধতি

www.pathagar.com

অনুসারে الصلوة ,الزكوة ও الربو -এর উচ্চারণ الصلاة ,الزكاة ,الربا হয়ে থাকে; কিন্তু আল-কুরআনে এগুলোকে الصلوة, الزكوة ও الربو রূপে লিখিত হয় এবং আলিফকে 'و' বর্ণ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়।[৪৭]

৪. وصل (সংযুক্তকরণ) ও ৫. فصل (পৃথককরণ): পবিত্র কুরআনের লিখনপদ্ধতিতে কোথাও কোথাও দুটি শব্দকে এক সাথে সংযুক্ত করে লেখা হয়, একে وصل বলা হয় এবং মিলিত শব্দটিকে موصول বলা হয়। আবার কোথাও কোথাও দুটি শব্দকে পৃথক পৃথকভাবে লেখা হয়। একে فصل বলা হয় এবং পৃথককৃত শব্দটিকে مفصول বা مقطوع বলা হয়। আল-কুরআনের তিনটি স্থানে بئس এবং ما শব্দটিকে মিলিয়ে লেখা হয়েছে। যেমন- بئسما اشتروا به انفسهم (২:৯০), بئسما يأمركم به ايمانكم (২:৯৩), بئسما خلفتموني من بعدي (৭:১৫০)। আবার ছয়টি স্থানে পৃথকভাবে লেখা হয়েছে। যেমন– لبئس ما شروا به انفسهم (২:১০২), لبئس ما كانوا يفعلون (৫:৬২), لبئس ما قدمت لهم (৫:৭৯), لبئس ما كانوا يفعلون (৫:৬৩), لبئس ما كانوايصنعون انفسهم(৫:৮০), فبئس ما يشترون (৩:১৮৭)।

ওয়াসল ও ফাসল-এর মধ্যে প্রত্যেক স্থানেই কাঠামোগত ও অর্থগত কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। إنّ এবং ما কুরআনের কেবল এক স্থানে পৃথকভাবে লেখা হয়েছে। যেমন- إن ما توعدون لآت (৬: ১৩৪)। তবে কুরআনের অন্যান্য স্থানে إنما সংযুক্তভাবে লিখিত হয়।

أنّ এবং ما কেবল দুটি স্থানে পৃথকভাবে লেখা হয়েছে। যেমন- و أنّ ما يدعون من دونه هو الباطل (২২:৬২), و أنّ ما يدعون من دونه هو الباطل (৩১:৩০)। তাছাড়া আল-কুরআনের সর্বত্র أنما এক সাথে লেখা হয়েছে।

كلّ এবং ما তিন স্থানে পৃথকভাবে লিখিত হয়েছে। যেমন- كل ما ردّوا الى الفتنة اركسوا فيها (৪:৯১), كل ما جاء امة رسولها كذبوه (২৩:৪৪), و اتكم من كل ما سالتموه(১৪:৩৪)।[৪৮] মিসরীয় পাণ্ডুলিপিসমূহে উক্ত তিনটি স্থানে كل এবং ما পৃথকভাবে লিখিত রয়েছে; কিন্তু আমাদের দেশে মুদ্রিত আল-কুরআনের (আঞ্জুমানে হিমায়তে ইসলাম, লাহোর থেকে মুদ্রিত সংস্করণসহ) প্রথমোক্ত দুটি স্থানে كل ও ما সংযুক্তভাবে লিখিত হয়েছে। কেবল তৃতীয় স্থানে পৃথকভাবে লিখিত হয়েছে। বাকি পনেরটি স্থানে كلما সংযুক্ত করে লিখিত হয়।

আল-কুরআনের এগারটি স্থানে في এবং ما পৃথকভাবে লিখিত হয়েছে। যেমন- فان خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في انفسهن من معروف . (২:২৪০) ও و هم في ما اشتهت انفسهم خلدون (২১: ১০২) ইত্যাদি। অন্য সকল স্থানে في এবং ما একত্রে মিলিত লিখিত হয়েছে। যেমন- . فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف (২:২৩৪)।

يوم এবং هم শব্দ দু'টি আল-কুরআনে মিলিয়ে ও পৃথক উভয়ভাবে লিখিত হয়েছে। যেমন-. يوم هم برزون لا يخفى على الله منهم شيئ (৪০:১৬) ও يوم هم على النار يفتنون. (৫১:১৩)। উপরোক্ত দুটি আয়াতে يوم ও هم পৃথকভাবে লিখিত হয়েছে। নিম্নের দুটি আয়াতে সম্বন্ধরূপে يوم ও هم এক সাথে মিলিয়ে লিখিত হয়েছে। যেমন– يومهم الذي فيه يصعقون . (৫২:৪৫) ও يومهم الذي يوعدون. (৪৩:৮৩)।

www.pathagar.com

لكى এবং لا আল-কুরআনে পৃথকভাবেও লিখিত হয়েছে এবং একত্রেও লিখিত হয়েছে। একত্রে লেখার উদাহরণ .لكيلا يعلم من بعد علم شيئا (২২:৫) । তাছাড়া দ্র.- ৩৩:৫০, ৫৭:২৩, ৩:১৫৩। দুটি স্থানে لكى এবং لا পৃথকভাবে লিখিত হয়েছে। যেমন- . لكى لا يعلم بعد علم شيئا (১৬:৭০) ও لكى لا يكون على المؤمنين حرج . (৩৩:৩৭) একটি স্থানে كي لا লিখিত হয়েছে। যেমন- كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم . (৫৯:৭)। তদনুরূপ اين এবং ما পৃথকভাবেও লিখিত হয়েছে এবং একত্রেও (اينما) লিখিত হয়েছে।

আল-কুরআনে দুটি স্থানে مال এবং দু'টি স্থানে فمال লিখিত হয়েছে। যেমন- فمال هذا الكتب (১৮:৪৯), مال هذا الرسول (২৫:৭), فمال هؤلاء القوم (৪:৭৮) ও فمال الذين كفروا (৭০:৩৬)। সাধারণ লিখনপদ্ধতি অনুসারে ما لهذا , فما لهؤلاء এবং فما للذين লিখিত হয়ে থাকে; কিন্তু আল-কুরআনে উল্লিখিতভাবে লিখিত হয়েছে। তাতে কোনোরূপ পরিবর্তন করা যাবে না।

আল-কুরআনের একটি স্থানে ابن এবং ام পৃথকভাবে লিখিত হয়েছে। যেমন- قال ابن امّ (৭:১৫০)। অপর একটি স্থানে মিলিয়ে এক সাথে লেখা হয়েছে। যেমন- قال يبنؤم لا تأخذ بلحيتي و لا برأسي . (২০:৯৪)। এখানে ابن , يا এবং امّ একত্রে মিলিয়ে লেখা হয়েছে।

৬. ادغام। আল-কুরআনের লিখনপদ্ধতির একটি বৈশিষ্ট্য ইদ্‌গাম (ادغام)।[৪৯] কুরআনের কোনো কোনো জায়গায় দুটি বর্ণকে পৃথকভাবে লেখা হয়েছে। যেমন- من ما, ام من , عن من , إن ما, ان لم , ان لن , ان لا , عن ما । আবার এ বর্ণগুলোকে অন্যান্য স্থানে মিলিয়ে লেখা হয়েছে। যেমন– الاّ, عمّا, ممّا, امّن , عمّن , إمّا , إلّم, الّن ।

আল-কুরআনের লিখনপদ্ধতির অপর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কোনো কোনো সময় একই শব্দ লম্বা ت, আবার কোনো কোনো সময় গোলাকার ة দ্বারা লিখিত হয়। যেমন- نعمت ও نعمة , رحمت ও رحمة , جنت ও جنة এবং شجرت ও شجرة ।

আল-কুরআন লেখার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কথা হলো যে, হজরত উসমান (রা.)-এর পাণ্ডুলিপির অনুসরণ করতে হবে। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট, এই প্রাচীন লিখনপদ্ধতিতে কোনো প্রকার রদবদল বা পরিবর্তন করা বিধেয় নয়। বিভিন্ন শব্দ লেখার ব্যাপারে যে পার্থক্য রয়েছে, তাতেও শব্দগত ও অর্থগত গুরুত্ব বিদ্যমান।[৫০]

বিভিন্ন দেশে আরবি ভাষা ও লিখনশিল্পের প্রচলন

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিজয়ী শক্তিরূপে এবং উন্নত সভ্যতা ও সুন্দর চরিত্রের ধারকরূপে ইসলামের সম্প্রসারণ ও মুসলমানদের প্রতিষ্ঠা লাভের সুবাদে আরবরা বিজিত জাতিগুলোকে তাদের নিজেদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার ছাঁচে ঢেলে নিতে সমর্থ হয়।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মক্কা থেকে মদিনা হিজরতের সাথে সাথে লেখাপড়ায় আরবদের শুভযাত্রার সূচনা হয়। পরে তা ক্রমশ ইসলামের বিস্তৃতির সুবাদে প্রথমত পুরো আরব দ্বীপে বিস্তার লাভ করে। যদিও তখন লেখাপড়ার বিস্তার অপেক্ষাকৃত

www.pathagar.com

অল্পসংখ্যক লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; তথাপি এ নবযাত্রাকে লেখাপড়ার অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক বিরাট বৈপ্লবিক উন্নতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআনের আয়াত ও সুরাসমূহ হয়তো ওহি লেখকগণ সেই যুগের প্রচলিত লেখার বিভিন্ন পত্রে লিপিবদ্ধ করতেন অথবা সাহাবিগণ মুখস্ত করে রাখতেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পরে খুলাফা-ই-রাশিদুন আরবি লিপিকলার উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেন।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা.) প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দিওয়ান বা রাজস্ব আদায় ও আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ এবং নামের তালিকা প্রস্তুতকরণের উদ্দেশ্যে রেজিস্ট্রি বিভাগের গোড়াপত্তন করেন।[৫১] এই কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য লেখকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই তাঁর আমলে কোনোরূপ বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ না করেও হস্তলিপির ক্রমোন্নয়ন সাধিত হতে থাকে। এ সময় প্রাদেশিক গভর্নরগণ নিজেদের জন্য বিশ্বস্ত কাতিব নিয়োজিত করেন। এভাবে হজরত উমর (রা.)-এর আমলেই বিভিন্ন রাজ্য বিজয়ের সূত্র ধরে আরবি লিপি আরব দ্বীপের সীমানা অতিক্রম করে বহির্জগতে পদার্পণ করে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হজরত উসমান (রা.)-এর আমলে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পবিত্র মুসহাফের অনুলিপি প্রেরণ করা হয়। এর মাধ্যমে আরবি লিপি মুসলিম জাহানের সর্বত্র ক্রমশ সমাদৃত হয়ে ওঠে এবং বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। হজরত আলী (রা.) ছিলেন একজন খ্যাতনামা হস্তলিপিবিশারদ। তাঁকে মনে করা হয় সমস্ত প্রধান ক্যালিগ্রাফারের আধ্যাত্মিক শিক্ষক। তিনিই প্রথম লিপিকে শিল্প মানে উন্নীত করেন। হাতের লেখা সুন্দর করার কৌশল শিখাতে গিয়ে তিনি বলেন, " তোমরা কলমের জিলফা প্রসারিত করো এবং মোটা থেকে তির্যকভাবে মাথার দিকে ক্রমে চিকন করে কেটে যাও, যাতে সঠিক সমানুপাত ও খাড়া আলিফ হয়।"[৫২] তিনি আরো বলেন, عَلَيْكُمْ بِحُسْنِ الْخَطِّ فَإِنَّهُ مِنْ مَفَاتِيحِ الرِّزْقِ . - "তোমাদের হাতের লেখাকে সুন্দর মনোমুগ্ধকর করো। কেননা সেটা তোমাদের রিযিকের উপায় হবে।"[৫৩] তাঁর খিলাফতকালে কুফায় চারুশিল্প ও ললিতকলার প্রসার ঘটতে শুরু করে। তদুপরি তখন ইরাক, পারস্য, সিরিয়া ও মিসর এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে আরবি ভাষার পাশাপাশি আরবি লিপিও প্রভূত বিস্তার লাভ করে। আমরা অপর পৃষ্ঠার চিত্রে (দ্র. চিত্র-৯) হজরত আলী (রা.)-এর লিখিত কুরআনের একটি পৃষ্ঠা দেখতে পাচ্ছি।

আরবি ভাষা পবিত্র কুরআনের ভাষা হওয়া এবং মুসলিম সভ্যতার সম্প্রসারণ ও বিশ্বব্যাপী তার সুদৃঢ় প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কারণে মুসলমানদের বিজিত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের রাজ্যসমূহে ইসলাম প্রসারের সাথে সাথে আরবি ভাষাও দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে। একের পর এক জাতিগুলো আরবি ভাষার পাশাপাশি আরবি বর্ণমালার চর্চা ও ব্যবহার করতে শুরু করে। তদুপরি কোনো কোনো দেশে ভাষা ভিন্ন ভিন্ন থাকলেও আরবি অক্ষরেই সেসব দেশের ভাষাগুলো লেখা হতো। তবে আরবি অক্ষরে অনারবি ভাষাসমূহ লেখার প্রথা কখন কোন অবস্থায় আরম্ভ হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এরূপ লিখনপ্রথা কীরূপ অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে, তা এখনও পুরোপুরি পরিষ্কার নয়।[৫৪]

www.pathagar.com

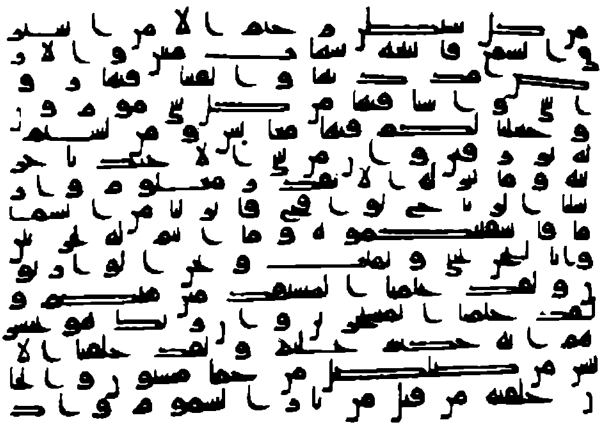

চিত্র-৯: হজরত আলী (রা.)-এর হাতে লিখিত মুসহাফের প্রাচীন আরবি লিপি

দীন ইসলাম আরবি ভাষা ও আরবি লিপির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় পৃথিবীর যেখানেই ইসলাম পৌঁছেছে সেখানে আরবি ভাষা ও লিপির চর্চা শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে আর্নস্ট কনেল বলেন, "দীন ইসলাম আরবদেরকে ভাষা ও লিপি দুই-ই দান করেছে। আরবি লিপি পুরো ইসলামি বিশ্বে প্রসার লাভ করেছে। ফলে তা ভৌগলিক সীমারেখা অতিক্রম করে সকল মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যের বন্ধনরূপে কাজ করতে থাকে।"[৫৫]

মোটকথা, ইসলামই হলো আরবি লিপির প্রসার ও উন্নতির একমাত্র উপলক্ষ্য। এর মাধ্যমে আরবি লিপিতে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং তা উন্নতির চরম শিখায় পৌঁছে যায়। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে তা প্রভূত বিস্তার লাভ করে। পূর্বদিকে ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল ও মালাই দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত, পশ্চিমে মাগরিব (মরক্কো)-এর প্রত্যন্ত অঞ্চল ও আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত, উত্তরে তুর্কিস্থানের উচ্চভূমি থেকে মধ্য ইউরোপ পর্যন্ত এবং দক্ষিণে জাঞ্জিবারের নিম্নভূমি পর্যন্ত সুবিশাল এলাকায় তার চর্চা হতে থাকে। তদুপরি তা প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী ও নিকটবর্তী দ্বীপসমূহ অতিক্রম করে সুদূর আমেরিকায়ও পদার্পণ করে। এ বিস্তীর্ণ এলাকার বিভিন্ন ভাষা, বর্ণ ও গোত্রের অসংখ্য জাতি যেমন আরব, তুর্কি, পারসিক, ইন্ডিয়ান, মালয়, আফগান, তাতার, কুর্দি, মোগল, বার্বার, সুদানি, হাবশি ও সাওয়াহিলি প্রভৃতি আরবি লিপি ও বর্ণমালা ব্যবহার করতে থাকে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, পৃথিবীতে আরবি বর্ণমালায় লিখিত ভাষার সংখ্যা এক শতের কম নয়।[৫৬]

পারস্যে আরবি বর্ণমালা পাহলভি বর্ণমালার স্থান দখল করে নেয়। আফগানিরা পামেরিয়ান উপভাষাসমূহ লেখার ক্ষেত্রে এর ওপর নির্ভর করে। বেলুচিরা মাসলা-মাসায়িল এবং ধর্মীয় বিষয়াদি লেখার ক্ষেত্রে আরবি ভাষা ও আরবি লিখনরীতির ওপর নির্ভর করে। ভারত উপমহাদেশে উর্দু ও কাশ্মীরি ভাষা লেখার ক্ষেত্রে আরবি লিখনরীতির ওপর নির্ভর করা হয়। মালাই দ্বীপপুঞ্জের মুসলমানগণ তাদের মালকা ভাষা

www.pathagar.com

লেখার ক্ষেত্রে আরবি বর্ণমালার ওপর নির্ভর করে। এভাবে আরবি বর্ণমালা সুদূর চীনদেশের মুসলমানদের কাছে পৌঁছে যায়। তারা ধর্মীয় বিষয় লেখার ক্ষেত্রে আরবি ভাষা ও বর্ণমালার আশ্রয় নিয়েছিল।

এভাবে আরবি বর্ণমালা কাস্পিয়ান সাগর, কৃষ্ণ সাগরের উত্তর উপকূল ও উরাল পর্বতমালার দক্ষিণ ভূ-ভাগ, এমনকি সাইবেরিয়া অঞ্চলজুড়ে বসবাসকারী বিশাল জনগোষ্ঠী তাতার ও তুর্কিদের ভাষায়ও প্রচলন লাভ করে। তবে বিভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে এসে কোথাও কোথাও এর সাথে এমন কিছু বর্ণ ও ধ্বনি যুক্ত হয়, যেগুলো আরবি ভাষায় নেই। তুর্কিরা মুসলিম হস্তলিপি ও শিল্পকলার এক স্বর্ণ যুগ রচনা করেছিল। মসজিদে নববিতে এবং বাইতুল্লায় খোদাই করা লেখাগুলো আজও তুর্কি শিল্প রুচির প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করছে। কামাল আতাতুর্কের ক্ষমতা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তারা আরবি বর্ণমালা ব্যবহার করত।

আফ্রিকায় ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা.)-এর আমলে মিসর বিজয়ের সাথে সাথে আরবি লিপির প্রসার শুরু হয়। এরপর থেকে এখানে খলিফা ও শাসকবর্গের চিঠিপত্র, মুসহাফ ও ধর্মীয় গ্রন্থাদি আরবি লিখনরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হতো। এমনকি পরবর্তীকালে কিবতিরাও[৫৭] ইঞ্জিল শরিফ লেখার ক্ষেত্রে একে ব্যবহার করতে থাকে। আফ্রিকায় প্রাথমিক পর্যায়ে আরবি লিপির প্রচলনে মাদাগাস্করের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এর কারণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আরব প্রতিনিধিদলসমূহের ব্যাপক হারে আগমনের সুবাদে এখানে প্রথম থেকে ইসলামের বিস্তার ঘটেছিল। এ সময় হাবশায়ও আরবি লিপি বিস্তার লাভ করে। উল্লেখ্য যে, হাবশা প্রথম থেকে মক্কার মুসলমানদের হিজরতের কারণে আরব প্রভাবাধীন ছিল। আজও সেখানে মুসলমানরা তাদের আঞ্চলিক উপভাষাগুলো, বিশেষ করে দক্ষিণে প্রচলিত আমহারিক ভাষা এবং পূর্বদিকে প্রচলিত হারারিক ভাষা আরবি বর্ণমালা যোগে লিপিবদ্ধ করে থাকে।[৫৮]

আন্দালুসেও দীর্ঘ মুসলিম শাসনামলে আরবি লিপি সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছিল। এমনকি দক্ষিণ ফ্রান্সেও তা বিস্তৃতি লাভ করেছিল। তাছাড়া স্প্যানিস ও সিসিলিয়নরা এবং অনেক ইউরোপীয় জাতি স্থাপত্যিক অলংকরণ ও মুদ্রার গাত্রে চিত্র অঙ্কনের জন্য একে গ্রহণ করেছিল। আমরা অপর পৃষ্ঠার চিত্রে সিসিলির রাজা দ্বিতীয় রোজার্সের কাপড়ে একটি আরবি লিপির চিত্র (দ্র. চিত্র-১০) দেখতে পাই। এটি বর্তমানে ভিয়েনার জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অসংখ্য সুদর্শন কুরআন, প্রাসাদ ভবন ও মসজিদে ইসলামি হস্ত ও শিল্পকলার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। যার বেশিরভাগ প্রমাণই খ্রিষ্টানরা ধ্বংস করে দিয়েছে।

বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন দেশে, যেখানে আরব অভিবাসী ও প্রবাসীরা নিজেদের আবাসস্থল গড়ে তুলেছে, সেসব অঞ্চলে আরবি ভাষার প্রচলনের সুবাদে আরবি লিপিরও প্রচলন শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো, ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশে আরবরা বেশ কয়েকটি আরবি পত্রিকা প্রকাশ করে। তদুপরি অনেক ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ, বিশেষ করে ফ্রান্স, জার্মান, সুইজারল্যান্ড ও ইতালি প্রভৃতি দেশের প্রাচ্যবিদ্যায় পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ এবং ইউরোপের বড়ো বড়ো

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে আরবি ভাষার শিক্ষার্থীরা আরবি ভাষার পাশাপাশি আরবি লিপিরীতি চর্চা করে।

চিত্র-১০: সিসিলির রাজা দ্বিতীয় রোজার্সের কাপড়ের ওপর চিত্রিত একটি আরবি লিপি নকশা

প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে ইসলামি সভ্যতা স্থাপত্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যে বড়ো বড়ো নিদর্শন রেখে গেছে, যা যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের মহা কৃতিত্বের স্বাক্ষর হয়ে বেঁচে থাকবে, সেগুলোর কথা বাদ দিয়ে যদি মনে করা হয় যে, ইসলামি সভ্যতা প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার মতো স্থাপত্যিক নিদর্শনাদি যেমন– মূর্তি, দেবালয়, পিরামিড ও অবিলিস্ক[৫৯] প্রভৃতি এবং ব্যাবিলনীয় ও অ্যাসিরীয় সভ্যতার মতো স্থাপত্যিক নিদর্শন ও দালানকোঠা এবং গ্রিক ও রোমান সভ্যতার মতো রাজপ্রাসাদ, মিউজিয়াম, ব্যায়ামাগার, নয়নাভিরাম উদ্যান ও থিয়েটারগৃহ প্রভৃতির মতো কোনো নিদর্শন রেখে যায়নি, তা হলে বলা যেতে পারে, ইসলামি সভ্যতা এমন অনেক অভৌতিক স্বভাবসিদ্ধ নিদর্শনাদি রেখে গেছে, যা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বংশ পরম্পরাসূত্রে যুগ যুগ ধরে ধারণ করে আসছে। যেসব জাতি ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয় বা ইসলামের প্রভাব বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাদের ওপর ইসলাম বিভিন্নভাবে স্থায়ী ছাপ ফেলতে এবং প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। তন্মধ্যে ধর্ম, ভাষা ও লিপিরীতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর কোনো কোনো জাতি যেমন– আরব ছাড়াও মিসর, সিরিয়া, ইরাক ও মাগরিব প্রভৃতি দেশের মুসলমানরা ধর্ম, ভাষা ও লিপিরীতি প্রভৃতি দিক থেকে ইসলামের স্থায়ী প্রভাব বলয়ের অধীন হয়ে পড়েছে। আবার কোনো কোনো জাতি যেমন– তুর্কি ও পারসিকরা এবং ভারত ও মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশের মুসলমানরা ধর্ম ও লিপিরীতি—এ দু দিক থেকে ইসলামের প্রভাব বলয়ের শিকার হয়। পক্ষান্তরে এমন অনেক জাতিও রয়েছে, যারা ধর্মের দিক থেকে নয়; বরং ভাষা ও লিপিরীতির দিক থেকে ইসলামের প্রভাব বলয়ের অধীন হয়ে পড়ে। এরা হলো আরব বিশ্বের অমুসলিমরা। আর কিছু জাতি রয়েছে যারা কেবল ধর্মের দিক থেকে ইসলামের প্রভাব বলয়ের শিকার, যেমন চীনের মুসলমানরা।[৬০]

উল্লেখ্য, ইসলামি সভ্যতার মতো রোমান সভ্যতারও কয়েকটি কালজয়ী নিদর্শন রয়েছে। বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি ও আমেরিকানরা বিভিন্ন দিক থেকে এ সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিশেষ করে তাদের ভাষা ও লিপিরীতির ক্ষেত্রে এ সভ্যতার একচেটিয়া

www.pathagar.com

প্রভাব রয়েছে। এ দুটি হলো রোমান সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। কিন্তু এ নিদর্শনগুলো এবং ইসলামি সভ্যতার নিদর্শনগুলোর মধ্যে বিস্তর তফাত বিদ্যমান। ল্যাটিন ভাষা যদিও বর্তমানে অধিকাংশ ইউরোপীয় ভাষায় প্রবেশ করেছে; তথাপি তা আসল রূপে জনমুখে প্রচলিত নয়; বরং বর্তমানে তাকে একটি মৃত ভাষা হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু আরবি ভাষা যত দিন ইসলাম এবং কুরআন থাকবে ততদিন বেঁচে থাকবে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে কোটি কোটি লোক আরবি ভাষায় কথা বলে। তদ্রূপ রোমান লিপিরীতি অবলম্বনে লেখার ধারা যদিও বর্তমানে কোনো কোনো ইউরোপীয় জাতি ও আমেরিকানদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে; তথাপি আরবি লিপিরীতি তার চাইতে অনেক বেশি প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাব, আরবি লিপিরীতি সকল মুসলমানের নিকট সমাদৃত হয়। উপরন্তু, এটাই হচ্ছে সমস্ত মুসলিম জনগোষ্ঠীর সাধারণ লিখনশৈলী। মোট কথা, এটা হলো নিরেট ধর্মীয় প্রভাব। আর ধর্মীয় প্রভাব এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব কিংবা প্রজাসাধারণের ওপর শাসকের আনুগত্যের প্রভাব–দুটোর মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।[৬১]

এখানে উল্লেখ্য, আরবি বর্ণমালার উপর্যুক্ত প্রচার ও বিকাশ বলতে গেলে বিভিন্ন দেশে ইসলামের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের সমতালে চলেছিল। পশ্চাদপদ, অনুন্নত ও প্রগতিবিরোধী জাতি হিসেবে অমুসলিম জাতিসমূহের আরবি বর্ণমালার সাথে অপরিচিত থাকা অথবা তার সাথে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও তা বর্জন করা অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু কোথাও কোথাও মুসলমানগণ কর্তৃক তাদের ভাষায় আরবি বর্ণমালা পরিত্যক্ত হওয়ার[৬২] কারণ সম্ভবত এ ছিল যে, স্থানীয় ভাষায় লেখাপড়া করার প্রথা সংখ্যালঘু অমুসলিমদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে অনেক অধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল; বরং বলতে গেলে তা তাদের একচেটিয়া অধিকারে পরিণত হয়েছিল। এককালে বাঙালি মুসলমানরা ফারসিকে এবং আলবেনীয় মুসলমানরা তুর্কি ভাষাকে প্রাধান্য দিত। অতঃপর যখন এ সকল দেশে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তন হয় এবং বিদেশি অমুসলিমদের চাপ ও প্রভাব পড়তে থাকে, তখন দেশীয় ভাষায় আরবি বর্ণমালার ব্যবহার সামান্য যা কিছু ছিল, তাও ধীরে ধীরে উঠে যায়। এর আধুনিকতম দুটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার জাভা প্রদেশে প্রচলিত জাভি ভাষা এবং তুরস্কে প্রচলিত তুর্কি ভাষা। জাভা প্রদেশে ওলন্দাজ সরকার দীর্ঘকাল ধরে সে দেশের ভাষায় ল্যাটিন বর্ণমালার ব্যবহারকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছে। অবশ্য এতদ্‌সত্ত্বেও সেখানকার ভাষায় এখনও সম্ভবত প্রয়োজনে ৫০% আরবি বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রতিবেশী দেশ মালয়েশিয়ার মালয় ভাষায় আজও আরবি লিপিই ব্যবহৃত হয়। তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের চেষ্টায় তুর্কি ভাষা ল্যাটিন বর্ণমালায় লিখিত হওয়ার প্রথা প্রবর্তিত হলেও এর পরেও অনেক দিন যাবৎ সেখানে তুর্কি ভাষায় আরবি বর্ণমালার ব্যবহারের প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। তুর্কি ভাষা আরবি বর্ণমালায় লেখা তুরস্কে আইনত নিষিদ্ধ। এ নিষেধাজ্ঞাই উক্ত বাস্তব সত্যের বহিঃপ্রকাশে এখন পর্যন্ত অন্তরায় সৃষ্টি করে রেখেছে। উল্লেখ্য যে, রুশ প্রভাবের ফলে মধ্য এশিয়া ও ককেসাস প্রভৃতি অঞ্চলের তুর্কি মুসলমানদেরকে রোমান বর্ণমালায় নয়; বরং রুশ বর্ণমালায় তুর্কি ভাষা লিখতে বাধ্য করা হচ্ছে। একই ভাষার জন্য দুটি বর্ণমালার (রোমান বর্ণমালা ও রুশ বর্ণমালা) এ টানাপোড়নের বিষয়টিকে মোটেই উপেক্ষা করা হয় না।

www.pathagar.com

আরবি বর্ণমালার উপর্যুক্ত পশ্চাদপদতার আংশিক ক্ষতিপূরণের জন্য কোনো কোনো দেশে একটি ব্যবস্থা গৃহীত হতে দেখা যায়। অন্তত ১৯৩২ খ্রি. থেকে নও-মুসলিম ইংরেজ ও নও-মুসলিম জার্মানদের মধ্যে এ আন্দোলন চলে আসছে (বর্তমানে অবশ্য তা সীমাবদ্ধ আকারে চলছে) যে, তারা নির্দিষ্ট কতগুলো (অর্থাৎ ধর্মীয়) ক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ ভাষা আরবি বর্ণমালায় লিখবে এবং নিজেদেরকে এবং নিজেদের সন্তানদেরকে কুরআন মজিদ ও মুসলিম জাহানের অধিকতর নিকটবর্তী করবে।

বর্তমানে আরবি লিপিতে লিখিত ভাষাসমূহের বর্ণমালা নিয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনাও আরম্ভ হয়েছে। পর্যালোচনায় জানা গিয়েছে যে, আরবি বর্ণমালায় লিখিত হয়ে থাকে—এরূপ দুই বা ততোধিক ভাষায় একই ধ্বনির জন্য এদের একটিতে এক আকৃতির বর্ণ এবং অন্যটিতে অন্য আকৃতির বর্ণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ১৯৪৯ খ্রি. থেকে পাকিস্তান আঞ্জুমন-ই তারাক্কি-ই উর্দু নামক সমিতি এ আন্দোলন করে আসছে, যে সকল দেশের ভাষা আরবি বর্ণমালায় লিখিত হয়ে থাকে, এদেরকে মুতামির-ই রসমুল খত্ত ওয়া ইরাব নামক একটি সংস্থার অধীনে একত্রিত করা হোক এবং উপর্যুক্তরূপ ভাষাসমূহের বর্ণমালার মধ্যে বিদ্যমান অমিল ও বিভিন্নতা দূর করতে এদের মধ্যে বর্ণমালাগত ঐক্য স্থাপনের ব্যবস্থা করা হোক। এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে লিখন ও পঠনের মধ্যকার অমিলের একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। আরব দেশসমূহে লেখা হয় جورنال; কিন্তু এটা পড়া হয় ژورنال রূপে।[৬৩]

তথ্যসূত্র

১ আল-কুরআন, ৬২:২।

২ যয়্যাত, আহমদ হাসান, *তারীখুল আদাবিল আরবি*, বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৩, পৃ ২৮; ইবন আব্দ রাব্বিহি, আহমদ আন্দালুসি, *আল-ইকদুল ফরীদ*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৯৮৭, খ ৬, পৃ ১১৯।

৩ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৫০।

৪ *প্রাগুক্ত*।

৫ *প্রাগুক্ত*।

৬ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩।

৭ আল-আযাভি, আব্বাস, *বাগদাদ 'আসিমাতুল খাত্তিল আরবি*, খ পৃ ৫।

৮ বালাযুরি, *ফুতুহুল বুলদান*, খ ৬৬৩; আল-কুরদি, মুহাম্মাদ তাহির, *তারীখুল খাত্তিল আরবি*, পৃ ৬৮।

৯ আল-কুরদি, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬৮।

১০ আল-কুরআন, ৯৬:১-৫।

১১ আল-কুরআন, ৬৮:১।

১২ আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবুস সুন্নাহ), হা.নং: ৪৭০০; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবুত তাফসীর), হা.নং: ৩৬৯৩; আহমদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ২২১৯৭, ২২১৯৯।

১৩ ইবনুল আছির, ইযযুদ্দীন, *উসদুল গাবাহ*, খ ২, পৃ ১১৮।

১৪ রাসূলুল্লাহ (সা.) বদরের অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন যুদ্ধবন্দিদের মুক্তিপণ স্থির করেছিলেন, তারা প্রত্যেকে দশ-দশজন করে মুসলিম বালককে লেখাপড়া শিখাবে। এরপর তাঁরা মুক্ত হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

১৫ জাব্বুরি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ১১।

১৬ আস-সালিহ, ড. সুবহি, *উলুমুল হাদিস ও মুস্তালাহু*, (বৈরুতঃ দারুল 'ইলম লিল-মালায়িন, ১৯৯১), পৃ ১৭।

১৭ ইবনুল আছির, *প্রাগুক্ত*, খ ৩, পৃ ২২।

১৮ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৫১।

১৯ আস-সাবুনি, মুহাম্মদ আলী, *আত-তিবয়ান ফি উলুমিল কুরআন*, বৈরুতঃ আলামুল কুতুব, ১৯৮৫, পৃ ৫২।

২০ বিস্তারিতের জন্য দেখুন, জাব্বুরি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ৯৩-১০৩।

২১ ইবনু হাম্বাল, আহমদ, *আল-মুসনাদ*, কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৪৯, খ ১, পৃ ১৭১।

২২ *সুনানে তিরমিযির* أبواب العلم -এর মধ্যে باب ما جاء في الرخصة فيه নামে এর ওপর একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করা হয়েছে (তিরমিযি, খ ২, প, পৃ ১০৬-১০৭)। এ ছাড়া *সাহীহ বুখারি* (১/২১ ও ২৩), *সুনানে আবি দাউদ* (২/৫১৩-৪) ও *মুস্তাদরাকে হাকিম* (১/১০৪) প্রভৃতি হাদিস গ্রন্থেও এ বিষয়ক অনেক হাদিস রয়েছে।

২৩ দারিমি, *আস-সুনান*, হা.নং: ৫০৩; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হা.নং: ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১; তাবারানি, *আল-মুজামুল কাবীর*, হা.নং: ৭০০।

২৪ বিস্তারিতের জন্য দেখুনঃ আহমদ আলী, হাদীস ইসলামী শরী'আতের একটি প্রামাণ্য দলিলঃ একটি পর্যালোচনা, *জার্নাল অব আর্টস*, চ. বি. খণ্ড ১৪ জুন ১৯৯৮, পৃ ১৬৬-১৭০।

২৫ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১২।

২৬ ৬৩৮ খ্রি. কুফা নগরী প্রতিষ্ঠার পর এ রীতি 'কুফি লিপিরীতি' নামে পরিচিতি লাভ করে।

২৭ Safadi, Y.H., *Islamic Calligraphy*, London, 1978, p. 9; আবদুর রহীম, মুহাম্মদ, *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, ঢাকাঃ যোগাযোগ পাবলিশার্স, ২০০২, পৃ ১৯।

২৮ Safadi, *op. cit.* p.9.
নাবাতি লিপিরীতি পরবর্তীকালে 'খত্তে নাসখ' নামে পরিচিতি লাভ করে। এর অর্থ রহিতকারী লিপিরীতি মনে করা ঠিক নয়; বরং এর অর্থ হচ্ছে সাধারণভাবে অনুসৃত লিপিরীতি। উল্লেখ্য যে, আরবি ভাষায় নাসখ শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে 'লিখন'।

২৯ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ ৯, পৃ ৪৫৫।

৩০ ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ*, খ ১, পৃ ৩৪৪।

৩১ আল-হামদ, গানিম কুদুরি, *রাসমুল মুসহাফ*, পৃ ৯৩।

৩২ আস-সাবুনি, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৫২-৩।
প্রাথমিক পর্যায়ে সুরাগুলোর ক্রমবিন্যাসের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম ছিল না। সাহাবিগণ যিনি যেভাবে ভালো মনে করতেন সেভাবে কুরআনের সুরাগুলো সুবিন্যস্ত করেছেন। যেমন হজরত আলী (রা.)-এর নিকট কুরআনের যে কপিটি ছিল তাতে প্রথমে সুরা ইকরা, অতঃপর সুরা মুদ্দাসসির, তারপর সুরা নুন, এরপর সুরা মুয্যাম্মিল এভাবে সুরাগুলো পরপর অবতরণের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সাজানো ছিল। অপরদিকে হজরত উবাই ইবন কাব (রা.)-এর নিকট কুরআনের যে কপিটি ছিল তাতে শুরুতে ছিল সুরা ফাতিহা, অতঃপর সুরা বাকারা, তারপর সুরা নিসা, এরপর আলু ইমরান, তারপর আন'আম...। কিন্তু কুরআন নাজিল সম্পন্ন হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) সুরাগুলোকে বর্তমান নিয়মে সাজানোর নির্দেশ প্রদান করেন। (মারযুক, ড. মুহাম্মদ আবদুল আযীয, *আল-মুসহাফুশ শরীফ*, পৃ ২০)।

৩৩ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ ৮, পৃ ৪৭৪-৫।

www.pathagar.com

৩৪ হিজরি ১১সালের যিলহজ্জ মাসে ইয়ামামা নামক স্থানে মুসাইলামাতুল কায্যাবের অনুসারী ও মুসলমানদের মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে প্রায় ৭০-এর অধিক হাফিজ শাহাদত বরণ করেন।

৩৫ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ ৮, পৃ ৪৭৭।

৩৬ বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে, তাঁরা কুরআনের ৬টি অনুলিপি প্রস্তুত করেছিলেন।

৩৭ বুখারি, *আস-সাহীহ*, বাবঃ জাম'উল কুরআন, হা.নং: ৪৭০২।

৩৮ কোনো কোনো বর্ণনা মতে, ইয়েমেন ও বাহরাইনেও এক একটি কপি প্রেরণ করা হয়।

৩৯ বাদাভি, মাহমুদ সিবাওয়াইহ, আল-মাসাহিফুল উসমানিয়্যা, *মাজাল্লাতু কুল্লিয়াতিল কুরআনিল কারীম ওয়াদ দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ*, আল-জামি'আতুল ইসলামিয়্যা, আল-মাদীনাতুল মুনাওয়ারা, ১৪০২-৩ হি. সংখ্যা-১, পৃ ৩২৩-৪।

৪০ যায়দান, জুরজি, *তারীখুত তামাদ্দুনিল ইসলামি*, কায়রো: ১৯২২, খ ৩, পৃ ৫৫।

৪১ রশিদ রিদা, শায়খ মুহাম্মদ, কিতাবাতুল মুসহাফ, *মাজাল্লাতুল বুহসিল ইসলামিয়্যাহ*, সংখ্যা-৬, পৃ ২৩; হিযবুল্লাহ, ড. হাফেজ মাওলানা এ.বি.এম., *বাংলা-ইংরেজি উচ্চারণে কুরআন বিকৃতির অপপ্রয়াস*, ঢাকা: দিপালী প্রেস, ২০০২, পৃ ৯২।

৪২ অনেক আলিমের মতে, কুরআনের লিখনপদ্ধতি তাওকীফী নয়। এ ধরনের মত পোষণকারীদের মধ্যে আধুনিক পণ্ডিতদের মাঝে ড. সুবহি সালিহ ও মান্না'উল কাত্তান প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে তাঁরা কুরআনের উসমানি লিখনপদ্ধতির সংরক্ষণের ঘোর সমর্থক। (সালিহ, ড.সুবহি, *মাবাহিসু ফি উলুমিল কুরআন*, বৈরুত: দারুল মালাঈন, ১৯৭৯, পৃ ২৮০; আল-কাত্তান, মান্না, *মাবাহিসু ফি উলুমিল কুরআন*, রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪১৩ হি., পৃ ১৪৯)।

৪৩ ইমাম ইবরাহিম আল-জা'বারি [৬৪০-৭৩২ হি.] (রাহ.) মুসহাফুল ইমামের লিখনপদ্ধতি মেনে চলা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইমাম চতুষ্টয়ের ইজমা নকল করেছেন। তবে শাইখুল আযহার জাদুল হক আলী (রাহ.) বলেন, পুরো অথবা আংশিক কুরআন মুদ্রণের ক্ষেত্রে মুসহাফুল ইমামের লিখনপদ্ধতি অনুসরণ ও তা সংরক্ষণ করা অবশ্যই ওয়াজিব এবং প্রচলিত লিখনপদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে না। তবে প্রমাণ উপস্থাপন, উদ্ধৃতি দান অথবা শিক্ষামূলক বইপত্রে দু'/একটি আয়াত বা আয়াতের অংশবিশেষ প্রচলিত নিয়মে লেখা যেতে পারে। (জাদুল হক, আলী, *বায়ানুল লিন্নাসি*, আল-আযহার, খ ২, পৃ ৩৯১)।

৪৪ হয়ফের বিভিন্ন রূপ ও উদাহরণসমূহের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য- আয-যারাকশি, *আল-বুরহান ফি উলুমিল কুরআন*, খ ১, পৃ ৩৮৯-৪০৮।

৪৫ বিস্তারিত উদাহরণের জন্য দ্রষ্টব্য - ইবনুল আম্বারি, *কিতাবু ঈদাহিল ওয়াকফি ওয়াল ইবতিদা*, দামিশক : ১৯৭১,খ ১, পৃ ২৫০-২৫৬।

৪৬ আল-কুরআনের লিখনপদ্ধতিতে এ কয়েকটি অতিরিক্ত বর্ণের সংযোজনের তাৎপর্য ও হিকমত সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র.- যারাকশি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ৩৮১-৩৮৭।

৪৭ যারাকশি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ৪০৯-৪১০।

৪৮ যারাকশি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ৪১৮।

৪৯ ইদ্গাম : تشديد -তাশদিদ দ্বারা দু'টি বর্ণের অঙ্গীভূতকরণ।

৫০ যারাকশি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ৩৭৬-৩৮০; বাদাভি, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪২।

৫১ ইয়াকুব আলী, *আরব জাতির ইতিহাস চর্চা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ ২৫৫-২৫৮।

৫২ আবদুর রহীম, মোহাম্মদ, *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, ঢাকা: যোগাযোগ পাবলিশার্স ২০০২, পৃ ২৪।

৫৩ জাব্বুরি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ১১।

www.pathagar.com

৫৪ ঐতিহাসিক বিবরণে জানা যায়, হজরত সালমান ফারসি (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে তাঁর স্বদেশবাসী নও-মুসলিমদের জন্য সুরা ফাতিহার ফারসি অনুবাদ করেছিলেন। ঐতিহাসিক বিবরণে এটাও জানা যায় যে, উমাইয়া খিলাফতের শেষ দিকে বার্বার ভাষায় কুরআন মজিদ অনূদিত হয়েছিল। কিন্তু কুরআন মজিদ কোন বর্ণমালায় লিখিত হয়েছিল, তা জানা যায় না। (*ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রবন্ধঃ অনারবি ভাষায় আরবি বর্ণমালার ব্যবহার, খ ৯, পৃ ৪৫৫-৪৫৬)।

৫৫ কনেল, আর্নস্ট, *ফান্নুল খাত্তিল আরবি*, বৈরূত, পৃ ২।

৫৬ *আল-কুরআন ফি কুল্লি লিসান*, দাক্ষিণাত্যঃ হায়দরাবাদ, ১৯৪৬; *Gospel in Many Tongues*, London: Bibel Society, 1948

৫৭ কিব্‌ত : মিসরের দেশীয় খ্রিষ্টান কপ্টদের আরবি নাম বা প্রতিশব্দ। এ নাম বা শব্দটি গ্রিক 'Aigyptos' শব্দ থেকে উদ্ভূত। এটা প্রাচীন মিসরীয় শব্দ 'Ha-Ka-Ptah'-এর ধ্বনি বিকৃতি। এ শব্দের অর্থ Ptah দেবতার গৃহ বা মন্দির, যা আবার 'Memphis' -এর তাৎপর্য প্রকাশক। গ্রিকরা শব্দটিকে মিসর ও নীলনদকে বোঝাতে ব্যবহার করেছিল। ফলত 'Coptio' শব্দটি 'মিসরীয়' শব্দেরই সমার্থক। গ্রিক 'Aigyptos' শব্দের উপপ্রত্যয় ও অন্তপ্রত্যয় বাদ দিলে 'Gypt' এ শব্দটি পাওয়া যায়, যার আরবি প্রতি বর্ণায়ন হয়েছে 'কিব্‌ত'। সেমিটিক সূত্রে অবশ্য বলা হয়েছে যে, এ শব্দটি এসেছে মিযরাইমের পুত্র কুফতাইম থেকে। এ কুফতাইম প্রথমে নীল উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেন। Thebes বা আধুনিক Luxer -এর নিকটস্থ কুফত বা গুফত শহরটি তার নামে ধারণ করে। এ শেষোক্ত ধারণাটিই আরব লেখকদের মধ্যে সচরাচর প্রচলিত রয়েছে। তাঁরা মিসরকে 'দারুল কিবত' বা কপ্টদের আবাসভূমি হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। আরবদের মিসর বিজয়কালে এ কপ্টরাই ছিল প্রাচীন মিসরীয় অধিবাসীদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত উত্তর পুরুষ।

৫৮ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৫৭।

৫৯ অবিলিস্ক : দীর্ঘ চতুষ্কোণবিশিষ্ট সূক্ষ্মাগ্র স্তম্ভবিশেষ।

৬০ যদিও তারা ধর্মীয় গ্রন্থাদি আরবি লিপিরীতি অবলম্বনে লিখত। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। বর্তমানে চীনে প্রায় ৭ কোটিরও অধিক মুসলমান রয়েছে, যারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে চীনের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কাশগড় ও জানকারিয়া প্রদেশ, দক্ষিণ-পশ্চিমের ইউনান প্রদেশ এবং মানশুরিয়া প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। তারা সকলেই চীনের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় কথাবার্তা বলে।

৬১ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৪-৩৫।

৬২ বাংলা ভাষা ও আলবেনীয় ভাষাকে এর দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়। এ দুটি ভাষা মধ্য যুগে আরবি অক্ষরে লিখিত হতো। পরে এর ব্যবহার পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে।

৬৩ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, (প্রবন্ধঃ অনারবি ভাষায় আরবি বর্ণমালার ব্যবহার), ইফাবা, খ ৯, পৃ ৪৫৭।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

আরবি লিখনশিল্পের বিকাশ ও পরিপূর্ণতা

পূর্বোক্ত অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামের আবির্ভাবের সামান্য পূর্বকালে আরবি লিপি উৎপত্তি লাভ করে স্বকীয় মর্যাদায় বিভূষিত হয় এবং ইসলামের সুমহান দাওয়াত তার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে এবং নিরক্ষর নবি (সা.)-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও বিজ্ঞজনোচিত কর্মকৌশলের সুবাদে তা বিস্তার লাভ করে। এ অধ্যায়ে আমরা আরবি লিপির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ যুগ ও দেশসমূহের ভূমিকার কথা তুলে ধরব।

উমাইয়া যুগে আরবি লিখনশিল্পের বিকাশ

উমাইয়া শাসনামলে আরবি ভাষা মুসলিম সাম্রাজ্যের সর্বত্র রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করে। প্রশাসন কাঠামোর সর্বস্তরে আরবি ভাষার ব্যবহার চালু হয়। ফলে একদিকে ধর্মীয়, অপরদিকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়ার কারণে মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের জনজীবনের সর্বস্তরে আরবি একমাত্র ভাষা হিসেবে গৃহীত হয় এবং ক্রমান্বয়ে তা তাদের মাতৃভাষায় পরিণত হয়। আরবিকে সর্বজনীন ও আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদায় উন্নীত করার মহান মানসে উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ইব্‌নু মারওয়ান (৬৭৫-৭০৫ হি.) বিশেষ কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথমত, অনারব জনগণের সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে বর্ণগুলোতে নুকতা ও স্বরচিহ্নের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। দ্বিতীয়ত, ভাষাকে সাবলীল ও গতিশীল করে তোলার উদ্দেশ্যে ব্যাকরণের নীতিমালা নির্ধারিত হয়। তৃতীয়ত, হস্তলিখনশিল্পের সরলীকরণ রীতি গৃহীত হয়। কারণ প্রশাসনে আরবিকরণ নীতি বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে আরবিতে লেখার কাজ পরিচালনা করার পরিধি অনেক গুণে বেড়ে যায় এবং সেজন্য লেখাকে অধিকতর স্পষ্ট ও সুন্দর করে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে স্বাভাবিকভাবে হস্তলিখনশিল্পের সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবিত হতে থাকে এবং তার পর্যায়ক্রমিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। এ সময় আরবি লিপি বিভিন্ন জড়তা ও সেকেলে অবস্থা (Primitiveness) থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে শুরু করে। তদুপরি তাকে অধিক গতিশীল ও প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য সহজতর পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা অব্যাহত থাকে।[১] এ আমলে আরবি লিপির বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন ও দিকগুলো হলো–

১. ইজাম (নুক্তার ব্যবহার)
২. তাশকিল (স্বরচিহ্নের ব্যবহার)
৩. আরবি বর্ণমালার ধারাবাহিক বিন্যাস
৪. লেখার নতুন নতুন পত্রের উদ্ভব
৫. বড়ো বড়ো ক্যালিগ্রাফার ও হস্তলিপিবিশারদের জন্ম

www.pathagar.com

ইজাম (Letter-pointing)

ইজাম[২] বলতে একই ধরনের আকৃতিসম্পন্ন বর্ণগুলোকে পরস্পর থেকে পৃথক করার জন্য বিন্দু প্রয়োগ করাকে বোঝায়। আরবিতে ২৯টি বর্ণের জন্য ১৯টি আকৃতি রয়েছে। তন্মধ্যে কোনো কোনো আকৃতিতে দুইটি করে বর্ণ লেখা হয়। যেমন د ও ذ, ر ও ز, س ও ش, ص ও ض, ط ও ظ এবং ع ও غ । আবার কোনো আকৃতিতে তিনটি করে বর্ণ লেখা হয়। যেমন ث, ت, ب ও خ, ح, ج । আবার কোনো কোনো আকৃতিতে কেবল একটি বর্ণই লেখা হয়। যেমন ا। তদুপরি বর্ণগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি যখন বিচ্ছিন্ন বা অযৌগিক অবস্থায় লেখা হয় তখন কোনো ধরনের অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয় না। তবে যখনই অন্য কোনো বর্ণের সাথে মিলিয়ে লেখা হয় তখন সন্দেহের উদ্রেক করে। যেমন ن ও ق । ن -এর একটি পৃথক অযৌগিক রূপ রয়েছে। একাকী অবস্থায় তা অনুসরণ করা হয়। কিন্তু যখন শব্দের শুরুতে বা শেষে অন্য বর্ণের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় তখন তার আকৃতি ي, ب, ت ও ث প্রভৃতি বর্ণের সাথে মিলে যায়। তদ্রূপ ق-এরও একটি পৃথক অযৌগিক রূপ রয়েছে। একাকী অবস্থায় তা অনুসরণ করা হয়। কিন্তু যখন শব্দের শুরুতে বা শেষে অন্য বর্ণের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় তখন তার আকৃতি ف -এর সাথে মিলে যায়। এ কারণে বর্ণগুলোকে পরস্পর থেকে পার্থক্য করার জন্য নুকতা প্রয়োগ বা বর্জন ইত্যাকার চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেয়, যাতে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা ও সংশয় সৃষ্টি না হয়। যদি এ ধরনের কোনো চিহ্ন ছাড়াই বর্ণগুলো লেখা হয়, তাহলে সাধারণ যে কোনো পাঠকের পক্ষে সম-আকৃতির বর্ণগুলোকে পার্থক্য করা এবং সঠিক মর্ম উদ্‌ঘাটন করা দুরূহ হয়ে পড়বে।[৩]

ইজামের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করা হয় যে, একবার ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত উসমান (রা.) মিসরে জনৈক ব্যক্তিকে গভর্নররূপে নিয়োগ ও প্রেরণ প্রসঙ্গে লেখেন, إذا جاءكم فاقبلوه - "সে যখন তোমাদের কাছে আসবে তখন তোমরা তাকে বরণ করে নিবে।" লোকেরা একে এভাবে পড়ল, إذا جاءكم فاقتلوه -"সে যখন তোমাদের কাছে আসবে তখন তোমরা তাকে হত্যা করো।" আর এটাই ছিল তাঁর মহাবিপর্যয়ের কারণ, যাতে শেষ পর্যন্ত তাঁকেও প্রাণ দিতে হলো। আরো বর্ণিত রয়েছে, একদা উমাইয়া খলিফা সুলায়মান ইবনু আবদুল মালিক পবিত্র মদিনা নগরীর প্রশাসককে উদ্দেশ্য করে লেখেন, أن احص المخنثين -"মেয়েলি লোকদেরকে গণনা করো।" মদিনার প্রশাসক একে এভাবে পড়লেন, أن اخص المخنثين -"মেয়েলি লোকদেরকে খোজা করো।" ফলে তিনি নয়জন মেয়েলি ব্যক্তিকে খোজা করে দেন। পবিত্র কুরআনের বেলায়ও এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হতে থাকে। বর্ণিত আছে, একদা এক বেদুঈন আরব ইমাম সাহেবকে সুরা আ'রাফের ৫৬ নং আয়াত ﴿قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ﴾ -কে এভাবে পড়তে শুনলেন : ﴿قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَسَاءَ﴾[৪]

তবে ইজামের প্রবর্তন কখন থেকে শুরু হয় এবং -কে সর্বপ্রথম এটা প্রণয়ন করেন, তা নিয়ে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত লোকদের মধ্যে এ ধারণা প্রচলিত রয়েছে, ইজামের ব্যবহার অনেক পরে ঘটেছে। উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের আমলে ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ আস-সকফি

www.pathagar.com

(৬৬০-৭১৪ খ্রি.) আরবি ভাষাকে সর্বজনীন ও সহজকরণের জন্য সর্বপ্রথম ইজামের প্রবর্তন করেন। কিন্তু অনেকের বিশ্বাস, ইজাম আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের খিলাফতকালের পূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল। এটিই সঠিক অভিমত।[৫] কারো কারো ধারণা, ইজাম পবিত্র মুসহাফ 'ইমাম' লিপিবদ্ধ করার অনেক আগ থেকে প্রচলিত ছিল। আবার কেউ কেউ মনে করেন, বর্ণের উৎপত্তির সাথে সাথে নুকতার ব্যবহারও শুরু হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে হজরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

> সর্বপ্রথম (তাঈ গোত্রের শাখা) বাওলানের তিনজন লোক আরবি বর্ণসমূহ উদ্ভাবন করেন। তাঁরা হলেন: মুরামির ইবন মুররাহ, আসলাম ইবন সুদরাহ ও আমির ইবন জুদরাহ। তাঁরা আম্বার নগরীতে এসে মিলিত হন এবং এখানেই তাঁরা (সুরয়ানি বর্ণমালার মডেল অনুকরণ করে) যৌথভাবে বিচ্ছিন্ন ও যৌগিক দ্বিবিধ অবস্থায় আরবি বর্ণগুলো উদ্ভাবন করেন। মুরামির বর্ণগুলোর আকৃতি তৈরি করেন, আসলাম বর্ণগুলোর বিচ্ছিন্ন ও যৌগিক রূপ নির্ণয় করেন এবং আমির নুকতা আবিষ্কার করেন।[৬]

উপর্যুক্ত রিওয়ায়াত থেকে বোঝা যায়, আরবরা তাদের বর্ণ উদ্ভাবনের সাথে সাথে নুকতাও উদ্ভাবন করেছিল। আর এটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কারণ, এটা অসম্ভব যে, সম-আকৃতির বর্ণগুলো মুসহাফে নুকতা প্রয়োগের সময় পর্যন্ত নুকতাবিহীনভাবেই চালু ছিল।[৭] Morilz ও Abbott প্রত্যেকেই নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, ইজাম ইসলাম পূর্বকাল অর্থাৎ জাহিলি যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল।[৮] মিসরের গভর্নর হজরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর জনৈক কর্মকর্তা বারদিয়ার উদ্দেশ্যে লিখিত একটি পত্রে কয়েকটি নুকতাবিশিষ্ট বর্ণের হদিস পাওয়া যায়। এটি হিজরি ২২ সালে লিপিবদ্ধ করা হয়। এতে যেসব বর্ণে নুকতার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় সেগুলো হলো: ن ، ش ،ز ، ذ ، خ।[৯] তদুপরি কয়েক বৎসর পূর্বে তায়িফ শহরের একটি জলাধারে হিজরি ৫৮ সালে হজরত মু'আবিয়া কর্তৃক নির্মিত যে উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং যাকে প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ G. C. Miles আমেরিকায় প্রকাশ করেছেন, তাতে একাধিক বর্ণে বিন্দুর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।[১০] এ দুটি লিপি থেকেও বোঝা যায়, আরবি লিপিতে নুকতার ব্যবহার তাঁদের সময়ে তো ছিলই; বরং এর অনেক পূর্ব থেকেই তা প্রচলিত ছিল। কেননা এটা যুক্তিসম্মত নয় যে, এ লিপি দুটিতেই সর্বপ্রথম নুকতা ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, ইসলামের প্রাথমিককালে পবিত্র কুরআন লেখার ক্ষেত্রে নুকতা ব্যবহার করা হয়নি। সম্ভবত তা ইচ্ছাকৃতভাবেই করা হয়েছে, যাতে লোকেরা কুরআন বোঝার জন্য গভীরভাবে মনোনিবেশ করে[১১] (দ্র. চিত্র-১)। এতদ্‌সত্ত্বেও আরব মুসলমানরা নিজেদের স্বভাবগত মেধা ও যোগ্যতা বলে অথবা বর্ণনাসূত্রে কিংবা শিক্ষার মাধ্যমে সুন্দর ও বিশুদ্ধরূপে কুরআন পড়তে পারত। এ কারণে তখন আরবি বর্ণগুলো সঠিকভাবে চেনার জন্য নুকতা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়নি। পরবর্তীকালে যখন মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে, অনারব মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে এবং ইরাকে ভাষার পঠন-পাঠন ও উচ্চারণে ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশ পেতে শুরু করে, তখন উমাইয়া খলিফা

www.pathagar.com

আবদুল মালিক ইব্‌নু মারওয়ানের নির্দেশে ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ ইব্‌নু ইউসুফ আস-সকফি (৬৯৪-৭১৪ খ্রি.) তাঁর দুই কাতিব—নসর ইব্‌নু আসিম আল-লায়সি (মৃ.৭০৮ খ্রি.) ও ইয়াহ্‌য়া ইব্‌নু ইয়ামুর আল-উদওয়ানি (মৃ.৭৪৬ খ্রি.)-কে[১২] ডেকে পাঠালেন এবং তাঁদেরকে এমন একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করার অনুরোধ জানালেন, যাতে একই ধরনের আকৃতিসম্পন্ন বর্ণগুলোকে পরস্পর পার্থক্য করা যায়।[১৩] আমিরের অনুপ্রেরণায় তাঁরা বর্ণগুলো পৃথককরণের জন্য বর্ণের ওপরে বা নিচে এক, দুই বা তিন বিন্দু প্রদানের প্রক্রিয়া চালু করেন। যে রঙের কালি দিয়ে বর্ণগুলো লেখা হতো সে একই রং দিয়ে বর্ণগুলোতে তাঁরা বিন্দু প্রদান করেন, যাতে বোঝা যায় যে, বিন্দুটি মূল বর্ণের অংশবিশেষ, অতিরিক্ত নয়। সাধারণত কালো রঙের কালি দিয়ে বর্ণগুলো লেখা হতো বলে কালো কালি দিয়েই বর্ণের পরিচয়সূচক বিন্দুগুলো প্রয়োগ করা হতো। এ প্রক্রিয়ায় আরবির মৌলিক ষোলোটি বর্ণকে আটাশটি বর্ণে পরিণত করে লিখনশিল্পের প্রাথমিক উন্নতি বিধান করা হয়।[১৪]

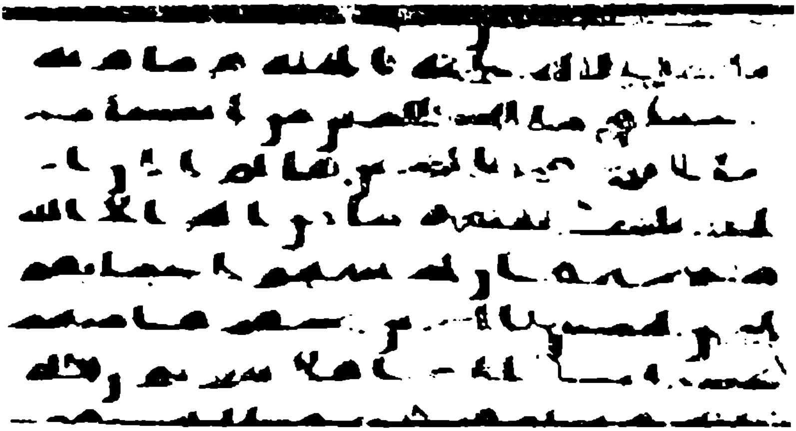

চিত্র-১: প্রাথমিক আরবি লিপিরীতিতে পার্চমেন্টের ওপর লিখিত নুকতাবিহীন কুরআন, হিজরি ১ম শতাব্দী

লেখার সারি অনুপাতে কুরআনের মূল ভাষ্য হলো (মায়িদা, ৭৩-৭৪):

حرم الله عليه الجنة و مأواه – جهنم و ما للظالمين من
أنصار – لقد كفر الذين قالوا إن الله – ثالث ثلثة و ما من إله
إلا اله –واحد و إن لم ينتهوا – عما يقولون ليمس الذين
كفروا – منهم عذاب أليم

হাজ্জাজ তাঁদের উদ্ভাবিত পদ্ধতিকে সমর্থন করেন এবং তাঁর রাজ্যের সকল কাতিবকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, তাঁরা যেন মুসহাফ লেখার সময় বর্ণগুলোতে একই রং ব্যবহার করে নুকতা প্রদান করেন এবং লাল রং দিয়ে হরকত প্রদান করেন (দ্র.

www.pathagar.com

চিত্র-২ ও ৩)। পরে এ খবরটি খলিফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের কাছে পৌঁছলে তিনিও এ ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন এবং লোকদেরকে এ ব্যবস্থা অনুসরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। এভাবে এ রীতিটি পবিত্র কুরআনসহ অন্যান্য সকল গ্রন্থ ও লেখায় বহুল প্রচলন লাভ করে।[১৫]

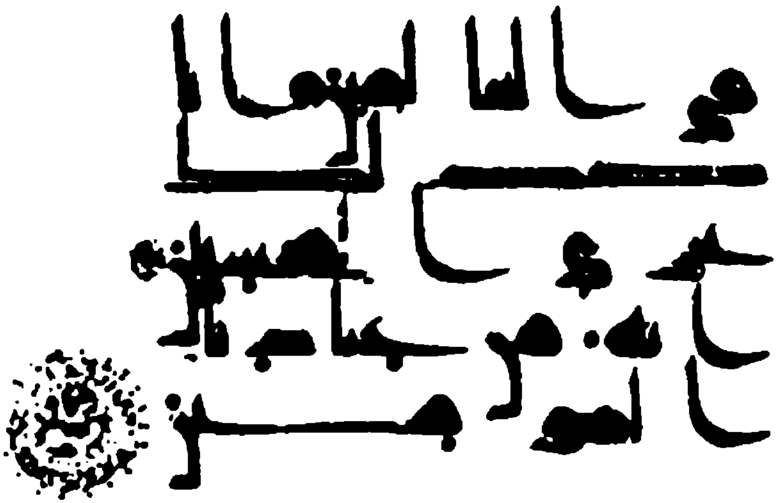

চিত্র-২: কুফি লিপিতে পার্চমেন্টের ওপর লিখিত নুকতার ব্যবহার সম্বলিত কুরআন। মদিনা শরিফ, হি. ২য় শতাব্দী। এতে লাল রঙের নুকতা দ্বারা হরকত এবং কালো রঙের নুকতা দ্বারা ইজামের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে

লেখার সারি অনুপাতে কুরআনের মূল ভাষ্য হলো (আস-সাফ্ফাত, ৭৩-৭৪):

في العلمين إنا – كذلك – نجزي المحسنين – إنه من عبادنا –
المؤمنين .

তবে জনসাধারণ ব্যাপারটি অবহিত হয়ে প্রথমদিকে সকলেই পবিত্র কুরআনে এ ধরনের কোনো চিহ্ন ব্যবহারের ব্যাপারে আপত্তি তোলেন।[১৬] তাঁরা বলেন যে, আল্লাহর রসুল (সা.) এবং সাহাবিগণ যখন কুরআনের শব্দগুলোতে এ ধরনের কোনো চিহ্ন ব্যবহার করেন নাই, এখন তা করা সঙ্গত হবে না। তাঁদেরকে বোঝানো হয় যে, এর উদ্দেশ্য কেবল 'د'-কে 'ذ' থেকে, এবং 'ب'-কে ت ও ث থেকে এবং ص-কে ض থেকে, ع-কে غ থেকে পৃথক করা। তাহলে কোন বর্ণ কিভাবে উচ্চারণ করতে হবে, পাঠকের নিকট তা স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। এতে অনারব পাঠক অথবা যাদের লেখাপড়া কম, তাদের পাঠের সুবিধা হবে। এটা শুনে জনসাধারণ শান্ত হয় এবং তাঁরা বুঝতে পারেন যে, এটা আল-কুরআনের রদবদল নয়; বরং আল-কুরআন সংরক্ষণের একটি প্রকৃষ্ট উপায়।

www.pathagar.com

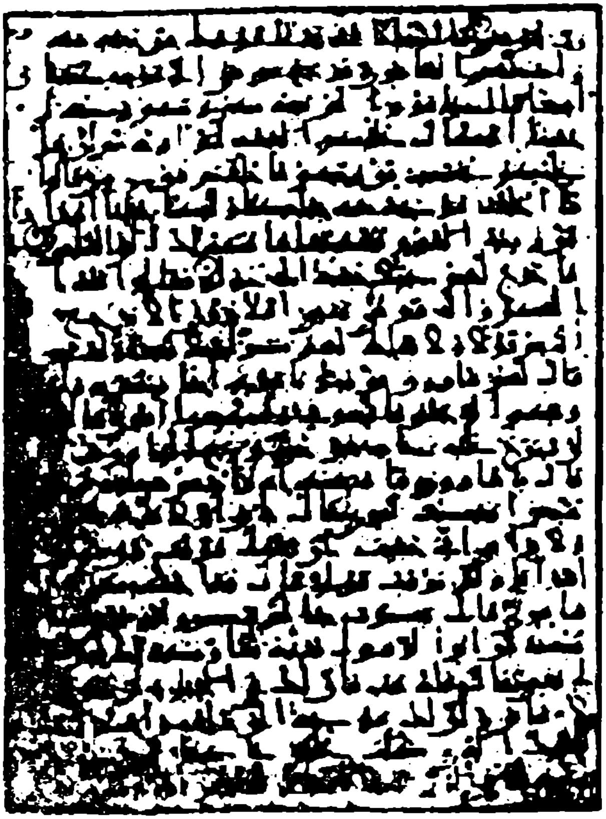

চিত্র-৩: কুফি লিপিতে বাগদাদি কাগজের ওপর লিখিত নুকতাবিশিষ্ট কুরআন। ইরাক, হি. ৩য় শতাব্দী। এতে লাল রঙের নুকতা দ্বারা হরকত এবং কালো রঙের নুকতা দ্বারা ইজামের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে

উল্লেখ্য, আরবিতে অক্ষর পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে নুকতার ব্যবহারের উপর্যুক্ত পদ্ধতি সিরীয় লিপিরীতি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।[১৭] তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সিরীয় লিপিতে এর ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত ছিল। কেবল ܕ ও ܪ -এ দুটি বর্ণেই নুকতার ব্যবহার ছিল। তদুপরি এ দুটি বিন্দুর আকৃতিতেও সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যেমন ܪ -এর বিন্দুটি সাধারণত বড়ো মাথাবিশিষ্ট হয়ে থাকে এবং লেখার জন্য যে রেখা টানা হয় তার কিছু ওপরে তা বসানো হয়। অপরদিকে ܕ-এর বিন্দুটি ছোট মাথাবিশিষ্ট হয়ে থাকে এবং তা রেখার নিচে বসানো হয়।[১৮] এ কথার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, নুকতা ব্যবহারের পদ্ধতিটি নাবাতি লিপি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।[১৯] ইতঃপূর্বে নাবাতি লিপির বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে, নাবাতি লিপিতে অক্ষর পৃথকীকরণের জন্য কোনো ধরনের নুকতা ব্যবহারের প্রচলন ছিল না।

www.pathagar.com

স্মর্তব্য যে, নুকতাবিশিষ্ট আরবি বর্ণগুলোর সবকটিতে একই সময়ে নুকতার ব্যবহার শুরু হয়নি; বরং প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রমে নুকতার প্রয়োগ বিকাশ ও উন্নতি লাভ করেছে। বর্তমানে নুকতা ব্যবহারের যে পরিণত অবস্থাটি দেখা যায়, তা দীর্ঘ সময় অতিক্রমের পরেই সুসম্পন্ন হয়েছে, এটা বলাই বাহুল্য। সর্বশেষ যে অক্ষরটিতে নুকতা বসিয়ে পার্থক্য করা হয়েছে তা হলো শেষস্থিত স্ত্রীবাচক ه বা ت অথবা ة ।[২০] কারো মতে—সর্বশেষ ألف مقصورة থেকে পার্থক্য করার জন্য ي তে নুকতা প্রদান করা হয়েছে। আঠারো'শ শতাব্দীর শুরুতে বৈরুতে আমেরিকান মিশনারিরা সর্বপ্রথম এটা প্রবর্তন করেন।[২১]

বিন্দুর স্বরূপ এবং ব্যবহারের ধরন

বিন্দুর দুটি আকৃতি রয়েছে। এক. চতুষ্ক (Square) ও দুই. গোলাকার। কোনো বর্ণের ওপর দুটি বিন্দু থাকলে বিন্দু দুটিকে পরস্পর উপর-নিচে করে বসানো যেতে পারে এবং একই লাইনে একসাথে পর পরও বসানো যেতে পারে। তবে তার পার্শ্বে যদি অন্য কোনো বিন্দু-সম্বলিত বর্ণ থাকে, তাহলে বিন্দু দুটিকে কেবল পরস্পর ওপর-নিচে করে বসাতে হবে। কেননা এমতাবস্থায় বিন্দুগুলো যদি একই লাইনে পর পর বসানো হয়, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে তা বর্ণের আয়তসীমাকে অতিক্রম করে যেতে পারে। ফলে বর্ণের পরিচয় উদ্‌ঘাটনে সংশয় সৃষ্টি হতে পারে। অপরদিকে বিন্দুগুলোকে পরস্পর উপর-নিচে করে বসানো হলে সংশয় সৃষ্টির কোনো অবকাশ থাকে না। তিন নুকতাবিশিষ্ট বর্ণ ث হলে এক লাইনে একই সাথে দুটি নুকতা বসানোর পর বাকি নুকতাটি ওপরে বসাতে হবে। আর ش হলে কোনো কোনো লিপিকার তাকে ث -এর বিন্দুগুলোর মতো এক লাইনে একই সাথে দুটি নুকতা বসানোর পর বাকি নুকতাটি ওপরে বসিয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ ث -এর চাইতে ش -এর বিস্তৃতি বেশি হওয়ায় একই লাইনে পর পর নুকতাত্রয় বসিয়ে থাকে।[২২]

তাশকিল[২৩] (Vocalization)

আরবি লিপি অন্যান্য সেমিটিক লিপির মতো কেবল অঘোষ (Surd) বর্ণসমূহ যোগে গড়ে ওঠে। তাতে স্বরধ্বনির প্রতিনিধিত্বকারী কোনো বর্ণ ছিল না।[২৪] তাই আরবি লিপি অভ্যুদয় লগ্ন থেকে ইসলামের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত কোনো রূপ হরকতের (Diacritical Dots যথা—জবর, জের ও পেশ) ব্যবহার ছাড়াই প্রচলন লাভ করেছিল। উদাহরণস্বরূপ আরবি লিপিরীতি অনুযায়ী যদি কেউ حمل শব্দটি লিখে, তাহলে এটা জানার কোনো সুযোগ নেই যে, এটি কি اسم (বিশেষ্য পদ), না কি فعل (ক্রিয়াপদ), فعل হলে এটা কি معروف (কর্তৃবাচ্য), না কি مجهول (কর্মবাচ্য)। আর যদি হয় اسم , তাহলে এর অর্থ কি মেষ শাবক, না কি বোঝা। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আরববাসীরা নিজেদের স্বভাবগত মেধা ও যোগ্যতা বলে শব্দগুলোকে সুন্দর ও বিশুদ্ধরূপে উচ্চারণ করতে পারত। এ কারণে তখন আরবি শব্দগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ করার জন্য হরকত সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। তদুপরি রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবা কেরাম

www.pathagar.com

(রা.)-এর আমলেও কুরআনের শব্দাবলির সঠিক রূপ জানার জন্য হরকতের ব্যবহার প্রচলন লাভ করেনি। কারণ তাঁরা ছিলেন আরব। তিলাওয়াতে তাঁদের কোনো ভুল হতো না। পরবর্তীকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি লাভ এবং আরবদের সাথে অনারবদের অবাধ মেলামেশা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হওয়ার ফলে কুরআনের তিলাওয়াত ও কিরাতে কিছু ভুল ধরা পড়ে। তারই প্রতিক্রিয়ায় প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে হজরত উসমান (রা.) তৃতীয়বারের মতো কুরআন সংকলনে ব্রতী হন। এতে রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত ও বিভিন্ন মুতাওয়াতির কিরাতের সমন্বয় সাধনের প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়। তখনও হরকত লিপিবদ্ধ করা হয়নি। তাই হজরত উসমান (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রীয়ভাবে সংকলিত কুরআনও ছিল হরকতবিহীন।[২৫] কিন্তু সাহাবা কিরাম (রা.)-এর আমলের শেষের দিকে যখন ইসলামের আলো ব্যাপকভাবে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং আরব ও অনারব দেশসমূহ একের পর এক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে শুরু করল, তখন সর্বসাধারণের মাঝে, বিশেষ করে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশ পেতে লাগল। কুরআনের শব্দরূপ নির্ধারণে সৃষ্টি হয় নানা রকম জটিলতা। বর্ণিত রয়েছে, একবার এক বেদুঈন আরব জনৈক ইমামকে সুরা বাকারার ২২১ নং আয়াত ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ -কে এভাবে পড়তে শুনলেন: ﴿وَلَا تَنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ অর্থাৎ 'তা'-এর উপরে পেশের পরিবর্তে জবর দিয়ে পড়লেন।[২৬] এমন জটিল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আরব বিশেষজ্ঞগণ এমন কোনো চিহ্ন উদ্ভাবনের কথা চিন্তা করতে বাধ্য হলেন, যাতে অনারব মুসলমানরা শব্দের উচ্চারণগত ভুল-ত্রুটি থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। বসরার গভর্নর যিয়াদ ইবনু সুমাইয়া সর্বপ্রথম বিষয়টি সমধিক গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করেন এবং তিনি সেই যুগের বিশিষ্ট পণ্ডিত হজরত আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালি (রাহ.)-কে ডেকে আনেন। তিনি তাঁকে এ মর্মে অনুরোধ জানান যে, তিনি যেন এমন কোনো উপায় উদ্ভাবন করেন, যাতে আরবি ভাষার পাঠক, বিশেষ করে অনারব পাঠকরা বিশুদ্ধ ও সুন্দরভাবে আরবি পড়তে পারে। তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

إِنَّ هَذِهِ الْحَمْرَاءَ قَدْ أَكْثَرَتْ، وَأَفْسَدَتْ مِنْ أَلْسِنَةِ الْعَرَبِ, فَلَوْ وَضَعْتَ شَيْئًا يُصْلِحُ بِهِ النَّاسُ كَلَامَهُمْ وَيُعْرِبُونَ بِهِ كِتَابَ اللهِ.

> এ কঠিন আশংকা দিনে দিনে বেড়ে যেতে লাগল এবং আরবদের ভাষাকে নষ্ট করে দিতে লাগল। যদি তুমি এমন কোনো পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে, যাতে লোকেরা তাদের ভাষাকে শুদ্ধ করে নিতে পারে এবং আল্লাহর কিতাব বিশুদ্ধরূপে তিলাওয়াত করতে পারে।

যিয়াদের প্রস্তাবে আবুল আসওয়াদ চিন্তিত হয়ে পড়েন। পরবর্তী সময়ে তিনি নিজেই শুনতে পান যে, এক ব্যক্তি আল-কুরআনের আয়াত ﴿أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ﴾ (৯:৩)-এর رَسُولُهُ শব্দটির ل -কে জের দিয়ে পড়ছে, যার অর্থ উদ্দিষ্ট অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। এতে আবুল আসওয়াদ অত্যন্ত দুঃখিত হন। তিনি বুঝতে পারেন যে, বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শীঘ্রই এর সমাধান করা উচিত। এর পর আবুল

www.pathagar.com

আসওয়াদ (রাহ.) গভর্নর যিয়াদকে বলেন, "কাজটি তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য আমাকে একজন স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ও সুদক্ষ লেখক দিতে হবে, যে আমি যা বলি তা বুঝতে পারে এবং তদনুযায়ী লিখে রাখতে পারে।" অতঃপর তেইশজন শ্রেষ্ঠ লেখককে ডেকে আনা হলো। তন্মধ্যে আবদুল কায়স গোত্রের এক কাতিবকে আবুল আসওয়াদ (রাহ.) তাঁর কাজে সহযোগিতা করার জন্য বেছে নিলেন। তিনি তাঁকে বললেন,

> তুমি মুসহাফ নিয়ে বসো এবং তাতে যে রঙের কালির ব্যবহার করা হয়েছে, তার চাইতে ভিন্ন এক প্রকারের রং নাও। যদি তুমি দেখতে পাও যে, কোনো হরফ উচ্চারণ করতে গিয়ে আমি আমার ওষ্ঠ দুটি খুলছি, তাহলে তুমি বর্ণটির ওপর একটি নুকতা বসাও। আর যদি দেখো, আমার ওষ্ঠ দুটি ভেঙে ফেলছি, তাহলে তুমি হরফটির নিচে একটি নুকতা বসাও। আর যদি দেখতে পাও যে, আমি ওষ্ঠ দুটি মিলিয়ে ফেলছি, তাহলে হরফের সামনে একটি নুকতা বসাবে। যদি এ হরকতগুলো পরপর গুন্নাহর সাথে উচ্চারণ করি, তাহলে দুটি করে নুকতা প্রদান করবে।"

এভাবে পুরো মুসহাফের মধ্যে হরকত প্রদানের কাজ শেষ হলো।[২৭] পরবর্তীকালে লোকেরা পবিত্র কুরআনে যাতে কোনো ধরনের ভুল-ভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়, সেজন্য আবুল আসওয়াদ (রা.)-এর এ উদ্ভাবিত রীতি পুরোপুরি মেনে চলতে থাকে[২৮] (দ্র. চিত্র-২ ও ৩)। উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক অবস্থায় এর জন্য রঙিন বিন্দু ব্যবহার করা হতো এবং কুফি লিখনরীতির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য ছিল।[২৯]

ইমাম নাবাবি (রাহ.) বলেন, কুরআনে নুকতা ও হরকত ব্যবহার করা মুস্তাহাব। কারণ এগুলোর যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে কুরআনকে ভুল ও বিকৃতির হাত থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব।[৩০] তবে সাধারণ বই-পুস্তক ও সাধারণ লেখালেখির ক্ষেত্রে এর ব্যবহার পুরো সমাদৃত হয়নি।[৩১] অনেকেই একে ভালো চোখে দেখত না। তারা মনে করত, شَكْلُ الْكِتَابِ سُوْءُ ظَنٍّ بِالْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ - "পত্রের মধ্যে হরকত প্রদান প্রেরিত ব্যক্তির প্রতি খারাপ ধারণা পোষণের নামান্তর।"[৩২] বর্ণিত আছে যে, একবার আবদুল্লাহ ইবনু তাহিরের কাছে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত একটি হরকতযুক্ত চিঠি পেশ করা হলে তিনি বললেন, مَا أَحْسَنَ هَذَا الْخَطَّ لَوْ لَا كَثْرَةُ شُوْنِيْزَةٍ - "এ লেখা কতই না সুন্দর, যদি না তাতে কালো কালো বিন্দুর আধিক্য হতো!"[৩৩]

উল্লেখ্য যে, নুকতা প্রয়োগের মাধ্যমে স্বরচিহ্ন প্রদানের উপর্যুক্ত পদ্ধতিটি সরাসরি সিরীয় লিপিরীতি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।[৩৪] তবে নিঃসন্দেহে তা আরবিতে পরিমার্জিত ও উপযোগী করে প্রয়োগ করা হয়েছিল। সিরীয়রা প্রথম প্রথম শব্দের প্রকৃত রূপ কিংবা তার প্রকরণ জানার জন্য বর্ণের ওপরে বা নিচে বড়ো বড়ো আকৃতির বিন্দু ব্যবহার করত।[৩৫] পরবর্তীকালে তারা পেশ, জবর, জের, ইমালা, রোম ও ইশমাম প্রভৃতি বোঝানোর জন্য বর্ণের ওপরে বা নিচে ছোট ছোট আকৃতির একক কিংবা দ্বিত্ব বিন্দুর ব্যবহার শুরু করে, যা আজও প্রচলিত রয়েছে।[৩৬]

কোনো কোনো প্রাচ্যবিদের মতে, আরবি লিপিতে স্বরচিহ্ন প্রয়োগের প্রক্রিয়াটি ইসলাম পূর্বকাল থেকে শুরু হয়েছে। কেননা ইরাক ও শামের আরবগণ ইসলাম

www.pathagar.com

পূর্বকাল থেকেই সিরীয় লিখনরীতি অনুসরণ করে লিখত। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সিরীয় লিখনরীতিতে স্বরচিহ্ন ব্যবহারের প্রচলন ছিল। তাই খুব সম্ভব, যেসব আরব সিরীয় কিংবা চূড়ান্ত নাবাতি লিপি থেকে তাদের লিখনরীতি গ্রহণ করেছিল তারা স্বরচিহ্ন ব্যবহারের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত ছিল। তারা যে কোনো ভাবেই হোক এর ব্যবহার করেছে।[৩৭]

আরবি বর্ণমালার ক্রমবিন্যাস

আমরা আরবি বর্ণমালা ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش... ক্রমানুযায়ী লিখি ও পড়ি। কিন্তু এটা আরবি বর্ণমালার প্রাচীনতম ক্রম নয়। প্রাচীনকালে আরবি বর্ণমালায় আবজদি বিন্যাস[৩৮] প্রচলিত ছিল। বর্তমানে প্রচলিত ক্রমবিন্যাস উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের আমলে নসর ইবন আসিম ও ইয়াহ্য়া ইবনু ইয়ামুর আল-উদওয়ানি প্রমুখ উদ্ভাবন করেন। এতে সম-আকৃতিবিশিষ্ট বর্ণগুলো এক স্থানে রাখা হয়েছে। যেমন—আবজদি বিন্যাসের আদি অক্ষর । ও ب দ্বারা আরবি বর্ণমালার এ নতুন বিন্যাস প্রক্রিয়াও সূত্রপাত করা হয়েছে। এরপর ب -এর সম-আকৃতির ت ও ث -কে রাখা হয়েছে। অতঃপর পুনরায় আবজদি বিন্যাসের ج বর্ণটি উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর তার সম-আকৃতির ح ও خ -কে রাখা হয়েছে। অতঃপর د, এর পর ذ উল্লেখ করা হয়েছে। আর ه বর্ণটি যেহেতু কোনো কোনো স্থানে حروف العلة (Vowels)-এর মতো অন্তর্হিত থাকে, তাই তাকেও সেগুলোর সাথে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। সম-আকৃতির জন্য ز বর্ণটি উল্লেখ করার আগে ر বর্ণটি উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে ز অপরাপর حروف الصفير (Sibilant Letters)-এর সাথে একত্রে থাকে। এ কারণেই ز -এর পরপর س উল্লেখ করা হয়েছে। س -এর আকৃতিগত সাদৃশ্যের কারণে ش বর্ণটি উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর ص, এর পর ض উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর ফিরে আবজদি ক্রমবিন্যাস থেকে ط বর্ণটি উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর আকৃতিগত সাজুয্যের কারণে ظ বর্ণটি উল্লেখ করা হয়েছে। আবজদি বিন্যাসের 'كلمن' পদের বর্ণগুলো সমআকৃতির বর্ণগুলোর পর শেষে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর ع উল্লেখ করা হয়েছে। আর আকৃতিগত মিলের কারণে এর পরে غ বর্ণটি উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর ف এরপরে ق উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর 'كلمن' পদের বর্ণগুলো পর পর উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর সর্বশেষ ه ও حرف علة--সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৯]

উপর্যুক্ত আরবি বর্ণমালার ক্রমবিন্যাসটি আরব-মাশরিকে প্রচলিত। মরক্কো ইত্যাদি দেশে প্রচলিত 'মাগরিবি' বর্ণমালা এরূপে লিখতে হয়–

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز ط ظ ك ل م ن ص ض ع غ ف ق س
ش هـ و ي لا

বিখ্যাত আরবি অভিধান 'আল-আইন'-এ বর্ণমালার ক্রম এরূপ–

ع ح هـ خ غ ق ك ج س ش ص ض ر ز ط د ت ظ ذ ث ل ن ف ب
م و ا ي

আত-তাহযীব ও আল-মুহকাম প্রভৃতি কতিপয় অভিধানেও এ ক্রম অনুসৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, এ সমস্ত হরফের নাম প্রাচীন সেমিটিক ভাষার। আরবি ভাষায় নামগুলো সংক্ষিপ্ত হয়েছে। কেবল নিম্নলিখিত হরফগুলোতে প্রাচীন নাম সম্পূর্ণ বা আংশিক রক্ষিত হয়েছে (যদিও এদের অর্থ আরবি ভাষাবিদগণের অজ্ঞাত)। ج د و ق ك ل م ن ع ف ص ش ।[৪০]

নতুন নতুন লেখার পত্র উদ্ভব

মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশের প্রাথমিক দিকে প্রাচ্যের দেশসমূহে লেখার পত্র হিসেবে শুধু প্যাপিরাসই ব্যবহৃত হতো। ধারণা করা হয় যে, চীনারাই সর্বপ্রথম কাগজ উৎপন্ন করেছিল। আরব ব্যবসায়ীরা প্রথম প্রথম দেশের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সেখান থেকে কাগজ আমদানি করত। মুসলিম বিশ্বে সর্বপ্রথম কাগজ উৎপন্ন হয় 'সমরকন্দে'। আরবরা হিজরি ৮৭ সালে এটি জয় লাভ করে। তালাসের নিকটবর্তী আতলাখের যুদ্ধের পর যে সকল চীনা যুদ্ধবন্দি সমরকন্দে নীত হয়, তারাই প্রথমে ১৩৪ হিজরি / ৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে চীনা পদ্ধতিতে লিনেন, শন বা শন জাতীয় আঁশ বা ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা তৈরি কাগজ শিল্পের প্রবর্তন করে। সমরকন্দ থেকে কাগজ তৈরির কৌশল প্রথমে আরব দেশসমূহে ও উত্তর আফ্রিকাতে এবং পরে স্পেনে বিস্তার লাভ করে।[৪১] সমরকন্দের কাগজ তখনকার বাজারে মিসরের প্যাপিরাস এবং প্রথমদিকে লেখার পত্র হিসেবে ব্যবহৃত পশুচর্মের প্রতিযোগিতা করত। কারণ এটি সেগুলোর তুলনায় অনেকখানি মসৃণ, সুন্দর ও সূক্ষ্ম ছিল।[৪২]

বড়ো বড়ো ক্যালিগ্রাফার ও হস্তলিপিবিশারদের জন্ম

উমাইয়া যুগে আরবি লিখনশিল্পের শ্রেষ্ঠতম লিপিকার হলেন প্রখ্যাত হস্তলিপিবিশারদ কুতবা আল-মুহাররির[৪৩] (মৃ. ১৫৪হি./৭৭০খ্রি.)। তিনি সর্বপ্রথম 'আল-খত্তুল জলিল' লিপিশৈলী উদ্ভাবন করেন। এটি এক প্রকারের বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট লিখনরীতি। এজন্য একে 'খত্তে জলি' নামেও অভিহিত করা হয়। এ লিপিতে আলিফের দৈর্ঘ্য প্রায় এক বিঘত কিংবা ২৪ সে.মি. হয়ে থাকে।[৪৪] Grohmann মনে করেন, এ লিপিতে দীর্ঘ উল্লম্ব রেখাবিশিষ্ট গ্রিক লিপির প্রভাব রয়েছে। উমাইয়া খলিফাগণ সরকারি চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজে স্বাক্ষর করার জন্য এ রীতি ব্যবহার করতেন।[৪৫] এ লিপি দ্বারা মিহরাব, মসজিদ ও দালানের দেয়ালে লেখা হতো। তাছাড়া শিলালিপি উৎকীর্ণ করার কাজেও এটা ব্যবহার করা হতো। এর পরপর তিনি এর চাইতে অপেক্ষাকৃত একটি ছোট লিখনরীতি উদ্ভাবন করেন। এটি হলো : 'তুমার লিখনরীতি'।[৪৬] অতঃপর ক্রমান্বয়ে 'মুখতাসারুত তুমার'[৪৭], 'মুহাক্কক' (এটি 'সুলুসে জলি' নামে পরিচিত), 'ইশআর', 'আশরিবাহ', 'সুমায়'ঈ', 'মুদাওয়ার'[৪৮] ও 'নরজসি' প্রভৃতি লিপিরীতি উদ্ভাবন করেন। সম্ভবত হি. ১৩৬ সালে তিনি সুলুস ও সুলুসাইন রীতিদ্বয়ও উদ্ভাবন করেন।[৪৯]

'সুলুস লিপিশৈলী' থেকে সুলুসে খফিফ (এটিই রিকা বা তাওকি লিপিরীতি) ও সকিল-এর উদ্ভব হয়। আর সকিল থেকে পরবর্তীকালে 'মিফতাহ', 'যনবুরি' ও 'হারাম'[৫০] প্রভৃতি লিপিরীতির সৃষ্টি হয়। আর 'হারাম' থেকে 'উহুদ লিপিরীতি'র জন্ম হয়।[৫১] আর 'সুলুসাইন', যা সরকারি দলিল-পত্র লেখার কাজেই কেবল ব্যবহার করা হতো, তা থেকে ক্রমান্বয়ে 'মুআমরাত', 'মনসুর', 'দিবাজ' ও 'খিরফাজ' প্রভৃতি লিখনরীতি সৃষ্টি হয়।[৫২]

www.pathagar.com

উপর্যুক্ত বর্ণনার আলোকে উমাইয়া যুগে উদ্ভূত সকল লিপিরীতিকে নিম্নোক্ত ছকে সাজানো যেতে পারে।

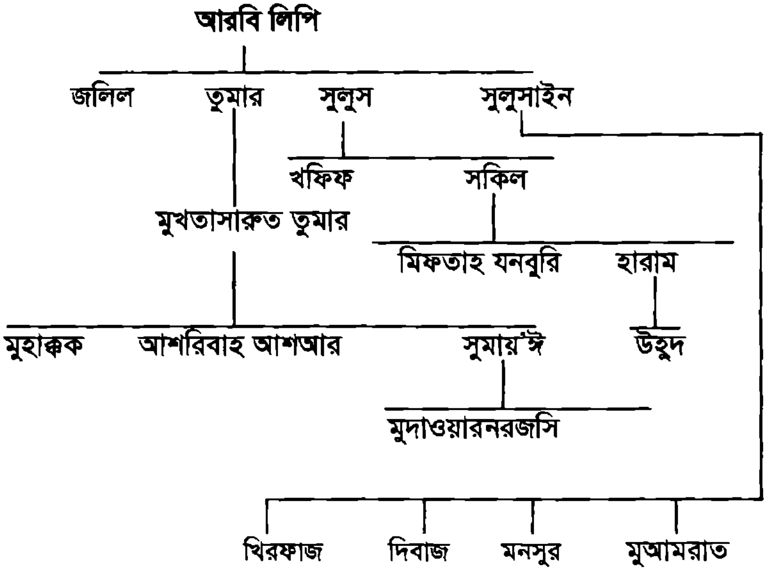

উমাইয়া যুগের বিশিষ্ট লিপিকারগণের মধ্যে খলিফা ওয়ালিদ ইবনু আবদুল মালিকের আমলের প্রখ্যাত লিপিকার খালিদ ইবনুল হাইয়াজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি পবিত্র মুসহাফ লেখার জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। খলিফা ওয়ালিদ (খিলাফত: ৮৬-৯৬হি./৭০৫-৭১৫খ্রি.) তাঁকে কুরআন, কবিতা, আরবদের ইতিহাস ও দৈনন্দিন ঘটনাবলি লেখার কাজে নিজ দরবারে নিয়োগ দান করেছিলেন। তিনি মসজিদে নববির কিবলার দিকের দেয়ালে পবিত্র কুরআনের সুরা আশ-শাম্‌স থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ২৪টি সুরার ৯৩টি আয়াত স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।[৫৩]

সে যুগের প্রসিদ্ধ লিপিকারদের মধ্যে আবু ইয়াহ্‌য়া মালিক ইবনু দিনার আল-ওয়ার্‌রাক (মৃ. ১৩১/৭৪৭ হি.) ও শুয়াইব ইবনু হামযা আল-কাতিব (মৃ.১৬২/৭৭৮ হি.) [রাহ.] প্রমুখও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন। মালিক ইবনু দিনার (রাহ.) খুবই ধার্মিক ও ইবাদতকারী লোক ছিলেন। তিনি স্বহস্তে লেখা কুরআন বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।[৫৪] শুয়াইব ইবনু হামযা (রাহ.) সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি উমাইয়া খলিফা হিশামের ব্যক্তিগত কাতিব ছিলেন।[৫৫]

সে যুগের অপর দুজন প্রসিদ্ধ লিপিকার হচ্ছেন রশিদ আল-বাসরি ও মাহদি আল-কুফি। তাঁদের পর বহুকাল পর্যন্ত তাঁদের সমমানের কোনো প্রসিদ্ধ লিপিকৌশলীর জন্ম হয়নি। আল-বাসরি এমন সুদক্ষ ছিলেন যে, তাঁর দক্ষতা সম্পর্কে বহু কাহিনি প্রচলিত আছে।

www.pathagar.com

আব্বাসীয় যুগে আরবি লিখনশিল্পের বিকাশ

আব্বাসীয় যুগ ছিল ইসলামি সভ্যতার চরম উন্নতির যুগ। এ সময় ইসলামি সভ্যতা সবদিক থেকে স্বর্ণশিখরে পদার্পণ করে। এ যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো আরবি লিপিরও চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ সময় অসংখ্য হস্তলিখনরীতির উদ্ভব হয়, যার অধিকাংশই বর্তমানে বিলীন হয়ে গেছে। আরবি লিপিকলার সকল শৈল্পিক প্রয়োজনীয়তা ও মাধুর্যের চরম বিকাশও ঘটে এ যুগে। তদুপরি লিপিশিল্পের সৌন্দর্য ও এর রূপসজ্জা এবং কুরআন ও অন্যান্য গ্রন্থের উজ্জ্বলতা বিধানের জন্য বাঁধাইশিল্পের বিকাশও শুরু হয় এ সময়ে। প্রখ্যাত আব্বাসীয় সুলেখক জাহিয 'المحاسن و الأضداد' গ্রন্থে লেখালেখির ক্ষেত্রে সে যুগের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে বলেন, "যুগ যুগ ধরে কীর্তিগুলো ধরে রাখার জন্য দালানকোঠার চাইতে গ্রন্থাদি রচনাই হচ্ছে অধিকতর কার্যকর পদ্ধতি। কেননা দালানকোঠা একদিন অবশ্যই বিলীন হয়ে যাবে এবং তার নিদর্শনাদি ধ্বংস হয়ে যাবে। অন্যদিকে গ্রন্থাদি প্রজন্মের পর প্রজন্মের মধ্যে যুগ যুগ ধরে স্থায়ীভাবে বেঁচে থাকবে। তা চির নতুন। তাতে যে-ই দৃষ্টি ফেলবে সে উপকৃত হবে। এজন্য কীর্তিগুলো ধরে রাখার ক্ষেত্রে গ্রন্থাদি দালান-কোঠা ও চিত্রাবলির চাইতে অধিকতর ফলপ্রসূ।..."[৫৬]

আব্বাসীয় যুগে স্বরচিহ্নের প্রয়োগগত সমস্যার সমাধানকে আরবি লিখনশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইতঃপূর্বে বর্ণের বিপরীত রঙের কালি দিয়ে নুকতা যোগে স্বরচিহ্ন প্রয়োগ করা হতো। সবসময় লেখকের জন্য দুটি রং যোগাড় করা কষ্টকর ছিল। তদুপরি সময় ও শ্রমও ব্যয় হতো প্রচুর। প্রখ্যাত বৈয়াকরণিক খলিল ইবন আহমদ আল-ফরাহিদি [১০০-১৭০হি.] (রাহ.) সমস্যাটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন এবং এর সমাধানকল্পে একটি উত্তম ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন। তা হলো: জবরের জন্য বর্ণের ওপরে একটি ছোট্ট হেলানো আলিফ, জেরের জন্য বর্ণের নিচে একটি ছোট্ট ইয়া[৫৭], পেশের জন্য বর্ণের ওপরে একটি ছোট্ট ওয়াও, তানভিনের জন্য ছোট্ট করে সংশ্লিষ্ট বর্ণটির দ্বিত্ব রূপ, তাশদিদের জন্য সিনের মাথা, সাকিনের জন্য 'হা'র মাথা, হামযার জন্য উচ্চারণগত নৈকট্যের কারণে আইনের মাথা এবং আলিফে ওয়াস্‌লের জন্য সোওয়াদের মাথা এবং মাদ্দে ওয়াজিবের জন্য দালের সামান্য অংশসহ একটি ছোট্ট মিম (مد)। এ পদ্ধতিতে একই কালি দিয়ে বর্ণ, স্বরচিহ্ন ও নুকতা প্রভৃতি একসাথে লেখা লেখকদের জন্য সহজ হয়ে যায়।[৫৮]

উল্লেখ্য, স্বরচিহ্ন প্রদানের এ পদ্ধতিটি সকল প্রকারের আরবি লিখনরীতির জন্য প্রযোজ্য। উপরন্তু, এ পদ্ধতির ফলে অনারবদের জন্য আরবি ভাষা আয়ত্ত করার পথ অনেকখানি সুগম হয়ে যায়।

আব্বাসীয় যুগে মুসলিম সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে আরবি ভাষার লেখার পরিধি অনেক বেড়ে যায় এবং সেজন্য লেখাকে স্পষ্ট ও সুন্দর করে তোলার জন্য অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। এ সময় সুহস্তলিখন-শিল্পীগণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। বিভিন্ন প্রশাসনিক অফিসে সরকারি চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজের অনুলিপি প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে হস্তলিখনশিল্পীদের নিয়োগ করা

www.pathagar.com

হতো। যেসব শিল্পীর হস্তলিখন খুব সুন্দর এবং অধিক দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে পারতেন, এ যুগে তাঁদের মর্যাদা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা অধিক অর্থ উপার্জন করতে পারতেন। তদুপরি এ সময় বিভিন্ন ভাষা হতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থাদি আরবিতে অনূদিত হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পণ্ডিতগণ কর্তৃক মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয়। মুদ্রণ যন্ত্র ও ছাপাখানার অভাবে এসব গ্রন্থের অধিক পরিমাণে অনুলিপি হস্তলিখন-শিল্পীগণ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়। ফলে হাতের লেখা সুন্দর করার দিকে এবং দ্রুত গতিতে সহজভাবে লেখার কাজ সম্পন্ন করার দিকে অধিক মনোযোগ প্রদান করা হয়। এভাবে এ যুগে সুহস্তলিখনশিল্পের বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়।

আব্বাসীয় যুগের বিশিষ্ট আরবি লিপিকারদের মধ্যে সিরিয়ার দাহ্হাক ইবনু আজলান ও ইসহাক ইবনু হাম্মাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দাহ্হাক প্রথম আব্বাসীয় খলিফা আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহের সমসাময়িক এবং ইসহাক ইবনু হাম্মাদ খলিফা মানসুর ও মাহদির সমসাময়িক ছিলেন। ইসহাক ইবনু হাম্মাদ-এর কাছ থেকেই প্রখ্যাত লিপিকার ইবরাহিম আস-সজযি জলিল লিপিরীতির শিক্ষা লাভ করেন। সাজযি 'জলিল' থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট এক ধরনের লিখনরীতি উদ্ভাবন করেন। তা হলো 'সুলুসাইন'। অতঃপর সুলুসাইন থেকে 'সুলুস' রীতি উদ্ভাবন করেন। ইবরাহিম আস-সাজযির ভাই ইউসুফ আস-সাজযিও ইসহাক থেকে জলিল লিপিরীতির শিক্ষা লাভ করেন। ইউসুফ জলিল লিপিরীতি থেকে অন্য একটি সুন্দর লিখনশৈলী আবিষ্কার করেন, যা দেখে খলিফা মামুনের মন্ত্রী ফদল ইবনু সাহ্ল অতিশয় মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তিনি এর দ্বারা যাবতীয় সরকারি চিঠিপত্র লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি এর নাম রাখেন 'রিয়াসি'। অন্যরা একে 'তাওকি' লিপিরীতি নামে অভিহিত করে থাকে। ইবরাহিম ও ইউসুফ ছাড়াও ইসহাকের প্রচুর শাগরিদ রয়েছে। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন:

১. কবি ইউসুফ লাকওয়াহ
২. আহমদ আল-কালবি (খলিফা মামুনের কাতিব)
৩. আবদুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ
৪. আবুল ফাদল ছালিহ ইবনু আবদুল মালিক আত-তামিমি
৫. সলিম (জাফর ইবনু ইয়াহ্য়ার খাদিম)
৬. সানা আল-কাতিবা (ইবনু কায়ুমার দাসী)
৭. ইবরাহিম ইবনুল হাসান
৮. আবদুল জাব্বার আর-রুমি
৯. উসমান ইবনু যিয়াদ আল-'আবিদ
১০. মুহাম্মদ ইবনু আবদুলাহ আল-মাদানি
১১. আমার ইবনু মাসআদাহ
১২. আহমদ ইবনু আবি খালিদ

www.pathagar.com

অতঃপর সুন্দর হস্তলিখনের ক্ষেত্রে ইবরাহিম আস-সাজযির শাগরিদ ও উজির আবু আলী ইবনু মুকলার শিক্ষক আল-আহওয়াল আল-মুহাররিরি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। আহওয়াল উস্তাদ ইবরাহিমের নিকট সুলুসাইন ও সুলুস লিপিরীতিদ্বয়ের শিক্ষা লাভ করেন এবং এতদুভয় থেকে 'কলমুন নিস্ফ' নামে একটি লিখনরীতি উদ্ভাবন করেন। তাছাড়া তিনি 'সুলুসে খফিফ' নামে সুলুসের চাইতে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি লিখনরীতি এবং 'মুসাল্সাল' নামে ধারাবাহিকভাবে সংযুক্ত এক ধরনের লিখনরীতি আবিষ্কার করেন। এগুলো ছাড়া তিনি গুবারুল হালবাহ, মুআমারাত, কাসাস ও হাওয়ায়িজি প্রভৃতি লিপিরীতিও উদ্ভাবন করেন। উল্লেখ্য যে, তাঁর লেখার অপূর্ব সৌন্দর্য ও শ্রী সত্ত্বেও গতিময়তা ও দৃঢ়তার অভাবে তাঁর সমসাময়িক অনেকেই তাঁর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল। এঁদের মধ্যে ওয়াজহুন না'জাহ জলিল লিপিতে, আবু দারজান নামে পরিচিত মুহাম্মদ ইবনু মা'আদান নিসফ লিপিতে এবং জকিফ নামে পরিচিত আহমদ ইবনু মুহাম্মদ হাফস সুলুস লিপিতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কিংবা তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল।

এতদসত্ত্বেও আহওয়াল মুহাররিরের গর্বের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তিনি আরবি লিপিশিল্পের এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের জন্ম দেন। তিনি হলেন উজির আবু আলী ইবনু মুকলা। আহওয়াল আরবি লিপিতে যে উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য আনয়নের সূত্রপাত করেছিলেন তিনি তার অনুসরণ করে একে অপূর্ব সুষমামণ্ডিত শিল্পে পরিণত করেন। তদুপরি তাঁর ভাই আবু আবদুল্লাহর পাশাপাশি তিনিও নাস্খ লিপিরীতির উৎকর্ষ সাধন করেন। দুই ভাই সম্পর্কে إعانة المنشي গ্রন্থ প্রণেতা মন্তব্য করেন, وولدا طريقة اخترعاها, وكتب في زمانهما جماعة فلم يقاربوهما -" তাঁরা উভয়ে নতুন একটি রীতি উদ্ভাবন করেন। তাঁদের আমলে একদল লোক লেখালেখি করত; কিন্তু কেউ তাঁদের নিকটবর্তী হতে পারেনি।"[৫৯] ইবনু মুকলা আরবি লিপিকে এতই সুষমামণ্ডিত ও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন, যাতে পরবর্তীরা তাঁর পদাঙ্ক অনুকরণ করতে থাকে এবং আরবি লিপি পৃথিবীর সর্বত্র সমাদর লাভ করে।

ইবনু মুকলার সর্বোত্তম আবিষ্কার হলো—বর্ণগুলোর জ্যামিতিক পরিমাপ ও মানদণ্ড নিরূপণ। তাঁর এ পরিমাপ ও মানদণ্ডের ভিত্তি ছিল বিন্দু ও বৃত্ত। তিনি একটি আলিফের পরিমাপ নির্ধারণ করেন কতকগুলো খাড়াভাবে সাজানো বিন্দুর সাহায্যে। এগুলো ৫ থেকে ৭ পর্যন্ত ব্যবহৃত হতে পারে। আলিফের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য অন্যান্য আরবি হরফের পরিমাপ নির্ধারিত করা হয় বৃত্তের মাধ্যমে অর্থাৎ একটি আলিফের দৈর্ঘ্য একটি বৃত্তের ব্যাসের সমতুল্য হবে। এভাবে ب ' ف ' ق প্রভৃতি অক্ষরগুলোর বক্রতা নির্ধারিত হয় সামঞ্জস্য, ভারসাম্য ও সাবলীল ছন্দ রক্ষার জন্য[৬০] (দ্র. চিত্র-৪)। পরিমাপের একক হিসেবে বিন্দুর ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় তাঁর এ লিপিকে اَلْخَطُّ الْمَنْسُوْبُ (সু-আনুপাতিক লিপি) নামেও অভিহিত করা হয়। লিপিকলার ক্রমবিকাশে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে উদ্ভূত এই কৌশল প্রয়োগ করে ইবনু মুকলা মোট ছয়টি বক্রাকার লিপিশৈলীর উৎকর্ষ সাধন করেন, যা 'আকলামুস সিত্তা' (Six Scripts) নামে পরিচিত। এ ছয়টি লিখনপদ্ধতি হলো : সুলুস, নাসখ, মুহাক্কাক, রায়হানি, রিকা ও তাওকি। তাছাড়া তিনি 'দার্জ' লিপিরীতি নামে নতুন একটি লিপিরীতিও আবিষ্কার করেন।

www.pathagar.com

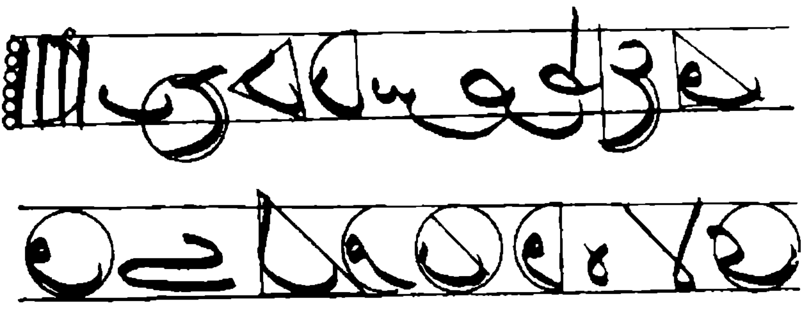

চিত্র-৪: ইবনু মুকলা উদ্ভাবিত রীতি অনুযায়ী বর্ণের জ্যামিতিক পরিমাপ ও মানদণ্ডের উদাহরণ

ইবনু মুকলা থেকে মুহাম্মদ ইবনুস সামসামানি ও মুহাম্মদ ইবনু আসাদ এবং তাঁদের উভয়ের নিকট থেকে আরবি লিখনশিল্পের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক ব্যক্তি আলী ইবনু হিলাল লিপিশিল্পের জ্ঞান লাভ করেন। আলী ইবনু হিলাল ইবনুল বাওয়াব নামে সুপরিচিত ছিলেন। ইবনু আসাদ তাওকি ও নাসখ লিপিরীতিসমূহের উৎকর্ষ সাধন করেন এবং 'খত্তুয যাহাব' নামে নতুন একটি লিপিরীতির জন্ম দেন। ইবনুল বাওয়াব লিখনশিল্পের নিয়ম-নীতিসমূহের পূর্ণতা বিধান করেন। উপরন্তু, তিনি ইবনু মুকলা কর্তৃক আবিষ্কৃত ছয়টি লিপিশৈলীর এমন উন্নতি সাধন করেন এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন যে, তা 'আল-মানসুব ফায়িক' বা অতীব সুষমামণ্ডিত লিখনরীতি নামে অভিহিত হয়।[৬১] কথিত আছে যে, তিনি তাঁর জীবদ্দশায় ৬৪টি পবিত্র মুসহাফ লিপিবদ্ধ করেন।[৬২] তদুপরি তিনি লিখনশিল্প সম্পর্কে একটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। তবে বর্তমানে এর ভূমিকা ছাড়া অন্য অংশগুলো খুঁজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া সুন্দর হস্তলিখন ও রচনা সম্পর্কে তার একটি প্রসিদ্ধ 'কসিদা রাইয়িয়্যাহ' ('রা' অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত কবিতা)ও রয়েছে।

ইবনুল বাওয়াব থেকে মুহাম্মদ ইবনু আবদুল মালিক, তাঁর থেকে প্রখ্যাত মুহাদ্দিসা ও লেখিকা জয়নব লিপিশিল্পের জ্ঞান অর্জন করেন। জয়নবের উপাধি ছিল শুহদা বিনতে আবারি। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, তিনি হলেন শুহদা বিনতে আহমদ আল-আবারি আদ-দায়নুরি। তিনি হি. ৫৭৪ সালে বাগদাদে মারা যান। জয়নব থেকে আমিনুদ্দীন ইয়াকুত, তাঁর নিকট থেকে ওয়ালি উদ্দীন আলী ইবনু জন্গি, তাঁর নিকট থেকে আফিফ, তাঁর নিকট থেকে তাঁর ছেলে শায়খ ইমাদুদ্দীন লিপিশিল্পের জ্ঞান লাভ করেন। ইমাদুদ্দীনকে যুগের 'ইবনুল বাওয়াব' বলা হতো। তাঁর নিকট থেকে ফুসতাতের হিসাব পরিদর্শক শায়খ শামসুদ্দীন ইবনু আবি রাকিবা, তাঁর নিকট থেকে শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু আলী আয-যাফতাভি লিপিশিল্পের জ্ঞান লাভ করেন। তিনি 'সুলুস' রীতি ও লিখনশিল্পের নীতিমালা সম্পর্কে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। জাফতাভি থেকে 'সুবহুল আশা' প্রণেতা আবুল আব্বাস আল-কালকাশান্দি ও মিসরের হিসাব পরিদর্শক শায়খ যায়নুদ্দীন শাবান ইবনু মুহাম্মদ ইবনু দাউদ আল-আসারি লিপিশিল্পের জ্ঞান লাভ

করেন। আল-আসারি লেখার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 'العناية الربانية في الطريقة الشعبانية' নামে একটি 'আলফিয়া' (আলিফ অন্ত্যানুপ্রাস যুক্ত কবিতা) রচনা করেন। পরে তিনি মিসর থেকে মক্কায়, অতঃপর ইয়েমেনে, অতঃপর ভারতে গমন করেন। অবশেষে মক্কায় ফিরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এখানেই তিনি লিখনশিল্পে পারদর্শিতা অর্জন করেন।

সর্বশেষ আরবি লিপি আব্বাসীয় আমলের শেষ পর্যায়ে ইয়াকুত আর-রুমি আল-হামাভি আল-বাগদাদি (মৃ. ৬২১ হি.)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে অভিনবত্ব ও উৎকর্ষের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পদার্পণ করে। এর পর তৃতীয় শ্রেষ্ঠ লিপিকার জামালুদ্দীন ইয়াকুত আল-মুস্তাসিমি (মৃ. ৬২৮ হি./১২৯৮ খ্রি.)-এর হাতে আরবি লিপিশিল্প অধিকতর লালিত্য ও সুষমামণ্ডিত রূপে প্রকাশ পায়। ইবনু মুকলা ও ইবনুল বাওয়াব আরবি লিখনশিল্পে যে দৃঢ়তা, অভিনবত্ব ও সৌন্দর্যের ধারা সূচনা করেছিলেন তিনিই তাকে পরিপূর্ণতা দান করেন। এজন্য তিনি 'কিবলাতুল খত্তাতিন' (Polestar of Calligraphers) নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর খ্যাতি এমনই সুদূরপ্রসারী ছিল যে, তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলি তাঁর জীবদ্দশায় মুসলিম জগতের বিভিন্ন অঞ্চলে চর্চা হতে শুরু করে। তিনি লিখনশৈলীতে ব্যবহৃত কলমের উন্নতি সাধিত করে হরফগুলোকে আরো সাবলীল ও ছন্দময় করে তোলেন। তাঁর মৃত্যুতে আরবি লিপিশিল্প, সাহিত্য ও কবিতা প্রভৃতি ইসলামি সভ্যতার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অঙ্গনসমূহ একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রকে হারাল।

ইয়াকুত আল-মুস্তাসিমির পর ছয়জন বিশিষ্ট লিপিকারের জন্ম হয়। তাঁরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে লিপি চর্চা করতেন; তবে প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ অঙ্গনে নিজের পারদর্শিতার ছাপ রাখেন। যেমন আবদুল্লাহ আস-সায়রাফি নাস্খ লিপিতে, আবদুল্লাহ আরগুন মুহাক্কক লিপিতে, ইয়াহ্ইয়া আস-সুফি সুলুস লিপিতে, মুবারাক শাহ কুতুব তাওকি লিপিতে, মুবারাক শাহ আস-সায়ুকি রায়হানি লিপিতে এবং আহমদ সোহরাওয়ার্দি তাইয়িব শাহ রিকা লিপিতে খ্যাতি অর্জন করেন।[৬৩]

আব্বাসীয় যুগে বিভিন্ন আরব রাজ্যে আরবি লিখনশিল্পের ব্যবহার

মিসরে ফাতেমীয় সাম্রাজ্যও আরবি লিখনশিল্পের উন্নতি ও শ্রী বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। সে-সময় মিসরের ফুসতাত নগরী সুন্দর হস্তলিখনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করে। এখানে লিপিশিল্পের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও চর্চার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, যেগুলো মামলুকদের আমল পর্যন্ত সরব ছিল।

উত্তর সিরিয়ায় হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে আরবি লিপিশিল্প সাবলীলতা ও সৌন্দর্যে বিরাট উন্নতি লাভ করেছিল। এখানে আরবি লিপিশিল্প সেকেলে আকৃতি ত্যাগ করে নতুন দুটি আকৃতি ধারণ করে। একটি হলো : নাসখ লিপিরীতি। অপরটি হলো তুমার ও তার উপজাত লিপিশৈলীসমূহ। তখন থেকে সহজ-সরল লিখনরীতিসমূহ একচ্ছত্র প্রাধান্য বিস্তার করে এবং মুসহাফ লেখার ক্ষেত্রে কুফিরীতির প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে।

আইয়ুবীয় আমলে মিসর ও সিরিয়ায় দেয়ালগাত্র ও প্রস্তরফলককে লেখার ক্ষেত্রে গোলাকার লিপিরীতিসমূহ কুফি লিখনরীতিসমূহের স্থান দখল করে নেয়। এভাবে

www.pathagar.com

হিজরি ৭ম শতাব্দীতে এসে কুফি লিখনরীতিসমূহের প্রভাব একেবারে সংকুচিত হয়ে পড়ে। কেবল দেয়ালের শোভা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যই ঝুলন্ত চিত্রলিপিসমূহে এর ব্যবহার বহাল থাকে, তাও আবার সীমিত পর্যায়ে।

মামলুকদের আমলে মিসরীয়রা ব্যাপকভাবে পূর্বসূরিদের সকল ঐতিহ্য সংরক্ষণ করতে প্রবৃত্ত হয়। তারা 'তুমার কবির' তথা সুলুস ও সুলুসাইন থেকে উদ্ভূত লিপিরীতিসমূহ নতুনভাবে চর্চা করতে থাকে।

সর্বশেষ সেলজুকরা নাসখ লিপির প্রভূত সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। তারা অতি মনোরম ও সুন্দরভাবে পবিত্র কুরআনের অনেক অনুলিপি প্রস্তুত করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, উমাইয়া যুগে প্রখ্যাত লিপিকার কুতবা আল-মুহাররিরের হাতে যে লিপিশিল্প মৌলিকত্ব অর্জন করে এবং বিভিন্ন নিয়ম-কানুন রচিত হয়, আব্বাসীয় আমলে তা দাহ্হাক, ইবনু হাম্মাদ, ইবনু মুকলা, ইবনুল বাওয়াব ও ইয়াকুতের হাতে অধিকতর সুষমামণ্ডিত রূপ লাভ করে এবং তা শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃতি লাভ করে। পরবর্তী যুগে লিপিকারগণ পূর্বসূরিদের উদ্ভাবিত নিয়ম-কানুন ও কলাকৌশলের ভিত্তিতেই কেবল এ লিপিচর্চা অব্যাহত রাখেন এবং ঐতিহ্যবাহী এ শিল্পের ধারাবাহিক বিকাশকে ধরে রাখেন।

অনারবি ভাষায় আরবি বর্ণমালার ব্যবহার

ঐতিহাসিক বিবরণে জানা যায়, হজরত সালমান ফারসি (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে তাঁর স্বদেশবাসী নও-মুসলিমদের জন্য সুরা ফাতিহার ফারসি অনুবাদ করেছিলেন। ঐতিহাসিক বিবরণে এটাও জানা যায় যে, উমাইয়া খিলাফতের শেষদিকে বার্বার ভাষায় কুরআন অনূদিত হয়েছিল। কিন্তু অনূদিত কুরআন মজিদ কোন বর্ণমালায় লিখিত হয়েছিল তা জানা যায় না। হি. ২৬ সালে যখন হজরত উসমান (রা.)-এর সেনাবাহিনী স্পেনে এবং এর পরবর্তীকালে মুসলিম বাহিনী মধ্য এশিয়ায় ও পূর্বে চীনে প্রবেশ করে, তখন তিনটি মহাদেশে বসবাসকারী বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন বর্ণমালা ব্যবহারকারী নও-মুসলিমদের জন্য কুরআন মজিদের বর্ণমালা শিক্ষা করা জরুরি হয়ে পড়ে। পরবর্তী শতাব্দীসমূহেও আরবি বর্ণমালার গুরুত্ব হ্রাস পায়নি, বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি আরবি ভাষা সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক হিসেবে শ্রেষ্ঠতম ভাষার মর্যাদার অধিকারী ছিল।

কিন্তু এ বিষয়টি এখনও অজ্ঞাত রয়ে গেছে যে, আরবি বর্ণমালায় অনারবি ভাষাসমূহ লেখার প্রথা কখন কোন অবস্থায় আরম্ভ হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এরূপ লিখনপ্রথা কীরূপ অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। সে যা হোক, এ কথা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, আরবি বর্ণমালায় অনারবি ভাষাসমূহ লিখিত হওয়ার রীতি প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে আরবি বর্ণমালার রূপ সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয় এবং তাতে সম-আকৃতিবিশিষ্ট বর্ণগুলোর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির জন্য বর্ণগুলোতে বিন্দু প্রয়োগের ব্যবস্থাও উদ্ভাবিত হয়।

www.pathagar.com

সম্ভবত ফারসি ভাষাই সর্বপ্রথম আরবি বর্ণমালাকে স্বীয় বর্ণমালারূপে গ্রহণ করে। তবে এতে কালক্রমে চারটি নুতন বর্ণ (گ ژ چ پ) সংযোজিত হয়। ইরানি জাতির পর বৃহৎ জাতিসমূহের মধ্যে তুর্কি জাতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের মধ্যে প্রাথমিক যুগ থেকেই ইসলাম বিদ্যমান থাকলেও তুর্কি ভাষা আরবি বর্ণমালায় লেখার রীতি প্রবর্তিত হয় ফারসি ভাষায় উক্ত রীতি প্রবর্তিত হওয়ারও পরে। তারা ফারসি ভাষার চারটি অতিরিক্ত বর্ণসহ তাদের ভাষায় কালক্রমে আরো দুটি বর্ণ (ڭ, ی) সংযোজন করে। প্রথমোক্ত বর্ণটি বাংলা যুক্ত বর্ণ ঙ+গ=ঙ্গ এবং শেষোক্ত বর্ণটি বাংলা যুক্ত বর্ণ জ+ঞ= জ্ঞ-এর সমধ্বনিবিশিষ্ট। বর্তমানে তুর্কিগণ ল্যাটিন বর্ণমালাকে তাদের ভাষার বর্ণমালারূপে গ্রহণ করেছে।

ভারত উপমহাদেশে উর্দু ভাষা প্রথমে ফারসি বর্ণমালায় সংযোজিত সকল নতুন বর্ণসহ আরবি বর্ণমালাকে স্বীয় বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। অতঃপর তা ক্রমান্বয়ে ٹ ڈ ڑ, গুন্নাহযুক্ত নুন (ں) ও ইয়া মাজহুল (ے) -এ পাঁচ বর্ণকে স্বীয় বর্ণমালায় নতুন বর্ণরূপে সংযোজন করে। তাছাড়া তা যুক্ত ধ্বনিসমূহের জন্য সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালায় একটি অতি মূল্যবান সংস্কার সাধন করতে দ্বিচক্ষুবিশিষ্ট ھ এবং হা-ই হাওয়ায ہ -এ দুটি বর্ণের উচ্চারণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। উর্দু ভাষায় শেষোক্ত অগ্রগতি অন্তত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ঘটেছিল। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত উত্তর ভারতের প্রাদেশিক ভাষাসমূহের ওপর উর্দু ভাষার অত্যন্ত গভীর প্রভাব রয়েছে। কাশ্মীর ও পাঞ্জাব থেকে আরম্ভ করে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূ-খণ্ডের ভাষাসমূহে উর্দু ভাষার বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে সিন্ধি ভাষার ইতিহাস বেশ চমকপ্রদ। প্রথমদিকে তা উর্দু ভাষার মতো অন্য বর্ণের সাথে দ্বিচক্ষুবিশিষ্ট ھ বর্ণকে যুক্ত করে বিভিন্ন যুক্ত বর্ণ গঠন করত। অতঃপর এটা এ দেশে ইংরেজ শাসন কায়েম হওয়ার প্রথমদিকে স্বীয় বর্ণমালাকে পর্যালোচনা করে جھ, چھ, ڈھ, دھ, ٹھ, تھ, پھ, بھ, گھ, کھ ইত্যাদি যুক্ত বর্ণগুলোকে একক বর্ণ ধরে এদের প্রত্যেকটির জন্য স্বীয় বর্ণমালায় একেকটি একক বর্ণ সংযোজিত করে।

দক্ষিণ ভারতের ভাষাসমূহের মধ্য থেকে গুজরাটি, কাচি এবং এদের প্রতিবেশী ভাষাসমূহ উর্দু বর্ণমালাকে অনুসরণ করে; কিন্তু তামিল ও মালয়ালম ভাষা দুটিতে শুধু এদের নিজস্ব স্বতন্ত্র ধ্বনিসমূহের জন্য নয়; বরং উর্দু ভাষার সাথে মিলযুক্ত এদের অনারবি ধ্বনিসমূহের জন্যও উর্দু বর্ণমালা থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র বর্ণমালা উদ্ভাবিত হয়েছে। এভাবে একই ধ্বনি উর্দুতে এক আকৃতির বর্ণে লিখিত হয়ে থাকে এবং 'আরব-তামিল' ও 'আরব-মালায়লাম' ভাষা দুটিতে অন্য আকৃতির বর্ণে লিখিত হয়ে থাকে।

সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, উক্ত ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলির অনুবাদে যে শুধু নামসমূহের (বর্ণের) বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়, তা নয়; বরং 'সংস্কৃত-ফারসি' অভিধান গ্রন্থাবলির যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে, তাতে সংস্কৃত শব্দাবলিও আরবি বর্ণমালায় লিখিত রয়েছে। তেলেঙ্গি (তেলেগু) ও কানেড়ি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলি আরবি বর্ণমালায় কমই রচিত হয়েছে। অবশ্য মুহাম্মদ বাকির আগার

www.pathagar.com

তেলেঙ্গি ভাষায় রচিত ও আরবি বর্ণমালায় লিখিত কিছু সংখ্যক কবিতা পাওয়া যায়। এরূপ আরো কিছু রচনা বিদ্যমান থাকা অসম্ভব নয়।[৬৪] মধ্যযুগে বাংলার মুসলিম শাসনামলে মুসলমানগণ বাংলা ভাষায়ও বাংলা লিপিরীতির পরিবর্তে আরবি লিপিরীতি অনুসরণের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। সে-সময়ে বহু বাংলা কাব্য ও পাণ্ডুলিপি আরবি লিপিরীতি অবলম্বনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন জাদুঘরে এর কিছু নমুনা আজও সংরক্ষিত রয়েছে। তবে পরবর্তীকালে আরবি ভাষার প্রতি শাসকবর্গের আগ্রহ হ্রাস পাওয়ায় বাংলাভাষী সাধারণ মুসলমানরাও বাংলা ভাষায় আরবি লিপিরীতির অনুসরণ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে।[৬৫] শ্রীলঙ্কার মুসলমানদের অধিকাংশের ভাষা তামিল। সিংহলি ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে আরবি বর্ণমালা প্রচলিত থাকার বিষয় জানা যায় না।

আরবি বর্ণমালা গ্রহণে মালয়েশিয়া ও জাভা (ইন্দোনেশিয়া) এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে। সেখানকার ভাষায় আরবি বর্ণমালায় অতিরিক্ত বিন্দু যুক্ত করে নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করা হয়েছে। ফিলিপাইনে মিন্দানাও ও সুলুর মুরদের ভাষায় আরবি বর্ণমালা বহুলভাবে প্রচলিত রয়েছে।[৬৬] অপরপক্ষে পশতু ভাষার বর্ণমালায়ও তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অতিরিক্ত বর্ণ সংযোজিত হয়েছে। উর্দু ভাষার ٹ ও ڈ বর্ণ দুটির পরিবর্তে পশতু ভাষায় তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বর্ণ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, পশতু ভাষার নিজস্ব স্বতন্ত্র ধ্বনি বিদ্যমান। কুর্দি ও ককেসীয় ভাষাগুলোতেও আরবি বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অনারবি ভাষায় আরবি বর্ণমালা শুধু প্রাচ্য ভাষাসমূহে নয়; বরং পাশ্চাত্য ভাষাসমূহেও ব্যবহৃত হয়েছে। স্পেনে আলজামিয়াড়ু (Aljamiado) ও কাস্তালি এবং পর্তুগালের আলজামিয়াড়ু পর্তুগিজ (Aljamiado Portuguesa) প্রভৃতি ভাষায় রচিত বিপুল সংখ্যক সাহিত্যগ্রন্থ আরবি বর্ণমালায় লিখিত হয়েছে। উক্ত ভাষাসমূহে আরবি বর্ণে লিখিত কুরআন-হাদিসের অনুবাদ ও ফিকহবিষয়ক বহু পাণ্ডুলিপি এখনও ব্রিটিশ মিউজিয়াম ইত্যাদিতে সংরক্ষিত রয়েছে। এটাও জানা যায় যে, পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া, ইউক্রেন ও বাইলো রাশিয়ায় বসবাসকারী তাতারি মুসলমানরা যখন তাদের মাতৃভাষা ত্যাগ করে স্থানীয় ভাষাসমূহ গ্রহণ করে, তখন তারা এসব ভাষার জন্য আরবি বর্ণমালা গ্রহণ করেছিল। তারা তাদের ভাষায় অনূদিত কুরআন মজিদের একটি অনুবাদ গ্রন্থকে আরবি বর্ণমালায় লিখেছিল। সিসিলি ও দক্ষিণ ফ্রান্সে দীর্ঘকাল মুসলমানদের অবস্থানের কারণে এটা অনুমান করা যায় যে, সিসিলীয় (ইতালীয়) ও প্রভাঁসাল (Provencal) ভাষাদুটিও হয়তো এককালে আরবি বর্ণমালায় লিখিত হতো। সুইজারল্যান্ডের ওপর আরব অধিকার জার্মান ভাষাকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল তা জানা যায় না।

আফ্রিকা মহাদেশের বার্বারি, হাবশি, নুবি, হাওসি, সাওয়াহিলি, মালাগাছি, সোমালি, ইরিত্রিয়ান ও গালা প্রভৃতি সাহিত্যভাষা আরবি বর্ণমালায় লিখিত হয়ে থাকে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়সমূহে বিশদ আলোচনা করা হবে, ইনশা' আল্লাহ।

আরবি বর্ণমালার উপর্যুক্ত প্রচার ও বিকাশ বলতে গেলে বিভিন্ন দেশে ইসলামের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের সাথে সমান পাল্লা দিয়ে চলেছিল। পশ্চাদপদ, অনুন্নত ও প্রগতিবিরোধী জাতি হিসেবে অমুসলিম জাতিসমূহের আরবি বর্ণমালার সাথে অপরিচিত

www.pathagar.com

থাকা অথবা এর সাথে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও তা বর্জন করা অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু মুসলমানগণ কর্তৃক তাদের ভাষায় আরবি বর্ণমালা পরিত্যক্ত হওয়ার[৬৭] কারণ সম্ভব এই ছিল যে, স্থানীয় ভাষায় লেখাপড়া করার প্রথা সংখ্যালঘু অমুসলিমদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে অনেক অধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল; বরং বলতে গেলে এটা তাদের একচেটিয়া অধিকারে পরিণত হয়েছিল। এককালে বাঙালি মুসলমানরা ফারসিকে এবং আলবেনীয় মুসলমানরা তুর্কি ভাষাকে প্রাধান্য দিত। অতঃপর যখন এ সকল দেশে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তন হয় এবং বিদেশি অমুসলিমদের চাপ ও প্রভাব পড়তে থাকে, তখন দেশীয় ভাষায় আরবি বর্ণমালার ব্যবহার সামান্য যা কিছু ছিল, তাও ধীরে ধীরে উঠে যায়। এর আধুনিকতম দুটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার জাভা প্রদেশে প্রচলিত জাভি ভাষা এবং তুরস্কে প্রচলিত তুর্কি ভাষা। জাভা প্রদেশে ওলন্দাজ সরকার দীর্ঘকাল ধরে সে দেশের ভাষায় ল্যাটিন বর্ণমালার ব্যবহারকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছে। অবশ্যই এতদ্‌সত্ত্বেও সেখানকার ভাষায় এখনও সম্ভবত প্রয়োজনে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ আরবি বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আজও প্রতিবেশী দেশ মালয়েশিয়ার মালয় ভাষায় আরবি লিপিই ব্যবহৃত হয়। তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের চেষ্টায় তুর্কি ভাষা ল্যাটিন বর্ণমালায় লিখিত হওয়ার প্রথা প্রবর্তিত হয় সত্যি; কিন্তু এর পরেও বলতে হয়, তুর্কি ভাষায় আরবি বর্ণমালার ব্যবহারের প্রবণতা বর্তমান তুরস্কের একটি অনস্বীকার্য বাস্তব সত্য হিসেবে বজায় রয়েছে। তুর্কি ভাষা আরবি বর্ণমালায় লেখা তুরস্কে আইনত নিষিদ্ধ। এ নিষেধাজ্ঞাই উক্ত বাস্তব সত্যের বহিঃপ্রকাশে এখন পর্যন্ত অন্তরায় সৃষ্টি করে রেখেছে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, রুশ প্রভাবের ফলে মধ্য এশিয়া ও ককেশাস প্রভৃতি অঞ্চলের তুর্কি মুসলমানদেরকে রোমান বর্ণমালায় নয়; বরং রুশ বর্ণমালায় তুর্কি ভাষা লিখতে বাধ্য করা হয়েছে। একই ভাষার জন্য দুটি বর্ণমালার (রোমান ও রুশ বর্ণমালা) এই টানাপোড়নের বিষয়টিকে মোটেই উপেক্ষা করা যায় না।

আরবি বর্ণমালার উপর্যুক্ত পশ্চাদপদতার আংশিক ক্ষতিপূরণের জন্য কোনো কোনো দেশে একটি ব্যবস্থা গৃহীত হতে দেখা যায়। অন্তত ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে নও-মুসলিম ইংরেজ ও নও-মুসলিম জার্মানদের মধ্যে এ আন্দোলন চলে আসছে (বর্তমানে অবশ্য এটা সীমাবদ্ধ আকারে চলছে) যে, তারা নির্দিষ্ট কতগুলো অর্থাৎ ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাদের স্ব-স্ব ভাষা আরবি বর্ণমালায় লিখবে এবং নিজেদেরকে এবং নিজেদের সন্তানদেরকে কুরআন মজিদ ও মুসলিম জাহানের অধিকতর নিকটবর্তী করবে।

বর্তমানে আরবি লিপিতে লিখিত ভাষাসমূহের বর্ণমালা নিয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনাও আরম্ভ হয়েছে। পর্যালোচনায় জানা গিয়েছে যে, আরবি বর্ণমালায় লিখিত হয়ে থাকে—এরূপ দুই বা ততোধিক ভাষায় একই ধ্বনির জন্য এদের এক একটিতে এক আকৃতির বর্ণ এবং অন্যটিতে অন্য আকৃতির বর্ণ ব্যবহৃত হয়। ১৯৪৯ খ্রি. থেকে পাকিস্তান আঞ্জুমানে তরক্কি-ই উর্দু নামক সমিতি এই আন্দোলন করে আসছে, যে সকল দেশের ভাষা আরবি বর্ণমালায় লিখিত হয়ে থাকে, এদেরকে 'মুতামির-ই রসমুল খত্ত ওয়া ইরাব' নামক একটি সংস্থার অধীনে একত্রিত করা হোক এবং উপর্যুক্ত রূপ ভাষাসমূহের বর্ণমালার মধ্যে বিদ্যমান অমিল ও বিভিন্নতা দূর করতে এদের মধ্যে বর্ণমালাগত ঐক্য স্থাপনের ব্যবস্থা করা হোক।[৬৮]

www.pathagar.com

বিভিন্ন আরবি লিখনশৈলী

আল-আকলামুস সিত্তাহ (Six Scripts)

কারসিভ বা গোলায়িত ধারার প্রধান ছয়টি লিপিকে আল-আকলামুস সিত্তাহ বলা হয়। এগুলো হলো : সুলুস, নাসখ, মুহাক্কক, রায়হানি, তাওকি ও রিকা।

এ ছয়টি লিপিকে সর্বপ্রথম নিয়মবদ্ধ করেন ইবনু মুকলা। তিনি একে সংশোধন, পরিমার্জন করে জটিল নিপুণ জ্যামিতিক এবং গাণিতিক পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করেন এবং বিজ্ঞানসম্মত ধারায় দাঁড় করান। এ ছয়টি লিপিরীতির অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধনের জন্য তাকে ক্যালিগ্রাফির গোলাকার ধারার প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। ইবনু মুকলার পরে ইবনুল বাওয়াব এ ছয়টি লিপিকে ইবনু মুকলার পদ্ধতি অনুসারে আরো উৎকর্ষ প্রদান করেন এবং ইয়াকুত আল-মুস্তাসিমি প্রভূত সৌন্দর্য প্রদান করেন। তাঁর অপূর্ব লেখনীর মাধ্যমে এবং বিশেষভাবে কলম কেটে ব্যবহারের জন্য এ ছয়টি লিপিতে অসাধারণ উন্নয়ন ঘটে। ধারণা করা হয় যে, তাঁর হাতেই এ লিপিগুলো পূর্ণতা লাভ করে।

সুলুস

এটি স্পষ্ট ও স্থূল প্রকৃতির একটি লিখনপদ্ধতি। একে 'সুলতানুল খুতুত' (লিপিসম্রাট) বা 'উম্মুল খুতুত' (লিপিসমূহের জননী) বলা হয়। নমনীয় ও সাবলীল গতি এ স্টাইলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ কথা অনস্বীকার্য যে, শুধু সুলুস লিপিই যদি অবশিষ্ট থাকত, তবু তা লিপিকলার ইতিহাসে সাংস্কৃতিক উচ্চাসনকে সমুন্নত রাখতে যথেষ্ট ছিল। এ কারণে লিপিকারগণ এ লিপিকে সর্বপ্রথম গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এর ছন্দময় গতি ও বর্ণের আকৃতিগত সৌন্দর্য অন্য সব লিপি থেকে একে পৃথক করেছে। এ লিপিটি আয়ত্ত করতে পারলে অন্য লিপিগুলো সহজে আয়ত্ত করা যায়।

'সুলুস' অর্থ এক-তৃতীয়াংশ। এ রীতিতে বর্ণের ঋজুদণ্ড গোলাকার অংশের এক-তৃতীয়াংশ হয়ে থাকে। কারো কারো মতে–এ রীতিতে বর্ণের চওড়া 'তুমার' লিখনপদ্ধতির বর্ণের চওড়ার এক-তৃতীয়াংশ হয়ে থাকে। অর্থাৎ তুমার লিপিতে আরবি বর্ণমালার প্রথম বর্ণ 'আলিফ'-এর বিস্তারকে পরিমাপের একক ধরা হয়, যা মোটামুটি ঘোড়ার ২৪টি পশমের বিস্তারের সমান। এ অনুপাতে সুলুস লিপিতে আলিফের বিস্তার তুমার লিপির আলিফের এক-তৃতীয়াংশ তথা ঘোড়ার ৮টি পশমের সমান (দ্র. চিত্র-৫)। এজন্য এ রীতিকে 'সুলুস' নামে অভিহিত করা হয়।[৬৯] তাছাড়া ইবনু মুকলার খত্তে মানসুবের নিয়ম অনুসারে আলিফের পরিমাপ হবে, যে কলমের মাধ্যমে আলিফটি করা হবে ঐ কলমের ছয়/সাতটি ফোঁটা বা নুকতা বরাবর লম্বা হবে এবং আলিফটির বিস্তার হবে কলমের নিবের অর্ধ নুকতা বরাবর। এ লিপিতে হরফসমূহের অগ্রভাগ সুচালো ও ইঙ্গিত বাঁকা হয়ে থাকে, যা কেবল কলমের কিনারা দিয়েই লেখা সম্ভব। তদুপরি হরফসমূহকে যতটুকু প্রসারিত করা হয়, তার চেয়ে সেগুলোকে গোলাকার রূপ দেওয়া হয় বেশি। শায়খ যায়নুদ্দীন শাবান আল-আসারি তাঁর আলফিয়্যার মধ্যে উল্লেখ করেছেন: এ লিপিতে আলিফ, জিম, হা, খা, তোওয়া, (পূর্ণ) কাফ এবং পৃথক লাম প্রভৃতি বর্ণের মাথায় আঁকশি বা কাঁটা থাকে। তদুপরি সোয়াদ, তোওয়া, যোওয়া, আইন, গাইন, ফা, ক্বাফ, মিম, হা, ওয়াও ও লাম-আলিফ প্রভৃতি বর্ণের মাঝের ফাঁসাকৃতিব খালি অংশগুলো ভরাট করা হয় না।

www.pathagar.com

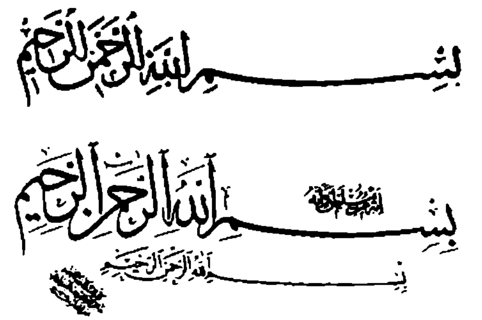

চিত্র-৫: সুলুস লিপিতে বিসমিল্লাহ

সুলুসের ঋজুদণ্ড ও গোলাকার রেখার পরিমাপ সাধারণত নাসখির মতো মনে হয়। অর্থাৎ উভয় রীতিতে আনুপাতিকভাবে বক্রাকৃতি ও গোলায়িত বর্ণ এক-তৃতীয়াংশ এবং লম্বদণ্ড ও ঋজুবর্ণ হয় দু-তৃতীয়াংশ। কিন্তু সুলুস রীতিতে বর্ণগুলো দৃঢ় ও স্থূল প্রকৃতির এবং নাসখিতে ক্ষীণ ও সরু হয়। এ ছাড়া সুলুস লিপিতে কখনো শব্দে ব্যবহৃত ঋজুদণ্ড ছোরার ন্যায় বক্রাকৃতি ধারণ করে এবং অক্ষরের বাঁক ও অনুভূমিক বাহু পানির তরঙ্গের ন্যায় প্রবহমান মনে হয়।[৭০]

সুলুস দুই প্রকার। এক. সকিল (স্থূল) ও দুই. খফিফ (হালকা)। সকিলে বর্ণের চওড়া ৮ অশ্বকেশ পরিমাণ; আর খফিফে বর্ণের চওড়া সামান্য কম।[৭১] শায়খ যায়নুদ্দীন আবদুর রহমান আস-সায়িগ সকিল ও খফিফের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো সকিলে খাড়া দণ্ডগুলো কলমের সাতটি নুকতার সমপরিমাণ হয়ে থাকে, আর খফিফে পাঁচটি নুকতার সমপরিমাণ হয়ে থাকে। এর চেয়ে কম পরিমাপের হলে তাকে 'লুলুয়ি' লিপিরীতি' নামে অভিহিত করা হয়।"[৭২] নিম্নে সুলুসে সকিলের রীতি অনুযায়ী আরবি বর্ণসমূহের একটি চিত্র (দ্র. চিত্র- ৬) উদ্ধৃত করা হলো।

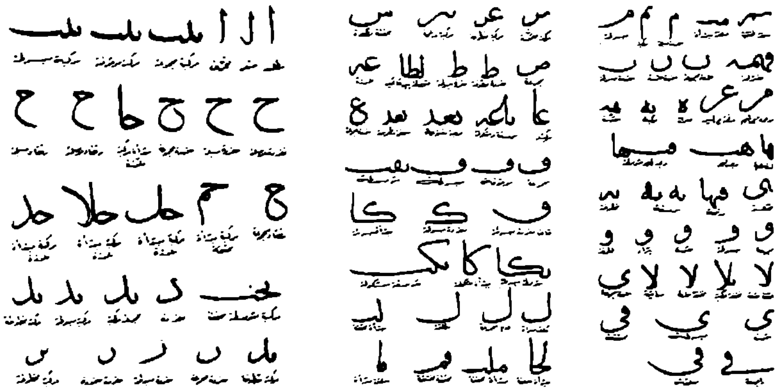

চিত্র-৬: সুলুস রীতিতে বর্ণসমূহের আকৃতি

www.pathagar.com

সুলুসে জলি

এটি সুলুস লিখনপদ্ধতির একটি প্রকরণ। এতে বর্ণসমূহ মূলরীতির তুলনায় অধিকতর বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট হয়ে থাকে। অটোমান সাম্রাজ্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে হাফিজ উসমান জলির গুণগত বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করে এর প্রভূত উন্নতি সাধন করেন।

খ্রিষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে সুলুস রীতির উদ্ভব হয়। উমাইয়া খলিফাগণের সক্রিয় সহযোগিতা, পৃষ্ঠপোষকতা এবং অকৃত্রিম আগ্রহ এ লিপির উন্নয়নে উলেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। কিন্তু উমাইয়া খিলাফতকালে ক্যালিগ্রাফির যে উন্নয়ন সাধিত হয় তার সঠিক ও তথ্যভিত্তিক প্রমাণ আমরা পাই না। কারণ আব্বাসীয় খলিফাগণের ধ্বংসাত্মকনীতির ফলে উমাইয়া যুগের সমস্ত কীর্তির প্রমাণাদি সরকারি কাগজপত্র ও রেকর্ডপত্র থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। যতটুকু প্রমাণ মেলে তাতে দেখা যায়, সুলুস লিপির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেন উমাইয়া আমলের প্রখ্যাত লিপিকার কুতবা আল-মুহাররির। তবে এর প্রকৃত উন্নয়ন শুরু হয় আব্বাসীয় আমল থেকে। ইতঃপূর্বেকার সুলুস লিপিতে কোনো ধরনের ছন্দময়তা দেখা যায় না। এ যুগের প্রথমদিকের লিপিকার ইসহাক ইবন হাম্মাদ সর্বপ্রথম সুলুস ও সুলুসাইন লিপিরীতি দুটিকে দৃষ্টিনন্দন ও শৈল্পিক মান আলোকোজ্জ্বল করেন এবং জনপ্রিয় ব্যবহারযোগ্য লিপিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর ইবনু মুকলাই প্রথম কারসিভ ধারায় জটিল নিপুণ জ্যামিতিক ও গাণিতিক পদ্ধতিতে একে বিন্যস্ত করেন এবং বিজ্ঞানসম্মত ধারায় এনে একে দাঁড় করান। তাঁর পরে ইবনুল বাওয়াব ইবনু মুকলার ধারার আরো উৎকর্ষ সাধন করেন। তিনি সুলুস লিপিকে নতুন সাজে সজ্জিত করেন এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন করেন। সর্বশেষ তা ইয়াকুতের হাতে পূর্ণতা লাভ করে। তিনি সুলুস লিপির যে স্বতন্ত্র ধারা উপস্থাপন করেন তাকে 'ইয়াকুতি ধারা' বলা হয়। তিনি একে কুরআন ও অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ লেখার উপযোগী করে গড়ে তোলেন। ক্রমে এটি ধর্মীয় গ্রন্থাবলি এবং কুরআনের অনুলিপি তৈরিতে এত বেশি ব্যবহৃত হতে থাকে যে, তা ধর্মীয় লিপির (Hieratic Script) মর্যাদা লাভ করে।[৭৩]

ফাতেমি ও সেলজুক আমলে সুলুস লিপির নিদর্শন মাগরিব, মিসর ও সিরিয়ায় দেখতে পাওয়া যায়। মামলুক সুলতানগণ একে আরো পরিশীলিত ও মার্জিত রূপ দান করেন। তাঁদের আমলে কাগজ, পাথর, টাইল্‌স, চামড়ার পার্চমেন্ট ও মেটাল প্রভৃতিতে এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়।

অটোমান তুর্কিরা সুলুস স্ক্রিপ্ট ব্যবহারে চমক দেখিয়েছে। বিখ্যাত অটোমান ক্যালিগ্রাফার আহমদ কারহিশারি বলতে গেলে সুলুস লিপিতে বিপ্লব ঘটান। এ লিপিতে তাঁর করা প্রচুর কাজের নিদর্শন আমরা দেখতে পাই।

১৬ শতকে ইস্তাম্বুলের হাজিয়া সোফিয়া মসজিদের গম্বুজের ভেতরের দিকে চার পাশে গোলাকৃতি করে সুলুস লিপিতে উৎকীর্ণ সুরা নুরের একটি আয়াত উসমানীয় খিলাফতের শেষ দিকের নিদর্শন হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্ববহ (দ্র. চিত্র-৭)।

www.pathagar.com

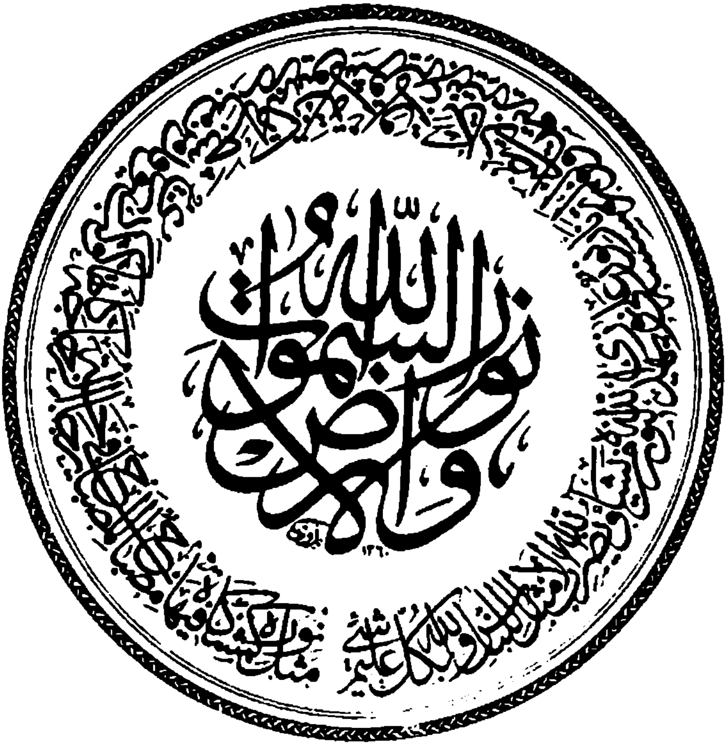

চিত্র-৭: ইস্তাম্বুলের হাজিয়া সোফিয়া মসজিদের গম্বুজের ভেতরে সুলুস লিপির ক্যালিগ্রাফি

গ্রানাডার আল-হামরায় আলংকারিক সুলুস লিপির একটি বিস্ময়কর নিদর্শন দেখা যায়। আন্দালুসিয়ান সুলুসের আরেকটি চমৎকার নিদর্শন হচ্ছে এই প্রাসাদের দেয়ালগাত্রে দুই জমজ রাজকন্যার স্মরণে চুনাবালির চমৎকার সুলুস লিপি বৃত্তাকারে উৎকীর্ণ করা হয়েছে।

ভারত উপমহাদেশসহ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলেও সুলুস লিপি প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। আফগানিস্তানের বল্‌খ প্রদেশের দৌলতাবাদে হজরত সালেহ্ মসজিদের মিনারের চারপাশে আলংকারিক সুলুস লিপিতে কুরআনের আয়াত উৎকীর্ণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় খান ওলজাইতু কর্তৃক নির্মিত ইস্পাহানে ফ্রাইডে মসজিদের মিহ্‌রাবে সুন্দর কুফি ও সুলুস লিপির সমন্বয় দেখা যায়। ১২২৬ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের কাশহানের মাইদান মসজিদে টাইলসে কুফি ও সুলুস লিপির চমৎকার নিদর্শন দেখা যায়। ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম ভাগে সুলতান নাসির উদ্দীনের নাম সম্বলিত একটি কাঁচের বাতিদানে চমৎকার সুলুস লিপিতে কুরআনের আয়াত লেখা হয়েছে, যা সিরিয়ার আলেপ্পোতে পাওয়া গিয়েছে।

www.pathagar.com

দৃষ্টিনন্দন ভারতীয় সুলুস লিপির চমৎকার উদাহরণ দিল্লির নিকটবর্তী বিখ্যাত ইসলামি বিজয়স্তম্ভ 'কুতুব মিনার'। এর দেয়াল গাত্রে অলংকৃত সুলুস ও কুফি লিপি উৎকীর্ণ হয়েছে। ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত এ মিনারের গায়ের সুলুস লিপির সাথে ফুলেল নকশাগুলো এক অপার্থিব ছন্দময়তা সৃষ্টি করেছে। এ ছাড়া দিল্লির কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের ইমারতগাত্রেও এর চমৎকার নিদর্শন বিদ্যমান।[৭৪] পূর্বভারতেও মুসলমানদের আগমনের সাথে সাথে এ লিপিরীতির বহুল ব্যবহার দেখা যায়। ৬৪০ হি./১২৪২ খ্রিষ্টাব্দে উৎকীর্ণ বিহারের বারী দরগাহের শিলালিপিটি এ অঞ্চলের দ্বিতীয় প্রাচীনতম আরবি শিলালিপি হিসেবে গণ্য। এটি একটি মাটির ফলকের ওপর বলিষ্ঠ সুলুস (সুলুসে জলি) রীতিতে লিপিবদ্ধ[৭৫] (দ্র.চিত্র-৮)।

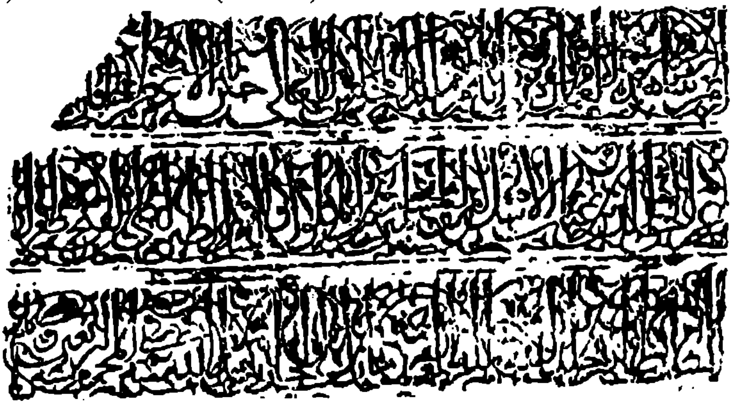

চিত্র-৮: সুলুসে জলি, বিহারের বারী দরগাহ, ১২৪২ খ্রিষ্টাব্দ

বাংলায়ও মোগল-পূর্ব-আমলে সুলুস রীতির অনেক এপিগ্রাফ (Epigraph) ও নিদর্শন পাওয়া যায়। এগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো—এর বর্ণগুলো অধিক বক্রাকার। অনেক ক্ষেত্রে এর ও নাসখি লিপির মধ্যে পার্থক্য করা দুরূহ হয়ে পড়ে। এজন্য অনেককে সুলুস রীতির নিদর্শনগুলোকে নাসখি রীতির নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করতে দেখা যায়। যেমন—শামসুদ্দীন আহমদ তাঁর *Inscription of Bengal* গ্রন্থে সুলুস রীতির একটি নিদর্শনও উল্লেখ করেননি। মোগল আমলেও বাংলা এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সুলুস রীতির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরবি ভাষার মূল বক্তব্য লেখার বেলায় নাসখির মতো সুলুস লিপিও অনুসরণ করা হতো। এ ছাড়া শিলালিপি উৎকীর্ণ করার কাজেও এর বহুল ব্যবহার ছিল। বাংলার সুলুস রীতির নিদর্শনাদির মধ্যে ১০৫৫হি./ ১৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দে উৎকীর্ণ ঢাকার বড়োকাটরার শিলালিপিটি অন্যতম। এটি অত্যন্ত ছন্দময় ও প্রাণবন্ত।[৭৬] এ ছাড়া সুলতান বারবাক শাহের শাসনামলে ঘিওরে প্রাপ্ত একটি কবরগাত্রের পাথরে কুফি ও সুলুস লিপির চমৎকার সমন্বয় লক্ষ করা যায়। সুলতান জালাল উদ্দীন ফাত্‌হ শাহের আমলে (১৪৮১-১৪৮৬ খ্রি.) উৎকীর্ণ শিলালিপিতে (দ্র. চিত্র-৯) ব্যবহৃত উল্লম্ব দণ্ড ও গোলাকার অক্ষরের আনুপাতিক প্রয়োগ বিবেচনা করে একে সুলুস রীতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

www.pathagar.com

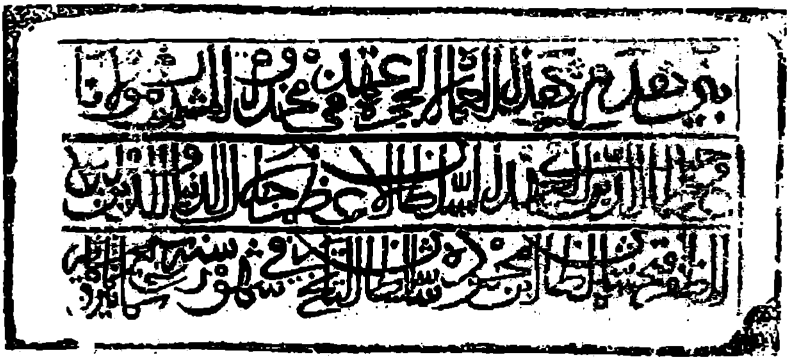

চিত্র-৯: সুলুস লিপি, সুলতান ফাত্হ শাহের আমলে (১৪৮১-১৪৮৬ খ্রি.)

দিনাজপুরের বালুরঘাট থানার সোনাডাঙ্গায়ও সুলুস লিপির একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। সম্ভবত ইলিয়াস শাহি আমলে (১৪৪২-১৪৬৮ খ্রি.) এটি উৎকীর্ণ করা হয়। এতে কৃষির ওপর কুরআনের আয়াত উৎকীর্ণ হয়েছে। রাজশাহীর সুলতানগঞ্জে সুলুস লিপিতে আয়াতুল কুরসি লেখা একটি পাথর পাওয়া যায়। পাবনার চাটমোহরে সম্রাট আকবরের শাসনামলে (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) মাসুম খান কাবুলি কর্তৃক একটি মসজিদ নির্মিত হয়। এর এপিগ্রাফে সুলুস লিপির চমৎকার নিদর্শন মেলে। অনুরূপভাবে রাজশাহীর কুমারপুর, রংপুরের উলিপুর ও মালদার জিলবাড়িতে সুলতানি ও মোগল আমলে উৎকীর্ণ সুলুস লিপির বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।[৭৭]

মোদ্দা কথা, সুলুস লিপি একটি গতিহীন স্মারকলিপি। এটা প্রধানত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ও উৎকীর্ণ লিপি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তদুপরি এ লিপি শিরোনাম, টাইটেল ও কলোফোনের জন্যও বর্তমানে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে সুলুস লিপিরীতিতে লিখিত পুরো কুরআন শরিফ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু এ লিপির অত্যাশ্চর্য নিদর্শন হিসেবে পরিপূর্ণভাবে বলিষ্ঠ সুলুস (সুলুসে জলি) রীতিতে লিখিত ও সম্পূর্ণ স্বর্ণখচিত কুরআনের সাতটি কপি ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে।[৭৮] স্বর্ণখচিত এ কপিগুলোর সূক্ষ্ম কারুকাজ ও লিপির ছন্দময় নিপুণ আঁচড় একে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা প্রদান করেছে। বর্তমানে ইরানে এ লিপি বিশেষভাবে মসজিদ, হোসেনিয়া (শিয়া মজহাবের মিলনকেন্দ্র) ও তাজিয়া (মুহাররমের শোকানুষ্ঠান কেন্দ্র)-গুলোতে ব্যবহৃত হয়।

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য ও ভারত উপমহাদেশ, এমনকি বাংলাদেশেও সুলুস লিপির ওপর কাজ চলছে। আহমদ মুস্তফা মধ্যপ্রাচ্যের একজন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার, যিনি সুলুস লিপির ওপর গবেষণা করেছেন। আমাদের দেশে প্রখ্যাত ক্যালিগ্রাফার আরিফুর রহমানের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তিনিও সুলুস লিপির চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সুলুসাইন

এটি এক প্রকার মোটা ও বলিষ্ঠ লিখনপদ্ধতি। খ্যাতনামা লিপিকার ইবরাহিম আস-সাজযি (মৃ. ৮২৫ হি.) এটি উদ্ভাবন করেন। পরবর্তীকালে এ রীতি থেকে 'সুলুস'

www.pathagar.com

লিখনপদ্ধতি উৎপত্তি লাভ করে। সুলুসাইন অর্থ দু-তৃতীয়াংশ। এ রীতিতে বর্ণের চওড়া 'তুমার' লিখনপদ্ধতির বর্ণের চওড়ার দু-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১৬ অশ্বকেশ পরিমাণ হয়ে থাকে। কারো মতে– এতে বর্ণের ঋজুদণ্ড গোলাকার অংশের তুলনায় দুই-তৃতীয়াংশ হয়ে থাকে। এজন্য এ রীতিকে 'সুলুসাইন' নামে অভিহিত করা হয়।[৭১] নিম্নের চিত্রে (দ্র. চিত্র-১০) সুলুসাইন রীতিতে লিখিত সুরা মার্‌ইয়ামের সূচনাটি দেখা যায়। এটি বর্তমানে বার্লিন জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

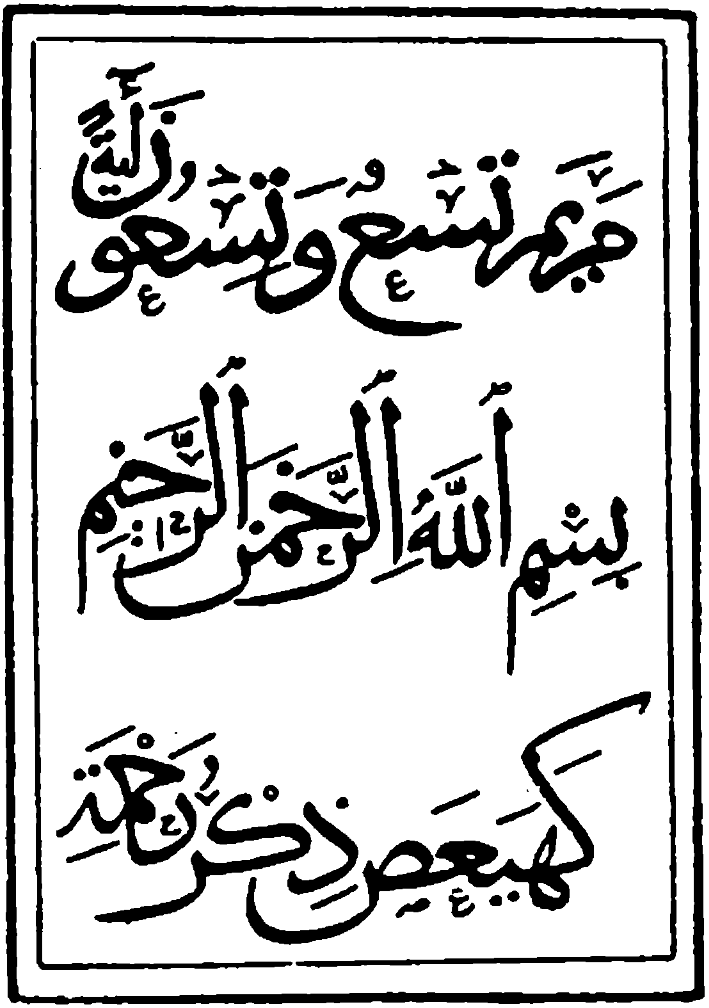

চিত্র-১০: সুলুসাইন লিপিরীতিতে লিখিত সুরা মার্‌ইয়ামের সূচনা

www.pathagar.com

তুমার

এটি সর্বাধিক মোটা ও বলিষ্ঠ লিখনপদ্ধতি। প্রখ্যাত লিপিকার কুতবা আল-মুহাররির উমাইয়া আমলে এটি উদ্ভাবন করেন। এতে বর্ণের প্রস্থ প্রায় ২৪ অশ্বকেশ পরিমাণ হয়ে থাকে। উমাইয়া যুগের খলিফাগণ সরকারি চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজে তাঁদের প্রতীক উৎকীর্ণ করার ক্ষেত্রে এই লিপিরীতি ব্যবহার করতেন।[৮০] প্রখ্যাত লিপিকার সুররামর্‌রি এ লিপির কতিপয় বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো–

ক. এ লিপির গোলাকৃতিসমূহ কলমের মুখাপাত দ্বারা, টানগুলো কলমের দাঁত দ্বারা এবং উল্লম্ব রেখাগুলো কলমের মুখাপাত দ্বারা ডান দিকে পাকানো অবস্থায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

খ. এ লিপিতে 'মিম' খোলা ও গোলাকৃতির হয় এবং 'ফা' ও 'ক্বাফের' মধ্যভাগ সুচালো এবং পার্শ্বদেশগুলো গোলাকৃতির হয়।

গ. বর্ণগুলোর মধ্যবর্তী শূন্যস্থানের পরিমাণ লাইনগুলোর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানের মতো হয়।

ঘ. কাগজের দুই দিকে সমান পরিমাপের অতিরিক্ত জায়গা থাকে।

ঙ. এ লিপিতে গোলাকৃতির সোয়াদ কিংবা খোঁড়ানো কাফ থাকে না।[৮১]

মাওলা যায়নুদ্দীন শাবান আল-আসারি তাঁর আলফিয়্যার মধ্যে উল্লেখ করেছেন, এ লিপিতে আলিফ, বা, জিম, দাল, রা, তোওয়া, (পূর্ণ) কাফ এবং লাম ও নুন (পৃথক অবস্থায় ও শুরুতে যুক্ত অবস্থায়) প্রভৃতি বর্ণের মাথায় আঁকশি বা কাঁটা থাকে। তদুপরি সোয়াদ, তোওয়া, ফা, ক্বাফ, হা, ওয়াও ও লাম-আলিফ প্রভৃতি বর্ণের মাঝের ফাঁসাকৃতির খালি অংশগুলো ভরাট করা হয় না।[৮২] নিম্নে প্রখ্যাত লিপিকার আলী আল-মানাশিরের লিখিত তুমার লিপির একটি লিপিচিত্র (দ্র. চিত্র-১১) দেখা যায়।

চিত্র-১১: তুমার লিপি

মুখতাসারুত তুমার

এটি তুমার লিখনপদ্ধতির একটি সংক্ষিপ্ত প্রকরণ। এতে বর্ণের প্রস্থ ২৪ থেকে ১৬ অশ্বকেশ পরিমাণের মাঝামাঝি হয়ে থাকে। এ লিপিতে বর্ণগুলোকে সুলুস রীতি অনুযায়ী সামান্য গোলাকার করে এবং মুহাক্কক রীতি অনুযায়ী বর্ণগুলোকে কিছুটা

www.pathagar.com

প্রসারিত করে লেখা যেতে পারে। তদুপরি বলিষ্ঠতা ও প্রসারণের দিক থেকে তুমার লিপির সাথে এর সম্পর্ক থাকায় তুমার লিপির মতো এতেও বিভিন্ন বর্ণের মাথায় আঁকশি বা কাঁটা থাকে এবং মাঝের ফাঁসাকৃতির খালি অংশগুলো ভরাট করা হয় না।[৮৩] নিম্নের চিত্রে (দ্র. চিত্র-১২) মুখতাসারুত তুমার লিপির একটি নমুনা দেখা যায়।

চিত্র-১২: মুখতাসারুত তুমার লিপি

নিসফ

এটিও এক ধরনের মোটা ও বলিষ্ঠ লিখনপদ্ধতি। 'নিসফ' অর্থ অর্ধেক। এ রীতিতে বর্ণের চওড়া 'তুমার' লিখনপদ্ধতির বর্ণের চওড়ার অর্ধেক অর্থাৎ ১২ অশ্বকেশ পরিমাণ হয়ে থাকে। কারো কারো মতে, এতে বর্ণের ঋজুদণ্ড গোলাকার অংশের অর্ধেক হয়ে থাকে। এজন্য এ রীতিকে 'নিসফ' নামে অভিহিত করা হয়।

মুহাক্কক

মুহাক্কক শব্দের অর্থ হচ্ছে নির্ভুলভাবে উৎপন্ন। নাস্‌খ ও সুলুসের শৈল্পিক গুণাবলির সমন্বয়ে 'মুহাক্কক' লিপিশৈলীর জন্ম হয়। উমাইয়া যুগের প্রখ্যাত লিপিকার কুতবা আল-মুহাররির এ লিপিরীতি উদ্ভাবন করেন এবং ইবনু মুকলা, ইবনুল বওয়াব ও ইয়াকুত আল-মুস্তাসিমি প্রমুখ লিপিকার এর উৎকর্ষ সাধন করেন। তবে ইয়াকুত আল-মুস্তাসিমির হাতেই এটি সর্বাধিক সুষমামণ্ডিত রূপ লাভ করে।[৮৪] মুহাক্কক একটি আলংকারিক রীতি। এ লিখনপদ্ধতিতে অক্ষরগুলো সহসা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অগ্র এবং শেষাংশ এক বা একাধিক সুতার মতো মনে হয়। অপরাপর আলংকারিক লিখনরীতির মতো লিপিকলার ইতিহাসে এটি খুব বিরল এবং কোনো বৈপরীত্য ও অভিনবত্ব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়।[৮৫] এ রীতিতে ঋজুদণ্ড এবং বক্রাকৃতি রেখা ও অনুভূমিক বাহুর আনুপাতিক ব্যবহার হবে যথাক্রমে তিন-চতুর্থাংশ ও এক-চতুর্থাংশ। এর বর্ণসমূহ মোটা এবং বলিষ্ঠভাবে লিপিকৃত হয়। এর উল্লম্ব রেখা একটু বেশি লম্বা এবং বক্র উপলাইনগুলো নমনীয় বক্রতায় লম্বাভাবে প্রসারিত হয়েছে, ঠিক যেন প্রবাহের মতো।[৮৬] খাড়া এবং বক্রাকার রেখার অনুপাতে 'মুহাক্ককের' সাথে 'রায়হানের' সাদৃশ্য রয়েছে; কিন্তু 'রায়হান' অপেক্ষা এর অক্ষরগুলো স্থূল ও সুদৃঢ়। এ ছাড়া অন্য যে পার্থক্য রয়েছে তা হলো মুহাক্ককের রেখাগুলো খুব কমই বাঁকানো থাকে এবং সমান্তরাল রেখাগুলো সূচাগ্র হয় না।[৮৭] উল্লম্ব রেখার মাথায় আঁকশি বা কাঁটা থাকা, হরফের মধ্যবর্তী ফাঁস আকৃতির খালি জায়গা ভরাট করা এবং পুরো লেখাটি গোলাকৃতি হওয়া প্রভৃতি দিক দিয়ে এর সাথে সুলুসের সাদৃশ্য রয়েছে।

www.pathagar.com

খ্রি. ১১-১৫শ শতাব্দীতে এ লিপিতে প্রচুর কুরআনের কপি করা হয়েছে। এজন্য একে মাসাহিফ বা কুরআনের লিপিও বলা হয়। প্রখ্যাত লিপিকার ইয়াকুতের লিখিত কুরআনের কয়েকটি পৃষ্ঠা ইস্তাম্বুলের সি ভাণ্ডারে সংরক্ষিত রয়েছে (দ্র. চিত্র-১৩)। ১৩০৪ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে ইয়াকুত আল-মুস্তাসিমির ছাত্র আহমদ আস-সোহরাওয়ার্দি কুরআনের একটি আয়াত মুহাক্কক লিখনরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করেন। এর ব্যাকগ্রাউণ্ড চমৎকার ফুলেল নকশায় সমৃদ্ধ (দ্র. চিত্র-১৪)। খ্রিষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর পর এ লিপি ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যায়।

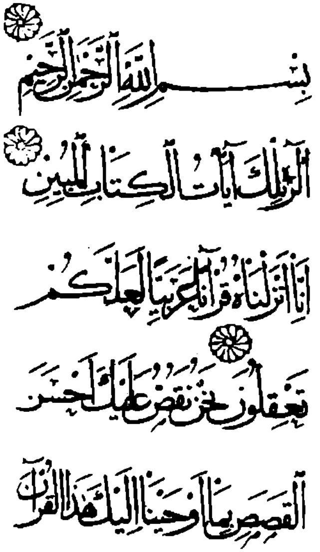

চিত্র-১৩: মুহাক্কক লিপি, ইয়াকূত আল-মুস্তাসিমি

চিত্র-১৪: মুহাক্কক লিপি, আহমদ আস-সোহরাওয়ার্দি

www.pathagar.com

রিকা

এটি আরবি লিপিকলার একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লিপিশৈলী। এটি মূলত 'নাসখ' লিপিরীতির একটি আলংকারিক প্রকরণ। ইবনু মুকলা এটি নাসখ লিপিশৈলী থেকে উদ্ভাবন করেন। রিকা রুক'আ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ কাগজের ছোট টুকরো। চিঠিপত্র প্রায়শ টুকরো কাগজে লেখা হয় বলে রুক'আকে চিঠিপত্র অর্থেও ব্যবহার করা হয়। এর রেখাগুলো সর্পিল। সর্পের মতো লীলায়িত ভঙ্গিতে অথবা জলধারার তরঙ্গের মতো সাবলীল ছন্দে প্রসারিত। আক্ষরিক বিন্যাসের দিক দিয়ে সুলুসের সাথে রিকার সাদৃশ্য থাকলেও এর বর্ণগুলো অধিকতর ক্ষীণ ও সরু এবং বক্ররেখাগুলো অধিকতর গোলাকার। তদুপরি এর সমান্তরাল এবং খাড়া অক্ষরগুলো একে অন্যের সাথে বিজড়িত। এতে আলিফসহ অন্যান্য বর্ণের উল্লম্ব রেখার মাথায় আঁকশি বা কাঁটা থাকে না। মাঝের ফাঁসাকৃতি অংশগুলো ভরাট হয়ে থাকে। এ লিপিতে শব্দের শেষ হরফকে পরের শব্দের হরফের সাথে মেলানোর বিষয়টি উল্লেখযোগ্য।[৮৮] নিম্নের চিত্রে রিকা রীতিতে বিসমিল্লাহির...-এর লিপিচিত্র দেখা যায় (দ্র.চিত্র-১৫)। এতে লক্ষ করা যায় যে, আল্লাহর আলিফকে বিসমের 'মিমের' সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। অথচ তা অন্যান্য লিপিরীতিতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।

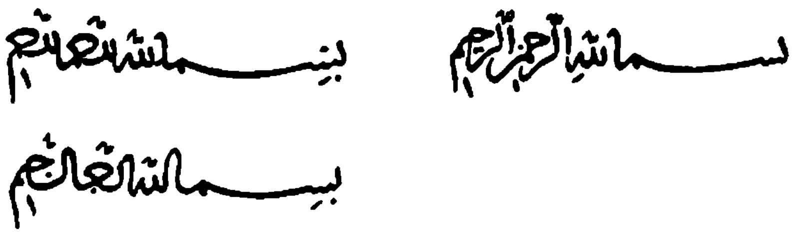

চিত্র-১৫: রিকা রীতিতে বিসমিল্লাহ

চিত্র– (উপরে বামে): এতে 'রা' -কে পরবর্তী বর্ণের সাথে যুক্ত করা হয়েছে এবং রহমান ও রহীমের 'হা'-কে পরিবর্তন করা হয়েছে।

চিত্র– (উপরে ডানে) এতে 'রা' -কে পরবর্তী বর্ণের সাথে যুক্ত করা হয়েছে; তবে রহমান ও রহীমের 'হা'র আকৃতি অনেকটা রক্ষা করা হয়েছে।

চিত্র– (নিচে) : এতে আলিফকে উপরের দিকে জড়িয়ে লেখা হয়েছে।

এই লিপিশৈলী টানা লেখার জন্য উপযোগী বলে এটি ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ও কার্যাদিতে লেখার জন্য অধিক ব্যবহৃত হয়। এজন্যই একে রিকা নামে অভিহিত করা হয়। অটোমান তুর্কিদের আমলে রুক'আ নামে অন্য একটি লিপিপদ্ধতির প্রচলন হয়। অনেকেই এ রীতিকে রিকা'আর একটি প্রকরণ মনে করেন।[৮৯] কিন্তু এ মত সঠিক নয়। কারণ, এটি তুর্কি সুলতান আবদুল মজিদ খানের আমলে (১৮৩৯-১৮৬১ খ্রি.) আবু বকর মমতাজ বেগ ইবনু মুস্তফা আফিন্দি সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে একই ধরনের লিখনরীতি প্রচলনের উদ্দেশ্যে ১২৮০ হিজরিতে উদ্ভাবন করেন। এর সাথে পূর্বোক্ত রিকার কোনো সম্পর্ক নেই। এই রুক'আ লিপিতে বর্ণগুলো অতি ছোট ও সহজ হয়

www.pathagar.com

এবং এ রীতিতে লেখার কাজ দ্রুত সমাধা করা যায়[১০] (দ্র. চিত্র-১৬)। দ্রুত লিখনের জন্য বিশেষ উপযোগী বলে এটি আরব বিশ্বে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। বর্তমানে যেখানে মুদ্রণ যন্ত্রগুলোতে নাসখি বর্ণগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে, সেখানে হস্তলিখনের ক্ষেত্রে সর্বত্রই এই রুক'আ লিপি বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করে আসছে।

রিকা ভারত ও বাংলায় ব্যবহৃত আরবি লিপিরীতিসমূহের মধ্যে অন্যতম। এখানকার কয়েকটি প্রাথমিক শিলালিপির মধ্যে এর নিদর্শন পাওয়া যায়। তন্মধ্যে গুজরাটের কেম্বাইয়ে· প্রাপ্ত শিলালিপিগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলোর অধিকাংশই হিজরি ৭ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে উৎকীর্ণ করা হয়। এ ছাড়া দক্ষিণ ভারতের কৈরালা অঞ্চলেও এ রীতির বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। তন্মধ্যে হি. ৭০৭/ খ্রি. ১৩০৭ -এ উৎকীর্ণ কাসরে হাতিমের শিলালিপিটি অন্যতম। এটি বর্তমানে বিহারের বিহার শরিফ নগরীতে বিদ্যমান। এ শিলালিপির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো— এর সমস্ত বর্ণ ধারাবাহিক ও সুশৃঙ্খলভাবে পরস্পর জড়িত। এজন্য এ লিপিকে 'رقاع متسلسل' (সুশৃঙ্খলিত রিকা) নামে আখ্যায়িত করা হয়।[১১] উল্লেখ্য, ভারতে মুসলিম শাসনের প্রথম ও মধ্যম ভাগে বাংলা ও বিহার রাজ্যে এ রীতির বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহের আমলে (১৪১৪-১৪৩২ খ্রি.) উৎকীর্ণ শিলালিপি (দ্র. চিত্র-১৭)-এর কথা উল্লেখ করা যায়। এতে ব্যবহৃত উল্লম্ব দণ্ড ও গোলাকার বর্ণের আনুপাতিক পরিমাণ বিচার করে একে রিকা লিখনপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু মোগলদের আগমনের পরে বাংলা ও ভারতের অন্যান্য বিভিন্ন রাজ্যে এর ব্যবহার ক্রমশ হ্রাস পায়। মোগল আমলে এ রীতিতে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি পাওয়া যায়। এটি রাজশাহীর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

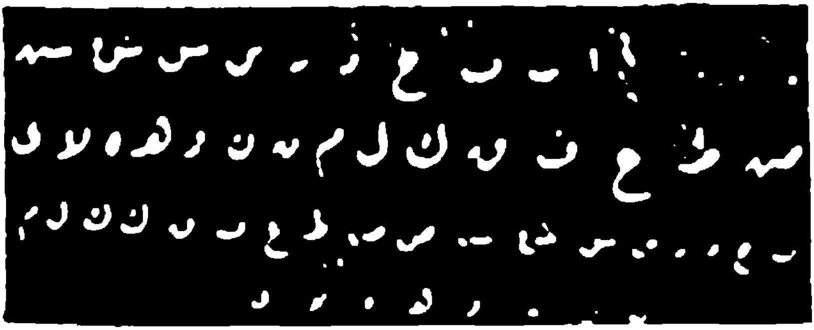

চিত্র-১৬: রুক'আ লিপির বর্ণমালা

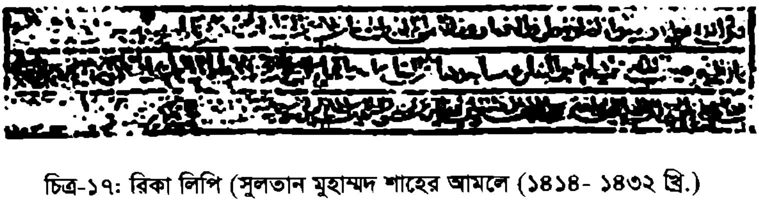

চিত্র-১৭: রিকা লিপি (সুলতান মুহাম্মদ শাহের আমলে (১৪১৪- ১৪৩২ খ্রি.)

www.pathagar.com

তাওকি (ইজাযা)

তাওকি গোলাকার লিপির একটি প্রকরণ। ইবনু মুকলা এটি উদ্ভাবন করেন। তবে কারো মতে—ইবনু মুকলার পূর্বে ইউসুফ আস-সাজযিই (মৃত্যু ৮২৫ হি.) সর্বপ্রথম এটি আবিষ্কার করেন। এ লিপিকে 'রিয়াসি'ও বলা হয়। উজির ফদল ইবনু হারুন তাঁর এ লিপি দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং একে সমস্ত সরকারি দপ্তরের লিপি হিসেবে ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তিনি এর নাম রাখেন 'রিয়াসি'।[৯২]

তাওকি লিপিটি মূলত স্বাক্ষর করার কাজে ব্যবহৃত হতো। তাওকি অর্থ স্বাক্ষর। আব্বাসীয় খলিফা ও কাজিগণ দলিল-দস্তাবেজ স্বাক্ষর করার বেলায় এই লিপিরীতি ব্যবহার করতেন। এজন্যই এটি তাওকি নামে পরিচিত হয়।[৯৩] একে 'ইজাযা'ও বলা হয়। ইজাযা অর্থ অনুমোদন। খলিফা ও কাজিগণ এই রীতিতে স্বাক্ষরদানের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের অনুমোদন করে থাকতেন বলে একে এ নামেও অভিহিত করা হতো। দলিল-দস্তাবেজ অনুমোদনের ক্ষেত্রে স্বাক্ষর করার বেলায় এই লিপিরীতি ব্যবহার করতেন। এ রীতিতে আনুপাতিক হারে সরল ও ঋজুদণ্ডের ব্যবহার হবে শব্দ সমষ্টির এক-চতুর্থাংশ এবং গোলাকার বর্ণ ও অনুভূমিক বাহুর ব্যবহার তিন-চতুর্থাংশ হয়ে থাকে। সুলুসের সাথে এর মৌলিক নীতিমালার সাদৃশ্য রয়েছে। তবে এর বর্ণগুলো সুলুসের চাইতে অপেক্ষাকৃত একটু বড়ো ও গোলাকার হয়ে থাকে এবং হরফের অগ্রভাগসমূহও তার চাইতে অধিকতর গোলাকৃতির হয়ে থাকে। তাছাড়া এতে কোনো কোনো হরফের খাড়া মাথা বাদ দিয়েও লেখা সম্ভব। মধ্যবর্তী আইন, ফা, ক্বাফ, মিম, ওয়াও এবং লাম-আলিফ প্রভৃতি বর্ণের গিঁটসমূহ উন্মুক্ত রেখে কিংবা বিলুপ্ত করেও লেখার ইখতিয়ার রয়েছে।[৯৪] নিম্নে পাশাপাশি সুলুস ও তাওকির কয়েকটি হরফের আকৃতি উল্লেখ করা হয়েছে। এতে প্রথমে সুলুস, পরে তাওকির হরফসমূহ লেখা হয়েছে। (দ্র. চিত্র-১৮)

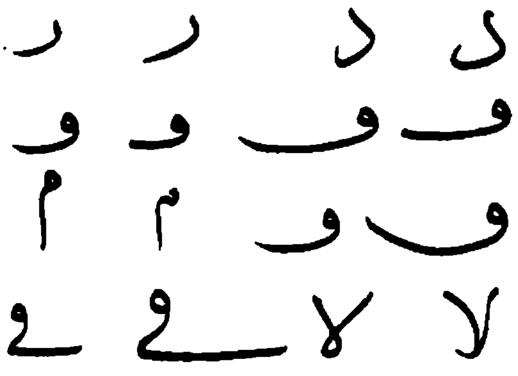

চিত্র-১৮, সুলুস ও তাওকি লিপিদ্বয়ের মধ্যে তুলনা

এর খাড়া দণ্ডগুলো রিকার দণ্ড অপেক্ষা প্রলম্বিত। অক্ষরগুলো পরস্পরের সাথে জড়িত, সমন্বিত এবং সুষমভাবে লিপিকৃত। রিকার চেয়ে তাওকির রেখাগুলো

অধিকতর মোটা এবং বক্ররেখাগুলো দীর্ঘায়িত না হয়ে স্বল্প গোলাকার (দ্র. চিত্র-১৯ ও ২০)। বর্তমানে অলংকৃত লিপি হিসেবে এটি বই-পত্রের টাইটেল পেজ, প্রচ্ছদ প্রভৃতিতে স্বল্পমাত্রায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

চিত্র-১৯: তাওকি লিপিতে বিসমিল্লাহ

চিত্র-২০: তাওকি লিপি

তাওকির লিপির একটি চমৎকার নিদর্শন রাজশাহীর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। এটি হি. ৭২২/ খ্রি. ১৩২২ সালে উৎকীর্ণ। এর অভিনব লিখন কৌশল দ্বারা বোঝা যায় যে, এ কোনো সুদক্ষ শিল্পীর নিপুণ কীর্তি। এতে বর্ণগুলো পরপর সংযুক্ত এবং কোনো ধরনের নুকতা ও হরকত এতে নেই। এর বর্ণগুলো পরপর জড়ানো ও শৃঙ্খলিত বিধায় এ শিলার লিপিকে التوقيع المتشابك (পরস্পর জড়ানো তাওকি) নামে অভিহিত করা হয়[১৫] (দ্র. চিত্র-২১)।

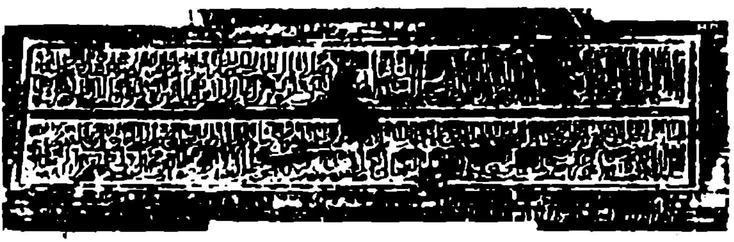

চিত্র-২১: পরস্পর জড়ানো তাওকি

www.pathagar.com

রায়হানি

এটিও নাসখ লিপিরীতির একটি প্রকরণ। এতে নাসখের পাশাপাশি মুহাক্কক ও সুলুসেরও প্রভাব দেখা যায়। খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীতে এই লিপিরীতি আলী ইবন উবায়দা আর-রায়হানি কর্তৃক আবিষ্কৃত হয় এবং উদ্ভাবকের নাম থেকেই এই লিপির নামকরণ হয়েছে।[৯৬] কারো মতে— রায়হান অর্থ তুলসী গাছ। এ লিপিতে বর্ণসমূহ (বিশেষ করে আলিফ ও লামসমূহ) -কে ধারাবাহিকভাবে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে এভাবে পরস্পর জড়ানো হয়, যাতে তা দেখতে তুলসী গাছের বিভিন্নভাবে জড়ানো ডালপালার মতো মনে হয়। এ কারণে এ লিপিকে 'রায়হানি লিপি' নামে অভিহিত করা হয়।[৯৭]

এ লিপিরীতির উপলাইনগুলো নাসখের মতো, উল্লম্ব রেখাগুলো সুলুস এবং বক্র ঢালগুলো মুহাক্কক লিপির মতো। এর সাথে হরকতগুলো আলাদা চিকন কলমে দেওয়া হয়।[৯৮] এর খাড়া সরল রেখাগুলো জড়ানোভাবে শেষ হয় এবং কচিৎ বক্রাকার বা ফাঁসের মতো দেখায় না। এই রীতিতে বর্ণগুলোর মধ্যভাগ মোটা থাকে এবং নিম্নভাগ ক্রমশ সরু হয়ে শেষ হয়। কখনো সেগুলো উল্লম্ব দণ্ডের মতো হলেও বামে সামান্য হেলানো থাকে।[৯৯]

বিশাল আকৃতির কুরআন শরিফের অনুলিপি প্রস্তুতে 'রায়হানি' লিপির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। পারস্যে ইলখানি রাজত্বে এই লিপিতে কুরআন লিপিবদ্ধ করা হয়। যেমন—আলহামদানির লিপিকলা। চৌদ্দ শতকে মামলুক সুলতান বারকুক ও তাঁর পুত্র সুলতান ফারাজ কায়রোর একটি মসজিদে রায়হানি লিপির কুরআন শরিফের কপি উপহার পাঠান (দ্র. চিত্র-২২)। এ লিপিরীতি আর-রায়হানির হাতে উদ্ভাবিত হলেও ইয়াকুতের হাতে সুষমামণ্ডিত রূপ লাভ করে।

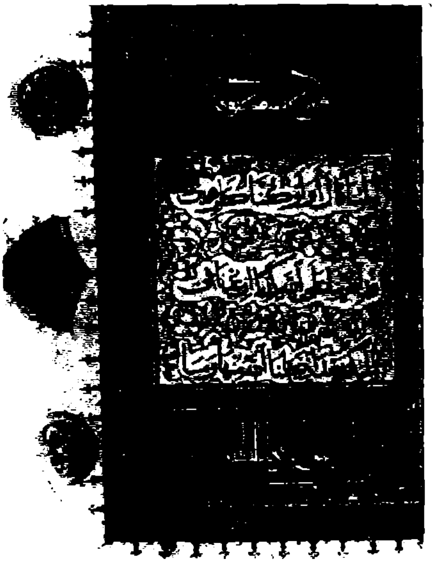

চিত্র-২২, রায়হানি লিপি

www.pathagar.com

নাসখ

'নাসখ' আরবি লিপিকলার একটি প্রাচীনতম লিপিশৈলী। 'নাসখ' অর্থ লেখা, অনুলিপি (Transcription)। কাতিবগণ চিঠিপত্র ও গ্রন্থাদি, বিশেষ করে পবিত্র মুসহাফের লিখন ও অনুলিপি তৈরির ক্ষেত্রে এ লিপির ওপর নির্ভর করত বলে একে 'নাসখ' নামে অভিহিত করা হয়। এ লিপিতে বর্ণের উল্লম্ব ও লম্বদণ্ড এবং অনুভূমিক বাহু এভাবে ঢালু করে উপস্থাপন করা হয় যে, এতে কোনোরূপ কোণ সৃষ্টি না হয়ে বর্ণ ও পুরো লেখাটি গোলাকার ও বক্রাকার রূপ ধারণ করে। তদুপরি এ লিপির অনুভূমিক রেখা ও উল্লম্ব রেখাগুলো সামনে-পেছনে মধ্যে সর্বত্র সমান। এর উল্লম্ব ও অনুভূমিক বক্রতাও গভীর ও সমান্তরাল। আর এর শব্দগুলো পরস্পর সুন্দরভাবে ফাঁক ফাঁক করে বিন্যস্ত। এটি নাবাতিদের গোলাকার লিখনপদ্ধতি (Cursive Script) থেকে উদ্ভূত। জাহিলি যুগে সিরিয়ার সাথে আরবের বাণিজ্যিক যোগাযোগের সময় আরবরা পথিমধ্যে অবস্থিত হুরান নগরীর নাবাতিদের নিকট থেকে এর শিক্ষা অর্জন করে।[১০০] জাহিলি ও ইসলামের প্রাথমিক যুগে এটি কুফি শৈলীর পাশাপাশি সমানভাবে প্রচলিত ছিল। কুরআনের অনুলিপি প্রণয়ন এবং মুদ্রা ও শিলালিপি উৎকীর্ণ করার কাজে কুফি শৈলী ব্যবহার করা হতো।[১০১] রাষ্ট্রীয় রেজিস্টার ও পত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রেও নাসখি শৈলী ব্যবহার করা হতো। হিজরি ৪র্থ/ খ্রি. ১০ম শতাব্দী পর্যন্ত কুফি লিপির প্রভূত বিকাশ সাধিত হয় এবং তা মুসলিম জগতের একচেটিয়া লিপিরীতি হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এর পর আরো দুই শতাব্দী পর্যন্ত তা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু হিজরি ৫ম/ খ্রিষ্টীয় ১১শ শতাব্দী থেকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে লেখার পরিধির অধিক বিস্তৃতি এবং অতি দ্রুত লেখার কাজ সমাধা করার জন্য কুফির অনুপযোগিতার কারণে নাসখি পদ্ধতি কুফি শৈলীর স্থান দখল করে নেয় এবং ক্রমশ এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১০২]

সর্বপ্রথম আবু আলী মুহাম্মদ ইবনু মুকলা হিজরি ৪র্থ শতাব্দীর শুরুতে এ লিপিপদ্ধতির উত্তরণে সর্বাধিক অবদান রাখেন। তিনি এর বিভিন্ন রীতি সংশোধন করে কুরআনের অনুলিপি, ধর্মীয় গ্রন্থাদি ও সরকারি রেজিস্টার প্রভৃতিতে এর ব্যবহার শুরু করেন। তিনি একে জটিল-নিপুণ জ্যামিতিক এবং গাণিতিক পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করেন এবং একে বিজ্ঞানসম্মত ধারায় এনে দাঁড় করান (দ্র. চিত্র-২৩)। নাসখি লিপির অভূতপূর্ব উন্নয়নে তাঁর এ অসামান্য অবদানের জন্য কেউ কেউ তাঁকে এ লিপিরীতির প্রতিষ্ঠাতা বলে উল্লেখ করেছেন।[১০৩] তিনি বৃত্ত ও বিন্দুকে লেখার মূলসূত্র হিসেবে ধরে নাসখি থেকে আরো পাঁচটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এগুলো হলো: সুলুস, মুহাক্কক, রায়হানি, তাওকি ও রিকা। নাসখিসহ এগুলো এক সাথে 'আকলামুস সিত্তা' (Six Scripts) নামে পরিচিত।[১০৪] ইবনু মুকলার পর ইবনুল বাওয়াব ইবনু মুকলার ধারাকে আরো উৎকর্ষ সাধন করেন এবং ইয়াকুত আল-মুস্তাসিমি এ লিপিরীতির আরো প্রভূত সৌন্দর্য দান করেন। তাঁর অপূর্ব লিখনীর ফলে লেখার গোলাকার ধারাটি অতি সাবলীল ও সহজসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। ধারণা করা হয় যে, এ লিপির উন্নয়ন তাঁর হাতের ছোঁয়ায় পূর্ণতা লাভ করে।

www.pathagar.com

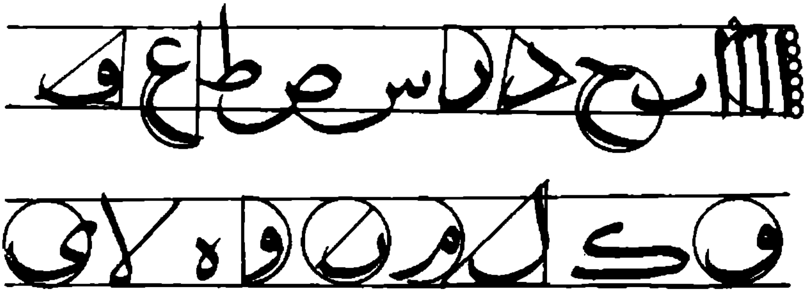

চিত্র-২৩: বর্ণের জ্যামিতিক বিন্যাস

নাসখি লিপির অধিকাংশ নিদর্শন পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সময়ের কপিগুলোতে দেখা যায়। খ্রিষ্টীয় ১৬ শতাব্দীর শেখ হামিদুল্লাহ আমাসি ছিলেন উসমানীয় লিপিকারদের মধ্যে একজন বিখ্যাত লিপিশিল্পী। তাঁর লিখিত নাসখি লিপির একটি কপি তুরস্কের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে। মামলুক সুলতান কুতুব উদ্দীন আইবেকের (১২০৬-১২১০ খ্রিষ্টীয়) আমলে ভারতে নাসখি লিপিরীতির ব্যবহার শুরু হয়। এর পূর্বে এটি আফগানিস্তান ও খোরাসানে বিস্তার লাভ করেছিল। আফগানিস্তানে গজনি সুলতানদের রাজধানী গজনিতে নাসখি লিপির কয়েকটি শিলালিপিও পাওয়া যায়। এগুলোতে সুলতান (৩য়) মাসউদের নাম উৎকীর্ণ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, আফগানিস্তান ও খোরাসান অঞ্চল থেকে মুসলিম সৈনিকগণ ভারত বিজয়ের জন্য আগমন করেছিলেন। এ সূত্রে এ লিপিশৈলী উপর্যুক্ত অঞ্চল থেকে ভারতবর্ষে প্রসার লাভ করে। কিন্তু এখানে এর একচ্ছত্র ব্যবহার শুরু হয় দিল্লির সুলতানি আমলে খ্রি. ১৩ শতাব্দীর প্রথমভাগে। তখন থেকে এটি দৈনন্দিন কাজ-কারবার এবং সরকারি বিধি-বিধান ও সিদ্ধান্তাবলি, পাণ্ডুলিপি, পাঠ্যগ্রন্থ ও মুদ্রাগাত্রে লিপিবদ্ধকরণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

বাংলায়ও মুসলিম শাসনের শুরু থেকে নাসখি লিপির ব্যবহার শুরু হয়। বীরভূম জেলার ভাওয়ালপুরের একটি কবরগাত্রে প্রাপ্ত ৬১৮ হি./১২২১ খ্রিষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপিটি বাংলায় নাসখি লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। লিপিটি বহুলাংশে নাসখি লিপির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কোনো কোনো বর্ণের ক্ষেত্রে 'সুলুস' ও 'রিকা' লিপিরীতির সাথেও এর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।[১০৫] পরবর্তীকালে এ লিপিশৈলী বাংলায় এতই প্রসার লাভ করে যে, শিলালিপি উৎকীর্ণকরণ, পাণ্ডুলিপি তৈরি, পাঠ্যপুস্তক লিপিবদ্ধকরণ ও দৈনন্দিন কাজে এর ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করে।

বাংলায় স্বাধীন সুলতানি আমলে (১৩৩৫-১৫৩৫ খ্রি.) নাসখি রীতিতে লিখিত অনেক পাণ্ডুলিপি আজও বিভিন্ন জাদুঘর ও লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে।[১০৬] তন্মধ্যে *ফরহাংগে ইবরাহিমি* নামক একটি ফারসি অভিধানের পাণ্ডুলিপি অন্যতম। এটি 'শরফনামা' নামে পরিচিত। এর লেখক ইব্রাহিম কাওয়ান ফারুকি। তিনি বাংলার সুলতান রুকনুদ্দীন ওয়াদ্দুনিয়া বারবাক শাহের আমলে (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রি.) এটি লেখেন। বানকিপুরের খোদাবখশ ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরিতে আরবি ও ফারসি পাণ্ডুলিপিসমূহের

www.pathagar.com

তালিকায় তিন খণ্ডে বুখারি শরিফের একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। এটি বাংলার সুলতান হুসায়ন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) মুহাম্মদ ইবন ইয়াযদান বখশ একডালা দুর্গে লিপিবদ্ধ করেন।[১০৭] এ সকল পাণ্ডুলিপি নাসখি লিপিরীতি অনুসারে লিখিত। এ ছাড়া তখনকার সময়ে বাংলায় বিভিন্ন রঙের সমন্বয়ে সুসজ্জিত ও অলংকৃত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিও তৈরি করা হয়। এ ক্ষেত্রে বাংলা সেসময়ে অনেক খ্যাতিও অর্জন করেছিল। এ ধরনের পাণ্ডুলিপিসমূহের মধ্যে বর্তমানেও কয়েকটি অবশিষ্ট রয়েছে। তন্মধ্যে সুলতান নুসরত শাহের আমলে (১৫১৯- ১৫৩২ খ্রি.) ফারসি ভাষায় লিখিত *সিকান্দর নামার* পাণ্ডুলিপিটি[১০৮] উল্লেখযোগ্য। এটি এ জাতীয় পাণ্ডুলিপিসমূহের মধ্যে একটি অতি চমৎকার নিদর্শন। লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এটি সংরক্ষিত রয়েছে। এতে একটি কাল্পনিক কাহিনিকে সুন্দরভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। এ কাহিনির মূল নায়ক হলো সিকান্দর আকবর। এটি বাংলায় নাসখি লিপির একচেটিয়া ব্যবহারের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে। বাংলায় সুলতানি আমলে নাসখি রীতিতে উৎকীর্ণ শিলালিপিসমূহের মধ্যে সুলতান জালাল উদ্দীন ফাত্হ শাহের আমলে (১৪৮১- ১৪৮৬ খ্রি.) উৎকীর্ণ শিলালিপি (দ্র. চিত্র-২৪) ও সুলতান আলাউদ্দীন হুসায়ন শাহের আমলে (১৪৯৩- ১৫১৯ খ্রি.) উৎকীর্ণ ফিরোজপুর শিলালিপি (দ্র. চিত্র-২৫) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া সুলতান রুকন উদ্দীন বারবাক শাহের আমলে (১৪৫৯- ১৪৭৪ খ্রি.) উৎকীর্ণ দেওতলা শিলালিপি (দ্র. চিত্র-২৬)-কে এর গঠনসৌষ্ঠব বিচার করে নাসখি কলমের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এতে ব্যবহৃত আলিফ ও লাম-এর লম্বদণ্ডসমূহের পাদদেশে উৎকীর্ণ অক্ষরসমূহকে দেখতে ধূলিকণার মতো মনে হয়। এজন্য একে নাসখির আলংকারিক প্রশাখা 'গুবার' পদ্ধতির লেখা হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়।[১০৯]

মোগল আমল (১৫২৬-১৮৫৮ খ্রি.)-এর প্রথমদিকে বাংলায় কুরআন, হাদিস এবং ধর্মীয় আরবি পাণ্ডুলিপিগুলোতে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার হতে থাকে। এ ছাড়া মসজিদ ও কবরগাত্রসমূহে উৎকীর্ণ শিলালিপিগুলোতেও এটি ব্যবহার করা হতো। কিন্তু মোগল আমলের শেষদিকে ক্রমশ এর ব্যবহার হ্রাস পেতে থাকে এবং নাস্তালিক রীতি এর স্থান দখল করে নেয়। সরকারি চিঠিপত্র ও ফারসি ভাষা লেখার ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য কাজে নাস্তালিক রীতি অনুসৃত হয়। সে সময়কার আরবি ও ফারসি—উভয় ভাষায় লিখিত কতিপয় ধর্মীয় গ্রন্থে লক্ষ করা যায় যে, মূল আরবি বক্তব্য নাসখি রীতিতে এবং ফারসি ভাষার টীকা-টিপ্পনী ও ব্যাখ্যাসমূহ পৃষ্ঠার নিচে ও উভয় পার্শ্বে নাস্তালিক রীতিতে লিপিবদ্ধ। এ ধরনের গ্রন্থাদির মধ্যে মোগল আমলে হিজরি ১১শ/ ১৭শ শতাব্দীতে লিখিত কুরআনের একটি অনুলিপি উল্লেখযোগ্য। এতে কুরআনের আয়াতগুলো পৃষ্ঠার মধ্যভাগে নাসখি রীতিতে এবং ফারসি ভাষার টীকা-টিপ্পনীগুলো পৃষ্ঠার পাদংশে ও উভয় পার্শ্বে নাস্তালিক রীতিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।[১১০] বাংলাসহ গোটা ভারতবর্ষে এই অবস্থা অদ্যাবধি এক নাগাড়ে চলে আসছে। এর ফলে পাঠকের পক্ষে মূল বক্তব্য এবং ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা সহজ হয়। বাংলায় মোগল আমলে লিখিত নাসখি লিপির একটি উৎকৃষ্ট নমুনা হলো ঢাকায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে, সংরক্ষিত কুরআনের একটি অনুলিপি (দ্র. চিত্র-২৭)।

www.pathagar.com

অধিকতর সহজসাধ্য ও সাবলীল রীতি হিসেবে বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্রই ছাপার অধিকাংশ কাজে, বিশেষ করে পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তকে আমরা এ লিপিরীতির বহুল ব্যবহার দেখতে পাই।

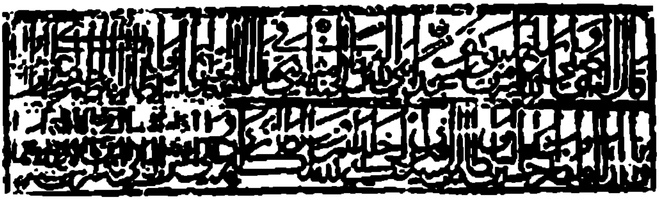

চিত্র-২৪: নাসখি রীতি, সুলতান ফাত্‌হ শাহের আমলে (১৪৮১- ১৪৮৬ খ্রি.)

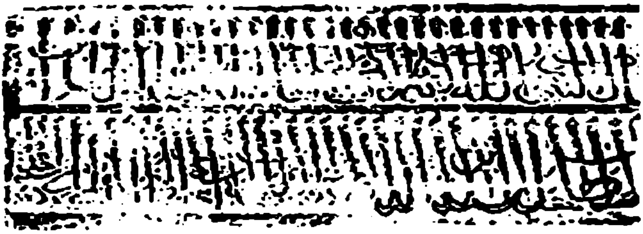

চিত্র-২৫: নাসখি রীতি, সুলতান আলাউদ্দীন হুসায়ন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.)

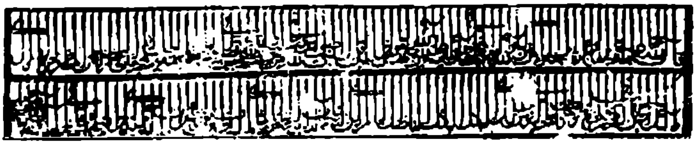

চিত্র-২৬: নাসখির আলংকারিক প্রশাখা গুবার পদ্ধতি, সুলতান রুকন উদ্দীন শাহের আমলে (১৪৫৯- ১৪৭৪ খ্রি.)

চিত্র-২৭: নাসখি রীতিতে কুরআন, হাফিজ উসমান, ১৭ শতাব্দী

www.pathagar.com

সুম্বুল

মনোগ্রামের জন্য মনোনীত বিশেষ ধরনের লিপির নাম খত্তুস-সুম্বুল। এ লিপিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রাম, লোগো ইত্যাদি করা হয়[১১১] (দ্র. চিত্র-২৮)।

চিত্র-২৮: খত্তুস-সুম্বুল লিপিতে মনোগ্রাম, আরিফ হিকমত

মুসান্না বা আয়নালি

মিরর বা দর্পণ লিপিকে মুসান্না বা আয়নালি লিপি বলে। এটি মূলত কোনো লিপিকে সরাসরি উল্টো করে লেখা হয়। একে মাকুস বা রিফ্লেকটেড অর্থাৎ প্রতিফলিত লিপিও বলা হয়।[১১২] (দ্র. চিত্র-২৯)

চিত্র-২৯: মুসান্না লিপি, মাহমুদ ইবরাহিম

www.pathagar.com

গুবার

গুবার গোলাকার লিপিধারার একটি প্রকরণ। গুবার অর্থ হচ্ছে উড়ন্ত বালুকণা। এ ধারার লিপি এতই ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম হয় যে, পড়তে হলে তা আতশি কাঁচ দিয়ে বড়ো করে দেখতে হয়। ক্ষুদ্রতার জন্য একে উড়ন্ত বালুকণার সাথে তুলনা করা হয়। এটি খুব ছোট কাগজে লেখা হয় (দ্র. চিত্র-৩০)। যুদ্ধের সময় কবুতরের মাধ্যমে এ লিপিতে সংবাদ লিখে প্রেরণ করা হতো। এজন্য অনেকে একে 'খত্তুল জানাহ' নামেও অভিহিত করেছেন।[১১৩] নবম শতাব্দীতে খলিফা আল-মামুনের দরবারে দলিল-দস্তাবেজে ব্যবহৃত 'রিয়াসি' লিপি থেকে আল-আহওয়াল আল-মুহাররির এ লিপিটি উদ্ভাবন করেন। এর প্রকৃত নাম হচ্ছে 'গুবার আল-হালবাহ'। এতে নাসখ ও রিকার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগত ছাপ লক্ষ করা যায়। মূলত অসাধারণ দক্ষতা ও শৈল্পিক গুণাবলি ব্যতিরেকে এত ক্ষুদ্র হরফে কুরআন লিপিবদ্ধ ও রাজকীয় চিঠিপত্র লেখা সম্ভব নয়। এ লিপিতে উলম্ব রেখাসমূহের মাথায় কোনো ধরনের আঁকশি বা কাঁটা থাকে না এবং হরফের ফাঁসাকৃতির শূন্য জায়গাসমূহ খোলা থাকে। তদুপরি তা নাসখ ও রিকা থেকে উদ্ভূত হওয়ায় তার সুচালো অগ্রভাগ কিছুটা গোলাকৃতির হয়ে থাকে।

মুসলিম জাহানে অনেক লিপিকার 'গুবার' লিপিশৈলীর চর্চায় সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে ইসমাইল ইবনু আবদুলাহ ওরফে ইবনে আল-জামাকজালি (মৃ. ১৩৮৬ খ্রি.), কাসিম গুবারি (মৃ. ১৬২৪ খ্রি.), তুরস্কের হাফিজ উসমান এবং মিসরের হাসান আবদ আল-জওয়াদ ও তাহির আল-কুরদি প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হাফিজ উসমান এ রীতি অনুসরণ করে অতি ক্ষুদ্রাক্ষরে কুরআন লিপিবদ্ধ করেন (দ্র. চিত্র-৩১)। ৫০ x ৪৫ সেন্টিমিটার পরিমাপের একটি কাগজের পাতায় সমগ্র কুরআন শরিফ লিপিবদ্ধ করার নজির রয়েছে। হাসান আবদ আল-জাওয়াদ একটি গমের দানায় কুরআন শরিফের তিনটি সুরা লিপিবদ্ধ করেন। হাফিজ উসমান মাত্র একটি ডিমের খোলসে পবিত্র কুরআন ও আরো কিছু কথাসহ ৭৭৯৩৪ শব্দ লিপিবদ্ধ করেন।[১১৪]

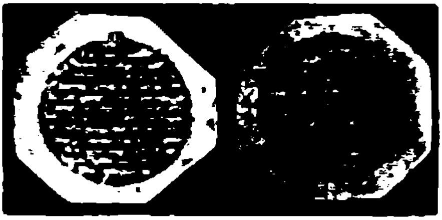

চিত্র-৩০: গুবার লিপিতে কুরআনের নমুনা, শিরায, ইরান, ১৫৪৩ খ্রি.

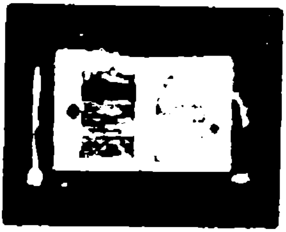

চিত্র-৩১: গুবার লিপিতে কুরআনের নমুনা, হাফিজ উসমান, ১৭ শতাব্দী

আল-মনসুর

মনসুর একটি অতি অদ্ভূত ধরনের লিপিশৈলী। এ রীতিতে মনে হয় যে, হরফগুলো কোনো রিবন বা ফিতাকে জড়িয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে হরফের শেষপ্রান্ত ফাঁসের মতো দেখায়[১১৫] (দ্র. চিত্র-৩২)।

www.pathagar.com

চিত্র-৩২: মনসুর লিপি

আল-হুর

আল-হুরও ফিতালিপি (দ্র. চিত্র-৩৩)। তবে এটা মনসুর থেকে কিছুটা সংস্কারকৃত আধুনিক শৈলী। এতে ফিতার বাঁকগুলো স্পষ্ট দেখানো হয়েছে।[১১৬]

চিত্র-৩৩: হুর লিপি

তাজ

পাগড়ি বা শিরস্ত্রাণ আকৃতির রীতিকে 'হুরূফ তাজ' বলা হয়। এর হরফের মাথা বা উপরিভাগ গম্বুজের মতো দেখতে। এর সাথে পাগড়ি বা ক্রাউনের মতো একে দেখা যায়[১১৭] (দ্র. চিত্র-৩৪)।

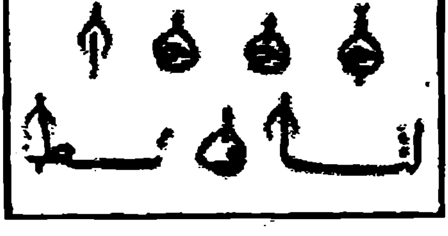

চিত্র-৩৪: তাজ লিপির কয়েকটি বর্ণ

www.pathagar.com

গুলজার, তাউস

গুলজার ও তাউস বিধি মোতাবেক কোনো শৈলী নয়। এ রীতিতে প্রচলিত ধারায় কলমের সাহায্যে লেখা হয় না; বরং কলমের আঁচড়ে প্রথম অক্ষরের একটি পরিলেখ সৃষ্টি করা হয় এবং পরে আলংকারিক রেখা অথবা ফুল, জ্যামিতিক নকশা, লিপি, মাছ, ময়ূর, প্রাণী, মৃগয়ার দৃশ্য, প্রতিকৃতি দ্বারা শোভিত থাকত (দ্র. চিত্র-৩৫)। আলংকারিক মোটিভের ওপর নির্ভর করে এর নামকরণ করা হয়েছে। যেমন গুলজার (বাগান), মাহি (মাছ) এবং তাউস (ময়ূর) প্রভৃতি[১১৮] (দ্র. চিত্র-৩৬)।

'তাউস' লিপিশৈলীতে বর্ণগুলোকে সমান্তরাল ও খাড়াভাবে এভাবে বিন্যাস করা হয় যে, তা সামগ্রিকভাবে ময়ূরের মতো দেখা যায়। হরফের আকৃতি দেওয়ার পর সাধারণত ভেতরের ফাঁকা স্থানটুকু ময়ূরের পেখম ও পালক প্রভৃতি দিয়ে অলংকরণ করা হয়। তাউস অর্থ ময়ূর। এ লিখনরীতি পুরোপুরি ময়ূরের মতো দেখা যায় বলে একে তাউস নামকরণ করা হয়েছে[১১৯] (দ্র. চিত্র-৩৭)।

চিত্র-৩৫: গুলজার, আলংকারিক লিপির জ্যামিতিক ও প্রাণীর নকশা সম্বলিত, হাসান রাযিন কলম, পারস্য, ১৮৮৩ খ্রি.

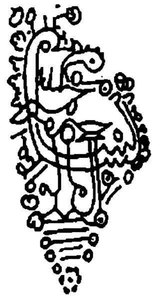

চিত্র-৩৬: তাউস রীতি

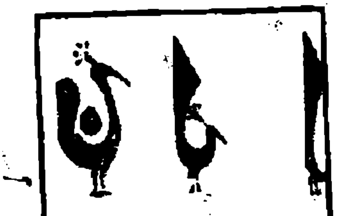

চিত্র-৩৭: তাউস রীতির কয়েকটি বর্ণ

www.pathagar.com

সাক্কি বা লারজা

সাক্কি একটি অভিনব লিপিরীতি। এটাও প্রচলিত ধারার লিপি নয়। বরং গুলজার ও তাউসের মতো একটি আলংকারিক শৈলী। এটা দেখতে দাঁতওয়ালা করাতের মতো। একে লারজাও বলা হয়। একে বাঁকানো পল্লবের মতো মনে হয়। এ লিপির বিশেষ দিক হচ্ছে লেখার সময় হাতের কম্পমান অবস্থায় এ ধরনের লেখা সম্ভব[১২০] (দ্র. চিত্র-৩৮)।

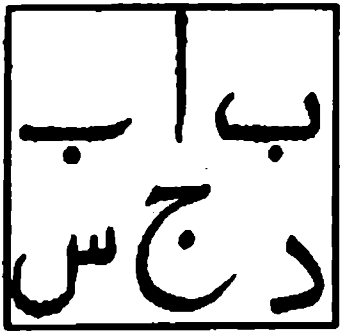

চিত্র-৩৮: লারজা লিপির কয়েকটি বণ

মুসালসাল

'মুসালসাল' অর্থ শৃঙ্খলাবদ্ধ। এটি এক প্রকারের ফিতালিপি। আব্বাসীয় যুগের প্রখ্যাত লিপিকার আল-আহওয়াল আল-বারমাকি এটি উদ্ভাবন করেন। এতে বর্ণগুলো, এমনকি و أ د ر ز প্রভৃতি শব্দকেও পরপর একটার সাথে অন্যটি জড়িয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়। পুরো লেখাটি দেখে মনে হয় যে, একটি শিকল দ্বারা তাকে জড়ানো হয়েছে[১২১] (দ্র. চিত্র-৩৯ ও ৪০)।

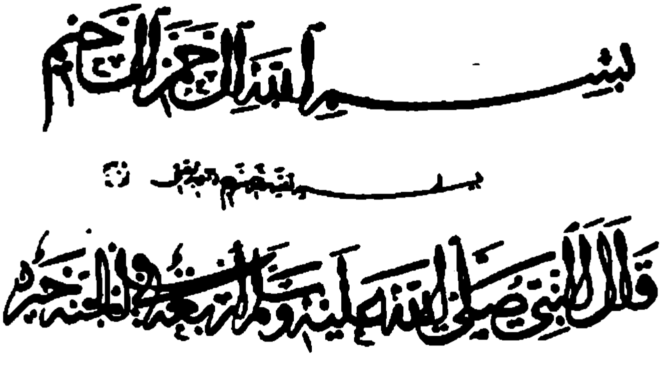

চিত্র- ৯: মুসালসাল রীতি (বিসমিল্লাহ ও একটি হাদিসের অংশবিশেষ)

www.pathagar.com

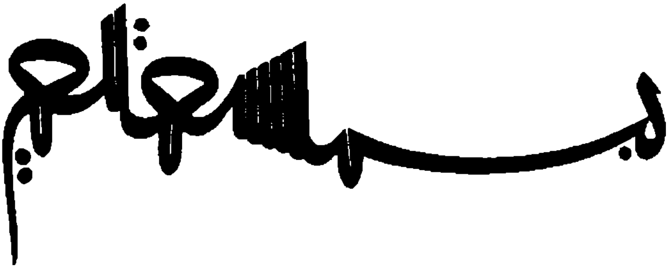

চিত্র-৪০: মুসালসাল রীতি (বিসমিল্লাহ), আহমদ কুররাহ হাছারি, ইস্তাম্বুল, ১৮৭০ খ্রি

আরবি বর্ণসমূহের ক্যালিগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য

ক্যালিগ্রাফির ক্ষেত্রে আরবি হরফ এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যে সমস্ত লিপিশিল্পের কথা জানা যায় তন্মধ্যে আরবি লিপিশিল্প ছাড়া চীন ও জাপানের লিপিশিল্পই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত দেশ দুটিতে ছবি আঁকা শুরু হয় ক্যালিগ্রাফি দিয়ে। তবে আরবি ছাড়া অন্য দেশের বর্ণমালা এত সুন্দর করে আঁকা সম্ভবপর নয়। আরবি বর্ণসমূহের চমৎকার ক্যালিগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য এ শিল্পকে সর্বাপেক্ষা পরিমার্জিত ও সুষমামণ্ডিত রূপ দান করেছে।

কোনো ক্যালিগ্রাফি করতে হলে বর্ণসমূহের গঠন, আকৃতি ও হরফে হরফে সুশৃঙ্খল যূথবদ্ধতা প্রভৃতি বিষয়কে অবশ্যই নজরে রাখতে হয়। বক্ষ্যমাণ অনুচ্ছেদে আরবি হরফসমূহের গঠন, আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে; কিন্তু এটা পরিপূর্ণ নয় এজন্য যে, ক্যালিগ্রাফির বিভিন্ন স্টাইলে হরফের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। আর এ বৈশিষ্ট্য হাতে-কলমে দেখানো ছাড়া এর আসল রূপ অনুধাবন করা পুরোপুরি সম্ভব নয়। তদুপরি আরবি হরফের ক্যালিগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য সর্ম্পূণ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করে দিন দিন উন্নতি লাভ করে চলেছে। লিপিকলার ইতিহাসে এমন নজির আর নেই।

আরেকটা ব্যাপার হলো, লিপির যেসব স্টাইল রয়েছে তন্মধ্যে কোনো একটি নিয়ে অনুশীলন করতে হলে সর্বপ্রথম এর নির্দিষ্ট ছাঁচকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রত্যেকটি হরফের একটি নির্দিষ্ট গঠন রয়েছে। সুতরাং খুবই সর্তকতার সাথে তা লক্ষ করতে হবে। হরফের রেখাগুলোর বিন্দুতে যে বলিষ্ঠতা অথবা দুর্বলতা রয়েছে তাও খেয়াল করতে হবে। হরফের সাধারণ আকৃতি, এর চড়াই-উতরাই এবং অলংকারসমূহের প্রতি যথেষ্ট নজরদারি থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে, যে সমস্ত হরফ পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ তাদের ভেতর যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে বিকৃতি এড়ানোর ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে।

'ا' (আলিফ) আরবি বর্ণমালার প্রথম হরফ। এটিই হলো সাধারণত সব আরবি হরফের মূল। এর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই অন্যান্য হরফ গঠন করা হয়। ইবনু মুকলার ভাষ্য মতে, "আলিফ সোজা উল্লম্ব রেখায় গঠিত হবে এবং কোনো রকম

www.pathagar.com

ডানে-বামে হেলে যাবে না এবং এর কোথাও কোনো বক্রতা থাকবে না। তদুপরি দৈর্ঘ্যে কিংবা প্রস্থে অন্য কোনো হরফের সাথে এর মিল থাকবে না।" তাঁর উদ্ভাবিত নিয়ম অনুসারে আলিফের পরিমাপ নির্ধারণ করা হয় খাড়াভাবে সাজানো ৫ থেকে ৭টি বিন্দুর মাধ্যমে এবং এর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য অন্যান্য আরবি হরফের পরিমাপ নির্ধারণ করা হয় বৃত্তের মাধ্যমে। অর্থাৎ একটি আলিফের দৈর্ঘ্য একটি বৃত্তের ব্যাসের সমতুল্য হতে হবে (দ্র. চিত্র-৪১)।

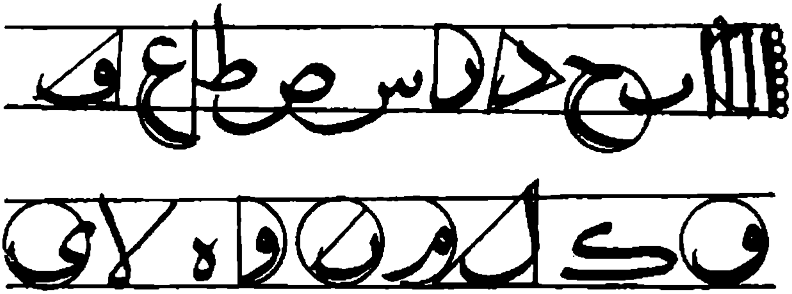

চিত্র-৪১: আলিফ এককসহ আরবি হরফসমূহের জ্যামিতিক পরিমাপ

'রাসাইলু ইখওয়ানিস সাফা' গ্রন্থপ্রণেতা বলেন, "আলিফের মোটা-চিকন সমানুপাতে এর দৈর্ঘ্য হবে এবং নিচের অংশ উপরের অংশ থেকে কিছুটা চিকন হবে।" ফাত্হুল্লাহ ইব্ন আহমদ বলেন, আরবি লিপি ভেদে আলিফের গঠন প্রকৃতির গতিপ্রবাহ ভিন্ন ভিন্ন হবে। মুহাক্কক লিপিতে অদৃশ্য প্রবাহ; 'সুলুস' লিপিতে স্পষ্ট, তাওকি ও রিকা লিপিতে অত্যন্ত স্পষ্ট, নাসখ ও রায়হানি লিপিতে খুবই সূক্ষ্ম। এ গতিপ্রবাহ লাইনের মোটা-চিকন দিকটি বিবেচনা করে বলা হয়েছে। তবে হরফের যেখানে যেখানে পাক অথবা বাঁক খাবে সেখানে এটা প্রযোজ্য নয়।

আলিফের ছয়টি স্টাইলের হরফ বৈশিষ্ট্যকে মানুষের পায়ের পাতার আকৃতির সাথে তুলনা করা হয়েছে। মাওলানা সুলতান আলী বলেন, আলিফের তিনটি মুভমেন্ট বা আন্দোলন প্রয়োজন। এ মুভমেন্টগুলো জীবনের বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পৃক্ত। নাস্তালিক ধারায় আলিফের তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ক. সিদা লেখনীতে উচ্চতা ১:২ অথবা ১:৩ হবে। খ. আলিফের মাথা তির্যকভাবে ক্রমশ ঢালু হবে। নিচের অংশ ক্রমশ চিকন হয়ে বেঁকে যাবে। গ. হরফের নিম্নাংশ পুরো শরীরের অনুপাতে তীক্ষ্ণ হবে।

'ب', 'ت' ও 'ث' হরফ তিনটি আলিফের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অনুভূমিক ও উল্লম্ব—দুই ধরনের রেখার সমন্বয়ে গঠন করা হয়। এগুলোর অনুভূমিক রেখা আলিফের দৈর্ঘ্যের সমান হবে এবং উল্লম্ব রেখা হবে এক-তৃতীয়াংশ। ইবনু আবদুস সালাম বলেন, " 'ب', 'ت' ও 'ث' প্রভৃতি হরফ বিন্দুর মাধ্যমে শুরু হবে এবং শেষও হবে বিন্দুর মাধ্যমে, যদি শেষাংশ বাঁকানো না হয়। যদি শেষাংশ বাঁকানো হয়, তাহলে তা কলমের বাম আঁচড় দিয়ে করতে হবে এবং তাতে গোলাকার অংশ খাড়া অংশের সমান হতে হবে। তবে খাড়া অংশ গোলাকার অংশের চাইতে অতি সামান্য প্রাধান্য পাবে এবং শুরুর আঁচড়টি দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে শেষের বাঁকানো আঁচড়ের চাইতে একটু লম্বা হবে।" সুলতান

www.pathagar.com

আলী বলেন, "'ب', 'ت' ও 'ث' যদি একটু বেশি লম্বা করা হয়, তবে শুরুর দিকটা লেজের দিকের থেকে একটু উঁচু করতে হবে, এতে হরফের প্রকাশভঙ্গি দৃষ্টিমুগ্ধ হয়। যদি হরফগুলো খাটো হয়, তবে অবশ্যই অনুভূমিক রেখাটি সোজা রাখতে হবে এবং সর্তকতার সাথে তা করতে হবে। হরফের প্রাথমিক আঁচড়গুলো নমনীয়ভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং অগ্রবর্তী হরফগুলোর সাথে সংযুক্ত হবে। সাথে সাথে ডায়াক্রিটিক্যাল মার্ক (জের, জবর, পেশ, নুকতা ও তাশদীদ প্রভৃতি) দিয়ে পৃথক করতে হবে। কিন্তু হরফের শেষ অবস্থায় ঢালু বা গোলাকৃতি হবে, বিশেষ করে নাস্তালিক লিপিতে।

'ج', 'ح' ও 'خ' দু ধরনের রেখার মাধ্যমে গঠন করা হয়। একটি হচ্ছে সোজা অনুভূমিক রেখা। ইবনু মুক্লার মতে–এটি ঢালু হবে। অন্যটি অর্ধবৃত্তাকার। উল্লেখ্য যে, বৃত্তের ব্যাস (diameter) আলিফের বৃত্তের সমান হবে, অনুভূমিক রেখাটি আলিফের দুই তৃতীয়াংশ হবে বা আরো এক বিন্দু পরিমাণ ছোট হবে এবং অর্ধবৃত্তটির বিস্তৃতি হবে দেড় আলিফ পরিমাণ। এদের মাথা প্রায় সমানভাবে বাম থেকে ডান দিকে প্রসারিত হবে। তবে কলমের মাথাকে সর্বদা সামান্য ডান দিকে লেখার অবস্থায় রাখতে হবে। প্রথমে কলমের ডান আঁচড় দিয়ে লেখা শুরু করবে এবং সর্বশেষ বক্র অংশটি কলমের বাম আঁচড় দিয়ে শেষ করবে। সুলতান আলী বলেন, জিমের আনুভূমিক রেখাটি আড়াই ফোটার সমান হবে। কিন্তু এর বৃত্তটি কেমন হবে তা মুখে বলে দেখানো সম্ভব নয়, যতক্ষণ না এটা লিখে দেখানো যাচ্ছে। তবে একটা ধারণা দেওয়া যেতে পারে। নাস্তালিক লিপিতে জিমের মাথাটি হবে নতুন চাঁদের অর্ধেকটার সমান এবং এর শরীরের বৃত্তটি হতে পারে দুই ধরনের। এক. ডিম্বাকৃতি, দুই. সুর্যাকৃতি এবং এ দুই ধরনের লেজটিও অর্ধবৃত্তাকার সদৃশ বিস্তৃত হবে এবং পরবর্তী হরফের সাথে সংযুক্ত হবে।

'د' এবং 'ذ' ঢালু ও অনুভূমিক দুই ধরনের রেখা দ্বারা গঠন করা হয় এবং প্রত্যেকটি রেখাকে অর্ধ-আলিফ পরিমাণ বিস্তৃত করা হবে। এভাবে পুরো আকৃতি মিলে আলিফের দৈর্ঘ্যের সমান হবে। এ হরফগুলোর লেখা শুরু করা হবে বিন্দুর মাধ্যমে এবং শেষের আকৃতিকে যদি সহজভাবে ছেড়ে দেওয়া না হয়, তাহলে কচের মাধ্যমে, আর বক্ররূপ দেওয়া হলে কলমের বাম আঁচড় দিয়ে লিখতে হবে। এ হরফগুলো ঢালু, অনুভূমিক ও গোলাকার তিন ধরনের রেখা দিয়েও গঠন করা হয়। এ তিন ধরনের মুভমেন্টের দরুণ এর আকার ও স্টাইল ভিন্ন হয়ে থাকে। নাস্তালিক স্টাইলে د-এর গোলাকার মুভমেন্টকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

'ر' ও 'ز' একটি ধনুকাকৃতির বক্র রেখা দ্বারা গঠন করা হয়। এটি বৃত্তের পরিধির এক-চর্তুথাংশ হবে এবং অবশ্যই আলিফের ব্যাসের সমান বৃত্ত হবে। এ হরফগুলোর লেখা শুরু করা হবে বিন্দুর মাধ্যমে এবং শেষের আকৃতিকে যদি সহজভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে কলমের ডান আঁচড় দিয়ে, আর বক্র রূপ দেওয়া হলে কলমের বাম আঁচড় দিয়ে লিখতে হবে। নাস্তালিক ও শিকাস্তা স্টাইলে দাল কলমের মাথা হেলানো অবস্থায় হরফের ওপর থেকে গোল হয়ে যখন শেষ হবে তখন তা হালকা স্বল্প রেখায় ক্রমশ শুরু হবে। কিন্তু 'ر' লিখতে প্রথমে হালকা রেখায় এবং ক্রমশ মোটা রেখায় নিচের দিকে ধাবিত হবে এবং লেজটা তখন ভারি মোটা মনে হবে। বিশেষ করে '

www.pathagar.com

এর সাথে এর সাদৃশ্য থাকলেও د ও ر -এর মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে এদের মাথা যথাক্রমে হালকা টানে কোণাকৃতি মাথা এবং বেশ ভারি টানে গোল সংযুক্ত রেখায় মাথা হবে। আর লেজ প্রায় সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। ر লেখার সময় কলম স্বাভাবিকভাবে গোলাকার টানে মাথা হবে। কিন্তু তাদের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো রয়েছে, অধিকাংশ সময় তা পর্যবেক্ষণ থেকে এড়িয়ে যায়। বিশেষভাবে শিকাস্তা স্টাইলে দাল কখনো কখনো পরবর্তী হরফের সাথে মিলিত হয় তার লম্বা টানের রেখার মাধ্যমে। অনুরূপভাবে শেষস্থিত 'ه'-এর কথাও বলা যায়। এভাবে যে সমস্ত হরফ লেজের লম্বা টানের সাথে পরবর্তী হরফ সংযুক্ত হয় না, শিকাস্তা স্টাইলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা মিলিত হয় পরবর্তী হরফের সাথে।

'س' ও 'ش' পাঁচটি রেখা দ্বারা গঠন করা হয়। এগুলো হলো—উল্লম্ব এবং অর্ধবৃত্তাকার, উল্লম্ব এবং অর্ধবৃত্তাকার ও প্রশস্ত অর্ধবৃত্তাকার। মাথার প্রথম দাঁত থেকে তৃতীয় দাঁত পর্যন্ত পরিমাপ হচ্ছে আলিফের দুই-তৃতীয়াংশ এবং س -এর প্রশস্ত ধনুকাকৃতিটি যদি বাঁকানো হয়, তাহলে তার অনুভূমিক অংশের পরিমাপ হবে এক আলিফের সমান, আর বাঁকানো না হয়ে প্রসারিত করা হয় দুই আলিফের সমান লম্বা হবে। আর এক দাঁত থেকে অন্য দাঁত পর্যন্ত পরিমাপ হচ্ছে আলিফের এক-ষষ্ঠমাংশের সমান। কিন্তু যদি দাঁতগুলো না দিয়ে লম্বা অনুভূমিক আঁচড়ে মাথা আঁকা হয়, তাহলে এর পরিমাপ হবে দুই আলিফের সমান। উল্লেখ্য যে, প্রথম দাঁত আঁকার পর দ্বিতীয় দাঁত এঁকে ওপরের দিক থেকে কলম টেনে নিয়ে এসে তৃতীয় দাঁত আঁকবে, যাতে নিচে সামান্য জায়গা ফাঁকা থাকে। আর যদি নিচের দিক থেকে কলম টেনে নিয়ে এসে তৃতীয় দাঁত আঁকা হয়, তাহলে দাঁতগুলোর নিচের অংশটি পরস্পর মিলে যাবে এবং দাঁতগুলোর মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাটি সমান হবে। ইবনু মুকলা বলেন, "দাঁতগুলো এমন সমানভাবে টানতে হবে, যাতে ওপরে-নিচে দুটি সরল রেখা আঁকা হলে দাঁতগুলো দুই দিকেই সামান্য বেরও হবে না এবং পরস্পর একটার চাইতে আরেকটি ছোটও হবে না।" এ হরফগুলোর লেখা শুরু করা হবে বিন্দুর মাধ্যমে এবং শেষের আকৃতিকে যদি প্রসারিত করা হয় তাহলে কলমের ডান আঁচড় দিয়ে, আর বাঁকানো হলে কলমের বাম আঁচড় দিয়ে লিখতে হবে। অন্য এক পদ্ধতি অনুসারে এক দাঁত থেকে অন্য দাঁত পর্যন্ত লম্বা হবে আলিফের এক-অষ্টমাংশ। এর লেজের পরিমাণ হবে আলিফের বৃত্তের অর্ধেক। সুলতান আলী বলেন, س-এর তিনটি দাঁত ব্যতীত সোজা লাইনে তা লেখা হবে। এটা কিছু কিছু সময় নাস্তালিক এবং অধিকাংশ সময় শিকাস্তা স্টাইলে লেখা হয়। কখনো দাঁতের পরিবর্তে যে অনুভূমিক লম্বা লাইনের রেখা লেখা হয়, তা সর্পিলাকার বা ঢেউয়ের মতো হবে। আর 'س' ও 'ش' -এর দৈর্ঘ্য সম্পর্কে সুলতান আলী বলেন: এদের দৈর্ঘ্য হবে ب ও ت-এর মতো, আর এগুলোর শুরুটা লেজ থেকে কিছুটা উঁচু হবে।

শেষস্থিত 'ت' অথবা অন্যান্য হরফের পূর্ববর্তী দাঁত কখনো কখনো চিহ্নিত হয় না, না হয় সমান কিংবা সূক্ষ্ম আঁচড়ে অর্ধগোলাকার বা বাঁকা হয়ে সংযুক্ত হয়। আবার কখনো কখনো হরফের ওপরের অংশ, কখনো কখনো নিচের অংশ অন্য হরফের সাথে সংযুক্ত হয়। যেমন- س -এর ওপরের অংশ শুধু তিনটি দাঁত বা এর সাথে মিলিত হয়।

www.pathagar.com

'ص' ও 'ض' তিন ধরনের রেখার মাধ্যমে লেখা হয়। খাটো অর্ধ-ডিম্বাকার, অনুভূমিক এবং প্রশস্ত অর্ধবৃত্তাকার। ইবনু আবদুস সালাম বলেন, "কলমের মাথার এক পার্শ্ব দিয়ে হরফগুলোর লেখা শুরু করা হয় এবং শেষের আকৃতি যদি প্রসারিত করা হয়, তাহলে কলমের ডান আঁচড় দিয়ে, আর বাঁকানো হলে কলমের বাম আঁচড় দিয়ে লিখতে হবে।" ص-এর মাথার দৈর্ঘ্যের পরিসর হচ্ছে আলিফের দুই-তৃতীয়াংশের সমান। আর এর বৃত্তাকার রেখার অগ্রভাগ থেকে লেজ পর্যন্ত পরিমাপ হচ্ছে আলিফের দৈর্ঘ্যের সমান, যদি বৃত্তাকার রেখাটিকে বাঁকানো হয়। আর যদি একে প্রসারিত করা হয়, তখন একে বর্ধিত করে দুই আলিফ পরিমাণ লম্বা করা হবে। নাস্তালিক স্টাইলে ص-এর মাথা একটি বিন্দু থেকে শুরু হবে আর আঙ্গুরের থোকা যেভাবে ঝুলে তেমনি এর লেজটি ক্রমশ নিচে ঝুলে থাকবে। যেন বীজ থেকে তরমুজ লতার শূন্যের দিকে ধাবিত হওয়া।

'ط' ও 'ظ' তিনটি রেখার সমন্বয়ে লেখা হয়। উল্লম্ব, খাটো অর্ধ-ডিম্বাকার ও অনুভূমিক। হরফ দুটির লেখা শুরু হবে বিন্দু প্রদানের মাধ্যমে এবং শেষও হবে বিন্দুর মাধ্যমে। এগুলোর অর্ধডিম্বাকৃতির দৈর্ঘ্যের পরিমাপ হচ্ছে আলিফের দুই-তৃতীয়াংশের সমান। ইবনু আবদুস সালাম বলেন, "এগুলোর উল্লম্ব রেখার আকৃতি ও দৈর্ঘ্য আলিফের মতো, অর্ধডিম্বাকার ঝুলন্ত ر -এর মতো এবং অনুভূমিক রেখা প্রসারিত ب -এর মতো।"

'ع' ও 'غ' দুটো ফাঁসের মতো দেখতে অর্ধবৃত্তাকার রেখার মাধ্যমে লেখা হয়। একটি ওপরে, অন্যটি ঠিক তার নিচে। ওপরেরটা আলিফের বৃত্তের এক-চতুর্থাংশ এবং নিচেরটা আলিফের বৃত্তের অর্ধেকটার সমান হবে। ইবনু আবদুস সালাম বলেন, " হরফ দুটি তিনটি রেখার সমন্বয়ে গঠন করা হয়। এগুলো হলো– অর্ধবৃত্তাকার, ঢালু ও অর্ধবৃত্তাকার। কলেমর মাথার এক পার্শ্ব দিয়ে হরফগুলোর লেখা শুরু করা হয় এবং এগুলোর বাঁকটি কলমের ডান আঁচড় দিয়ে শেষ করা হয়। বাঁকটির ব্যাস অর্ধবৃত্তের সমান হবে।" ফাতহুল্লাহ ছয় প্রকার ع -এর কথা বলেছেন। আর সুলতান আলী চার প্রকার ع দেখিয়েছেন। এগুলো হলো–

১. ع -এর মাথার আকৃতি হচ্ছে ঘোড়ার খুরের নালের মতো।
২. ع -এর মাথার আকৃতি হচ্ছে ص -এর মতো।
৩. ع হচ্ছে সিংহের চোয়াল সদৃশ।
৪. ع হচ্ছে ড্রাগনের চোয়ালের মতো।

যখন 'ع' পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী দু হরফের মাঝে যুক্ত হবে, তখন সিংহের চোয়াল সদৃশ হবে, আর যখন শুধু পূর্ববর্তী হরফের সাথে যুক্ত হবে, তখন তা ড্রাগনের চোয়াল সদৃশ হবে।

'ف' চারটি রেখার সমন্বয়ে লেখা হয়। ঢালু, অর্ধশয়ান, উল্লম্ব এবং অনুভূমিক রেখা। ইবনু আবদুস সালাম বলেন, "শুরু করা হবে একটি বিন্দুর মাধ্যমে। এর পরিমাণ হচ্ছে আলিফের এক-ষষ্ঠাংশের সমান। অতঃপর বাম দিকে একটি ছোট রেখা টানা হবে। তারপর অর্ধশয়ান রেখাটি টেনে নিয়ে অনুভূমিক রেখার অগ্রভাগের সাথে যুক্ত করে দেবে। এভাবে এটা দেখতে উল্টো د -এর মতো দেখাবে। অতঃপর

www.pathagar.com

অনুভূমিক বাহুটি আঁকতে থাকবে। সর্বশেষ এটি সমবাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের মতো দেখাবে। শেষের আকৃতিকে যদি বাঁকানো না হয়, তাহলে কলমের আঁচড় দিয়ে, আর বাঁকানো হলে কলমের কচ দিয়ে লিখতে হবে।"

'ق' চারটি রেখার সমন্বয়ে লেখা হয়। ঢালু, অর্ধশয়ান, উল্লম্ব এবং অর্ধবৃত্তাকার রেখা। ইবনু মুকলার মতে, ঢালু, অর্ধশয়ান ও অর্ধবৃত্তাকার- এ তিনটি রেখার সমন্বয়ে গঠিত হয়। এর মাথা ঠিক 'ف' -এর মাথার মতো হবে। তবে ঘাড়ের কাছ থেকে নিচের অংশ ن -এর মতো হবে। শেষের আকৃতিকে যদি বাঁকানো না হয়, তাহলে কলমের ডান আঁচড় দিয়ে, আর বাঁকানো হলে কলমের বাম আঁচড় দিয়ে লিখতে হবে। অর্ধবৃত্তাকার রেখার শুরু থেকে শেষ পর্যন্তকার বিস্তৃতি হবে এক আলিফ পরিমাণ, যদি শেষাংশ বাঁকানো হয়। আর যদি প্রসারিত করা হয়, তাহলে অর্ধবৃত্তাকার রেখার শুরু থেকে শেষ পর্যন্তকার বিস্তৃতি হবে দুই আলিফ পরিমাণ। নাস্তালিক স্টাইলে ق -এর শুরুটা একটা ফোটা সদৃশ হবে আর শরীরটা ب -এর মতো। ق এবং ف -এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে তাদের শরীর; কিন্তু তাদের মাথা একই রকম। ق -এর শরীর প্রায় ج -এর মতো দেখতে।

'ك' চার ধরনের লাইনের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়। ঢালু, অনুভূমিক, উল্লম্ব ও অনুভূমিক। ইবনু আবদুস সালামের মতে, রেখা চারটি হলো: ১. অর্ধশয়ান, ২. অনুভূমিক, এর দৈর্ঘ্য এক আলিফ এবং এর এক-তৃতীয়াংশের সমান লম্বা হবে। ৩. ডান দিকে ঢালু রেখা, এ রেখাটি আলিফের এক-তৃতীয়াংশের সমান হবে। ৪. অনুভূমিক রেখা। এটি দুটি আলিফের সমান লম্বা হবে। এর মাথার নিচের অংশকে আলিফের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ বাড়ানোও যেতে পারে, যাতে তার শেষে যুক্তাংশ থেকে মাথা পর্যন্ত একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয় যেমন দুই অনুভূমিক বাহুর মধ্যে ফাঁকা জায়গা থাকবে।" একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, ك দুই ধরনের ى -এর ছাঁচের সমন্বয়ে লেখা যায়। এক. প্রশস্ত। দুই. বিপরীতমুখী। নাস্তালিক স্টাইলে যেমন ك -এর ওপরের তির্যক আঁচড়টি মুছে দিয়ে মাথাটাকে অনুভূমিক অথবা ডান দিকে ঢালু রেখাটি বর্ধিত করা হয়। সুলতান আলী বলেন: ك -এর অনুভূমিক রেখাটি বেশ খানিকটা লম্বা এবং শেষ প্রান্ত ب ও ت -এর মতো। ك -এর নিচের অংশটি কখনো কখনো অগ্রবর্তী রেখার সাথে যুক্ত হয়।

'ل' দু ধরনের রেখার সমন্বয়ে লেখা হয়। উল্লম্ব ও অনুভূমিক। অনুভূমিক রেখাটি আলিফের দুই-তৃতীয়াংশ এবং উল্লম্ব রেখাটি আলিফের সমান হবে। শেষের আকৃতিকে যদি বাঁকানো না হয়, তাহলে কলমের কচ দিয়ে, আর বাঁকানো হলে কলমের বাম আঁচড় দিয়ে লিখতে হবে। কুফি স্টাইলে ل মাথা থেকে গোড়াটা সামান্য ডান দিকে তির্যক হয়ে থাকবে। কিন্তু পরবর্তীকালে এর আকৃতি পরিবর্তিত হয়। দেখতে গোলাকৃতি হয়। ঠিক আলিফের শেষে ن যোগ হয়ে যেমন দেখায়। কিন্তু যখন ل অন্যান্য হরফের সাথে মিলিত হয়, তখন এর নিম্নাংশ উহ্য থাকে। শুধু খাড়া অংশ অন্যের সাথে মিলিত হয়।

www.pathagar.com

'م' চার ধরনের রেখার সমন্বয়ে লেখা হয়। ঢালু, অর্ধশয়ান, অনুভূমিক ও অর্ধবৃত্তাকার। ইবনু আবদুস সালামের মতে রেখা চারটি হলো : ঢালু, অর্ধবৃত্তাকার, বাম দিকে ঢালু অর্ধশয়ান ও বাঁকা। এর বাঁকা অংশটি ر -এর মতো। এটি পরিমাণে আলিফের বৃত্তের এক-চতুর্থাংশ হবে। কখনো কখনো م -এর পাদংশকে উল্লম্ব রেখার রূপ দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় তা আকার ও দৈর্ঘ্যে ঠিক আলিফের মতোই হবে। কোনো রকম ডানে-বামে হেলে যাবে না এবং কোথাও কোনো বক্রতা থাকবে না। এর লেখা কলমের পার্শ্বভাগ দিয়ে শুরু করতে হয় এবং শেষও করতে হয় কলমের পার্শ্বভাগ দিয়ে। م-এর মাথার বিস্তৃতি হবে আলিফের এক-ষষ্ঠাংশ পরিমাণ এবং তা ডিমের মতো দীর্ঘ গোলাকৃতির হবে ও ডান দিকে সামান্য খাড়া হবে। কখনো কখনো م-এর মাথার গোলাকার অংশটি থাকে না। অন্যান্য হরফের সাথে যুক্ত হওয়ার সময় বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে। নাস্তালিক স্টাইলে م -কে দু হরফের মাঝে যখন ব্যবহার করা হয়, তখন কেবল একটি মাত্র ফোটার মাধ্যমে তা দেখানো হয়। তবে সেটা বেশ চাতুর্যপূর্ণ হয়ে থাকে। কখনো কখনো এটা লম্বা রেখাসহ হরফের সাথে যুক্ত হয়। কিংবা কোনো লাইন পূর্ণ করতেও م -এর মাথা থেকে লম্বা লাইন যুক্ত হয়।

'ن' শুধু একটি অর্ধগোলাকার লাইনের মাধ্যমে লেখা হয়। একটি বৃত্তের অর্ধেকটার মতো প্রায়। বিন্দুর মাধ্যমে এর লেখা শুরু হবে। আর শেষাংশকে যদি বাঁকানো হয়, তাহলে কলমের বাম আঁচড় দিয়ে লিখতে হবে এবং এর বিস্তৃতির পরিমাণ হবে এক আলিফের সমান। যদি প্রসারিত করা হয়, তাহলে কলমের ডান আঁচড় দিয়ে লিখতে হবে এবং এর বিস্তৃতির পরিমাণ হবে দুই আলিফের সমান। ن -এর মাথা কখনো লাইন থেকে সামান্য ওপরে ওঠে। আবার কখনো একে তরঙ্গের মতো করে লেখা হয়। আবার ডায়াক্রিটিক্যাল মার্কসহ একে লেখা হয়। তবে শেষস্থিত ن-এর ক্ষেত্রে দুই ধরনের নিয়ম আছে। এক. ডায়াক্রিটিক্যাল চিহ্নসহ। দুই. একটা সাধারণ ড্যাশ দিয়ে একে চিহ্নিত করা।

'ه' তিন ধরনের রেখার সমন্বয়ে লেখা হয়। ঢালু, উল্লম্ব ও অর্ধবৃত্তাকার। ইবনু আবদুস সালামের মতে, রেখাত্রয় হলো : ঢালু, অনুভূমিক এবং অর্ধশয়ান রেখা। বিন্দুর মাধ্যমে এর লেখা শুরু হবে এবং কলমের ডান আঁচড় দিয়ে শেষাংশকে প্রসারিত করা হবে। ঢালু রেখাটির দৈর্ঘ্য হবে আলিফের অর্ধেক, অনুভূমিক রেখার দৈর্ঘ্য হবে আলিফের এক-তৃতীয়াংশ এবং অর্ধশয়ান রেখাটির দৈর্ঘ্য হবে আলিফের অর্ধেক পরিমাণ। ফাতহুল্লাহ নয় ধরনের ه দেখিয়েছেন। সুলতান আলী এ নয় প্রকার থেকে দু ধরনের ه – এর বর্ণনা দিয়েছেন। এক. د ও ف -এর মিশ্রিত রূপ। এটা শব্দের প্রথমে অথবা মধ্যে লেখার সময় হবে। বিশেষ করে ل কিংবা س ও ش -এর সাথে যুক্ত হলে ه এভাবে লিখতে হবে। এতে শব্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। দুই. দুটো ص-এর মাথা একত্রিত করে ه তৈরি করতে হবে, যেমন দুই ع দিয়েও হয়।

উল্লেখ্য, নাস্তালিক স্টাইলে এত বেশি ه লেখা যায়, যা বর্ণনার অতীত। ক্যালিগ্রাফার তার খেয়াল-খুশি এবং দক্ষতা দিয়ে অসংখ্য প্রকার ه লিখতে পারেন। শব্দের প্রথমে যখন ه আসে তখন কলমের একটি পূর্ণ প্যাঁচে তা লেখা হয়। অবশ্য

www.pathagar.com

কখনো কখনো এর ব্যতিক্রমও হয়। সূক্ষ্ম আঁচড়েও সেটা করা যায়। শব্দের প্রথমে অথবা মধ্যে যেখানেই হোক না কেন ه সেখানে হৃদয়ের মতো অথবা বৃত্তের মধ্যে রেখা সহকারে যেমন দেখায়, ঠিক তেমনি ه লেখা হয়ে থাকে। শেষস্থিত ه যদি নাসখ স্টাইলে হয়, তবে তা হয় গোল কিংবা অর্ধ বৃত্তাকার হবে। কিন্তু নাস্তালিক স্টাইলে শেষস্থিত ه ক্যালিগ্রাফারের হাতের খুবই সংক্ষিপ্ত একটি ছোট বাঁকা আঁচড়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে। শিকাস্তা স্টাইলে শেষস্থিত ه একটি লম্বা ডিম্বাকৃতি রেখার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

'و' তিন ধরনের রেখার সমন্বয়ে লেখা হয়। অর্ধশয়ান, ঢালু ও অর্ধবৃত্তাকার। ইবনু আবদুস সালামের মতে, চার ধরনের রেখার সমন্বয়ে লেখা হয়। এর মাথা ঠিক ف -এর মাথার মতো। তবে এর নিচের অর্ধবৃত্তাকার রেখাটা হবে ر -এর মতো। এটা বৃত্তের এক-চতুর্থাংশের সমান হবে। এর মাথা কলমের গোলাকার আঁচড়ে করা হয়। শেষের আকৃতিকে যদি প্রসারিত করা হয়, তাহলে কলমের ডান আঁচড় দিয়ে, আর পেঁচানো রূপ দেওয়া হলে কলমের বাম আঁচড় দিয়ে লিখতে হবে। و -এর শরীরের রেখায় মুভমেন্ট খুবই সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। যেজন্য ক্যালিগ্রাফার অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতার সাথে একে লিখে থাকেন। আর একে প্রাণবন্ত করতে অবশ্যই এর মুভমেন্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

'لا' (ل + ا) তিন ধরনের রেখার সমন্বয়ে লেখা হয়। ডান দিকে ঢালু, সোজা অনুভূমিক এবং বাম দিকে অর্ধশয়ান। ডান দিকে ঢালু রেখাটি আলিফের সমপরিমাপের হবে। অনুভূমিক রেখাটি হবে আলিফের দুই তৃতীয়াংশের সমান এবং বাম দিকে অর্ধশয়ান রেখাটি হবে আলিফের সমপরিমাণ। এ যে পরিমাপের ব্যাপারটি তা বিভিন্ন স্টাইলে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাছাড়া ক্যালিগ্রাফার তার নিজের ইচ্ছাকে প্রয়োগ করতে পারেন এখানে। ডান দিকে ঢালু রেখাটি বিন্দুর সাহায্যে শুরু করা হবে। তদ্রূপ বাম দিকে অর্ধশয়ান রেখাটিও বিন্দুর সাহায্যে শুরু করা হবে। উল্লেখ্য যে, এর নিচের অংশ হবে এক-তৃতীয়াংশ এবং ওপরের অংশ হবে দুই-তৃতীয়াংশ। তদুপরি লামের মাথা থেকে আলিফের মাথা পর্যন্ত একটি সরল রেখা এবং ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত আর একটি রেখা টানা হলে কোথাও কোনো অংশ বেরও হবে না এবং ছোটও হবে না। লাম-আলিফের অন্য একটি আকৃতি রয়েছে। এটিও তিন ধরনের রেখার সমন্বয়ে গঠিত হয়। এগুলো হলো : ডান দিকে ঢালু, গোলাকার ও বাম দিকে অর্ধশয়ান। বাম দিকের অর্ধশয়ান রেখাটি ঠিক ডান দিকের ঢালু রেখার মুখোমুখি হবে।

'ي' লিখতেও তিন ধরনের রেখার প্রয়োজন। অর্ধশয়ান, ঢালু ও অর্ধবৃত্তাকার। ইবনু আবদুস সালাম বলেন, এটি দেখতে ن -এর মতো। তবে এর মাথা ঠিক উল্টো ২ -এর মতো। কলমের মাথার পার্শ্বভাগ দিয়ে এর লেখা শুরু করতে হয়। ي-এর অর্ধশয়ান রেখাটি আলিফের অর্ধেকের সমান হবে এবং তদ্রূপ ঢালু রেখাটিও আলিফের অর্ধেকের সমান হবে। আর বৃত্তাকার রেখাটি যদি পেঁচালো হয়, তাহলে তার বিস্তৃতি হবে এক আলিফ পরিমাণ এবং তার শেষাংশ কলমের বাম আঁচড় দিয়ে লিখতে হবে। যদি বৃত্তাকার রেখাটি প্রসারিত করা হয়, তাহলে তার বিস্তৃতি হবে দুই আলিফ পরিমাণ এবং তার

www.pathagar.com

শেষাংশ কলমের ডান আঁচড় দিয়ে লিখতে হবে। শেষস্থিত ي-এর লেজটি উল্টো দিকে অর্থাৎ বাম থেকে ডান দিকে কখনো কখনো লেখা হয়। তবে এটা অর্ধবৃত্তের সমান হলে ভালো হয়। অবশ্য ক্যালিগ্রাফার ইচ্ছেমতো তা লম্বা করতে পারেন। যখন م -এর পূর্বে বা শব্দের মধ্যে অথবা শব্দের শেষস্থিত হরফ হিসেবে ي ব্যবহার হবে, তখন সেটা লম্বা ঢেউয়ের মতো বা অর্ধ-বৃত্তাকার লাইনের মতো টেনে করা হয়।[১২২]

উল্লেখ্য, আরবি হরফসমূহের মাথা ও পাদংশ লেখার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে কলমের ব্যবহার করতে হয়। এ ক্ষেত্রে কখনো কলমের জিলফা (যেখান থেকে কলমের মাথার দিকে কাটা হয়), কখনো কলমের কচ, কখনো বা কলমের মাথার অংশ ব্যবহার করা হয়।

আরবি হরফসমূহের সূচনাগত অবস্থাকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—

১. বিন্দু দিয়ে লেখার সূচনা। ا ب ت ث د ذ ر ز س ش ع غ ل ن هـ প্রভৃতি বর্ণের লেখার সূত্রপাত করা হয় বিন্দু দিয়ে।

২. কলমের মাথার অংশ দিয়ে লেখার সুচনা। ج ح خ ص ض ط ظ ك ي প্রভৃতি বর্ণের মাথাগুলোর লেখা কলমের মাথার এক পার্শ্ব দিয়ে শুরু করতে হয়।

৩. জিলফা দিয়ে লেখার সূচনা। ف ق م و প্রভৃতি বর্ণের মাথাগুলোর লেখা কলমের জিলফা দিয়ে শুরু করতে হয়।

আরবি হরফসমূহের শেষাবস্থাকেও তিনভাগে ভাগ করা হয়। যেমন -

১. কলমের কচ দ্বারা লেখা শেষ করা। ب ت ث د ذ ط ظ ف ك ل প্রভৃতি বর্ণের পাদংশ কলমের কচ দিয়ে শেষ করতে হয়।

২. কলমের মাথার অংশ দিয়ে লেখা শেষ করা। এভাবে শুধু ألف-এর পাদংশকেই লিপিবদ্ধ করা হয়।

৩. কলম প্রসারণের মাধ্যমে লেখা শেষ করা। ج ح خ ر ز س ش ص ض ع غ ق م ن و هـ ي প্রভৃতি বর্ণের পাদংশ লেখার সময় কলমকে প্রসার করে লিখতে হয়।[১২৩]

আরবি হরফসমূহের আকৃতি ও যূথবদ্ধতা

ক্যালিগ্রাফির জন্য হরফের আকৃতি গঠন ও হরফে হরফে যূথবদ্ধতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'রাসাইলু ইখওয়ানিস সাফা'র প্রণেতা বলেন: "কোনো ব্যক্তি যখন ইচ্ছা করে যে, তার হস্তলিপি চমৎকার এবং সুশৃঙ্খল হবে, তাহলে তার উচিত হবে এমন একটি প্যাটার্ন বা ধরন মেনে চলা, যাতে তার হরফগুলো সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে প্রবাহিত হয়।"[১২৪] আরবি হরফসমূহের আকৃতি ও হরফে হরফে যূথবদ্ধতা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও বিজ্ঞানসম্মত।

উল্লেখ্য, আরবি হরফগুলোর আকৃতি ও যূথবদ্ধতা প্রথমদিকে সুশৃঙ্খল ছিল না। প্রাচীন কুফি লিপিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম প্রখ্যাত লিপিকার ইবনু মুকলাহ আরবি বর্ণের গঠনকে সঠিক পরিমাপ ও শৃঙ্খলা প্রদান করেন। তিনি প্রথম দেখিয়েছেন, আরবি বর্ণ ২৯টি হলেও এগুলোর মোট আকৃতি হচ্ছে মাত্র ১৯টি। আর এ বর্ণগুলো যখন যে স্টাইলে লেখা হয়, তখন সে স্টাইলের নিয়ম মেনে লেখা হয়। ধরা যাক, কুফি স্টাইলে লেখা হবে, এখানে ক্যালিগ্রাফারের একটি বিষয় গভীরভাবে দৃষ্টি দিতে হয়, তা হলো আলিফ মডিউল—আলিফ একক। এখানে কলমের নিচের প্রশস্ততাও

www.pathagar.com

বিবেচনায় রাখতে হয়। আলিফকে উল্লেখিত স্টাইলে পাঁচ/ছয় ফোঁটা লম্বা ধরে একটি বৃত্ত আঁকতে হয়, যা পুরো বর্ণ আকৃতির নিক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। এখন এর বিন্যাস হবে ঐ স্টাইলের অক্ষরের ভিত্তিতে। শব্দের মধ্যে ফাঁকগুলো, দুই লাইনের মধ্যে গ্যাপ, অক্ষরের উল্লম্ব রেখার কৌণিক বিস্তৃতি সব বিবেচনায় রাখতে হবে। যদি প্রধান উল্লম্ব রেখা ১০০° অথবা ৯০° হয়, তবে ঐ স্টাইলের বাকি উল্লম্বরেখাসমূহ ঐ অনুপাত অনুযায়ী হবে।

এভাবে নাসখি, সুলুস, রায়হানি, তাওকি, রিকা ও ফারসি প্রভৃতি স্টাইলগুলোতে এ গঠন ও বিন্যাস ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ও মাত্রা পেয়ে থাকে।

নাসখিতে শব্দে শব্দে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফাঁকা স্থান থাকে। অক্ষরগুলো সাধারণত গোটা গোটা হয়ে থাকে। অনুভূমিক ও উল্লম্ব উভয় রেখা সমান মাপের হয়ে থাকে। এর অক্ষরে বক্র ঢালটি গভীর ও সমান্তরাল।

সুলুস হচ্ছে ক্যালিগ্রাফির আশ্চর্যতম নিদর্শন। নমনীয় ও সাবলীল গতি এ স্টাইলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর বিন্যাস হচ্ছে ছন্দময় ও স্রোতের মতো সাবলীল। নদীর ঢেউ যেমন একটা নির্দিষ্ট ছন্দে ও মাত্রায় চলতে থাকে, সুলুস লিপিও তেমনি মাত্রা ও ছন্দ নিয়ে রচিত হয়।

রায়হানি স্টাইলেও অক্ষর বিন্যাস প্রায় সুলুসের মতো। তবে এর বক্র ঢালগুলো অপেক্ষাকৃত লম্বা ও চিকন। এর স্বরচিহ্নগুলো আলাদা চিকন কলমে লেখা হয়। সাধারণত দুই বাক্যের মাঝে বিরতি-চিহ্ন লাইনের ওপরে দেওয়া হয়। ফলে লাইনের স্বাভাবিক প্রবাহ বজায় থাকে।

তাওকি ও রিকা দুটি লিপি দ্রুত ধাবমান ঘোড়ার মতো। সেজন্য দৌড়রত ঘোড়ার অদৃশ্য পায়ের মতো এতে স্বরচিহ্ন অনুপস্থিত থাকে। ক্যালিগ্রাফারগণ এ লিপিদুটিকে নিজেদের লিপিচর্চার খসড়া হিসেবে ব্যবহার করেন। কারণ এ দুটি লিপির অধিক চর্চায় অন্যান্য নমনীয় লিপি আয়ত্তে আসে।

এভাবে বিভিন্ন স্টাইলের বর্ণের গঠন ও বিন্যাস ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় করা হয়েছে।[১২৫]

অলংকরণ মোটিফ হিসেবে আরবি লিখনশিল্পের ব্যবহার

শিল্পকলার ইতিহাসে আরবি লিপিকলা সৃজনশীল বৈশিষ্ট্যে ভরপুর। আরব লিপিশিল্পীগণ তাঁদের শিল্পকর্মে হরফের প্রকাশভঙ্গিকে জ্যামিতিক ফর্মে ফুটিয়ে তুলতেন। প্রাথমিক পর্যায়ে আরবি লিপি ডায়াক্রিটিক্যাল চিহ্নসহ জ্যামিতিক বিধি মেনে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়েছে। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, ইসলামের আর্বিভাবের পূর্বে ও পরে এর ব্যবহার হয়েছে। আরবি লিপিকলার উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি যে বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো–পবিত্র কুরআন, ধর্মীয় চেতনা ও বিধিনিষেধ শিল্পীদের এককভাবে লিপিকলার চর্চায় আত্মনিয়োগে সাহায্য করে। মুসলমানগণ প্রাথমিককালে কুরআন সংরক্ষণের তাগিদেই পাথর, চামড়া, কাঠের টুকরো, হাড় ইত্যাদির ওপর কুরআনের বিভিন্ন আয়াত খোদাই করে রাখতেন। এর কিছুকাল পরে কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করা হয় এবং তার অনুলিপি প্রণয়ন করা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। পবিত্র কুরআনের তাগিদেই তাঁদের লেখা যথাসম্ভব সুন্দর করা হতো। এভাবে আরবি লিপি দ্রুত মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারিত হতে থাকে এবং ক্রমশ এক পর্যায়ে গিয়ে শিল্পের রূপ

www.pathagar.com

পরিগ্রহ করে। খ্রিষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের পৃষ্ঠাগুলো লিপিকারগণ এমন অসামান্য দক্ষতা, জ্ঞান ও ধর্মীয় অনুভূতি সহকারে বিভিন্ন ধরনের অপূর্ব নকশাবলি দ্বারা অলংকৃত করেন যে, সেগুলো আজ পর্যন্ত বিমূর্ত শিল্পকলার ইতিহাসে সর্বোত্তম কৃতিত্ব হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে।[১২৬]

ইসলামে জীবজন্তুর ছবি এবং ভাস্কর্য নির্মাণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকায় মুসলমানরা হস্তলিপির প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ করে। অধিকন্তু এই বিষয়ে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উৎসাহ প্রদান ছিল এই শিল্পের বিকাশে অত্যন্ত সহায়ক। তদুপরি আরবি বর্ণমালা সমান্তরাল এবং লম্ব প্রকৃতির। তাই তাকে প্রয়োজনবোধে সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন করে অলংকরণের উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা যায়। উদ্ভিদীয় ও জ্যামিতিক পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে আরবি বর্ণমালা দিয়ে যে কোনোভাবে নকশা করা যায়। আরবি বর্ণমালার উল্লম্ব দণ্ড এবং অনুভূমিক ও চক্রাকৃতি রেখা বর্ধিত ও হ্রাস করে শিল্পীগণ অলংকরণের পরিমণ্ডলে সৌন্দর্যের এক মনোরম ছন্দ সৃষ্টি করেন। উপরন্তু, আরবি অক্ষরের অনুভূমিক ও অর্ধাবৃত্তাকৃতি রেখা দ্বারা অলংকরণের এক একটি ইউনিটের জন্য বর্গাকৃতি পরিসর, বৃত্তাকার, ত্রিভূজাকার ও ডিম্বাকার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে শিল্পীগণ অলংকরণ প্রক্রিয়ায় গতি ও প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন এবং দর্শকদের নিকট সাজসজ্জাকে উপভোগ্য করে উপস্থাপন করেন। অলংকরণের প্রয়োজনে সৃষ্ট হস্তলিখনশিল্পের সারিতে এক সজীব প্রাণ স্পন্দন লক্ষ করা যায়। কাজেই কেবল লিখনশিল্পের কার্যকারিতা হিসেবে আরবি হস্তলিখনশিল্প বিকাশ লাভ করেনি; বরং অলংকরণ ও সাজসজ্জার উপকরণ হিসেবে তা সমাদৃত হয়েছে।[১২৭] ইসলামি সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলে খ্যাত আব্বাসীয় খিলাফতে অসংখ্য হস্তলিপির স্টাইল বা রীতির উদ্ভব হয়, যা বর্তমানে বিলীন হয়ে গেছে। এই যুগে আরবি লিপিমালার সকল শৈল্পিক প্রয়োজনীয়তা ও মাধুর্যের চরম বিকাশ ঘটে। আরবি হস্তলিখনপদ্ধতির প্রকারভেদ এবং রসোত্তীর্ণ শিল্পমাধ্যম হিসেবে এর ব্যবহার দেখে অবাক হতে হয়।

এ পর্যন্ত যে সমস্ত লিপিশিল্পের কথা জানা যায় তন্মধ্যে আরবি লিপিশিল্প ছাড়া চীন ও জাপানের লিপিশিল্পই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত দেশ দুটিতে ছবি আঁকা শুরু করতে হয় ক্যালিগ্রাফি দিয়ে। তবে আরবি ছাড়া অন্য কোনো দেশের বর্ণমালা এত সুন্দর করে আঁকা সম্ভবপর হয় না।

উল্লেখ্য, আরবদের আগে পৃথিবীর কোনো জাতি শিল্প হিসেবে হস্তলিপির চর্চা করেনি। বলতে গেলে, তারাই লিপিশিল্পকে জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে এবং অন্যান্য শিল্পের ওপর একে প্রাধান্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-বিজ্ঞান রূপে একে সাজিয়ে তুলেছে। তাদের এ লিপিশিল্পকে 'আর্ট অব হেভেন' বলা হয়। এর দৃষ্টিনন্দন কারুকার্য ও নিপুণ আঁচড় এ উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছে। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন,

> Calligraphy is perhaps the only Arab art which today has Christian and Moslem representatives in Constantinople, Cairo, Beirut and Damascus whose productions excel in elegance and beauty any masterpieces that the ancients ever produced.
>
> লিপিশিল্প সম্ভবত আরবদের একমাত্র শিল্প, যা আজও কনস্টান্টিনোপল, কায়রো, বৈরুত ও দামিশকে খ্রিষ্টান ও মুসলিম লিপিকারগণ চর্চা করে থাকেন, যা সৌন্দর্যের দিক দিয়ে প্রাচীনদের প্রবর্তিত যে কোনো শিল্পের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে।[১২৮]

www.pathagar.com

তবে এই শিল্পের উৎপত্তি ও প্রাথমিক পর্যায়ের বিকাশ যদিও আরবদের হাতে শুরু হয়; কিন্তু এর পূর্ণবিকাশ ও উৎকর্ষ সাধিত হয় পারস্যবাসীদের দ্বারা।[১২৯] বলতে গেলে, তাদের হাতেই এ শিল্প ইতিহাসের বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে এখনো তার চিরন্তন, সক্রিয় ও প্রভাবশালী উপস্থিতি বজায় রেখেছে।

আশ্চর্যের বিষয়, এর সাংস্কৃতিক বিকাশ এমনভাবে বর্ধিত হয় যে, উমাইয়া শাসনামল থেকে শুরু করে আব্বাসীয় শাসনামলে এটা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। আরবি ক্যালিগ্রাফির শিল্পসুষমায় মুগ্ধ হয়ে মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসসংক্রান্ত আরবি বাণী অমুসলিম শাসক ও শিল্পানুরাগীরা তাদের মুদ্রা ও স্থাপত্যে উপস্থাপন করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ৮ম শতাব্দীর মরিসাস খ্রিষ্টান শাসক আফ্ফা (৭৫৭-৭৯৬ খ্রি.) তাঁর মুদ্রায় কুফি লিখনপদ্ধতিতে অলংকরণ বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল রেখে মুসলমানদের কালিমা উৎকীর্ণ করেন (দ্র. চিত্র-৪২)। খ্রিষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে ব্রোঞ্জ নির্মিত একটি আইরিশ ক্রুশের মধ্যস্থলে কুফি লিখনপদ্ধতিতে 'বিসমিল্লাহ' উৎকীর্ণ হয়েছে (দ্র. চিত্র-৪৩)। আরবি 'অ্যারাবেস্ক' ম্যাজিকের মতোই ইউরোপে প্রভাব ফেলেছে। ইতালি, স্পেন এবং ফ্রান্সের গির্জা সমাধির অলংকরণে সাবলীল লিপিকলা মোটিফ হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে।[১৩০] স্কট উল্লেখ করেন, খ্রিষ্টানদের অজান্তেই কুফি লিপিশৈলীর মাধ্যমে কুরআনের বাণী গির্জার প্রাচীরে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। যেমন সেন্ট পিটারের প্রসিদ্ধ গির্জার সুউচ্চ ফটকে আরবি লিপির কালিমা শোভিত বাণী খোদাই করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা ধর্মীয় কোনো চেতনার প্রতিফলন নয়; এটা আরবি লিপির এমন এক শৈল্পিক অভিব্যক্তি, যা শিল্পীকে নিজের অজান্তেই আন্দোলিত করেছে।[১৩১] চতুর্দশ শতাব্দীর রেঁনেসা চিত্রকর জিওট্টো (Giotto) ও ভেনিজিওনোর চিত্রকর্মে কুফিরীতিতে আরবি নকশা পাওয়া যায়। এমনকি বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিল্পী পল ক্লি, যিনি বহু দিন তিউনিসে অবস্থান করেন, তাঁর 'হারবার ইন ব্লুম' (Harbour in Bloom) শীর্ষক চিত্রে 'মুহম্মদ' শব্দটি কুফিরীতিতে অঙ্কিত করেন। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, আরবি লিপিকলার সাংস্কৃতিক বিকাশ অন্যান্য লিপিকলার চাইতে উৎকৃষ্ট বা নয়নাভিরাম না হলে বিভিন্ন অমুসলিম দেশে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের স্থাপত্যে অলংকরণ প্রক্রিয়ায় আরবি লিপিকলা এক মর্যাদাপূর্ণ স্থান পেত না।

চিত্র-৪২: কুফিরীতিতে কালিমা, মর্সিয়ার রাজার আফ্ফার স্বর্ণমুদ্রা, স্পেন, অষ্টম শতাব্দী

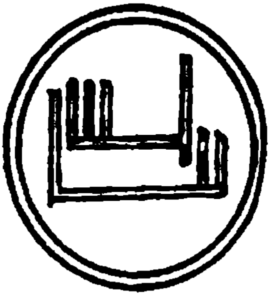

চিত্র-৪৩: কুফিরীতিতে বিসমিল্লাহ আইরিশ ক্রুশ, নবম শতাব্দী

www.pathagar.com

বর্তমান সময়ের প্রখ্যাত লিপিশিল্পী কামাল বাউল্লতা (জন্ম ১৯৪২ খ্রি.) তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, অ্যারাবেস্কের জ্যামিতিক এবং ফুলেল নকশার সাথে আরবি হরফের বৈশিষ্ট্যগত আশ্চর্য মিল পাওয়া যায় (দ্র. চিত্র-৪৪)। এ কারণেই বর্তমানে ড্রয়িং, পেইন্টিং এবং স্থাপত্যে এর বিস্ময়কর প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। পেইন্টিং সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারায় উন্নতি লাভ করেছে। এর একটি শাখা ক্যালিগ্রাফিতে নিমগ্ন। কামাল বাউল্লতা, হুসায়ন জেন দরুদি (জন্ম ১৯৩৭), রশিদ কুরাইশি (জন্ম ১৯৪৭) ও সা'ঈদ হাসসান শাকির (জন্ম ১৯২৫) প্রমুখ ক্যালিগ্রাফার পেইন্টিংয়ে ক্যালিগ্রাফিকে একটি মর্যাদাবান স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সা'ঈদ শাকির মাদ্রিদে পেইন্টিং ও এনগ্রেভের মাধ্যমে শিল্পকর্ম তৈরি করেছেন। তার কাজে সভ্যতার ক্রমবিকাশ, উপাদান, রং ও রেখার সমন্বয় প্রকাশ পায়। রশিদ কুরাইশি আধুনিক ক্যালিগ্রাফিতে নতুন আবহ এনেছেন। চীনা হরফের সাথে আরবি হরফের কম্পোজিশনের এক মোহনীয় রূপ তৈরি করেছেন (দ্র.চিত্র-৪৫)।

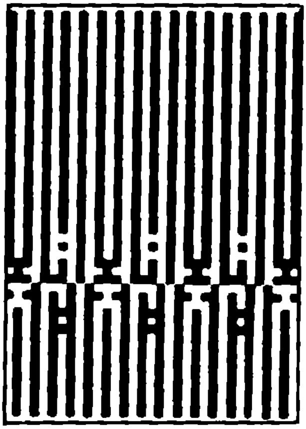

চিত্র-৪৪: ক্যালিগ্রাফি কম্পোজিশন, কামাল বাউল্লতা চিত্র-৪৫: ক্যালিগ্রাফি কম্পোজিশন, রশিদ কুরাইশি

তথ্যসূত্র

১ ইয়াকুব আলী, *মুসলিম মুদ্রা..*, পৃ ৩০৬; *মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা*, পৃ ২৬৫-৬।

২ ইজাম: এর আভিধানিক অর্থ অস্পষ্টতা (عجمة) দূরীভূত করা। এটি আরবদের প্রচলিত প্রবচন- أعْجَمْتُ الكِتَابَ. (অর্থাৎ আমি গ্রন্থের অস্পষ্টতা দূরীভূত করলাম) থেকে গৃহীত। এখানে হামযাটি দূরীভূত করা (سلب) অর্থ বোঝানোর জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। নুকতা প্রয়োগ বা বর্জনের মাধ্যমে আরবি বর্ণগুলোর অস্পষ্টতা দূরীভূত করা হয় বলে এগুলোকে حُرُوفُ المُعْجَمِ বলা হয়। (ইবনু মানযুর, আবুল ফাদ্ল জামালুদ্দীন, *লিসানুল আরব*, ইরান: নাশরু আদবিল হাওযা, কুম, ১৪০৫ হি., খ১২, পৃ ৩৮৭-৩৮৯; রাগিব ইস্পাহানি, আবুল কাসিম হুসায়ন, *আল-মুফরাদাত ফি গারীবিল কুরআন*, মিসর: দাফতারু নাশরিল কিতাব, ১৪০৪হি., পৃ ৩২৩-৪)।

www.pathagar.com

৩ কালকাশান্দি, *প্রাগুক্ত*, খ ৩, পৃ ১৫৩-৪।

৪ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬১।

৫ আল-আসাদ, নাসিরুদ্দীন, *মাছাদিরুশ শি'রুল জাহিলি*, কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৬, পৃ ৩৪-৪১।

৬ ইবনুন নাদীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪-৫।

৭ বর্ণিত রয়েছে,. إنَّ الصَّحَابَةَ جَرَّدُوا الْمُصْحَفَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى مِنَ النُّقَطِ وَ الشَّكْلِ - "সাহাবিগণ মুসহাফকে প্রত্যেক কিছু থেকে, এমনকি নুকতা ও স্বরচিহ্ন প্রয়োগ থেকেও মুক্ত রেখেছেন"(তাশকুবরি যাদাহ্, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ৮৬)। উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, সাহাবিগণের নুকতার জ্ঞান ছিল। তবে তাঁরা মুসহাফে উসমানীতে বর্ণিত কুরআনের বর্ণগুলোর ওপর অতিরিক্ত কিছু বাড়ানোকে অশোভনীয় মনে করতেন। যদি তাঁদের যুগে নুকতার অস্তিত্ব না-ই থাকত, তাহলে তা থেকে কুরআনকে মুক্ত রাখার প্রশ্নই ওঠত না।

৮ *Encyclopedia of Islam*, Article: Arabic, vol.1, p 382; Abbott, op.cit., p 38.

৯ Abbott, *op.cit.*, plate no-4 ; রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬১।

১০ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ ৯, পৃ ৪৫৫-৬; তাওকান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৭৭৮।
এতে প্রয়োজনানুযায়ী অক্ষরগুলোতে বিন্দু ব্যবহার করা হয়েছে। ث -এর ত্রিকোণ তৈরিকারী বিন্দুত্রয় সাধারণত যেভাবে বসানো হয় এতে তা উল্টোভাবে বসানো হয়েছে। ن ও ب -এর বিন্দুগুলোকে অক্ষরগুলোর মাথার ওপরে কিংবা নিচে বসানো হয়েছে। শেষস্থিত দীর্ঘায়িত ب -এর নুকতাকে অনুভূমিক রেখার নিচে মধ্যস্থলে বসানোর পরিবর্তে তার প্রথমে উত্থিত মাথার নিচে বসানো হয়েছে। যেমন ب -এর পরিবর্তে তদ্রূপ ت ও ي বিন্দুগুলো তেরচাভাবে বসানো হয়েছে।

১১ এ প্রসঙ্গে হজরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
جَرِّدُوا الْقُرْآنَ لِيَرْبُوَ فيه صَغِيرُكم ولا يَنْأى عنه كَبِيرُكُم.
"কুরআনকে (অন্য কিছুর মিশ্রণ থেকে) মুক্ত রাখো, যাতে তোমাদের ছোটরা কুরআন নিয়ে চিন্তা করতে করতে বড়ো হয় এবং বড়োরাও যাতে কুরআন থেকে দূরে সরে না যায়।" (আয-যামাখশারি, *আল-ফায়িক ফি গারীবিল হাদীস*, খ ১, পৃ ২০৫)।

১২ তাঁরা দুইজনেই হজরত আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালির শাগরিদ ছিলেন।
তবে কারো কারো মতে, হাসান আল-বাসরি (৬৪২-৭২৮ খ্রি.) ও ইয়াহ্য়া ইবনু ইয়ামুর (মৃ.৭৪৬ খ্রি.) সর্বপ্রথম নুকতা প্রণয়ন করেন (সুয়ূতি, জালালুদ্দীন, *আল-ইতকান ফি উলূমিল কুরআন*, খ ৪, পৃ ১৮৪)। কেউ কেউ মনে করেন, সর্বপ্রথম হজরত আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালি (রা.)ই হজরত আলী (রা.)-এর নির্দেশনায় অক্ষর পৃথককরণের জন্য নুকতা প্রণয়ন করেন (তাশ কুবরি যাদাহ্, *প্রাগুক্ত*, খ ১৪, পৃ ৮৬)। এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ, তিনি আরবি অক্ষরে যে নুকতা প্রবর্তন করেছিলেন তা ছিল হরকত তথা স্বরচিহ্নের উদ্দেশ্যে; অক্ষর পৃথককরণের জন্য নয় (জাওয়াদ আলী, *প্রাগুক্ত*, খ ৮, পৃ ১৮৭)।

১৩ উবাদাহ্, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২৮।

১৪ বাদাভি, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩০; Safadi, *op.cit.*, p14.

১৫ উবাদাহ্, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২৮।

১৬ এর কারণ হলো—নুকতাবিহীন কুরআনই হলো মূল কুরআন। রাসুলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবা কিরাম (রা.)-এর সময় কুরআনে অক্ষর পরিচিতির জন্য কোনো নুকতা ব্যবহারের প্রচলন ছিল না। যেহেতু তাঁরা ছিলেন আরব, তাই কুরআন তিলাওয়াতে তাঁদের কোনো ধরনের ভুল হতো না। এ কারণে তখন কুরআনে নুকতা ব্যবহারে অনেকের আপত্তি ছিল। হজরত আবদুল্লাহ মাসউদ (রা.) বলেন, . جَرِّدُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَخْلِطُوهُ بِشَيْءٍ " কুরআনকে (অন্য

www.pathagar.com

কিছুর মিশ্রণ থেকে) মুক্ত রাখো এবং তাকে কোনো কিছুর সাথে মিশ্রিত করো না" (সুয়ুতি, *আল-ইতকান*, খ ৪, পৃ ৪৩২)।

১৭ ফারিহা, আনিস, *আল-খাত্তুল আরবি: নাশআতুহু ও মাশকিলাতুহু*, বৈরুত: দ্যা অ্যামেরিকান ইউনিভার্সিটি অব বৈরুত, ১৯৬১, পৃ ৪৮-৫১।

১৮ তাওকান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৭৭৯।

১৯ Drangor, D., *Alphabet*, Newyork, 1948; p 276.

২০ *Encyclopedia of Islam*, vol.1, p 363.

২১ যয়দান, জুরজি, *তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যা*, বৈরুত: দারু মাকতাবিল হায়াত, তা.বি., খ ১, পৃ ২২৪।

২২ কালকাশান্দি, *প্রাগুক্ত*, খ ৩, পৃ ১৫৫-৬।

২৩ তাশকিলের অর্থ হলো: বর্ণগুলোতে হরকত প্রদান করা। এটি আরবি বচন- شَكَّلْتُ الْكِتَابَ وَ أَشْكَلْتُهُ. (আমি গ্রন্থটিতে হরকত প্রদান করলাম) থেকে গৃহীত। (ইবনু মান্যুর, *প্রাগুক্ত*, খ ১১, পৃ. ৩৫৮) কেউ কেউ মনে করেন, شَكْل -এর মূল অর্থ হলো: পশু-প্রাণীকে দড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাঁধা। যেমন বলা হয়—شَكَلْتُ الدَّابَّةَ. (আমি প্রাণীটিকে রশি দিয়ে বাঁধলাম)। আর যে রশি, দড়ি দিয়ে প্রাণীকে বাঁধা হয় তাকে شِكَال (fetter) বলা হয়। এ অর্থের সাথে সঙ্গতি রেখে বলা হয়- شَكَلْتُ الْكِتَابَ (অর্থাৎ আমি গ্রন্থটিতে হরকত প্রদান করলাম)। কেননা বর্ণগুলোতে যখন হরকত প্রদান করা হয়, তখন তাকে বিভিন্ন রূপে পড়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায়, যেমন রশি পশু-প্রাণীকে পালিয়ে যেতে বাধা দেয় (রাগিব ইস্পাহানি, *আল-মুফরাদাত*, পৃ. ২৬৬)। তবে এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এর মূল অর্থ 'আকৃতি' থেকে এটি গৃহীত হয়েছে। কেননা বর্ণগুলোতে হরকতের ব্যবহার করা হলে তাদের সঠিক রূপ ও আকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় (আবু সিক্কিন, *ফিকহুল লুগাহ*, পৃ ১১৭)।

২৪ ইতিহাসের প্রাচীনতম কাল থেকে সেমিটিকরা অ্যাসিরিয়া, ব্যাবিলন, ফিনিশিয়া, ইয়েমেন ও হিজাজ প্রভৃতি এলাকায় তাদের ভাষাগুলো হরকত ছাড়াই লিপিবদ্ধ করত। তারা হরকত উদ্ভাবনের কোনো প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেনি। সর্বপ্রথম সিরীয়রা খুব সম্ভব খ্রিষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর দিকে ভাষার পঠনের ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি থেকে বাঁচার জন্য হরকতের প্রচলন করে।

২৫ আস-সাবুনি, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২২৪; মুস্তাফিজুর রহমান, ড. মুহাম্মদ, *কুরআন পরিচিতি*, ঢাকা: নুবালা পাবলিকেশন্স, পৃ ২১১।

২৬ আবু সিক্কীন, *ফিকহুল লুগাহ*, কায়রো: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, ১৯৮১, পৃ ১১৪-১১৫; রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬০।
নুকতা প্রয়োগের মাধ্যমে স্বরচিহ্ন প্রদানের রীতি কে সর্বপ্রথম প্রণয়ন করেন—এ নিয়ে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। কারো মতে- নসর ইবনু আসিম আল-লায়সী, আর কারো মতে—ইয়াহ্য়া ইবনু ইয়ামুর আল-উদওয়ানি (রাহ.), আবার কারো মতে—হাসান আল-বাসরি (রাহ.)ই সর্বপ্রথম এ রীতি প্রণয়ন করেন (সুয়ুতি, *আল-ইতকান*, খ ২, পৃ ২১৮)। তবে অধিকাংশের মতে, সর্বপ্রথম আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালি (রাহ.)ই এ রীতি প্রবর্তন করেন (যায়দান, *তারীখুদ তামাদ্দুনিল ইসলামি*, খ ৩, পৃ ৬১)।

২৭ আবু সিক্কীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১১৫-৭; রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬০।

২৮ উল্লেখ্য, গ্রিকগণ (এবং তাদের নিকট থেকে লিপিবিদ্যা শিক্ষাগ্রহণকারী ল্যাটিনিগণ) তাদের ভাষার বর্ণমালা থেকে কতগুলো ব্যঞ্জন বর্ণ বাদ দিয়ে তদস্থলে কতগুলো স্বরবর্ণ সংযোজন করেছিল; কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষার লিপিতে উচ্চারণগত ভুল-

www.pathagar.com

ভ্রান্তির অবকাশ হ্রাস পায়নি। (সেমেটিক ভাষাসমূহ YOU—যার শেষ বর্ণের সঠিক উচ্চারণ ی নয়; বরং ا، -এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। গ্রিক ভাষায় বর্ণমালায় এদেরকে সংযোজিত করার পরও IUA -এর শুদ্ধ উচ্চারণের সমস্যা থেকে গ্রিকগণ মুক্তি পায় নাই।) আরবি ভাষায় আলিফ, ওয়াও ও ইয়া—এ তিনটি বর্ণ দীর্ঘ হরকত প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং হ্রস্ব হরকতের জন্য কোনো বর্ণ ব্যবহার না করে তার স্থান বুঝে নেওয়ার দায়িত্ব পাঠকের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষায় উক্ত তিনটি স্বরবর্ণ হ্রস্ব হরকত প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং এদের দ্বারা কখনও দীর্ঘ হরকত প্রকাশ করা হলে তা শুধু অনুমানের ভিত্তিতে পাঠককে বুঝে নিতে হয়। তাছাড়া গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষায় এই ত্রুটি সৃষ্টি হয়ে যায় যে, স্বরবর্ণগুলিকে হ্রস্ব হরকত প্রকাশক বর্ণ নির্ধারিত করার ফলে প্রতিটি শব্দে তাদের ব্যবহার তিন-চার গুণ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শব্দ লেখার জন্য অধিক স্থানের প্রয়োজন হয়- যা এক ধরনের অপচয় বটে এবং লিপিকারকেও লিপিকার্যে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়। আরবি লিপিবিদ্যা হ্রস্ব হরকতসমূহ প্রকাশের জন্য জবর, জের, পেশ ইত্যাদি চিহ্ন উদ্ভাবন করেছে। কোনো শব্দে যখন উক্ত চিহ্ন সম্পূর্ণ ও যথাযথরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন তার উচ্চারণে ভুল-ভ্রান্তি ঘটার অবকাশ বা আশঙ্কা থাকে না। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রচলিত ভাষাসমূহের কোনো ভাষার লিপিপদ্ধতিই এ দিক দিয়ে আরবি ভাষার লিপিপদ্ধতির সাথে মুকাবিলা করতে পারে না (*ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ ৯, পৃ ৪৫৬)।

২৯ Safadi, *op.cit.*, p 13.

৩০ কিতাবাতুল মুসহাফ, *মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যা*, রিয়াদঃ গবেষণা, ইফতা, দাওয়া ও ইরশাদ বিভাগ, খ ৬, পৃ ২১।

কিন্তু প্রথম পর্যায়ে কুরআনে নুকতা ও হরকত ব্যবহারে অনেকেই বিরোধিতা করেছিল। নুখামি (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি কুরআনে নুকতা ও হরকতের ব্যবহারকে অপছন্দ করতেন। ইবনু সিরীন (রাহ.) একে মাকরুহ মনে করতেন। শুধু তা-ই নয়; এমনকি তাঁরা সুরার প্রথমে সুরার নাম, আয়াত ও রুকুর সংখ্যা ইত্যাদি লেখাকেও অগ্রহণযোগ্য মনে করতেন। ইবনু আবি দাউদ (রাহ.) বর্ণনা করেন, একবার ইমাম নুখামি (রাহ.)-এর নিকট একখানা কুরআন আনা হলো। তাতে লেখা ছিল অমুক সুরা, এত আয়াত। তিনি বললেন, এগুলো মুছে দাও। কারণ, ইবনু মাসউদ (রা.) এটাকে মাকরুহ মনে করতেন। তবে পরবর্তীকালে কুরআনে এসব লেখা সবাই মেনে নেন।

৩১ ভাষার লিপি যেহেতু প্রকৃতপক্ষে সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষী লোকদের পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়ে থাকে এবং যেহেতু শুধু সংকেতই তাদের পঠন-পাঠনের জন্য যথেষ্ট, তাই কোনো রূপ ভ্রান্তির অবকাশ নেই এমন বাক্যে কোনো শব্দের কোনো হরকত তুলে দিলে তাতে সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষী লোকদের কোনো রূপ অসুবিধা হয় না। এটাই নিজের মাতৃভাষা সম্বন্ধে প্রত্যেক মানুষের অভিজ্ঞতা। যেমন কোনো ইংরেজ এ অভিযোগ করে না যে, hades, fall, father, at, hare, real, calender, heap ও bureau—এদের বানানে a বর্ণটির উচ্চারণ প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে স্বতন্ত্র। ফরাসি, জার্মান, ইটালিয়ান, রুশ প্রভৃতি ভাষার অবস্থাও ঐরূপ। উর্দুভাষী বা আরবিভাষী স্বল্প শিক্ষিত লোকেরাও তাদের নিজ নিজ ভাষায় লিখিত শুধু সেই সকল শব্দ পাঠে ভুল করে থাকে, যা অল্প ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং কোনো বিদ্বানের মুখে উচ্চারণ করতে শোনেনি।

৩২ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২৭; রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬০।

৩৩ হাজি খলিফা, মুস্তাফা আর-রুমি, *কাশফুয যুনুন*, বাগদাদঃ মাকতাবাতুল মুসন্না, ১৯৪১, খ ১. পৃ ৭১৩; রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬০।

www.pathagar.com

৩৪ কালকাশন্দী, *প্রাগুক্ত*, খ ৩, পৃ ১২-১৪; তাওকান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৭৮০।

৩৫ লিপির এ পদ্ধতিটি 'নাস্তুরি সিরীয় রীতি' নামে পরিচতি ছিল। ভারতবর্ষে এটি 'কালদানি রীতি' নামে পরিচিতি লাভ করে।

৩৬ এ পদ্ধতিটি ইয়াকুব আর-রাহাভি উদ্ভাবন করেন বলে একে তার দিকে সম্বন্ধ করে 'সিরীয়-ইয়াকুবি রীতি' নামে অভিহিত করা হয়। এ রীতিতে মোট ৭টি স্বরচিহ্নের ব্যবহার রয়েছে (যায়দান, *তারীখুত তামাদ্দুনিল ইসলামি*, খ ৩,পৃ ৬১; ওয়াফি, *ফিকহুল লুগাহ*, পৃ ৬৮, ২৫৪)।

৩৭ জাওয়াদ আলী, *প্রাগুক্ত*, খ ৮, পৃ ১৯১।

৩৮ আবজদ (أبجد) : মুখস্থ করার সুবিধার্থে আরবি ২৮টি বর্ণকে ভাগ করে যে আটটি শব্দে বিন্যস্ত করা হয়েছে, আবজদ এগুলোর মধ্যে প্রথম শব্দ। আরব-মাশরিকে এ শব্দগুলোর ক্রম সাধারণত এরূপ–أبجد, هوز, حطي, كلمن, سعفص, قرشت, ثخذ, ضظغ আর আরব আল-মাগরিবে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও অষ্টম শব্দের মধ্যে অক্ষরপুঞ্জের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। নিম্নে সে পার্থক্য দেখানো হলো: أبجد, هوز, حطي, كلمن, صعفض, قرست, ثخذ, ظغش। আরব-প্রাচ্য ক্রমের প্রথম ছয়টি অক্ষরপুঞ্জে ফিনিশীয় ভাষার বর্ণমালার ক্রম যথাযথভাবে বর্তমান রয়েছে। শেষের দুটি অতিরিক্ত অক্ষরপুঞ্জে শুধু আরবিতে ব্যঞ্জনবর্ণগুলোই একত্র করা হয়েছে। এজন্য দুটিকে روادف (বাহনের পশ্চাদাংশে আরোহণকারী) বলা হয়। আরবি বর্ণমালার এ আবজদি বিন্যাস যদিও নিশ্চিতই বহু পুরাতন; তথাপি বর্ণের ধ্বনি কিংবা সাথে এগুলোর কোনো বিশেষ সামঞ্জস্য নাই। প্রথম ২২টি বর্ণের বিন্যাস রাস্ শাম্মারায় আবিষ্কৃত একটি প্রাচীন ফলকেও রয়েছে। এই ফলকে খ্রি.পূ. চতুর্দশ শতাব্দীর উগারিতদের ব্যবহৃত তীরাক্ষর বর্ণমালারও তালিকা রয়েছে। উগারিতদের ভাষা প্রাচীন হিব্রু ভাষার সাথে সম্পর্কিত একটি সেমিটিক ভাষা। সুতরাং এ আবজদি বিন্যাসের মূলত কিন'আনি হওয়া নিশ্চিত। কিন্তু এটাও সত্য যে, হিব্রু ও অ্যারামি বর্ণমালাতেই এ বিন্যাস প্রণালি বর্তমান আছে এবং নিঃসন্দেহে আরবরা হিব্রু বর্ণগুলো এই ক্রমবিন্যাস প্রণালিসহ উক্ত ভাষা থেকে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আরবি বর্ণমালার এ বিন্যাস প্রক্রিয়া সম্পর্কে কয়েকটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনাও রয়েছে। যেমন—একটি বর্ণনা এই যে, মাদয়ানের ছয়জন বাদশাহ আরবি বর্ণমালাকে তাদের নামানুসারে বিন্যস্ত করেছিলেন। আর একটি বর্ণনা হলো—বর্ণমালার ক্রমবিন্যাসের প্রথম ছয়টি শব্দ ছয়জন দেবতার নাম। তৃতীয় আর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে—এগুলো সপ্তাহের সাত দিনের নাম। আরব ভাষাতত্ত্ববিদদের মধ্যে অনেকেই এসব বর্ণনা বিশ্বাস করতেন না; বরং এগুলো কাল্পনিক কাহিনি বলে উড়িয়ে দিতেন। তাঁরা পরিষ্কার বলেছেন, এ সমস্ত মুখস্ত করার পক্ষে সহায়ক শব্দ; আরবি নয় (*ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ ১, পৃ ৪৪২)।

৩৯ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২৪।

৪০ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ ২, পৃ ৪৩৫।

৪১ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪১১।

৪২ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬১-৬২।

৪৩ 'মুহাররির' অর্থ লেখক। ইসলামের প্রাথমিককালে এ শব্দটি সুদক্ষ লিপিশিল্পীদের উপাধি হিসেবে বহুলভাবে ব্যবহৃত হতো। আর কুতবা ছিল এ উপাধিতে ভূষিত সর্বপ্রথম নিপুণ লিপিশিল্পী। এর দীর্ঘদিন পর এ শব্দের পরিবর্তে সুদক্ষ লিপিকারদের জন্য একচ্ছত্রভাবে 'খত্তাত' (Calligrapher) শব্দ ব্যবহার হতে লাগে (জাব্বুরি, *প্রাগুক্ত*, খ ১,পৃ ১৩৮)।

৪৪ Grohmann, A., *From the World of Arabic Papayri*, P 77.

৪৫ *Ibid*, P 78.

www.pathagar.com

৪৬ 'তুমার' শব্দের অর্থ এক হাত প্রস্তবিশিষ্ট বড়ো ধরনের পাতা। এ লিপি খলিফাগণ বিভিন্ন অনুলিপি ও রাজা-বাদশাহ ও বড়ো বড়ো লোকের নিকট প্রেরিত চিঠিপত্র ও নিদের্শনামা প্রভৃতিতে স্বাক্ষর করার কাজে ব্যবহার করতেন।

৪৭ 'মুখতাসারুত তুমার' মন্ত্রীবর্গ ও সরকারি প্রতিনিধিগণ বিজ্ঞপ্তি অনুমোদন এবং গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র লেখার কাজে ব্যবহার করতেন।

৪৮ 'মুদাওয়ার' লিপিশৈলীকে সরকারের দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড এবং হাদিস ও কবিতা লেখার কাজে ব্যবহার করা হতো।

৪৯ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, ৬২; নাজি, যায়নুদ্দীন, *বাদা'ইয়ুল খাত্তিল আরবি*, পৃ ৩৪।

৫০ এটি মহিলা ও প্রাসাদের অভ্যন্তরে অবস্থানরত রাজপরিবারের সদস্যবর্গের চিঠিপত্রের লিখনপদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

৫১ উহুদ দ্বারা বিভিন্ন প্রকার চুক্তিপত্র ও অঙ্গীকারনামা লিপিবদ্ধ করা হতো।

৫২ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬২।

৫৩ *ইবনুন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ ৬; কুরদি, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৮; রিফা'ঈ, প্রাগুক্ত*, পৃ ৬৬।

৫৪ ইবনু কুতায়বা, *আল-মা'আরিফ*, পৃ ৪৭০, ৫৭৭; ইবনু খাল্লিকান, *ওফায়াতুল আ'ইয়ান*, খ ৪, পৃ ১৪০-৯।

৫৫ আল-মুনজিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৮২।

৫৬ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬৭।

৫৭ পরবর্তীকালে এর জন্য ইয়ার নিচের অংশবিশেষ ব্যবহার হতে থাকে।

৫৮ হুফনি বেগ নাসিফ, *তারীখুল আদাব ওয়া হায়াতুল লুগাতিল আরাবিয়া*, পৃ ৯৬; বাদাভি, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৩০-১।

৫৯ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬৯।

৬০ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬৯; মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২৭।

৬১ Safadi, *op.cit.*, p 18.

৬২ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৭০।

৬৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৭১।

৬৪ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ ৯, পৃ ৪৫৬।

৬৫ সিদ্দিক, মুহাম্মদ ইউসুফ, আল-খত্তুল আরবি ওয়া আছরুহুল হাদারি, আল-জামি'আতুল ইসলামিয়া, *আল-জামি'আতুল ইসলামিয়্যা লিল 'উলুমিল ইসলামিয়্যাহ*, লন্ডন, বর্ষ-১, সংখ্যা-২, এপ্রিল-জুন ১৯৯৪, পৃ ১৭৮।

৬৬ 'উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১১৯।

৬৭ বাংলা ভাষা ও আলবেনীয় ভাষাকে এর দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

৬৮ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ ৯, পৃ ৪৫৭।

৬৯ কালকাশান্দি, *প্রাগুক্ত*, খ ৩, পৃ ৬২; আল-জাব্বুরি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ২৯৫।

৭০ ইয়াকুব আলী, *মুসলিম মুদ্রা..*, পৃ ৩৬৬।

৭১ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৭৫।

৭২ কালকাশান্দি, *প্রাগুক্ত*, খ ৩, পৃ ১০৪; আল-কুরদি, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১০৩; রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৭৫।

৭৩ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২৯।

৭৪ Ganam, N.M., *Development of Muslim Calligraphy in India*, Paper presented in South Asian Workshop on Epigraphy, Mysore, Department of Epigraphy, March, 25.31.1985, P 27.

www.pathagar.com

৭৫ কেউ কেউ বিহারের বারি দরগাহের শিলালিপিটিকে অলংকৃত নাসখি লিপির একটি প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। (Mustafizur Rahman, *op. cit*. P. 183) এ মতটি সঠিক নয়। সম্ভবত তাঁরা সুলুস লিপি থেকে নাসখি লিপিকে পার্থক্য করতে পারেননি।

৭৬ সিদ্দীক, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৮৩।

৭৭ আবদুর রহীম, মুহাম্মদ, ইসলামিক ক্যালিগ্রাফিতে খুলুখ লিপি, *দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকা*, ৩ এপ্রিল, ১৯৯৮, পৃ ৬।

৭৮ Safadi, *op cit*. P 19. y.

৭৯ কালকাশান্দি, *প্রাগুক্ত*, খ ৩, পৃ ৫২; রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৮৬।

৮০ কালকাশান্দি, *প্রাগুক্ত*, খ ৩, পৃ ৫৩; রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৭৩।

৮১ কালকাশান্দি, *প্রাগুক্ত*, খ ৩, পৃ ৫৫; রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৭৩।

৮২ কালকাশান্দি, *প্রাগুক্ত*, খ ৩, পৃ ৫৫; রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৭৩।

৮৩ কালকাশান্দি, *প্রাগুক্ত*, খ ৩, পৃ ৫৯; রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৭৪।

৮৪ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৮৮।

৮৫ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২৯।

৮৬ আবদুর রহীম, *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, পৃ ৫৩।

৮৭ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩০।

৮৮ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৮৪।

৮৯ Ziauddin, *op.cit*. p. 63; Safadi, *op. cit*. p 20.

৯০ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১০৯-১১০।

৯১ সিদ্দীক, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৯০।

৯২ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৮২।

৯৩ Safadi, *op.cit*., p 20.

৯৪ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৮২।

৯৫ সিদ্দীক, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৯১।

৯৬ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩০।

৯৭ কুরদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৪১।

৯৮ আবদুর রহীম, *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, পৃ ৫৪।

৯৯ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩০।

১০০ 'উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৮।

১০১ ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩০৬; David James, *Islamic Art*, London: Hamlin Publishing Group, 1974, P 19 & 22.

১০২ Hasan, Jafar, *Muslim Calligraphy: Indian Art and Letters*, London, 1935, vol. Ix, P 61.

১০৩ Qadi Ahmad, *Gulistan-i-Hunr*, Eng. Tran. Entitled : Calligraphers & Painters, T. Minor Sky, Freer Gallery of Art, Washington, 1959, P 56.

১০৪ Safadi, *op. cit*. P 17.

১০৫ Desai, Dr. Z. A., *An Early Thirteenth Century Inscription from West Bengal*, E.I.A.P.S. 1975, P 6-12.

১০৬ তবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নাসখি রীতিতে লিখিত 'হাউযুল হায়াত' নামক একটি পাণ্ডুলিপি বাংলায় পাওয়া যায়। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'অমৃতকন্দ' গ্রন্থের আরবি

www.pathagar.com

অনুবাদ। এটি আলাউদ্দীন আলী মর্দান খিলজির আমলে (১২১০-১২১২ খ্রি.) কাজি রুকনুদ্দীন সমরকন্দি লক্ষ্ণৌতে অনুবাদ করেন।

১০৭ *Catalogue of Arabic and Persian Manuscripts in the Oriental Public Library of Bankipur*, vol.- v, part-1, p 130-132.

১০৮ Skeleton, Robert and Francis, Mark, ed: *Arts of Bengal, The Heritage of Bangladesh and Eastern India*, London, White Chapel Art Gallery. 1979, P 34.

১০৯ ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৫৮-৩৬৭।

১১০ সিদ্দীক, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৮২।

১১১ আবদুর রহীম, *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, পৃ ৬১।

১১২ *প্রাগুক্ত।*

১১৩ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৮৫।

১১৪ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩১-৩২ ; আবদুর রহীম, *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, পৃ ৬০-৬১

১১৫ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৭।

১১৬ আবদুর রহীম, *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, পৃ ৬০।

১১৭ আবদুর রহীম, ইসলামী ক্যালিগ্রাফি, পৃ ৬১।

১১৮ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২।

১১৯ আবদুর রহীম, *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, পৃ ৫৯।

১২০ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৩; আবদুর রহীম, *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, পৃ ৫৯।

১২১ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৮৭; জাব্বুরী, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ৩০০।

১২২ কালকাশান্দি, *প্রাগুক্ত*, খ ৩, পৃ ২৬-৩৮; জাব্বুরি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ২৫৮-২৬২; আবদুর রহীম, ইসলামী ক্যালিগ্রাফি: যুগে যুগে, *অগ্রপথিক*, ইফাবা, ১৬ বর্ষ ৩ সংখ্যা, মার্চ ২০০১, পৃ ১৪১-১৫০।

১২৩ কালকাশান্দি, *প্রাগুক্ত*, খ ৩,পৃ ৩৯-৪০।

১২৪ *প্রাগুক্ত*, খ ৩, পৃ ৪৫।

১২৫ জাব্বুরি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ২৬২-২৬৫; আবদুর রহীম, ইসলামী ক্যালিগ্রাফি: যুগে যুগে, *অগ্রপথিক*, নভেম্বর ৯৯, পৃ ৪৬-৪৭।

১২৬ *An Introduction to Persian Art*, 1930, p 102.

১২৭ ইয়াকুব আলী, *মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখনশিল্প*, পৃ ৩৪১।

১২৮ Hitti, *op. cit*, p 424.

১২৯ জিয়াউদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২।

১৩০ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১১; ইয়াকুব আলী, *মু সলিম মুদ্রা ও হস্তলিখনশিল্প*, পৃ ৩৪২।

১৩১ Scott, *History of the Moorish Empire in E*[illegible] :. vol-111

পঞ্চম অধ্যায়
কুফি লিপিশৈলী

কুফি লিপিরীতির উৎপত্তি ও বিকাশ

'কুফি লিপিশৈলী' আরবি লিপিরীতিসমূহের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে বহুল ব্যবহৃত একটি প্রাচীন লিপিরীতি। এটি একটি কৌণিক জ্যামিতিক ধারার উল্লম্ব ও অনুভূমিক রেখাপ্রধান লিপি। ১৭ হি./ ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে কুফা নগরী প্রতিষ্ঠার প্রায় এক শতাব্দীকাল পূর্বে এটি 'সুরয়ানি সতরঞ্জলি' থেকে উৎপত্তি লাভ করে।[১] কোনো কোনো মনীষীর মতে—হজরত আলী (রা.) মাকালি বৈশিষ্ট্যের বর্ণমালা থেকে কুফি লিপিরীতি উদ্ভাবন করেন।[২] ইসলামপূর্ব যুগে হিরা নামক শহরে এ লিপির প্রচলন ছিল বলে একে 'হিরি লিপিরীতি' নামে অভিহিত করা হতো। হিরার পাশে কুফা নগরী[৩] প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেখানে এ রীতি বহুলভাবে ব্যবহৃত হতো বলে এটি 'কুফি লিপিরীতি' নাম ধারণ করে।[৪] এই নগরীতেই সর্বপ্রথম সরকারিভাবে এ ধরনের লিপিকলার প্রয়োগ করা হয়। সরকারিভাবে প্রচলিত হলে এই লিপিশৈলী অম্লান মর্যাদায় সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আরবরা হিজরতের কিয়ৎকাল পূর্বে ইরাকের অধিবাসীদের নিকট থেকে এ লিপির শিক্ষা গ্রহণ করে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাতিবে ওহিগণ এ রীতি অনুসরণ করে আল-কুরআন লিপিবদ্ধ করতেন। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ ও সম্রাটদেরকে ইসলামের দাওয়াত জানিয়ে যে-সব চিঠিপত্র লিখে পাঠিয়েছিলেন সেগুলোও কুফি হস্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ করা হয়। উল্লেখ্য, এ সমস্ত চিঠিপত্র কুফিরীতির প্রাথমিক পর্যায়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হিজরি ৭ম সালে মিসরের শাসনকর্তা মুকাওকাসের নিকট প্রেরিত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চিঠিটি কৌণিক বর্ণমালা ও অমসৃণ অক্ষরের প্রতিনিধিত্ব করে।[৫] এটি সম্ভবত মুসলিম শাসনামলের সর্বপ্রাচীন আরবি লিপি। এ লিপির কাঠিন্য এবং কোণাকৃতি বক্রাকার লিপি তাকে অপরাপর লিপি থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে রেখেছে।[৬] কুফা নগরী প্রতিষ্ঠার পর এ ধারার লিপির বিকাশ শুরু হয় এবং চতুর্দিকে তার ব্যবহার বেড়ে যায়। ফলে এই লিপি অল্প কিছু দিনের মধ্যে বিভিন্ন দেশে পৌঁছে একেকটা নতুন মাত্রা পেয়েছিল। তাই স্থান, সময় ও পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে এগুলোর পরিচয় ভিন্ন ভিন্ন হয়েছিল। আবু হাইয়ান আত-তাওহিদির বর্ণনা মতে— তখন কুফি লিপির ১২টি প্রকরণ সৃষ্টি হয়। এগুলো হলো: ইসমাইলি, মক্কি, মাদানি, আন্দালুসি, শামি, ইরাকি, আব্বাসি, বাগদাদি, মুশা'আব, রায়হানি, মুজাওয়ার ও মিসরি। এ প্রকারগুলোর মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের কিছু না কিছু স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, যা তাকে অপরাপর প্রকার থেকে বিশিষ্টতা দান করেছে।[৭]

ইসলাম-পরবর্তী যুগে দীর্ঘদিন কুফি লিপি আল-কুরআন লেখার ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী লিপিরীতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম যুগের মুসলমানদের একনিষ্ঠতা এবং অনমনীয়

www.pathagar.com

ধর্মীয় অনুভূতি, যা গর্বিত ও দুর্দমনীয় আরবদের কুরআন শরিফের সুদৃঢ় ও লীলায়িত বাক্যালঙ্কার অনুপ্রাণিত করে, শহরের ব্যবসায়ীদের ব্যবহৃত অসংলগ্ন ও সাবলীল বক্রাকৃতি লিপির পরিপন্থি ছিল; তারা পবিত্র কুরআনের অমোঘ বাণীকে লিপিবদ্ধ করার জন্য এই প্রকার লিপিশৈলী উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেনি। এক্ষেত্রে কুফিই ছিল একমাত্র যোগ্য লিপিশৈলী; কুরআনের পবিত্র বাণীগুলোকে সুদৃঢ় ও সুচারুরূপে লিপিবদ্ধ করার জন্য এটি ছিল উপযুক্ত।[৮] খুলাফা রাশিদুনের আমলে কুফি লিপির যথেষ্ট মর্যাদা ও ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এ সময় কুফি পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম কুরআন লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থাবদ্ধ করা হয় এবং কুরআনের বিভিন্ন অনুলিপি তৈরি করা হয় (দ্র. চিত্র- ১)। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে লিখিত বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজও এ পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, হজরত উসমান (রা.) কর্তৃক কৃত পবিত্র কুরআনের অনুলিপিসমূহ কুফি লিপির অন্যতম প্রকরণ 'মাদানি রীতি' দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয়। উল্লেখ্য, তখন মদিনায় আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তিন ধরনের লিপি প্রচলিত ছিল। ১. মুদাওয়ার (গোলাকার), ২. মুসাল্লাস (ত্রিকোণাকৃতি বিশিষ্ট) ও ৩. তায়ম (গোলাকার ও কৌণিক লিপির মিশ্রিত রূপ)। পবিত্র মুসহাফের অনুলিপি তৈরির ক্ষেত্রে মাদানি রীতির এ তিনটি ধারা ব্যবহৃত হয়।[৯] বস্তুত এ মাদানি প্রকরণগুলোই ছিল বিভিন্ন দেশে আরবি লিপির সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা বৃদ্ধির প্রথম উপলক্ষ্য। তবে পরবর্তী পর্যায়ে কুফা যেহেতু মুসলিম বিশ্বের রাজধানী ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়, সেহেতু লিপিশাস্ত্রের বিকাশ ও উন্নয়নে তার ভূমিকাই প্রাধান্য লাভ করে।

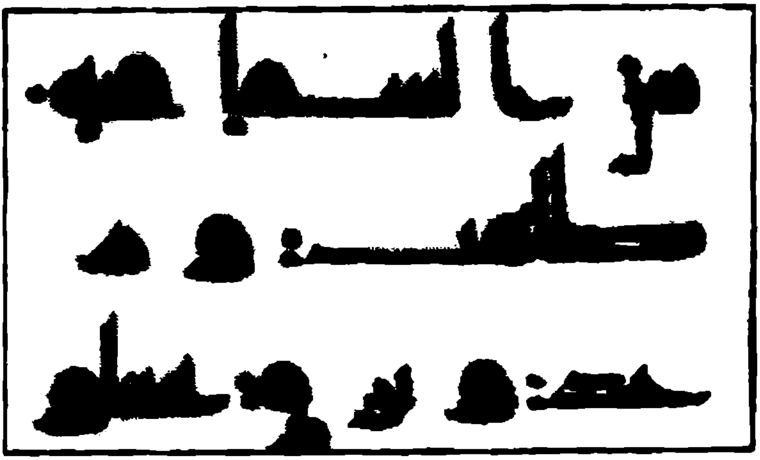

চিত্র-১: প্রাথমিক কুফিরীতিতে লিখিত আল-কুরআনের নিদর্শন। এটি হজরত আবু বকর (রা.)-এর আমলে লিপিবদ্ধ করা হয়।

খুলাফা রাশিদুনের মধ্যে হজরত আলী (রা.) একজন প্রসিদ্ধ ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। তিনি হাতের লেখা সুন্দর করার কৌশল শিখাতে গিয়ে বলেন, "তোমরা কলমের

www.pathagar.com

জিলফা প্রসারিত করো এবং মোটা থেকে তির্যকভাবে মাথার দিকে ক্রমে চিকন করে কেটে যাও, যাতে সঠিক সমানুপাত ও খাড়া আলিফ হয়।" কুফি লিপির উন্নয়নে তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (দ্র. চিত্র-২)। তিনি লাম-আলিফের মাথাকে দুই শিং বিশিষ্ট করে একটি নতুন ধারার কুফি লিপির প্রচলন করেন (দ্র.চিত্র-৩)।[১০]

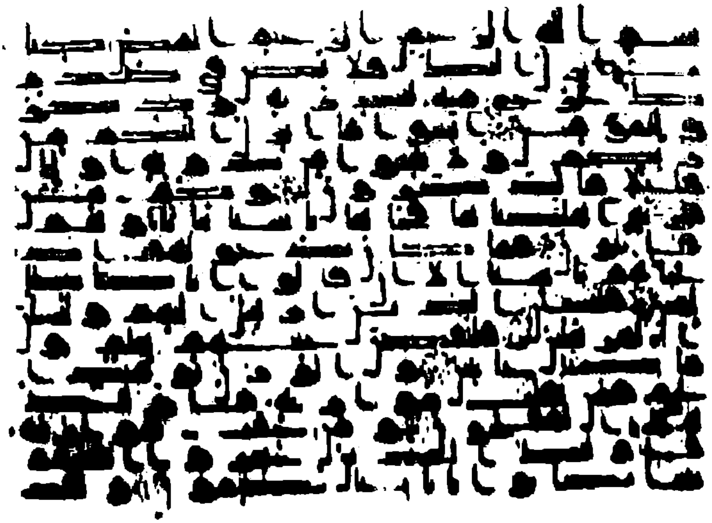

চিত্র-২: কুফি লিপিতে পবিত্র কুরআন (সূরা আ'রাফ : ১-৭)
হজরত আলী (রা.) এটি লিপিবদ্ধ করেন।

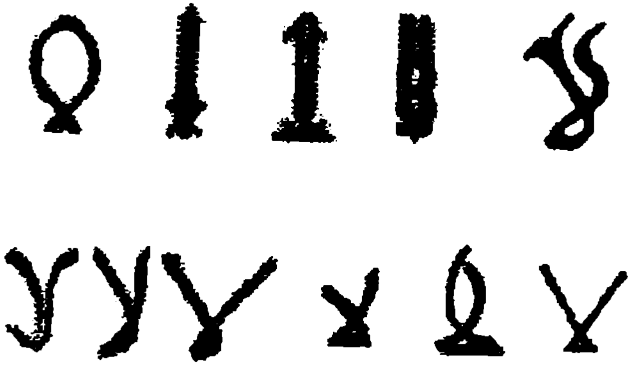

চিত্র-৩: হজরত আলী (রা.)-এর দুই শিং বিশিষ্ট লাম-আলিফ ও অন্যান্য লাম-আলিফ

উমাইয়া যুগে খ্যাতনামা ক্যালিগ্রাফারগণের কঠোর সাধনা, গবেষণা ও অনুশীলনের ফলে কুফিরীতি একটি শিল্প হিসেবে মানসম্পন্ন পর্যায়ে পৌঁছে। এ যুগে

www.pathagar.com

হজরত আলী (রা.)-এর সুযোগ্য শিষ্য হজরত আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালি (মৃ.৬৯ হি.) কুফি লিপিরীতির উন্নতি সাধন করেন। তিনি বিন্দুর আকারে স্বরচিহ্ন প্রবর্তন করেন। তারপর প্রথিতযশা লিপিকার কুতবা আল-মুহাররির কুফি লিখনশৈলীর বিভিন্ন উপরীতি আবিষ্কার করেন।

তাঁর পরে এক্ষেত্রে খালিদ ইবনুল হাইয়াজ (মৃ.৯৬হি./৭১৫খ্রি.)-এর অবদান বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মসজিদে নববির মিহরাবে সোনালি অক্ষরে লিখিত সুরা আশ-শামস তাঁরই শৈল্পিক দক্ষতার পরিচায়ক। তিনি পবিত্র মুসহাফ লেখার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন।[১১] এ ক্ষেত্রে আরো যাঁরা অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে মালিক ইবনু দিনার, রশিদ আল-বাসরি ও মাহদি আল-কুফি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দামিশক থেকে ১০৯ মাইল দূরত্বে যে মাইল নির্দেশক প্রস্তরফলক রয়েছে তা উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের রাজত্বকালে প্রোথিত করা হয়। এ পাথরে লিখিত লিপির সৌষ্ঠব ও লিপিকৌশল পূর্বের কুফি লিখনপদ্ধতির চেয়ে আরো উন্নতমানের। এতে বর্ণগুলো অসংযত ও এলোমেলোভাবে খোদিত হয়নি; বরং ভারসাম্য রক্ষা করে নিপুণভাবে উৎকীর্ণ রয়েছে। সর্বোপরি এতে লিপিশিল্পের একটি মোহনীয় রূপ তুলে ধরা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর লিখিত পত্রটির অক্ষরগুলোর সাথে তুলনা করলে প্রতীয়মান হবে যে, এই ফলকের লিপিমালা অপেক্ষাকৃত কম কোণাকৃতি এবং জটিল।[১২]

আব্বাসীয় যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মতো আরবি লিপিরও চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ যুগে প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ খলিল ইবন আহমদ (মৃ. ৭৮৬ খ্রি.) ও আলী ইবন কুসাইরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কুফি লিপিশৈলী উৎকর্ষের চরম শিখরে পৌঁছে। এ যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে সিরিয়ার দুজন প্রখ্যাত ব্যক্তি লিপিশাস্ত্রে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁরা হলেনঃ আবুল আব্বাস সাফ্ফাহর আমলে দাহহাক ইবন আজলান এবং ২. খলিফা মানসুর ও মাহদির আমলে ইসহাক ইবনু হাম্মাদ। প্রখ্যাত লিপিবিশারদ আবু আলী ইবনু মুকলা (৮৬৬-৯৪০ খ্রি.) কুফি লিখনপদ্ধতিকে পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে একটি অভিনব অবস্থায় রূপান্তরিত করেন। ফলে এতে নতুনত্ব ও পরিপূর্ণতা আগমন করে। আব্বাসীয় খলিফা আল-মাহদির মসজিদে মার্বেল পাথরে হিজরি ১৫৫/ খ্রিষ্টীয় ৭৭১ সালে উৎকীর্ণ শিলালিপিটি হিজরি ১ম ও ২য় শতাব্দীতে উৎকর্ষিত কুফি লিখনপদ্ধতির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ পেশ করে। উল্লম্ব দণ্ড এবং তির্যক বাহুর অগ্রভাগ তীক্ষ্ণাকারে পরিণত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। কদাচিৎ বর্ণের লম্ব দণ্ডের কোনো অংকে সাজ-প্রক্রিয়া বর্ধনের লক্ষ্যে এতে স্পষ্টতার ছাপ প্রদান করা হয়েছে। সম্পূর্ণ লিপিটিতে নিবিড়তার ছাপ সুস্পষ্ট। তদুপরি উপস্থাপিত অক্ষরগুলো পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। এতেও স্বরচিহ্নের জন্য ব্যবহৃত বিন্দুর প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়নি।[১৩] এ রীতি হিজরি ২য় শতাব্দীতে সর্বাপেক্ষা কোণাকৃতি লাভ করে। পরবর্তী সময়ে এ লিপিশৈলী ক্রমান্বয়ে বক্রাকার হতে থাকে। এম. এন. ডি. খানিকভ কর্তৃক দারবান্দ ও বাকুতে আবিষ্কৃত ১৭৫ হিজরি, মতান্তরে ১৯৫ হিজরিতে সালে উৎকীর্ণ শিলালিপিগুলো ঐ শতাব্দীর অপরাপর কুফিশৈলী অপেক্ষা পৃথক ছিল। এগুলোতে লিখনরীতি মাত্রারিতিরিক্ত

www.pathagar.com

বক্রাকার রূপ ধারণ করে। এর অক্ষরগুলো খুবই আর্কষণীয়। তদুপরি এতে স্বরচিহ্নেরও ব্যবহার লক্ষ করা যায়।[১৪]

কুফি লিপিরীতি

কুফি লিখনপদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, শিরঃকোণ (Vertical) এবং তির্যক রেখা (Obliquelines)।[১৫] এতে বর্ণের উল্লম্ব ও লম্ব দণ্ড এবং অনুভূমিক বাহু লেখার সময় এমনভাবে সাজানো হয় যে, তা কোনো না কোনোভাবে কোণের সৃষ্টি করে।[১৬] কোনো রূপ বক্রতা ও ধনুকাকৃতি এতে দেখা যায় না। প্রথমদিকে তাতে বর্ণের গোলাকার রূপের কিছুটা সংমিশ্রণ থাকলেও হিজরি ২য় শতাব্দীতে এসে এটি পুরোপুরি কৌণিক আকৃতি লাভ করে। এ পদ্ধতির লেখাকে রোলার দ্বারা পরিমাপকৃত লেখা বলে মনে হয়। এতে বর্ণের লম্ব দণ্ড সাধারণত খর্বাকৃতির হয় এবং অনুভূমিক ও সমান্তরাল রেখাগুলোকে দীর্ঘায়িত করে অন্য বর্ণের সাথে এমনভাবে সংযোজন করা হয় যে, এ প্রক্রিয়া দ্বারা সৃষ্ট সারিতে মূল বক্তব্য নিহিত থাকে। প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজে এ লিপি ব্যবহৃত হতো। এ ছাড়া কুরআনের পাণ্ডুলিপি ও খোদাই লিপি প্রভৃতি এ রীতিতে লেখা হতো। এমনকি জাহিলি যুগের এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগের লেখার যে সকল নমুনা পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই কুফি কায়েদায় লেখা।

এ লিপির মারাত্মক ত্রুটি হলো: এতে প্রথমদিকে আরবি অক্ষরগুলোকে পৃথক করার জন্য কোনো নুকতা বা হরকতের প্রচলন ছিল না। এ ছাড়া বর্ণগুলোও ছিল প্রায় পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।[১৭] ফলে এ জাতীয় লেখার পাঠোদ্ধার খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ত। এজন্য হজরত উসমান (রা.) যখন কুফিরীতিতে মুসহাফের ছয়টি কপি করে ৪টি মক্কা, বসরা, কুফা ও শাম প্রভৃতি শহরে প্রেরণ করেন এবং অবশিষ্ট দুটির মধ্যে একটি মদিনার সাধারণ লোকদের জন্য, অন্যটি নিজের কাছে রাখেন, তখন তিনি প্রত্যেকটি মুসহাফের সাথে এক একজন করে কারিও পাঠান। হজরত যায়দ ইবনু সাবিত (রা.) ছিলেন মুসহাফে মাদানির তিলাওয়াতকারী, আবদুল্লাহ ইবনু সায়িব (রা.) মুসহাফে মক্কির তিলাওয়াতকারী, মুগিরা ইবনু শিহাব (রা.) মুসহাফে শামির তিলাওয়াতকারী, আবু আবদুর রহমান (রা.) মুসহাফে কুফির তিলাওয়াতকারী ও আমির ইবনু আবদ কায়স (রা.) মুসহাফে বাসরির তিলাওয়াতকারী ছিলেন।[১৮] হিজরি ২য় শতাব্দীতে এসে সিরিয়ক লিপির প্রভাবে এতে নুকতা ও হরকতের ব্যবহার যুক্ত হয় এবং এর লিখনরীতিও ধীরে ধীরে বক্রাকার হতে থাকে।[১৯] এর ফলে এ ধারার লেখার পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে পূর্বে যে কষ্ট হতো তা ধীরে ধীরে কমে যায়।

কুফি লিপিরীতির বিভিন্ন প্রকরণ

কুরআন কপি করার জন্য কুফি লিপি বিভিন্ন প্রকারভেদে প্রায় হিজরি পাঁচ শতাব্দী ধরে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে পৃথিবীর যে-যে অঞ্চলে ইসলামের বাণী পৌঁছেছে, সেখানেই অবলীলাক্রমে এটা পৌঁছে গেছে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ার কারণে স্থানীয় ক্যালিগ্রাফারদের মাধ্যমে তাতে বিভিন্ন পরিবর্তন হতে থাকে। ফলে তাতে বিভিন্ন ধারা ও রীতি গড়ে ওঠে। মরক্কোয় এ লিপিটি মাগরিবি লিপি, সুদান ও ইথিওপিয়া থেকে

www.pathagar.com

পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে এটি ওয়েস্টার্ন কুফি, স্পেন ও আলজেরিয়া প্রভৃতি দেশে আন্দালুসিয়ান কুফি, আরব উপদ্বীপ, পারস্য ও ভারতীয় উপমহাদেশে এটি ইস্টার্ন কুফি নামে পরিচিতি পায়।[২০] উল্লেখ্য, কুরআন লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কুফিরীতিটি ছিল অন্যান্য কুফিরীতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আব্বাসীয় খিলাফতের শেষদিকে কুফিরীতির বিশোধিক প্রকার পরিলক্ষিত হয়। সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী কুফিরীতির শতাধিক প্রকারের অস্তিত্ব দেখা যায়। এ কারণে এ লিপিকে 'হস্তলিপির জননী' নামে আখ্যায়িত করা হয়।[২১] এ প্রকারগুলো আকার-আকৃতি কিংবা যুগ বা স্থান নির্বিশেষে বিভিন্ন নাম ধারণ করেছে। বিভিন্ন কুফিরীতিসমূহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়, তাদের লম্বা রেখার সাথে অসমকোণের অনুপাতের তারতম্যে, লম্বা রেখা ও অসমকোণের মধ্যবর্তী বক্ররেখায় এবং সর্বোপরি একটি অক্ষরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাতের দ্বারা। এই দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ পরিমাপের একমাত্র উপায় হচ্ছে কলম দিয়ে কতকগুলো চৌকো বিন্দু সৃষ্টি করা। যেমন একটি লম্বা রেখা ৭ কিংবা ৮টি এ ধরনের চৌকো বিন্দুর পরিমাপের সমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, লম্বা রেখার অনুপাত হ্রাস করে একটি অক্ষরের আকার পরিবর্তন করা যায়, যার ফলে শব্দটি একটি চতুষ্কোণ আকার ধারণ করে। যেমন محمد শব্দটি কুফিরীতিতে সাধারণত আয়তাকার; কিন্তু পরস্পর অক্ষরের মধ্যবর্তী সংযোগকারী বক্ররেখার পরিমাপ হ্রাস করে এটিকে একটি চতুষ্কোণ রূপ দেওয়া সম্ভব।[২২]

তবে মৌলিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে এ লিপিরীতিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো–

১. স্মারক কুফি (الكوفي التذكاري): এ লিপি অপেক্ষাকৃত অধিকতর কঠিন ছিল। যে কেউ সহজে এ লিপি আয়ত্ত করতে পারত না। এটি শিরঃকোণবিশিষ্ট ছিল। শক্ত উপাদানসমূহে যেমন উটের হাড়, বিশেষ করে ঘাড়ের চওড়া অংশ ও পাঁজর, মৃৎপাত্র, সমান্তরাল সাদা পাথর, কাঠ এবং ধাতব পাত্রে এ লিপির দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সাধারণত এগুলোতে কুরআনের কোনো আয়াত কিংবা কোনো হাদিস বা দু'আ বা কারো মৃত্যু-সন খোদাই করে লেখা হতো। এ লিপিশৈলীতে আরবদের জ্যামিতিক সামঞ্জস্য এবং গাণিতিক যথার্থতার প্রমাণ পাওয়া যায়, বিশেষ করে শিলালিপির নিপুণ খোদাই কাজে। এ লিপিতে অক্ষরগুলোকে পৃথক করার জন্য কোনো নুকতার প্রচলন ছিল না। তদুপরি বর্ণগুলো ছিল পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ ও জড়ানো। তাই এ জাতীয় লেখার পাঠোদ্ধার খুবই কষ্টকর হয়ে যেত। তথাপি এ লেখার নজরকাড়া সৌন্দর্য ও জ্যামিতিক সামঞ্জস্য সকলকে আকৃষ্ট করত।

২. সহজ কুফি (الكوفي اللين): এ লিপি অধিকতর সহজ ও অনায়াসসাধ্য ছিল। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বক্রাকৃতি। অপেক্ষাকৃত নরম উপাদানসমূহে যেমন চামড়া, তালপাতা, পার্চমেন্ট ও প্যাপিরাস প্রভৃতিতে এ লিপির দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সাধারণত ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ লেখার কাজে এ লিপি ব্যবহার করা হতো। এ কারণে একে 'পত্র লেখার কুফি' (خط التحرير) নামেও অভিহিত করা হয়।

www.pathagar.com

৩. মুসহাফি কুফি (الكوفي المصحفي): এ লিপি স্মারক লিপির চেয়ে অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য এবং সহজ কুফির চাইতে কঠিন। মূলত একে স্মারক কুফি ও সহজ কুফির সমন্বিত রূপ বলা চলে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিরঃকোণ ও তির্যক রেখা। এতে বর্ণের উল্লম্ব ও লম্ব দণ্ড এবং অনুভূমিক বাহু লেখার সময় এমনভাবে সাজানো হয় যে, তা কোনো না কোনোভাবে কোণের সৃষ্টি করে। কুরআনের পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজে প্রধানত এ লিপি ব্যবহৃত হতো বলে একে 'মুসহাফি কুফি' বলা হয়। হিজরি ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত কুরআন লেখার ক্ষেত্রে এ কুফিরীতির একচ্ছত্র ব্যবহার ছিল (দ্র. চিত্র-৪ ও ৫)। বর্তমানে কুফি লিপি বলতে এ 'মুসহাফি কুফি'কে বোঝানো হয়।[২৩]

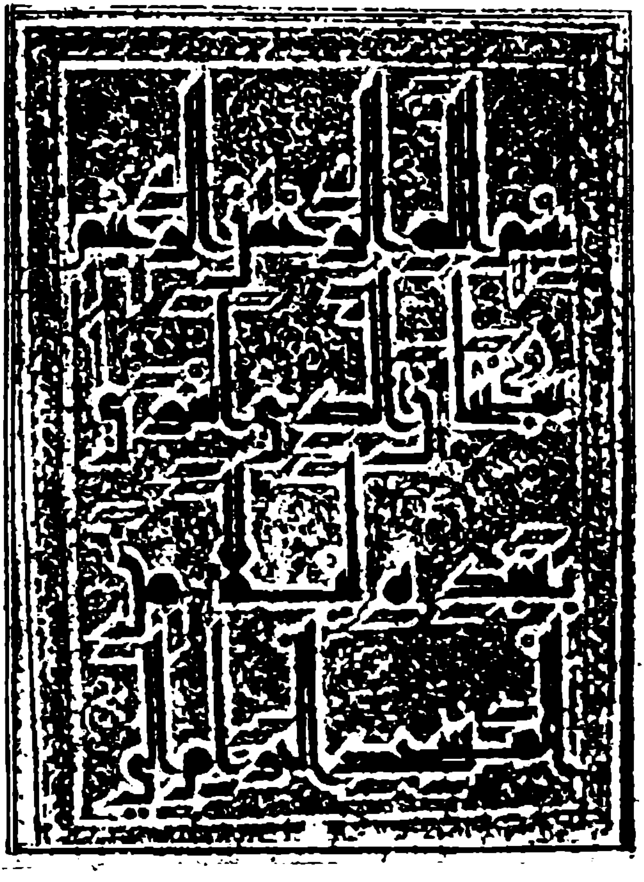

চিত্র-৪: কুফি, কুরআন ৫৬৬হি.

www.pathagar.com

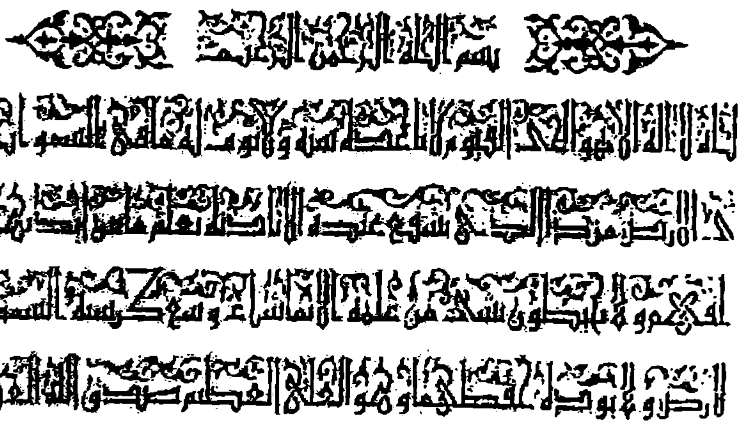

চিত্র-৫: কুফি, আয়াতুল কুরসি

অলংকরণ মোটিফ হিসেবে কুফি লিপির বিচিত্র ব্যবহার

কুফি লিপি অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে এসে পরিপূর্ণতা অর্জন করে। এটি ইসলামের আবির্ভাবের পরে তিনশত বছর ধরে কুরআনের লিপি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে এ লিপির বর্ণমালার কৌণিক রূপ এবং উল্লম্ব দণ্ড ও তির্যক বাহুর পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্টকরণ জটিল ও ধীর গতি হওয়ায় ধীরে ধীরে পবিত্র কুরআনের অনুলিপি প্রণয়নে এর একচ্ছত্র প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়। তদুপরি সাধারণ লেখা এবং রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে কুফি লিপি অনেকটা উপযুক্ততা হারিয়ে বসে। ইসলামের বিজয়ধারা অব্যাহতভাবে চলার ফলে রাষ্ট্রের বিস্তৃতি বৃদ্ধির সাথে সাথে রাষ্ট্রের কার্যের পরিধিও প্রসারিত হয়। সর্বোপরি সরকারি ফরমান ও চিঠিপত্রাদি আদান-প্রদান অনেক গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এ সময় জটিল ও সময়সাধ্য কুফি লিপির স্থলে তুলনামূলকভাবে সহজ ও দ্রুততর কোনো লিপিরীতির প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এ পরিস্থিতিতে ক্রমে কুফির কৌণিক লেখার পরিবর্তে অধিকতর সহজসাধ্য বক্রাকার লিপি—নাসখির প্রচলন শুরু হয় এবং ক্রমশ তার ব্যবহার বেড়ে যায়। খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এসে এটি কুরআনের সুরাসমূহের টাইটেল এবং অলংকরণের কাজে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এ সময় স্থাপত্যিক অলংকরণ ও মৃৎপাত্রসমূহে এর বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। মিহরাব, খিলান, গম্বুজ ও মিনারে এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও কাঠের মিম্বর, রিহাল, দরজা, জানালা, বাক্স, ধাতব পাত্র, বর্ম, হেলমেট, তলোয়ার, বল্লমকোঁচ, ঝুড়ি, গহনা প্রভৃতিতে এ লিপির চমৎকার সব শিল্পকর্ম সৃচিত হয়েছে।[২৪]

কুফি লিপির এ অলংকরণ করার কাজে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ লিপিতে জাঁকজমকপূর্ণ অলংকরণ করতে যে সময় ও অর্থের প্রয়োজন, সেখানে শুধু জনগণের সম্পৃক্ততায় সেটা সম্ভব ছিল না। মুসলিম শাসকগণের উদার মানসিকতা ও অকাতরে অর্থব্যয়ের ফলে কুফি লিপির আশ্চর্য সব কারুকাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

www.pathagar.com

কুফি লিপির আরেকটি দিক হলো—মুসলিম সংস্কৃতি ও সামাজিক পরিবেশ যখন সাদাসিধে প্রকৃতির ছিল, তখন কুফি লিপিও তেমনি সাদামাটা ভাবের দেখতে পাওয়া যায়। কোনো রূপ অলংকরণ ও সাজসজ্জা তাতে দেখা যেত না। হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকে অষ্টম শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত কুফি লিপির এই সহজ-সরল ধারা (الكوفي البسيط) প্রচলিত ছিল। বায়তুল মুকাদ্দসের গম্বুজে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে এ সরল কুফির উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা যায় (দ্র. চিত্র- ৬)।

চিত্র-৬: বায়তুল মুকাদ্দসের গম্বুজে উৎকীর্ণ শিলালিপি

এতে “ له ما في السموات و الأرض . بنى هذه القبة عبد الله الإمام المأمون أمير المؤمنين في سنة اثنين و سبعين تقبل الله منه . ” লিপিবদ্ধ করা হয়।

কিন্তু মুসলিম জীবনবোধ যখন সুষমা-বৈচিত্র্যে জাঁকালো হতে থাকে, ঠিক তেমনিভাবে কুফি লিপিতেও জাঁকজমক আসতে থাকে। এর অলংকরণ প্রভা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। হিজরি ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বিভিন্নভাবে জড়ানো, পরস্পরের সাথে বোনা, লতাপাতা ও পুষ্পসজ্জিত এবং জ্যামিতিক নকশায় এর বিভিন্ন অপূর্ব অলংকরণ রীতির প্রকাশ ঘটে।[২৫]

সাধারণ কুফি লিপিতে নান্দনিকতা আমরা দেখতে পাই মিসরের রাজধানী কায়রোতে। এ ছাড়া ফাতেমি, সেলজুক ও গজনি শাসনামলের বিলাসী সৌন্দর্যবোধ কুফি লিপিতে যে নান্দনিকতা আনয়ন করে তা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

ইরানে কুফি লিপির অলংকৃত ধারাটি পৃথিবী বিখ্যাত। আরবদের পারস্য বিজয়ের পর কুফিরীতি ইরানে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং তা পাহলভি লিপির পরিবর্তে ইরানের জাতীয় লিপির মর্যাদা অর্জন করে।[২৬] কুফিরীতি তাদের হাতে প্রভূত উন্নতি লাভ করে। তারা সর্বপ্রথম কৌণিক অবয়বের আব্বাসীয় কুফিরীতি থেকে অন্য একটি লিপিশৈলী উদ্ভাবন করে, যেখানে অক্ষরসমূহ অধিকতর বড়ো কোণবিশিষ্ট। এটি পারসীয় কুফিরীতি নামে খ্যাত (দ্র. চিত্র-৭)। এ পদ্ধতি অবলম্বনে লিখিত একটি আল-কুরআনের সুরার শিরোনাম নিউইয়র্ক মেট্রোপলিটন জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।[২৭]

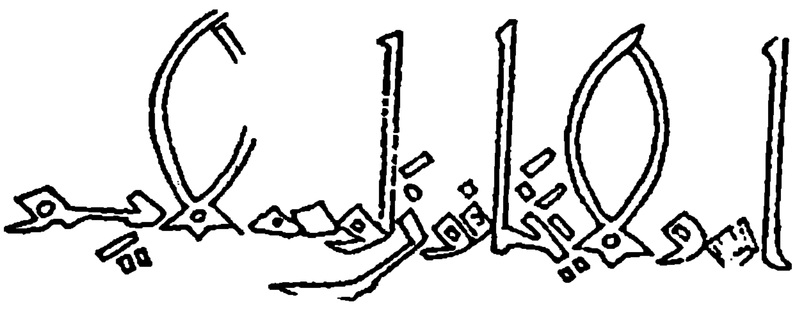

চিত্র-৭: পারসীয় কুফিরীতি

দশম শতাব্দীর শেষদিকে পারস্যবাসীদের হাতে পারসীয় কুফিরীতির প্রভাবে অন্য একটি পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। আদর্শ কুফিরীতির (Standard Kufic) চেয়ে এর কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ লিপিপদ্ধতিতে উপরের দিকে চলমান দীর্ঘ রেখাসমূহ অত্যন্ত উল্লম্বরূপে অবস্থান করে। আর ছোট রেখাসমূহ বামদিকে ঢালু কিংবা বাঁকানো হয়। এ কারণে পাশ্চাত্যের গবেষকগণ একে Bent Kufic (বক্রাকৃতির কুফি) নামে আখ্যায়িত করেছেন। এ রীতিতে রেখাসমূহ আদর্শ কুফির রেখাসমূহের তুলনায় অধিকতর লম্বা ও সুচারু। কোনো কোনো বর্ণের বড়ো আকারসমূহ অনুভূমিক বাহুর দিকে বিস্তৃতভাবে নিম্নগামী।

পারস্যবাসীদের হাতে উৎকর্ষপ্রাপ্ত এ 'ইস্টার্ন কুফি' আদর্শ কুফির গতিহীন শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করে মার্জিত ও সুচারু রীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এটি কিছুকাল পূর্বেও কুরআনের শিরোনামের আলংকারিক লিপি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[২৮]

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে 'ইরানি কুফিরীতি' সেলজুকদের (১০৩৭-১১৫৭ খ্রি.) হাতে প্রভূত বিকাশ লাভ করে। উল্লেখ্য যে, আব্বাসীয় শাসনামলে কুফি লিপির উন্নয়ন প্রায় চরম শিখরে পৌঁছলেও সেলজুকদের হাতেই এর চূড়ান্ত উন্নয়ন সাধিত হয়। তারা 'আলংকারিক কুফি' (Ornamental Kufic) নামে নতুন একটি কুফিরীতি উদ্ভাবন করে। এতে যে সমস্ত হরফের মাথা গোল সেগুলোকে ফুল ও লতাপাতা দিয়ে অলংকরণ করা হয় এবং নিচের ঢালগুলোকে গোলাকৃতি করা হয়। এ ধরনের আলংকারিক কুফিকে 'ফুল-লতাপাতা সমন্বিত কুফি' (الكوفي المورق) নামে অভিহিত করা হয়। তাদের আমলে অলংকৃত মুসহাফসমূহে (কুরআনের অনুলিপি) এ লিপির প্রকৃষ্ট নিদর্শন দেখা যায় (দ্র. চিত্র-৮ ও ৯)।

www.pathagar.com

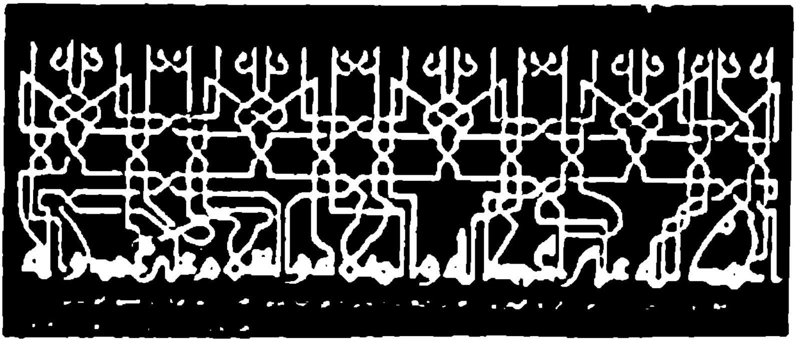

চিত্র-৮: সেলজুকীয় অলংকৃত কুফিরীতি

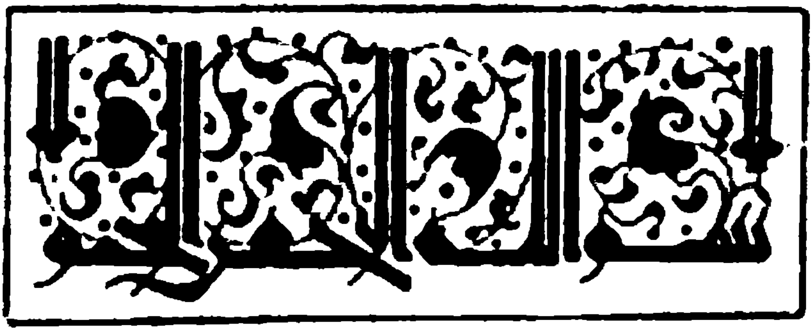

চিত্র-৯: সেলজুকীয় অলংকৃত কুফিরীতি

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে লিপিকার কাসিম ইবনু ইবরাহিম কর্তৃক ৪২৭ হি./ ১০৩৬ খ্রিষ্টাব্দে সেলজুকীয় অলংকৃত কুফিরীতিতে লিখিত ডালপালা ও লতাপাতার সমন্বয়ে অলংকৃত ও সুসজ্জিত কুরআনের কয়েকখানা পৃষ্ঠা রয়েছে। এ ছাড়াও নিউইয়র্ক মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামে ৪৪৫হি./১০৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ইরানীয় কুফি পদ্ধতিতে ও অভিনব আলংকারিক উপাদান সম্বলিত সেলজুকীয় রীতিতে লিখিত কুরআন শরিফের দুপৃষ্ঠা সংরক্ষিত আছে। এক পৃষ্ঠায় রকমারি রং মিশ্রিত স্বর্ণাক্ষরে লিখিত সুরার শিরোনাম চিত্রিত করা হয়েছে। অন্যটিতে কয়েকখানা আয়াত কেবল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়েছে। আয়াতসমূহ অতিশয় অলংকৃত কুফিরীতিতে উৎকীর্ণ। এর লম্বসমূহের শেষ প্রান্তে ডালপালার অভিনব অলংকরণ বিদ্যমান এবং অনুভূমিক বাহুগুলোকে সোনালি ফুল, লতাপাতা ও শাখা-প্রশাখা দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে।[২৯] কুফির এ আলংকারিক রীতিকে 'পুষ্প সজ্জিত কুফি' (الكوفي المزهر) নামে অভিহিত করা হয়। পাশ্চাত্যের চারুশিল্পীরা এ ধরনের লেখাকে Arabasque[৩০] নামে অভিহিত করে।

www.pathagar.com

ইস্টার্ন কুফির আর একটি প্রকরণ হলো বিভিন্নভাবে জড়ানো ও পরস্পরের সাথে বোনা কুফি লিপি (الكوفي المعقود أو المضفر)। হিজরি ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এ লিপির উদ্ভব হয়। এটি কুফি লিপির একটি আলংকারিক প্রকরণ, যা কখনো এমন সীমাহীন জটিল রূপ ধারণ করে যে, পাঠকের পক্ষে বর্ণগুলোকে পরস্পর পৃথক করা কিংবা অলংকার থেকে বর্ণগুলো পৃথক করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। এতে কখনো এক একটি শব্দকে পৃথক পৃথকভাবে (দ্র. চিত্র-১০), আবার কখনো দুই বা ততোধিক শব্দকে পরস্পরের সাথে জড়ানো ও বোনা হয় (দ্র. চিত্র-১১)।[৩১]

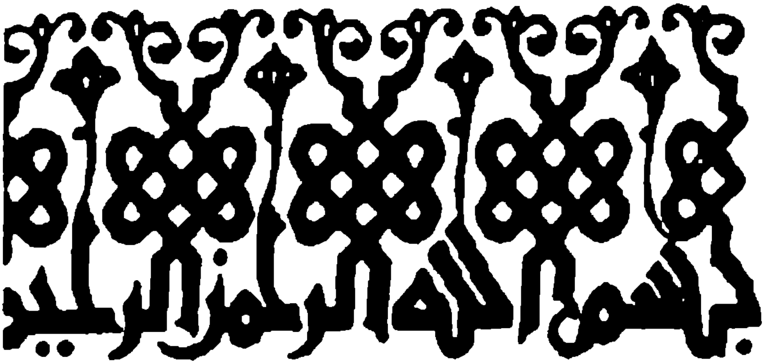

চিত্র-১০: বিভিন্নভাবে জড়ানো কুফি

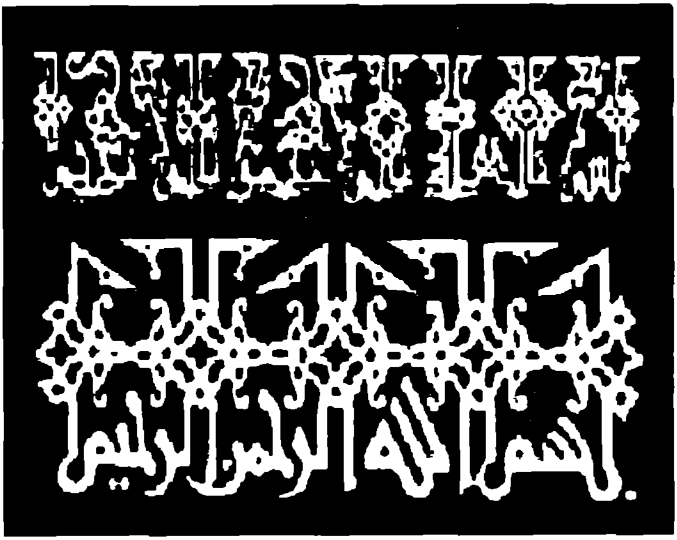

চিত্র-১১: বিভিন্নভাবে জড়ানো কুফি

www.pathagar.com

জ্যামিতিক নকশায় বোনা কুফি (الكوفي الهندسي الأشكال) লিপিটি শক্ত সোজা ভাব ও খাড়া কোণ প্রভৃতি দিক থেকে কুফিরীতির অন্যান্য আলংকারিক প্রকরণের চাইতে বিশিষ্টতা রাখে। এ ধরনের লিপি ইরান ও ইরাকের মসজিদসমূহে বেশ দেখা যায়। এ ধারার লেখায় ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ, ষষ্ঠভুজ, অষ্টভুজ ও গোলাকার প্রভৃতি আকৃতির লিপিসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ ধরনের লিপিতে অক্ষরগুলো, এমনকি পুরো লেখা পরস্পর প্রবিষ্ট ও মিলিত হওয়ায় বিভিন্ন ধরনের পঠনের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়।[৩২] নিম্নের চিত্রসমূহে আমরা এ ধরনের কয়েকটি লিপিচিত্র দেখতে পাচ্ছি (দ্র. চিত্র-১২ ও ১৩)

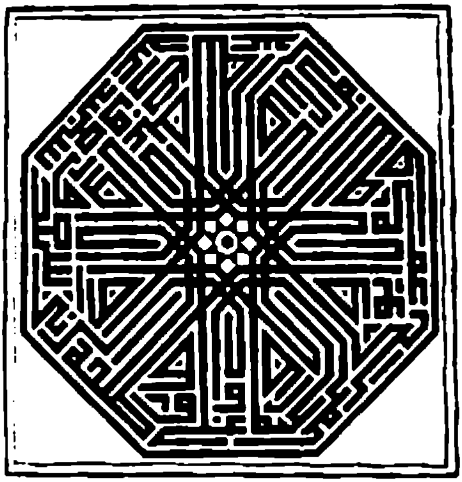

চিত্র-১২: জ্যামিতিক নকশায় কুফি লিপি, (দশজন বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবিদের নাম)

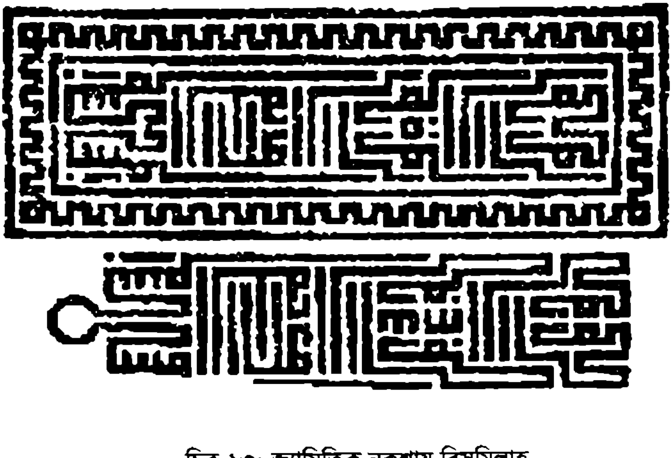

চিত্র-১৩: জ্যামিতিক নকশায় বিসমিল্লাহ

www.pathagar.com

ইস্টার্ন কুফির একটি উল্লেখযোগ্য ধারা হচ্ছে কারামাতিয়ান কুফি। এই লিপির উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে মানসম্পন্ন অলংকরণের ব্যবহার। খুবই উঁচু মানের অলংকরণ, যা অন্য কোথাও এত সাবলীল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়ে ওঠেনি। প্রধানত ফুলের নকশা ও জ্যামিতিক ডিজাইনের বৈচিত্র্য এ লিপিতে দেখা যায় (দ্র. চিত্র-১৪)।[৩৩]

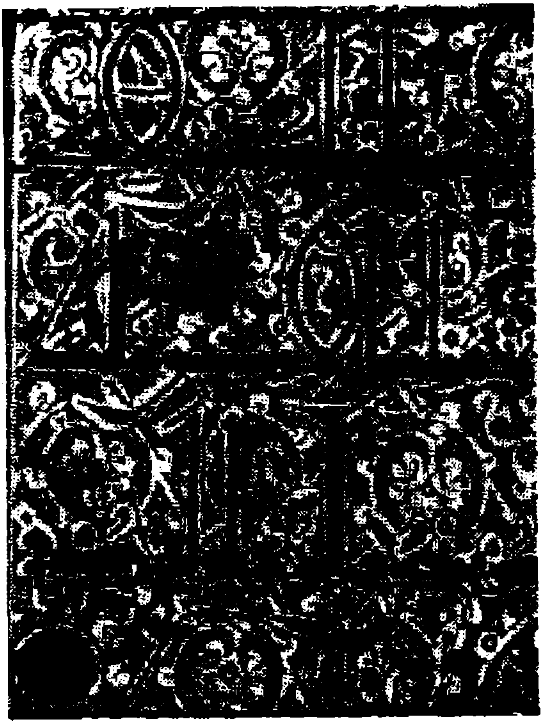

চিত্র-১৪: কারামাতিয়ান কুফি লিপিতে কুরআনের নিদর্শন

ইস্টার্ন কুফির অন্য একটি নিদর্শন হিসেবে দিল্লির কুতুব মিনারের গায়ে উৎকীর্ণ লিপির কথা ধরা যেতে পারে। ১৩শ শতাব্দীর এই শিল্পকর্মে উল্লম্ব হরফ 'আলিফ-লাম'-কে এমনভাবে বিনুনি দেয়া হয়েছে, যেন জাফরি কাটা জানালা। (দ্র. চিত্র-১৫) তাছাড়া ১১৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মউসুলের জাতীয় মসজিদের মিহরাবে আশ্চর্য রকমের আঙুর-লতা-পাতার বিনুনি দেওয়া কুফি লিপি আলংকারিক কুফির একটি সুষমামণ্ডিত নমুনা।[৩৪]

চিত্র-১৫: আলিফ-লামের বিনুনি দিয়ে গড়া পুষ্পসজ্জিত কুফি

www.pathagar.com

দশম শতকে উত্তর আফ্রিকায় মানসম্পন্ন কুফির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তিউনেসিয়া এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে ধরনের কুফি লিপির প্রচলন ছিল, পশ্চিম আফ্রিকায় এসে তার কিছুটা পরিবর্তন আমরা লক্ষ করি।[৩৫]

ওয়েস্টার্ন কুফিরীতির নমুনা হিসেবে তুরস্কের দিয়ারবেকিতে ১০৩৪ খ্রিষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপিটি অন্যতম।[৩৬] এই লিপির ককেসীয় রীতিতে লিপিবদ্ধ কুফি লিপি বিশেষভাবে ব্যতিক্রমধর্মী। এই বৈশিষ্ট্যের একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাবে ৪৭১ হিজরিতে আর-রশিদ বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকরের মসজিদে উৎকীর্ণ বাকুর একটি শিলালিপিতে। প্রথম নজরেই এর মৌলিকতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকারের কুফি লিপিশৈলীর সাথে এর কোনো যোগসূত্র নেই। এই শিলালিপির অক্ষরমালা খুবই সাধারণ ও অনাড়ম্বর। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এর লম্বা রেখাগুলোর অসামঞ্জস্যপূর্ণ লিপিবদ্ধকরণ, যা কেবল আকারে ক্ষুদ্রই নয়; শেষাংশ অর্থাৎ চূড়াগুলো চেপ্টা অথবা সুচাগ্র এবং এক সারি অসংযত দাঁতের মতো মনে হবে। অক্ষরগুলোর অসমকোণ এবং প্রধান সমান্তরাল লেখাগুলো এমনভাবে বিকৃত যে, শিলালিপি উৎকীর্ণ করার সময় কুফিরীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলো প্রায় অর্ধেক বিলুপ্ত হয়ে গেছে। مسجد শব্দটি এমন বাঁকানোভাবে খোদিত হয়েছে যে, তা অর্ধ-বৃত্তাকারে পরিণত হয়েছে। মূল রেখাগুলো বাঁকানো হয়েছে অথবা তরঙ্গায়িত রেখার মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে।

ইউসুফ ইবন কবিরের সমাধিতে উৎকীর্ণ ৫৫৭ হিজরির একটি শিলালিপিতে ককেসীয় কুফিরীতির আর একটি প্রকরণ দেখা যায়। এই লিপিকলার অভিনবত্ব হচ্ছে এই যে, এর প্রতিটি শব্দের সুস্পষ্ট ও নিখুঁত বিন্যাসে এগুলো একটি স্বতন্ত্র রূপ লাভ করেছে। যেমন প্রথম সারির শেষ শব্দ ذكي আঁকাবাঁকা ভঙ্গিতে খোদিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে الإسلام শব্দটির চারটি লম্বা রেখা দুটি সমান্তরাল রেখার সাথে এমনভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে যে, মাথার ওপর দুটি ত্রিকোণাকার ছাদের সৃষ্টি হয়েছে।

লক্ষণীয় যে, দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত সংস্কৃতমনা জনসমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা ককেসীয় পার্বত্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বপ্রথম প্রচলিত কুফি লিপির আদিরূপ অব্যাহত থাকে। হিজরি ৫ম শতাব্দীতে কুফি লিপিশৈলী অন্যান্য দেশে বিলুপ্ত হলেও ককেসীয় লিপিকারগণ হিজরি ৮ম শতাব্দী পর্যন্ত এই রীতির চর্চা অব্যাহত রাখেন। তাঁরা এই লিপিশৈলীকে একটি ভাষার লিপিমালা অপেক্ষা অলংকরণের মাধ্যম হিসেবে সমাদর করেন। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক ঘটনা এই যে, তাঁরা শিলালিপির প্রচলিত লিখনপদ্ধতির সাথে সঙ্গতি না রেখে শিলালিপিগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে শিল্পকলার উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেন।[৩৭]

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলেও এ রীতিতে উৎকীর্ণ অনেক শিলালিপি দেখতে পাওয়া যায়। ১০৭হি./৭২৭-৭২৮ খ্রিষ্টাব্দে উৎকীর্ণ সিন্ধুর বনবহুরের জামে মসজিদের শিলালিপি[৩৮] এবং ৪৮২ হি./১০৯০ খ্রিষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হান্ড (Hund)-এর শিলালিপি[৩৯] প্রভৃতি ভারতবর্ষে কুফিরীতির প্রাচীনতম শিলালিপি হিসেবে অনুমান করা হয়। গুজরাট, দিল্লি, আজমির ও মোহান্দরগড় প্রভৃতি এলাকায় বিভিন্ন শিলালিপি দেখতে পাওয়া

www.pathagar.com

যায়। এর অধিকাংশই হিজরি ৭ম/ খ্রিষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে তথা দিল্লির মামলুক সুলতানদের শাসনামলে (১২০৬-১২৯০খ্রি.) প্রথমদিকে উৎকীর্ণ করা হয়। আজমির ও দিল্লিতে প্রাপ্ত শিলালিপিগুলো ঐ যুগের বিভিন্ন ধরনের অলংকৃত কুফিরীতির উৎকৃষ্ট নমুনা হিসেবে ধরা হয়।[৪০] বাংলায় এ লিপিরীতির কেবল একটি শিলালিপিই খুঁজে পাওয়া যায়। এটি ঐতিহাসিক পাণ্ডুয়া নগরীর আদিনা মসজিদে বিদ্যমান। এতে প্রথমে সুলুস রীতির অনুকরণে দুটি লাইন লিপিবদ্ধ আছে। এর ওপরে অলংকরণের উদ্দেশ্যে ছোট্ট আকারে কুফি লেখাগুলো উৎকীর্ণ করা হয়।[৪১] এ ছাড়া সুলতান বারবাক শাহের শাসনামলে (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রি.) ঘিওরে প্রাপ্ত কবর গাত্রের পাথরে কুফি ও সুলুস লিপির চমৎকার সমন্বয় লক্ষ করা যায়।[৪২]

স্থাপত্যে কুফি লিপি আজও সুষমা ছড়িয়ে চলেছে (দ্র. চিত্র-১৬)। দিল্লির কুতুব মিনার থেকে তুরস্কের ইনস্ মিনারেলি মাদরাসায় এ লিপির অত্যাশ্চর্য কাজ আমাদেরকে অতীত গৌরবগাথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

চিত্র-১৬: প্লাস্টার ও সিরামিক প্লেটে লতাপাতা সমন্বিত কুফি

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১ মুছলেহ উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১১৬-১১৭।
২ ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩০৬।
৩ ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা.)-এর নির্দে-কে হজরত সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা.) হিজরি ১৭ সালে কুফা নগরীর গোড়াপত্তন করেন।
৪ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৮।
৫ ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩১৯।
৬ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২০।
৭ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১১৬।
৮ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৬।
৯ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১১৬।
১০ ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ,* খ ১০, পৃ. ৫৫; আবদুর রহীম, *ইসলামী ক্যালিগ্রাফী*, পৃ ৪৭।
১১ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬৬।
১২ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২০।
১৩ *প্রাগুক্ত।*
১৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ ২০-২১।
১৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৮।
১৬ ইয়াকুব আলী, *মুসলিম মুদ্রা...*, পৃ ৩০৫।
১৭ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১১৫-১১৬
১৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১১৬।
১৯ ওয়াফি, *ফিকহুল লুগাহ*, পৃ ২৫৩-২৫৪।
২০ আবদুর রহীম, *ইসলামী ক্যালিগ্রাফী*, পৃ ৪৭।
২১ রাহপেইমা, গোলাম রেযা, ইসলামী সংস্কৃতির উৎকর্ষ বিধানে হস্তলিপি শিল্পের ভূমিকা, *নিউজ লেটার*, প্রাগুক্ত, বর্ষ-২৫, সংখ্যা-১১-১২, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৩, পৃ ৪১।
২২ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২১।
২৩ জুমু'আ, ড.ইব্রাহিম, *দিরাসাতুন ফী তাতাওয়ারিল কিতাবাতিল কুফিয়্যা*, পৃ ২৮; জাব্বুরি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ১২৭-৮।
২৪ আবদুর রহীম, *ইসলামী ক্যালিগ্রাফী*, পৃ. ৪৮।
২৫ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১১৬-১২৪; জাব্বুরি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ১২৮।
২৬ *মাসিক হুনর ও মর্দুম*, ২৮তম সংখ্যা, বাহমন, ১৩৪৩, ইনতিশারাতে ওযারাতে ফরহঙ্গ ও হুনর, তেহরান, ইরান, পৃ ১৬।
২৭ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৯৫।
২৮ Safadi, *op.cit.*, P-12.
২৯ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৯৫; জাব্বুরি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ১২৮।
৩০ এটি অ্যারাবিক শব্দ থে-কে উদ্ভূত। অঙ্কন ও অঙ্গসজ্জার জন্য যে আরবি লিপি ব্যবহৃত হতো তা-ই হলো 'অ্যারাবেস্ক'।
৩১ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১২০।
৩২ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১২১।
৩৩ আবদুর রহীম, *ইসলামী ক্যালিগ্রাফী*, পৃ ৫০।

www.pathagar.com

৩৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪৮।
৩৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৫০।
৩৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪৭।
৩৭ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২১-২২।
৩৮ Mustafizur Rahman, P.I.S., *Islamic Calligraphy in Medieval India*, University Press Limited, Bangladesh, 1979, Plate-1.
৩৯ Mustafizur Rahman, *op. cit.*, P.23-24.
৪০ Annemari Schimmel, *Islamic Calligraphy*, Leiden, E. J. Brill, 1970, Plate-x (a.b.c.), P -22.
৪১ সিদ্দিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৭৯।
৪২ আবদুর রহীম, মোহাম্মদ, ইসলামিক ক্যালিগ্রাফিতে থুলুথলিপি, *দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকা*, ৩ এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ ৬।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

তুগরা লিপিশৈলী

তুগরার পরিচয়

'তুগরা' طغرى আরবি লিখনশিল্পের সর্বাপেক্ষা চাতুর্যপূর্ণ একটি কৌশল। অলংকরণের উদ্দেশ্যেই এ লিপিরীতির উদ্ভব হয়। এ রীতিতে শিল্পীগণ অত্যন্ত দক্ষতা ও সৃজনশীলতার সাথে অক্ষরগুলোকে এমন চাতুর্যের সঙ্গে বিন্যাস করেন যে, তা আলংকারিক মোটিফে রূপান্তরিত হয়। লিপি-বিজ্ঞানী ও গবেষকগণ তুগরা লিপির পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে নানা মত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশ লিপিবিশারদ একে স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ লিপিশৈলী হিসাবে গণ্য করেছন। তাঁদের মতানুসারে 'ইজাযা' (إجازة) ও 'দিওয়ানি' (ديواني) পদ্ধতিদ্বয়ের সমন্বয়ে এ লিপিশৈলীর উদ্ভব হয়। আবার অনেকের অভিমত হচ্ছে— এটি কোনো স্বতন্ত্র লিখনপদ্ধতি নয়; বরং এটি যে কোনো প্রধান প্রধান লিখনপদ্ধতির অলংকরণ কৌশল মাত্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'নাসখ' (نسخ) ও 'সুলুস' (ثلث) লিখনপদ্ধতি বিশেষ অলংকরণ প্রক্রিয়ায় উপস্থাপিত হয়ে 'তুগরা' নাম ধারণ করে। বস্তুত প্রাথমিক পর্যায়ে 'তুগরা' আলংকারিক কৌশল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। লিপিকারগণ যে-কোনো প্রধান রীতির অলংকরণের জন্য এটি ব্যবহার করত। কিন্তু পরবর্তীকালে এর বহুল প্রয়োগ এবং জনপ্রিয়তার কারণে সাধারণভাবে একে একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[১]

'তুগরা' মূলত ফারসি نشان (নিদর্শন)-এর প্রতিশব্দ। তবে ব্যবহারগত দিক থেকে এটি আরবি শব্দ توقيع (Seal)-এর সমার্থক হিসেবে প্রচলিত। এটি খাঁটি আরবি শব্দ নয়; বরং আরবি ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট শব্দ। আরবরা সরকারি প্রচারপত্র ও মুদ্রাসমূহে উৎকীর্ণ চিত্র অর্থে এটি ব্যবহার করে। বর্তমানে একে রাষ্ট্রীয় কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক প্রতীক অর্থেও ব্যবহার করা হয়।[২] তবে প্রাথমিক পর্যায়ে 'তুগরা' বলতে কেবল পত্রশীর্ষে 'বিসমিল্লাহ'র ওপরে উৎকীর্ণ চিত্রকে বোঝানো হতো। সেখানে মোটা কলমে যুক্তাক্ষরে পত্র প্রেরণকারী বাদশাহের নাম বা উপাধি কিংবা তাঁর কোনো স্তুতিবাদ লিপিবদ্ধ করা হতো।[৩]

ঐতিহাসিক মাকরিযির মতে, শব্দটি ফারসি।[৪] অন্য কারো কারো ধারণা, এটি তাতারীয় শব্দ। তাদের মতানুযায়ী শব্দটি মূলত طورغاي ছিল। বহুল ব্যবহারের ফলে এটি ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হয়ে طغرى-য় পরিণত হয়।[৫] যদিও অনেক ঐতিহাসিক ও ভাষাবিদের মতানুযায়ী শব্দটি তুর্কি নয়, হয়তো তা ফারসি কিংবা তাতারীয়; কিন্তু অধিকতর বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, এটি প্রাচীন তুর্কি শব্দ। আবদুর রহমান কাশগড়ি বলেন: 'তুগরা' উগুজ উপভাষার শব্দ। এটি মূলত طغراغ ছিল। নিয়ম হচ্ছে যে, অটোমান তুর্কি ভাষায় উগুজ শব্দের শেষ কণ্ঠনালিস্থ বর্ণ[৬] -কে বিলুপ্ত করা হয়। উক্ত নিয়ম মোতাবেক طغراغ শব্দের শেষ কণ্ঠনালিস্থ বর্ণ 'غ' বিলুপ্ত হয়ে অটোমান তুর্কি

www.pathagar.com

ভাষায় এটি طغری-য় পরিণত হয়।[৭] কারো কারো মতে, طغری তুর্কি শব্দ طوغ থেকে উদ্ভূত। তুর্কি ভাষায় এর অর্থ ঘোড়া। বহুল ব্যবহারের ফলে এটি প্রথমে 'طوغو'-তে পরিণত হয়। অতঃপর ক্রমে ক্রমে এটি طغری-য় রূপান্তরিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো কোনো 'তুগরা' দ্রুতগামী অশ্বারোহীর আকৃতিতে উৎকীর্ণ করা হতো বলে এ ধরনের চাতুর্যপূর্ণ আলংকারিক রীতিকে পরবর্তীকালে সাধারণভাবে 'তুগরা' নামে অভিহিত করা হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, শব্দটি মূলত আরবি নয়। হয়তো তা ফারসি বা তাতারীয় কিংবা তুর্কি। আরবরা সেখান থেকে এটি গ্রহণ করে এবং ব্যাপকভাবে তা ব্যবহার করে। কবিগুরু আহমদ শাওকি মহানবি (সা.)-এর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন,

نُظِمَتْ أَسَامِيُ الرُّسُلِ فِي صَحِيْفَةٍ فِي اللَّوْحِ، وَاسْمُ مُحَمَّدٍ طُغْرَاءُ

اسْمُ الْجَلَالَةِ فِي بَدِيْعِ حُرُوْفِهِ أَلِفٌ هُنَالِكَ، وَاسْمُ طَهَ الْبَاءُ

লাওহে মাহফুজে একটি গ্রন্থে রসুলগণের নামসমূহ সুবিন্যস্তভাবে সাজানো হয়েছে। সেখানে মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম 'তুগরা'রূপে বিদ্যমান। অর্থাৎ সর্বাগ্রে বড়ো অক্ষরে চিত্রিত হয়েছে।

এর অভিনব বর্ণসমূহের মাঝে মহান আল্লাহর নাম 'আলিফ' হিসেবে এবং তোয়াহা অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম 'বা' হিসেবে শোভা পাচ্ছে।[৮]

তুগরার উৎপত্তি ও বিকাশ

পাশ্চাত্য লিপিবিজ্ঞানী ও প্রাচ্যবিদগণ কেবল অটোমান তুর্কিদের সূত্রে তুগরা লিপি সম্পর্কে অবহিত হন। অটোমানরা প্রায় চার শতাব্দীর অধিক সময় ধরে এই লিপিকৌশল অনুসরণ করেছিল। তবে বিভিন্ন তথ্য এ কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, তাদের পূর্বেও বিভিন্ন স্থানে এর প্রচলন ছিল। তাদের পূর্বে এশিয়া মাইনরে সেলজুক, বাংলায় মুসলিম এবং মিসরে মামলুকদের মাঝে এর ব্যাপক ব্যবহার ছিল। এ ছাড়া ভারত উপমহাদেশের গোলকুণ্ডা, হায়দরাবাদ ও বিজাপুর প্রভৃতি এলাকায়ও মধ্যযুগে মুসলিম লিপিশিল্পীদের লিপিকর্মে এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়।[৯] কারো কারো ধারণা, তুগরা সুলতান উগুজ খানের প্রতীক ছিল।[১০] এস. এম. হাসান বলেন,

তুগরা শৈলীতে স্বাক্ষরের যে রীতি প্রচলিত হয় ষোড়শ শতাব্দীতে তুরস্কে তার বিবর্তন পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, এই লিপিকৌশল প্রথমে উগুজ এবং পরে সেলজুকদের আমলে ব্যবহৃত হত। কিন্তু তুর্কি সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় তুগরা রাজকীয় সিল মোহরের লিপি হিসেবে সর্বাধিক মর্যাদা লাভ করে।[১১]

উগুজদের ব্যবহৃত তুগরা লিপির কোনো নিদর্শন বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যায় না। তদ্রূপ সেলজুকদের ব্যবহৃত তুগরার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও অবগত হওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তবে প্রবল ধারণা করা হয় যে, সেলজুকীয় তুগরাগুলো ধনুকাকৃতির ছিল। ধনুকের নিচে বাদশাহদের নাম লিপিবদ্ধ করা হতো। সেলজুকীয় আমলের (১০৩৭-

www.pathagar.com

১৩০০ খ্রি.) অন্যতম খ্যাতনামা তুগরা লিপিকার হচ্ছেন আবূ ইসমাইল হুসায়ন ইবন আলী মুহাম্মদ ইস্পাহানি তুগরায়ি (মৃ.৫১৬ হি.)। তিনি সুলতান মাসউদ ইবন মুহাম্মদ সেলজুকির (১১৩৩-১১৫২ খ্রি.) উজির ছিলেন।[১২] মিসরে মামলুক সুলতানদের আমলে তুগরার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে তাঁরা এটা আইয়ুবীয়দের (১১৭৪-১২৪৯ খ্রি.) মাধ্যমে সেলজুকদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন।

মিসরে মামলুকদের আমলে (১২৫০-১৫১৭ খ্রি.) যখন তুগরা লিপির প্রভূত চর্চা হয়, ঠিক তখনি বাংলাদেশেও স্বাধীন সুলতানি আমলে (১৩৩৫-১৫৩৫ খ্রি.) উক্ত রীতির বেশ চর্চা লক্ষ করা যায়। উপরন্তু, উভয় দেশের তুগরাসমূহের মাঝে বড়ো ধরনের সাদৃশ্যও ছিল। লক্ষণীয় যে, তখনকার সময়ে উভয় দেশের সুলতানদের মাঝে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। বিশেষত বাংলার সুলতান জালালুদ্দুনিয়া ওয়াদ-দীন মুহাম্মদ শাহ (১৪১৮-১৪৩৩ খ্রি.) ও তাঁর সমসাময়িক মামলুক সুলতান বারস্‌বায়-এর আমলে (১৪২২-১৪৩৮ খ্রি.) দু দেশের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তাঁরা উভয়ে একে অপরের কাছে হাদিয়া পাঠাতেন। উভয় দেশের এ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে বাংলার তুগরা লিপি স্বভাবত মামলুকদের তুগরা লিপি দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, বাংলার তুগরা লিপি প্রচলনের সামান্যকাল পূর্বে মামলুকদের মাঝে তুগরার ব্যবহারের সূত্রপাত হয়।

বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনাকাল তথা ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে তুগরা লিপির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। শামসুদ্দীন আহমদ বলেন, "মুসলিম লিপিকলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং আলংকারিক রীতিতে উদ্ভূত রীতি হচ্ছে 'তুগরা'। এই শৈলী বাংলার মুসলিম শাসনের প্রথম যুগেই ব্যবহৃত হয়েছে।"[১৩] কিন্তু কীভাবে বাংলায় এই লিপির অভ্যুদয় হয় তা সঠিকভাবে অবগত হওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তবে ধারণা করা হয় যে, মধ্য এশিয়া ও নিকট-প্রাচ্যে ইসলামি সভ্যতার প্রাণকেন্দ্রসমূহে মোগলদের লাগাতার আক্রমণ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে মুসলিম শিল্পী ও লিপিকারগণ দূরবর্তী নিরাপদ ইসলামি রাষ্ট্রসমূহে যেখানে এই সমস্ত আক্রমণের কোনো প্রভাব পড়েনি যেমন–মিসর ও বাংলা প্রভৃতি দেশে পালিয়ে যায়। মোগলদের রণক্ষেত্র থেকে বাংলার দূরবর্তী সুবিধাজনক অবস্থানের কারণে অনেক শিল্পী নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে একে বেছে নেয়। উপরন্তু, বাংলার শাসকগণ তাদেরকে সাদরে বরণ করেন এবং তাদের যথাযথ কদর করেন। এ ছাড়া তাঁরা শিল্পীদেরকে তাদের শিল্পকর্ম চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও প্রভূত উৎসাহ যোগান। এর ফলে তারা অতি উন্নত ও প্রকৃষ্ট শৈল্পিক চিত্রকর্ম সৃষ্টির প্রয়াস এক নাগাড়ে চালিয়ে যায়। এভাবে সেলজুকদের দীক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীগণের মাধ্যমে বাংলায় তুগরা রীতির প্রচলন হয়। তারা বাংলায় উক্ত রীতির ব্যাপক চর্চা করে। অবশেষে তা ঐ সময়কার আলংকারিক লিপির সর্বাপেক্ষা চাতুর্যপূর্ণ কৌশলে পরিণত হয়।

বাংলায় তুগরা লিপি ক্রমে এতোই উৎকর্ষ লাভ করে যে, সুলতানি আমলে এই লিপিরীতি অত্যন্ত সাবলীল ও মাধুর্যপূর্ণ লিপিতে পরিণত হয়। এ ছাড়া ভারতের গুজরাট, গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর প্রভৃতি এলাকায়ও তা প্রভূত বিস্তার লাভ করে। বাংলায়

www.pathagar.com

সুলতানি আমলের স্থাপত্যরীতিতে আরবি শিলালিপিগুলোতে তুগরা রীতির ব্যবহার দেখা যায়। কালো পাথরে উৎকীর্ণ এই সমস্ত শিলালিপির বহু নিদর্শন বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে। হিজরি ৮ম, ৯ম ও ১০ম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে অর্থাৎ যখন ভারত উপমহাদেশের রাজ্যগুলো একের পর এক মোগল সাম্রাজ্যের পদানত হচ্ছিল তখন থেকেই এর ব্যবহার ভারত উপমহাদেশে ক্রমশ বিলুপ্ত হতে থাকে। অবশেষে মোগলরা যখন বাংলায় প্রবেশ করে তখন এর ব্যবহার প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। মোগল আমলের (১৫৭৫-১৭৫৭ খ্রি.) সূচনা থেকেই এ রীতির কোনো নিদর্শন খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

মিসরে আশরাফিয়া সাম্রাজ্যের পতনকাল তথা সুলতান শাবান ইবন হুসায়নের আমল (১৩৬৩-১৩৭৬ খ্রি.) পর্যন্ত এ লিপিরীতি সরকারি প্রচারপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ-সমূহে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।[১৪] ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে অটোমান সুলতান প্রথম সেলিম (১৫১২-১৫২০ খ্রি.) মামলুক সুলতান তুমান-বে (১৫১৬-১৫১৭ খ্রি.)-কে পরাজিত করে মিসর দখল করে। ফলে মামলুক সাম্রাজ্যের সমস্ত সরঞ্জাম, এমনকি কুরআনের অনুলিপি ও বিভিন্ন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুলের রাজকোষে গিয়ে জমা হয়। এ সুযোগে মিসরের তুগরা লিপিরীতি অটোমান তুর্কিদের হস্তগত হয়। অতঃপর তাদের লিপিশিল্পীদের হাতে ধীরে ধীরে উক্ত রীতি বিকাশ লাভ করে। সর্বশেষ ১২৪১ হিজরিতে খ্যাতনামা লিপিকার মুস্তফা রাকিমের হাতে এ লিপিরীতি চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। তদুপরি অটোমান সুলতানদের সিলমোহরের লিপি হিসেবে এই লিপিরীতি সর্বজনীন রূপ লাভ করে।[১৫] পাপাডোপোলো বলেন,

> আরবি লিপিকলার অসামান্য গুণাবলি এবং নির্বস্তুক বহিঃপ্রকাশের যে ধারা রয়েছে তা তুরস্কে 'তুগরা' নামে এক আকর্ষণীয় লিপিশৈলীতে রূপান্তরিত হয়। এই লিপি অটোমান সুলতানদের সুললিত ও দীর্ঘায়িত রাজকীয় স্বাক্ষরের লিপিতে পরিণত হয়।[১৬]

অটোমান তুগরার উৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তৈমুর লঙ্গ (১৩৭০-১৪০৫ খ্রি.) ও সুলতান বায়েজিদ উসমানির (১৩৮৯-১৪০৩ খ্রি.) মাঝে পর্যায়ক্রমে যোগাযোগ চলাকালীন তৈমুর একদা বায়েজিদের কাছে একটি হুঁশিয়ার বাণী প্রেরণ করেন। তৈমুর লিপি-বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ায় তিনি তাঁর হুঁশিয়ার বাণীতে নিজের স্বাক্ষর সম্বলিত সিলমোহর প্রয়োগের পরিবর্তে টিপসই দিয়েছিলেন। এর পর থেকে তুর্কি সুলতানদের কাছে স্বাক্ষর সম্বলিত সিলমোহর প্রয়োগের রীতি অতি নির্ভরযোগ্য বস্তুতে পরিণত হয় এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় 'তুগরা' রাজকীয় সিলমোহরের লিপি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রথম ভাগে সুলাইমান ইবন বায়েজিদ (১৫২০- ১৫৬৬ খ্রি.) সর্বপ্রথম তুগরা পদ্ধতিতে রাজকীয় স্বাক্ষর সম্বলিত সিলমোহর প্রয়োগের রীতি প্রবর্তন করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন, তৃতীয় উসমানীয় সুলতান ১ম মুরাদই (১৩৫৯-১৩৮৯ খ্রি.) সর্বপ্রথম এই লিপিরীতির প্রবর্তন করেন।[১৭]

Von Hammer-এর মতে, সুলতান ১ম মুরাদ বা তাঁর পিতা উর খানের আমলে (১৩২৪-১৩৬০ খ্রি.) তুগরার অভ্যুদয় হয়। উপরন্তু, তিনি বলেন, "সুলতান ১ম মুরাদ লিখনশাস্ত্র সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলেন বলে তিনি তাঁর হাতের অঙ্গুলিগুলোর বিভিন্ন নিদর্শনের অনুকরণে তুগরার গোড়াপত্তন করেছিলেন। তাঁর এ মতের যথার্থতা

www.pathagar.com

নিরূপণের জন্য যথেষ্ট প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তিনি তাঁর এ মতের স্বপক্ষে কোনো দলিল পেশ করেননি।[১৮] এটা সত্য যে, Fekete খলিল আদহামের বরাতে ১ম মুরাদের তুগরাযুক্ত মুদ্রার উল্লেখ করেছেন; কিন্তু এ লেখকের ক্যাটালগে এই মুদ্রা উল্লেখ করেননি।[১৯] কর্নেল আলীও ১ম মুরাদের সময়কাল থেকে তুগরার লেখচৈত্রিক (Graphic) বিবর্তনের বিবরণ দিয়েছেন; কিন্তু তিনি এটা বলেননি যে, তিনি কোথা থেকে এটা গ্রহণ করেছেন।[২০]

তুর্কি সুলতানদের দরবারে তুগরা লিপিকারদের বিশেষ আদর-কদর ছিল। তাদের কর্মদক্ষতা অনুসারে সুলতানগণ তাদেরকে বিভিন্ন মর্যাদা ও পদবিতে অভিষিক্ত করতেন। নিশানজি (نشانجی) এ ধরনের সম্মানজনক পদবিসমূহের অন্যতম। এ পদবিতে অভিষিক্ত ব্যক্তি বিভিন্ন আইন-কানুন ও দলিল-দস্তাবেজের ওপর যথোপযুক্ত তুগরা উৎকীর্ণ করতেন। তাঁর পদমর্যাদা সরকারি মুফতির পদমর্যাদার সমান ছিল। রাজ্যের পরিধি ও কর্ম বেড়ে যাওয়ার ফলে নিশানজিগণ طغراكش-তুঘরা বিশেষজ্ঞ নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করতে থাকে।

এভাবে তুর্কি সুলতানদের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে প্রায় চার শতাব্দীর অধিক সময় ধরে এ লিপিরীতি সর্বজনীন ব্যবহার লাভ করেছিল। সর্বশেষ তুর্কি সুলতান আবদুল হামিদ (১৮৭৬- ১৯০৯ খ্রি.) সিংহাসনচ্যুত হওয়ার পর ১৯২২ সনের নভেম্বর মাসে জারিকৃত আঙ্কারা অর্ডিন্যান্স মোতাবেক সরকারি পর্যায়ে এর ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়।[২১]

মামলুকীয় তুগরার লিখনরীতি

'তুগরা' শব্দ ও এর ব্যবহার দেশ থেকে দেশান্তরে বিস্তার লাভ করেছিল বটে; কিন্তু প্রত্যেক দেশে এর স্বরূপ ও প্রকৃতি একই ধরনের ছিল না। অটোমানদের পূর্বে বিভিন্ন রাজ্যে প্রচলিত তুগরার আকৃতি ও স্বরূপ অটোমান তুগরার স্বরূপ ও আকৃতি থেকে ভিন্ন ছিল। বাংলা এবং ভারতের কয়েকটি রাজ্যে শিলালিপিতে চিত্র উৎকীর্ণ করার কাজে এটি ব্যবহার করা হতো। দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ (১৩৫২-১৩৮৮ খ্রি.) ধাতব মুদ্রার গাত্রে ও রাষ্ট্রীয় প্রতীক হিসেবে এর ব্যবহার করেছিল।[২২]

মামলুক সুলতানগণ বিভিন্ন ফরমান ও নির্দেশাবলিতে তুগরা ব্যবহার করতেন। তাঁরা তুগরা তৈরি করার জন্য বিশেষ লিপিকার ও কর্মচারী নিয়োগ করতেন। কর্মচারীদের দায়িত্ব ছিল, তারা আয়তাকার কাগজের কতকগুলো খণ্ডের ওপর তুগরাগুলো তৈরি করত। এরপর লিপিকারগণ ঐ সকল খণ্ডকে দস্তাবেজ বা পত্রের সাদা অংশে কিংবা উপরিভাগে নির্ধারিত দূরত্ব বজায় রেখে (অর্থাৎ তুগরার স্থানে) 'বিসমিল্লাহ'-এর ওপর দিকে সেঁটে দিতেন।

মামলুকদের তুগরাগুলো ছিল অতি দীর্ঘাকৃতির। ط , ل ,ا ও ظ প্রভৃতি বর্ণের পরস্পর সন্নিহিত উল্লম্ব দণ্ডসমূহের শিরোদেশবিশিষ্ট সমান্তরাল রেখাগুলোর সমন্বয়ে এ দীর্ঘ আকৃতির রূপ সৃষ্টি হয়। এ দীর্ঘাকৃতির চিত্রের ভিত্তিমূলে বাদশাহের নাম ও তাঁর উপাধি লিপিবদ্ধ করা হতো। বর্ণগুলোর উল্লম্ব দণ্ডের সংখ্যা কম-বেশি হওয়া এবং বাদশাহের বংশধারা দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত হওয়ার ভিত্তিতে তাদের তুগরার বৈশিষ্ট্য, মাত্রা (Dimension) ও আঙ্গিক গঠন প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। বাক্যে বর্ণের লম্বসমূহের

www.pathagar.com

সংখ্যার প্রতি তুগরা লিপিকারদের বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হতো। যদি এগুলো কম হয়, তাহলে মোটা প্রশস্ত কলমে যেমন مختصر الطومار (হ্রস্ব তুমার) বা এ জাতীয় লিপিশৈলীর অনুকরণে লম্বসমূহ উৎকীর্ণ করা হয়, যাতে কাগজের খালি জায়গা ভরপুর হয়ে যায়। আর লম্বসমূহ যদি সংখ্যায় বেশি হয়, তাহলে পূর্বের চেয়ে ছোট কলমে যেমন ' جليل الثلث ' (বলিষ্ঠ সুলুস) বা এ জাতীয় লিপিরীতির অনুকরণে লম্বসমূহ উৎকীর্ণ করা হয়। এমতাবস্থায় একে প্রসারিত ও স্থূল আকৃতিতে রূপান্তরিত করার প্রয়োজন থাকে না। এ ছাড়া কাগজ ছোট-বড়ো হওয়ার কারণেও লম্বসমূহের আকৃতি বিভিন্ন হয়ে থাকে।[২৩]

উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, তুগরা লিপির সুনির্দিষ্ট কোনো লিখনরীতি নেই। সুলুস, সুলুসাইন, তুমার, নাসখ ও মুহাক্কক প্রভৃতি লিখনরীতির অনুকরণে এর লেখার কাজ সমাধা করা হতো। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ মামলুক সুলতানদের ব্যবহৃত দুটি তুগরার ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো। তন্মধ্যে একটি মামলুক বংশের অন্যতম খ্যাতনামা সুলতান মুহাম্মদ ইবন কালাউনের (১২৯৩-১২৯৪, ১২৯৮, ১৩০৯-১৩৪১ খ্রি.) তুগরা। এর প্রতিপাদ্য বিষয় হলো:

السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا و الدين محمد بن السلطان الشهيد الملك المنصور سيف الدين قلاوون

এখানে ل, ا ও ط প্রভৃতি বর্ণের খাড়া ও দীর্ঘ লম্বসমূহের সংখ্যা ৩৫। এগুলো قلم النصف (নিসফ শৈলী)[২৪] লিখনপদ্ধতি অবলম্বনে লিখিত। এগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, অতি সন্নিহিত প্রতি দু'টি লম্বের মাঝে এমন একটি লম্ব বিদ্যমান, যার উভয় পার্শ্বে খালি জায়গা রয়েছে। এর দৈর্ঘ্য অর্ধ হাতের চেয়ে অল্প বেশি এবং প্রস্থ তদনুরূপ। এর সুশৃঙ্খল বিন্যাসকে কার্যকর করতে গিয়ে কিছু বর্ণকে যথাস্থানে না বসিয়ে অন্যস্থানে বসানো হয়েছে। যেমন 'الملك' শব্দের 'ا'-কে 'السلطان' -এর লম্বদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে বসানো হয়েছে। তুগরার নিচে ঠিক মধ্যভাগে এক আঙ্গুল পরিমাণ জায়গা খালি রেখে جليل الثلث (বলিষ্ঠ সুলুস) লিখনপদ্ধতি অবলম্বনে ' خلد الله سلطانه' বাক্যটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে (দ্র. চিত্র-১)।

চিত্র-১: সুলতান মুহাম্মদ ইবন কালাউনের তুগরা

www.pathagar.com

দ্বিতীয়টি সুলতান শাবান ইবন হুসায়নের তুগরা। এর প্রতিপাদ্য বিষয় হলো :

السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين ناصر الدنيا و الدين ابن الملك الأمجد ابن السلطان الملك الناصر ابن الملك المنصور قلاوون

এখানে আলিফ ও তদনুরূপ বর্ণসমূহের লম্বগুলোর সংখ্যা ৪৫। এগুলো **جليل الثلث** (বলিষ্ঠ সুলুস) লিখনপদ্ধতি অবলম্বনে লিখিত। এর প্রত্যেকটি লম্ব অপর লম্ব থেকে এক লম্ব পরিমাণ খালি জায়গার ব্যবধানে অবস্থিত। এর মোট দৈর্ঘ্য কোনো দিকে এক-তৃতীয়াংশ হাত ও কোনো দিকে এক-চতুর্থাংশ এবং প্রস্থও একই পরিমাপের। তুগরার মাঝখানে তুমার লিখনশৈলী দ্বারা সুলতান শাবান ইবন হুসায়নের নাম কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্তনকারী এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্তিত হিসেবে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। **شعبان** -এর **ب** , **ع** , **ش** ও **ا** এক লাইনে এবং **شعبان** -এর **ن** ও **بن** পূর্ববর্তী লাইনের **ش** ও **ع**-এর ওপরে অন্য লাইনে '**حسين**' - এর ওপরে অন্য লাইনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। **شعبان** -এর **ألف** -এর দৈর্ঘ্য এক হাতের ষষ্ঠাংশ পরিমাণ। ষষ্ঠদশ লম্বের পর নামের প্রথম অংশ উৎকীর্ণ করা হয়েছে। আর '**حسين**'-এর '**ن**' টি বাম দিকে খাড়া অবস্থানরত **شعبان** -এর **ألف**-কে ভেদ করে বাম দিকে সামান্য বের হয়েছে[২৫] (দ্র. চিত্র-২)।

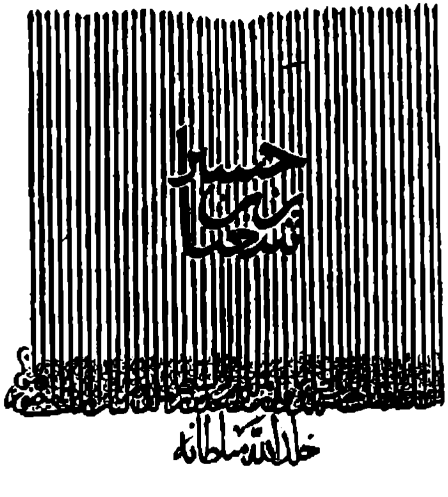

চিত্র-২: সুলতান শাবান ইবন হুসায়নের তুগরা

বাংলার তুগরা লিখনশৈলী

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলার তুগরা রীতি মিসরের মামলুকদের অনুসৃত তুগরা রীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত। তবে তাদের তুগরার ব্যবহার ক্ষেত্রের তুলনায় বাংলায় তুগরার ব্যবহার ক্ষেত্র অধিকতর ব্যাপক ও বিস্তৃত। বাংলার শিলালিপিগুলোতে তুগরা প্রধান শৈলী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

মুদ্রাশিল্পীগণ মুদ্রার গাত্রে আলংকারিক লিখন-উপকরণ হিসেবে এটি ব্যবহার করতেন। এভাবে লক্ষ করা যায় যে, বাংলায় তুগরার যে অর্থ ও ব্যবহার প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল, তা ভারত উপমহাদেশের বাইরে ইসলামি রাষ্ট্রসমূহে প্রচলিত তুগরার অর্থ ও ব্যবহার প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন ছিল। উল্লেখ্য, বাংলার অধিকাংশ তুগরা লিপি অটোমান তুগরা লিপির চেয়ে মামলুকীয় তুগরার সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। বিশেষ করে, শিরোদেশবিশিষ্ট বর্ণসমূহের (الحروف الرأسية) উল্লম্ব রেখাগুলো দীর্ঘ হওয়ার ক্ষেত্রে মামলুকীয় তুগরার সাথে বাংলার তুগরা রীতির সাদৃশ্যের বিষয়টি পরিস্ফুট হয়। তবে বারবাক শাহের আমলের (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রি.) একটি স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ তুগরাটি অটোমান তুগরার সাথে অনেকাংশে মিল দেখা যায়[২৬] (চিত্র-৩)

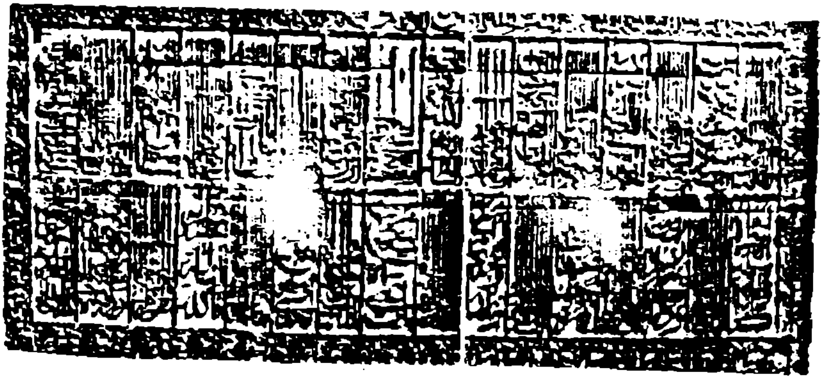

চিত্র-৩: সুলতান বারবাক শাহের শিলালিপি, ৮৭৯ হি.

প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলার তুগরা রীতিতে আলিফ ও লামের ন্যায় শিরোদেশবিশিষ্ট বর্ণসমূহের উল্লম্ব রেখাগুলো অলংকরণ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উপরের দিকে সুশৃঙ্খল ও সংগতিপূর্ণভাবে দীর্ঘায়িত করে লিপিবদ্ধ করা হতো। ক্রমে বাংলায় উক্ত রীতির প্রভূত বিকাশ সাধিত হয়। এতে বিভিন্ন শৈল্পিক অভিব্যক্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। উপরন্তু, প্রয়োজন অনুসারে বর্ণসমূহের সম্প্রসারণ, সঙ্কোচন এবং দীর্ঘ ও পরিবর্তনের মাধ্যমে নানা ধরনের তুগরা সৃষ্টি করা হতো।

নানা ধরনের বিমূর্ত আলংকারিক তুগরা সৃষ্টির পেছনে শিল্পীদের কল্পনাশক্তির বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এ ছাড়া এই লিপিরীতিও শিল্পীদেরকে শৈল্পিক অভিনবত্ব সৃষ্টির বিপুল সুযোগ দান করে, যা অন্য কোনো লিপিরীতির মধ্যে দেখা যায় না। এই লিপিরীতিতে বর্ণসমূহের মাত্রা ও আকার-আকৃতির সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম-কানুন নেই। ফলে শিল্পীগণ এ লিপিরীতিতে তাঁদের শৈল্পিক মনোবাঞ্ছা পূরণে যথার্থরূপে সক্ষম হন। তাঁরা তাঁদের পূর্ণ ইচ্ছা মোতাবেক এ রীতিতে নতুন নতুন ধারা ও অভিনব আকৃতি উদ্ভাবন করে থাকেন। এ লিপিশৈলীতে বর্ণসমূহের সুনির্দিষ্ট কোনো মাত্রা ও এদের

www.pathagar.com

ধারাবাহিক বিন্যাসের গুরুত্ব না থাকায় লিপিকারগণ অতি অল্প ও নির্দিষ্ট স্থানে অনেক শব্দ ও দীর্ঘ বিষয়কে এমন কম সময়ে লিখতে সক্ষম হন, যা অন্যান্য লিপিরীতিতে সম্ভব নয়। এজন্য দেখা যায় যে, শিলালিপিগুলোতে নির্দিষ্ট স্থানে দীর্ঘ বক্তব্য বিন্যস্ত করতে গিয়ে বর্ণ ও শব্দগুলোকে একটার ওপর আর একটা লিপিবদ্ধ করা হয়। আবার অনেক সময় বর্ণ ও শব্দকে এদের যথাযথ স্থান ব্যতীত অন্য স্থানে লেখা হয়। তুগরা লিপির এ বৈশিষ্ট্যের কারণে শিল্পীগণ শরিয়তের কোনো নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হওয়া ছাড়াও তাঁদের শৈল্পিক মনোবাঞ্ছা পূরণের সুযোগ লাভ করেন। প্রাণীর চিত্রাঙ্কন ইসলামে নিষিদ্ধ। তাই এ লিপিরীতিতে শূন্য স্থানগুলো বিভিন্ন আলংকারিক উপাদানের সমন্বয়ে এমনভাবে পূরণ করা হয় যে, তন্মধ্যে অনেকটা বিভিন্ন আকর্ষণীয় বস্তুর চিত্রে পরিণত হয়। আবার অনেকটা প্রাণীর চিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হয়।[২৭]

সুলতানি আমলে তুগরা লিপির বিভিন্ন প্রকরণে লক্ষ করা যায় যে, এ আমলের শিলালিপিগুলোতে মূলত অলংকরণের উদ্দেশ্যেই তুগরার ব্যবহার করা হয়েছে। শিল্পীগণ অপরিসীম দক্ষতা ও সৃজনশীলতার গুণে বর্ণগুলোকে এমন চাতুর্যের সঙ্গে বিন্যাস করেন যে, তা আলংকারিক মোটিফে রূপান্তরিত হয়। এ ক্ষেত্রে সনাতনী পদ্ধতিতে সমান্তরালভাবে শব্দগুলোকে সাজাতে হবে এমন নয়। কারণ দীর্ঘ শিলালিপি ক্ষুদ্র পরিসরে খোদাইয়ের জন্য পরপর কয়েকটি স্তরে বর্ণগুলো জড়িত করে উৎকীর্ণ করা হয়। লক্ষণীয় যে, পরস্পর জড়িত বর্ণগুলো জটিলতার ও পাঠোদ্ধারে অসুবিধার সৃষ্টি করলেও এদের ভারসাম্য, সুসামঞ্জস্য ও শৈল্পিক চাতুর্য ব্যাহত হয় না।[২৮] এ প্রকৃতির শিলালিপিসমূহের মধ্যে ৬৪৭ হিজরির মাসুদ জানির শিলালিপি (দিনাজপুর) এবং ৭০৯ হিজরির ফিরোজ শাহের শিলালিপি (বিহার) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলার সুলতানি আমলে সমান্তরাল রেখা ও উল্লম্ব দণ্ডগুলো এমনভাবে বিন্যাস করা হয় যে, কোনো কোনো তুগরা যুদ্ধাভিযানে সৈন্যবাহিনীর সারিগুলোর মতো, কোনো কোনোটা নৌকা ও দাঁড়ের মতো, কোনোটা নামাজের জামাতের মুসল্লিদের কাতারসমূহের ন্যায়, আবার কোনোটা পানিতে ভাসমান হাঁসের মতো, কোনোটা তীর-ধনুকের মতো, কোনোটা দো-চালা ঘর, আবার কোনোটা বেহালা ও বাঁশির মতো মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ, মাহমুদ শাহের ৮৬০ হিজরির শিলালিপি (ভাগলপুর), ইউসুফ শাহের ৮৭৮ হিজরির শিলালিপি (সুলতানগঞ্জ, চিত্র-৪) হজরত পাণ্ডুয়ার শিলালিপি (আদিনা মসজিদ, চতুর্দশ শতাব্দী, চিত্র-৫), মুজাফ্ফর শাহের হিজরি ৮৯৮ সালের শিলালিপি, মালদা (চিত্র -৬), ফিরোজ শাহের ৮৮৬ হিজরির শিলালিপি, বাংলা (চিত্র-৭), ইউসুফ শাহের শিলালিপি, ৮৮৪ হিজরি, দরাসবাড়ি, গৌড় এবং হুসায়ন শাহের শিলালিপি, ৯০৪ হিজরি, রাজশাহী (চিত্র-৮) প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়।

নৌকার আকৃতিতে ঈমানে মুফাস্সল দ্বারা গঠিত তুগরায় (দ্র. চিত্র-৯) এবং নাশপতির আকৃতিতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কিংবা অন্য কোনো ধর্মীয় বক্তব্য দ্বারা গঠিত তুগরায় (দ্র. চিত্র-১০ ও ১১) ব্যতিক্রমধর্মী অথচ সৃজনশীল আলংকারিক মোটিফ প্রকাশ পায়।

www.pathagar.com

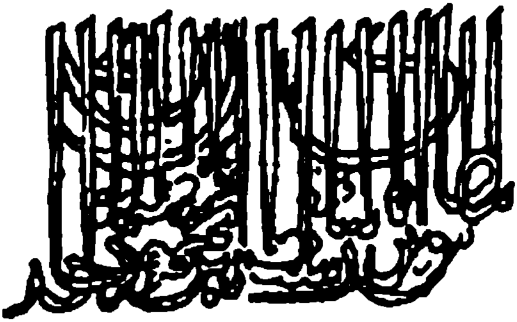

চিত্র-৪: তুগরা, সুলতান ইউসুফ শাহের শিলালিপি, ৮৭৮ হিজরি, নৌকারীতি

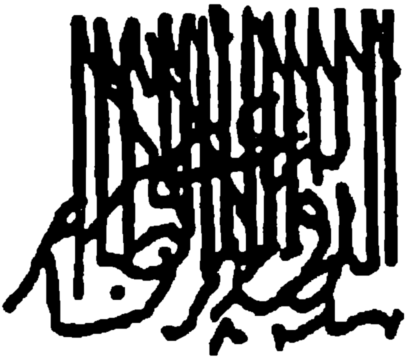

চিত্র-৫: তুগরা, আদিনা মসজিদ, হজরত পাণ্ডুয়া, মালদা, পশ্চিম বঙ্গ, চতুর্দশ শতাব্দী, তীর ও ধনুক রীতি

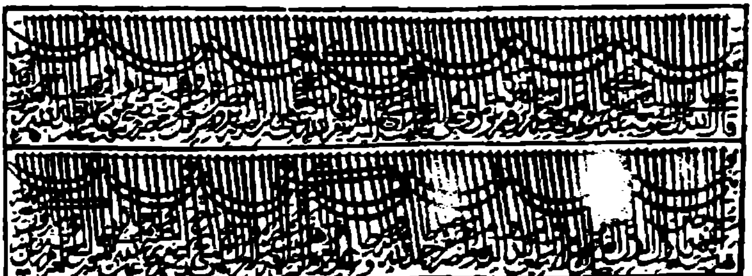

চিত্র-৬: তুগরা, সুলতান মুজাফ্‌ফর শাহের শিলালিপি, ৮৯৮ হিজরি

www.pathagar.com

চিত্র-৭: তুগরা, সুলতান ফিরোজ শাহের শিলালিপি, ৮৮৬ হিজরি

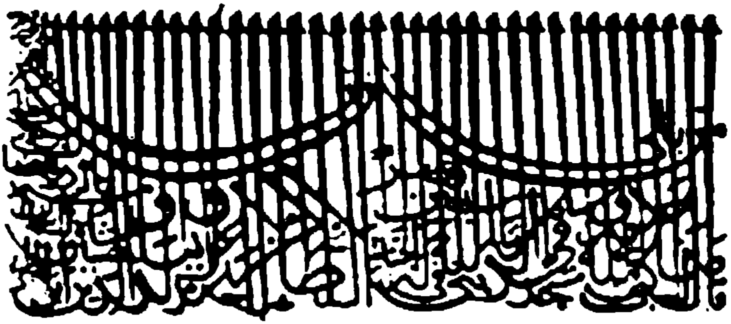

চিত্র-৮: তুগরা, সুলতান হুসায়ন শাহের শিলালিপি, ৯০৪ হিজরি

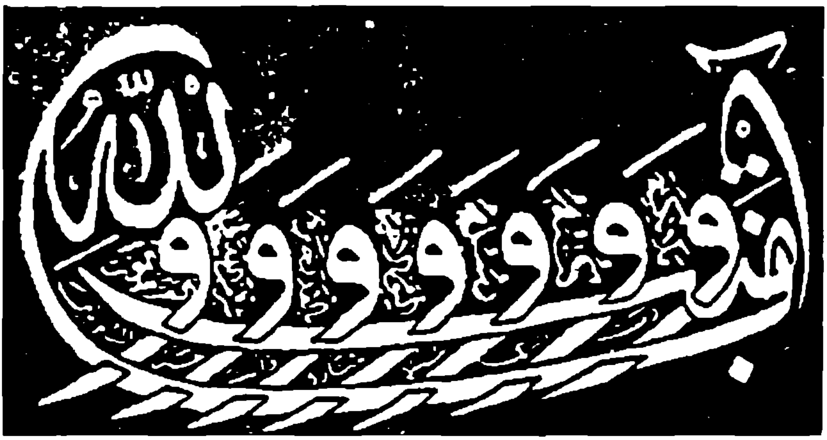

চিত্র-৯: তুগরা, ঈমানে মুফাস্সল, নৌকার আকৃতিতে

www.pathagar.com

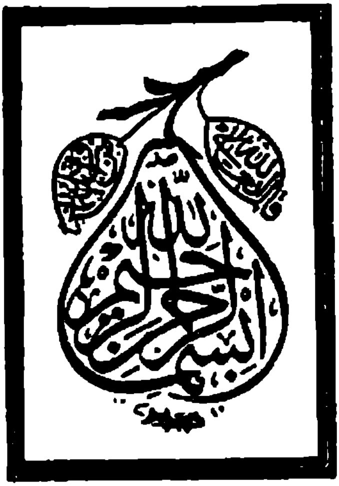

চিত্র-১০: তুগরা, নাশপতির আকৃতি

চিত্র-১১: তুগরা, নাশপতির আকৃতি

কুরআনশরিফের কোনো আয়াত বা বিশেষ দু'আ অলংকরণ প্রক্রিয়ায় যে কোনো প্রাণীর যেমন—বাঘ (দ্র. চিত্র-১২), হাতি (দ্র. চিত্র-১৩), ময়ূর (দ্র. চিত্র-১৪) ইত্যাদি আকৃতিতে রূপায়িত করা সম্ভবপর। সাধারণ মানুষ এই সমস্ত তুগরা মাদুলি হিসেবে ব্যবহার করে।

চিত্র-১২: তুগরা, বাঘের আকৃতি

চিত্র-১৩: তুগরা, হাতির আকৃতি

চিত্র-১৪: তুগরা, ময়ূরের আকৃতি

হজরত আলী (রা.) শৌর্য ও বীর্যের প্রতীক সিংহ অথবা বাঘের আকৃতি 'তুগরা'য় চিত্রিত হয়েছে। নাদ-ই-আলী নামে এই সমস্ত জীবজন্তুর আকৃতিতে যে তুগরা ব্যবহৃত হয়েছে তা হজরত আলী (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে লিপিবদ্ধ। এসব নিদর্শন ভূতপ্রেতের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য গৃহে রাখা হয়। এই ধরনের জীবজন্তুর প্রতিকৃতি

www.pathagar.com

ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মুসলমানদের গৃহে আকর্ষণীয় অলংকরণ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। গৃহসজ্জা ছাড়াও তুগরা লিপিশৈলীতে লিপিবদ্ধ মোটিফ ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার অধিকারী।[২৯]

এম জিয়াউদ্দীন বলেন,

> The figure of the tiger has a text in Urdu which informs us that a Hindu or Moslem or any one who has faith in this drawing and hangs it on the wall of his house, would be safe from all sorts of evil influences. The Tugrha was written at an auspicious time. A rather favourite form of 'Tughra' used for such magical purpose is the parrot.[৩০]

তুগরা লিপির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এই লিপিতে স্বাতন্ত্র্য ও মহত্ত্ব ফুটে ওঠে। আল্লাহ, মুহাম্মদ (সা.), তাঁর কন্যা হজরত ফাতিমা (রা.) এবং খুলাফা-ই-রাশিদুনের নাম এমন চাতুর্যের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হয়, যাতে তাঁদের গুণাবলি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়ে ওঠে। একটি দৃষ্টান্তে আল্লাহ, হজরত মুহাম্মদ (সা.), হজরত আলী (রা.) ও ইমাম হুসায়নের (রা.) নাম মানুষের মাথার আকৃতিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে (দ্র. চিত্র-১৫)। তাওয়ারার নবাবের পুরো নাম ও পদবি দ্বারা হাওদা সম্বলিত হাতি সৃষ্টি করা হয়েছে (দ্র. চিত্র-১৩)।

সুলতানি আমলের তুগরা লিপিশৈলীর অপর একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রকরণ হচ্ছে এই যে, কখনো কখনো নিম্নাংশে কুফিরীতিতে লিপিবদ্ধ বর্ণগুলোর উপরের ভাগ মানুষ ও জীবজন্তুর প্রতিকৃতি দ্বারা অলংকৃত। নিম্নাংশ দেখে মনে হবে যে, সেগুলো উপরে অঙ্কিত প্রতিকৃতিগুলোর দেহের নিম্নভাগ অথবা তারা খুব ভারী ও মোটা জুতা পরিধান করে আছে। এরূপ অলংকৃত প্যানেলটি দেখে একটি শোভাযাত্রা বলে মনে হতে পারে। বর্ণগুলো এমন মোটাভাবে লিপিকৃত হয়, যাতে উপরের প্রতিকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে।[৩১]

চিত্র-১৫: তুগরা, মনুষ্যাকৃতি

www.pathagar.com

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলায় মোগলদের অনুপ্রবেশের পর ক্রমশ এর ব্যবহার বিলুপ্ত হয়ে যায়। বাংলায় মোগল আমলের তুগরা লিপির নিদর্শন খুঁজে বের করা অত্যন্ত দুরূহ। গোলকুণ্ডায় মির্জা নিযামুদ্দীনের সমাধিতে উৎকীর্ণ চিত্র মোগল পরবর্তী যুগের তুগরার একটি দুর্লভ নিদর্শন। এখানে যেভাবে আলিফ ও লাম বর্ণগুলোকে সুশৃঙ্খল আকৃতিতে বিন্যাস করা হয়েছে এতে তুগরা রীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া ঢাকা ডি সি রোড মসজিদে ১০৫২হিজরি/১৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে উৎকীর্ণ মোগল চিত্রেও এই রীতির ব্যবহার দেখা যায়। লিপিকার এখানে তুগরার অনুকরণে আলিফ ও লাম বর্ণগুলোর লম্বসমূহকে উপরের দিকে সমান্তরালভাবে বিস্তৃত করার চেষ্টা করেছেন। তবে সুলতানি আমলের তুগরা লিপিতে আমরা যে সাবলীলতা ও মাধুর্য লক্ষ করি, এতে তা দেখতে পাই না।

অটোমান তুর্কি তুগরার লিখনশৈলী

অটোমান সাম্রাজ্যে তুগরা লিপি সমধিক মর্যাদার সাথে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত ছিল। আরবি লিপির অন্যান্য আলংকারিক রীতির ন্যায় তুগরাও অটোমান লিপিশিল্পীদের প্রচেষ্টায় একটি চাতুর্যপূর্ণ আলংকারিক লিপিকৌশল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং অটোমান সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় এটি রাজকীয় সিলমোহরের লিপি হিসেবে সর্বজনীন মর্যাদা অর্জন করে (দ্র. চিত্র-১৬, ১৭ ও ১৮)।

চিত্র-১৬: সুলতান আবদুল হামিদের তুগরা

www.pathagar.com

চিত্র-১৭: সুলতান মুস্তফা খানের তুগরা

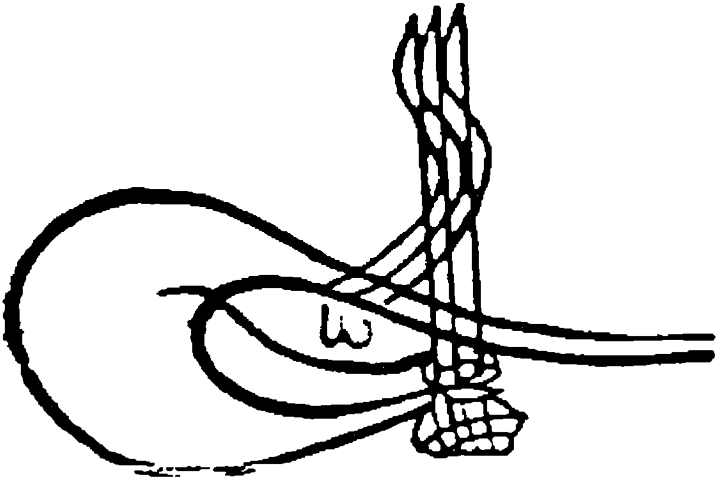

চিত্র-১৮: সুলতান সুলাইমানের তুগরা

তুগরা যদিও সরকারি ফরমানসমূহে রাজকীয় সিলমোহরের লিপি হিসেবে সর্বাধিক মর্যাদা অর্জন করেছিল, তবু এর ব্যবহার এতে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং অটোমানরা ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় যেমন বিসমিল্লাহ ও কালিমা শাহাদত ইত্যাদি লেখার ক্ষেত্রে একে প্রধান আলংকারিক রীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তারা এসব অলংকৃত বাণী লিখে মসজিদ ও পাঠাগারগুলোতে, হোটেল-রেস্তোরাঁয় বা নিজেদের বাড়িতে ঝুলিয়ে রাখত (দ্র. চিত্র- ১৯ ও ২০)।

www.pathagar.com

চিত্র-১৯: তুগরা (وانك لعلى خلق عظيم)

চিত্র-২০: তুগরা (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)

অটোমান তুগরার আকৃতি ও প্রকৃতি মিসরের মামলুকীয় তুগরার চেয়ে ভিন্ন ছিল। অটোমান তুগরায় সাধারণত বাদশাহের নাম ও উপাধিসমূহ উৎকীর্ণ করা হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একে অলংকৃত রূপ দেওয়া হতো (দ্র. চিত্র-২১)। সুলতান সুলাইমান আল-কানুনির (১৫২০-১৫৬৬ খ্রি.) নামোৎকীর্ণ মুদ্রা এ জাতীয় তুগরার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

www.pathagar.com

চিত্র-২১: ফুল ও লতাপাতার সমন্বয়ে অলংকৃত তুগরা.

সাধারণত অটোমান তুগরা 'সুলুস' কিংবা 'দিওয়ানি' লিপিশৈলী অবলম্বনে লিপিবদ্ধ করা হতো। সরকারি ফরমান ও নির্দেশ সম্বলিত পত্রসমূহে তুগরা প্রায়শ 'দিওয়ানে জলি' (বলিষ্ঠ দিওয়ানি)[৩২] রীতিতে উৎকীর্ণ করার নিয়ম ছিল। তাই এর সাথে সঙ্গতি বজায় রাখার জন্য চিঠির বক্তব্য লেখার ক্ষেত্রেও দিওয়ানি রীতি ব্যবহার করা হতো।[৩৩] সাধারণত কয়েকটি মৌলিক উপাদানের ওপর নির্ভর করে অটোমান তুগরার প্রাণবন্ত আকৃতি রচিত হতো। উক্ত মৌলিক ভিত্তিসমূহ হলো :

১. আলিফ কিংবা লামের তিনটি উল্লম্ব রেখা। এগুলোর দৈর্ঘ্য পরস্পরের তুলনায় কম হবে।

২. তিনটি ডিম্বাকৃতির বাঁকা রেখা। এগুলোর প্রথম অংশ সামান্য পিছনের দিকে প্রত্যাগমন করবে, যাতে সম্মুখে আগমনকারী বক্ররেখা সমূহের সাথে এদের দ্বন্দ্ব হয়।

৩. দুইটি রেখা। এগুলো পেছনের দিকে ডিম্বাকৃতির বাঁকা রেখার রূপ ধারণ করে সামনের দিকে বিস্তৃতভাবে গমন করবে।

৪. আর একটি বক্ররেখা। এটি পেছনের দিকে ডিম্বাকৃতির বাঁকা রেখা দুটিকে ভেদ করার উদ্দেশ্যে উপরের দিকে উঠে হঠাৎ আবার নিচের দিকে গমন করবে।

৫. সর্বশেষ একটি ছোট্ট আলিফ। এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপরের দিক থেকে ধনুক দুটিকে ভেদ করে থাকে[৩৪] (দ্র. চিত্র -২২)।

www.pathagar.com

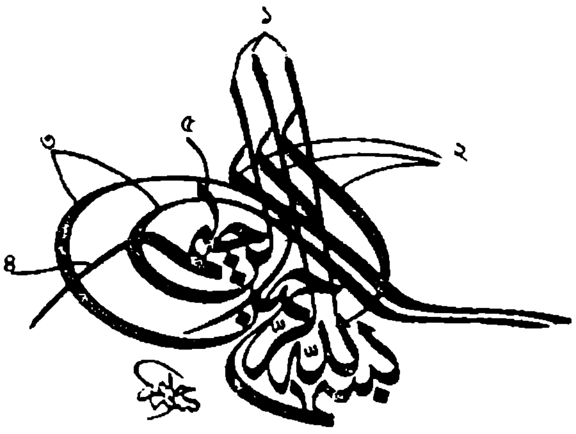

চিত্র-২২: তুগরা

অটোমান তুগরার প্রাচীনতম প্রসিদ্ধ নিদর্শন হচ্ছে ১৪০৩-১৪১৬ খ্রিষ্টাব্দে আমির সুলাইমানের মুদ্রায় উৎকীর্ণ তুগরা। এই তুগরায় দেখা যায়, উল্লম্ব রেখাত্রয় আমির ও তাঁর পিতার নামের মধ্যের আলিফগুলো থেকে নেওয়া হয়েছে। উপরন্তু এগুলো তুগরার নিম্নাংশে গমন করে আমিরের নামের সাথে মিলিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ ডিম্বাকৃতির বাঁকা রেখাগুলো মূলত ' ابن ' শব্দগুলোর নুন বর্ণসমূহের সম্প্রসারণ মাত্র। এ ছাড়া পাখির আকৃতিতে ও দ্রুতগামী অশ্বারোহীর আকৃতিতে অটোমান তুগরার বেশ কিছু নিদর্শন রয়েছে।[৩৫]

তুগরা লিপির সাধারণ বৈশিষ্ট্য

যদি আমরা উপর্যুক্ত তিন ধরনের 'তুগরা'র মধ্যে সাধারণ উপাদান নির্ধারণের উদ্দেশ্যে তুলনা করি, তাহলে আমরা তুগরাগুলোতে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই'। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, শিরোদেশবিশিষ্ট বর্ণগুলো (الحروف الرأسية)-এর উল্লম্ব রেখাসমূহ। এগুলো অটোমান ও মামলুকীয় তুগরাসমূহে যেমন দেখা যায়, তেমনি বাংলার এবং গোলকুণ্ডা, বিজাপুর ও হায়দরাবাদ প্রভৃতি ভারত উপমহাদেশের এলাকাসমূহের তুগরাতেও লক্ষ করা যায়। ফলে এ বিষয়ে সাধারণ-ভাবে আমরা এ উপসংহারে পৌঁছতে পারি যে, তুগরার অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উল্লম্ব রেখাসমূহের এক বিশেষ সংখ্যা, যা স্থিরীকৃত নয়। তাছাড়া ডিম্বাকৃতির বাঁকা রেখাগুলোও তুগরার সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে এগুলো এ লিপিরীতির অপরিহার্য উপাদান নয়। এর কারণ, অধিকাংশ তুগরায়, বিশেষ করে মিসরের মামলুকদের তুগরায় এগুলো লক্ষ করা যায় না। তদ্রূপ আলংকারিক মোটিফও এর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তুগরারীতি অভ্যুদয়ের পর থেকেই শিরোদেশবিশিষ্ট বর্ণসমূহের (الحروف الرأسية) উল্লম্ব রেখাগুলোর সাহায্যে আলংকারিক মোটিফ সৃষ্টি এর একটি প্রাচীনতম উপাদান হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে।

www.pathagar.com

আধুনিক যুগে তুগরার ব্যবহার

তুগরা কালের বিবর্তনে ক্রমেই রাষ্ট্রীয় সিল বা রাজকীয় প্রতীক চিহ্নে পরিণত হয়। শাসকগণ কেবল রাষ্ট্রীয় ফরমান ও নির্দেশাবলিতে নিজের নামের সিল প্রয়োগের জন্য এটি ব্যবহার করেন না; বরং সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কিত দলিল-দস্তাবেজ, মুদ্রার গাত্র, জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ, ইমারত গাত্র ও সমরযান প্রভৃতিতেও তুগরা রীতিতে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রীয় সিল ব্যবহার করা হয়। অতি সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত বিভিন্ন ইসলামি দেশে চুক্তিপত্র, পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, ডাক টিকেট, প্রত্যর্পণপত্র ও ধাতুকারদের ছাপচিত্র ইত্যাদিতে উক্ত রীতি অবলম্বনে রাষ্ট্রীয় সিল প্রয়োগের রীতি এক নাগাড়ে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। তুগরা রীতিতে রাষ্ট্রীয় প্রতীক উৎকীর্ণ পাকিস্তানের কিছু ধাতব মুদ্রা-এর সাম্প্রতিক ব্যবহারের উজ্জ্বলতম উদাহরণ।

তুগরার ব্যবহার সর্বসাধারণের মধ্যেও ক্রমে প্রসার লাভ করে। অনেকেই নিজেদের বাড়ি-ঘরে তুগরা লিপিগুলো খুবই আকর্ষণীয় অলংকরণ হিসেবে টাঙিয়ে রাখে। এ ছাড়া মসজিদ, ঘর-বাড়ি ও হোটেল-রেস্তোরাঁ প্রভৃতি জায়গায় বিনোদন-লিপি হিসেবেও তুগরা লিপি উৎকীর্ণ করা হয়। বর্তমানে মিসর, পাকিস্তান প্রভৃতি মুসলিম রাষ্ট্রে এ রীতির অনুকরণে বিভিন্ন ট্রেড মার্কও দেখা যায় (দ্র. চিত্র-২৩)। এ ছাড়া বাংলাদেশ, সৌদি আরব ও মিসর প্রভৃতি দেশে আকর্ষণীয় আলংকারিক কৌশল হিসেবে বইয়ের প্রচ্ছদসমূহে এর ব্যবহার লক্ষণীয় (দ্র. চিত্র- ২৪)। জেদ্দা কিং আবদুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সর্বাধিক সুষমামণ্ডিত আকৃতিতে তুগরা লিপির নিদর্শন বিদ্যমান। এর অভ্যর্থনা-কক্ষের স্তম্ভগুলো সুসজ্জিত করার লক্ষ্যে 'بسم الله الرحمن الرحيم'-কে অটোমান তুগরার অনুকরণে ধাতবপাত্রে অভিনব আকৃতিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ সমস্ত উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আলংকারিক মোটিফ হিসেবে তুগরার ব্যবহার বিভিন্ন দেশে বর্তমান অবধি চলে আসছে।

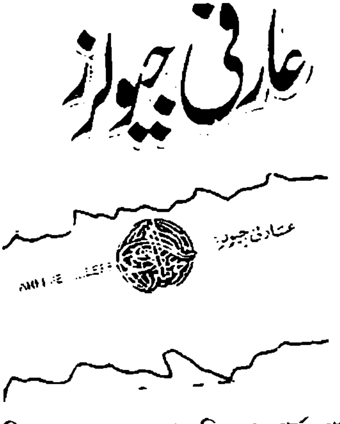

চিত্র-২৩: তুগরা, আরেফি জুয়েলার্স, পাকিস্তান

চিত্র-২৪: তুগরা, প্রচ্ছদপট, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, তুগরা মুসলিম লিপিকলার একটি সুষমামণ্ডিত আলংকারিক লিপিকৌশল। উগুজ ও সেলজুকদের হাতে এর উদ্ভব হয়। পরে মিসরের মামলুক ও বাংলার মুসলমানদের মাঝে এর বিকাশ সাধিত হয়। কিন্তু এই লিপিরীতি অটোমান সুলতানদের রাজকীয় সিলমোহরের লিপি হিসেবেই সর্বাধিক মর্যাদা ও গুরুত্ব অর্জন করে। প্রাথমিক পর্যায়ে এর ব্যবহার ছিল সীমিত। সর্বসাধারণের মাঝে এর প্রচলন ছিল না। কেবল সুলতানগণ রাষ্ট্রীয় চিঠিপত্রসমূহে নিজেদের নাম, উপাধি ও স্বাক্ষর লেখার ক্ষেত্রে এ লিপিশৈলী অনুসরণ করতেন। তবে বাংলা ও ভারতের মুসলমানদের মধ্যে প্রথম থেকেই এর সর্বজনীন ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তারা শিলালিপিতে অলংকরণের উদ্দেশ্যে এ লিপিরীতি ব্যবহার করত। বিভিন্ন মুসলিম দেশে ক্রমে ক্রমে এর বিকাশ সাধিত হয়। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানের প্রতীক হিসেবে এর ব্যবহার প্রসার লাভ করে। এ ছাড়া বর্তমানে এটি সর্বসাধারণের নিকট আকর্ষণীয় আলংকারিক লিপি হিসেবে সমাদৃত হয়।

তথ্যসূত্র

১ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১২৫-১২৬।

২ *আল-কামূসুল জাদীদ লিত্ তুল্লাব*, 'আশ-শারিকাতুত তিউনিসিয়্যা লিত্ তাওযী', আল-মুওয়াসসাতুল ওয়াতানিয়্যা আল-জাযায়িরিয়্যাহ, ১৯৮৮, পৃ ৬১০।

৩ ইবনু খাল্লিকান, শামসুদ্দীন আহমদ, *ওফায়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আনবাউ আবনায়িয যমান*, তাহকীক: ড. ইহসান 'আব্বাস, বৈরূত: দারুছ্ছাকাফাহ, ১৯৬২, খ ২, পৃ ১৯০)।

৪ মাকরিযি, তকি উদ্দীন আহমদ ইবন আলী, *আল-খুতাত*, কায়রো: মুওয়াসসাতুল হালভি ওয়া শারিকাহু, ১৩৭০ হি. খ ২, পৃ ২২৬।

৫ *আল-মুজামুল ওয়াসীত*, (মাজমা'উল লুগাতিল 'আরাবিয়্যা, কায়রো), ইউ.পি.: কুতুবখানা হুসায়নিয়া, দেওবন্দ, সন অজ্ঞাত, পৃ. ৫৫৮; কাশগড়ি, আবদুর রহমান, *আল-মুফীদ*, ঢাকা, ১৯৬১, খ ১, পৃ. ৪৮৬

৬ حلق অর্থ কণ্ঠনালি। غ , ع , خ , ح , ه , ء এ ছয়টি বর্ণ কণ্ঠনালি থেকে উচ্চারণ করা হয় বিধায় এগুলো ' حروف حلقية ' নামে পরিচিত।

৭ *দায়িরাতুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়্যা*, ইনতিশারাতেহাঁ তেহরান, ১৩৫২ হি./ ১৯৩৩ খ্রি., ১ম সংস্করণ, খ ১৫, পৃ ২০৩।

৮ শাওকি, আহমদ, *আশ-শাওকিয়াত*, বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরবি, সন অজ্ঞাত, খ ১, পৃ ৩৪।

৯ সিদ্দিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৯২।

১০ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১২৫।

১১ Hasan, S.M., *Islamic Calligraphy*, Vis a Vis Bengali Style, Bangladesh Quarterly, Vil. 12, No. 4, June, 1992, P. 10-24.

১২ ইবনু খল্লিকান, *প্রাগুক্ত*, খ ২, পৃ ১৯০।

১৩ Ahmed, Shamsuddin, *Inscription of Bengal*, Vol. 11, Rajshahi, 1960, P. 17.

১৪ কালকাশান্দি, *প্রাগুক্ত*, খ ১৩, পৃ ১৬২।

www.pathagar.com

১৫ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১২৭।
১৬ Papadopoulo, A., *Islam & Muslim Art*, London, 1980.
১৭ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১২৬, ১২৭।
১৮ সিদ্দিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২০১।
১৯ Fekete, L., *Einfuhrung in die Osmanischturkische Diplomatic*, Bodapest, 1916, p. 43.
২০ আলী, *তুঘরা-ই হুমায়ুন* (তুর্কি ভাষা), T.O. E.M., খ ৮, (১৯১৭-১৯১৮), সংখ্যা-৪৪, পৃ ১১০-১১১।
২১ *প্রাগুক্ত।*
২২ সিদ্দীক, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৯৩।
২৩ কালকাশান্দি, *প্রাগুক্ত*, খ ১৩, পৃ ১৬৩।
২৪ নিসফঃ এটিও এক ধরনের মোটা ও বলিষ্ঠ লিখনপদ্ধতি। 'নিসফ' অর্থ অর্ধেক। এ রীতিতে বর্ণের চওড়া 'তুমার' লিখনশৈলীতে ব্যবহৃত বর্ণের চওড়ার অর্ধেক অর্থাৎ ১২ অশ্বকেষ পরিমাণ হয়ে থাকে। কারো কারো মতে, এতে বর্ণের ঋজুদণ্ড গোলাকার অংশের অর্ধেক হয়ে থাকে। এজন্য এ রীতিকে 'নিসফ' নামে অভিহিত করা হয়।
২৫ সিদ্দিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৯৭।
২৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ ২০০।
২৭ *প্রাগুক্ত।*
২৮ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪০।
২৯ Ziauddin,M., *A Monograph on Moslem Calligraphy*, Visva, Bharti Studies, No. 6, V-B-Q, NS, Vol.1 Part- 1V, Vol.11, Part 1&11, Calcutta, 1963, p. 67-68
৩০ Ziauddin, *op. cit.* p 68.
৩১ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৯।
৩২ দিওয়ানে জলিঃ এটি দিওয়ানি লিপিরীতির একটি প্রকরণ। এতে বর্ণগুলো 'দিওয়ানি' রীতির তুলনায় অধিকতর জলি বা স্পষ্ট ও স্থূল প্রকৃতির হয়ে থাকে। এর অপর নাম হুমায়ুনি।
৩৩ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১২৭।
৩৪ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১২৭-১২৮।
৩৫ সিদ্দিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২০১।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

পারস্যে আরবি লিপির প্রচলন[১]

ভূমিকা

'ফারসি' পৃথিবীর ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন লক্ষ লক্ষ সমৃদ্ধ ভাষার অন্যতম। এটি পারস্য তথা—ইরান, আফগানিস্তান, কুর্দিস্তান, তাজিকিস্তান ও বেলুচিস্তান প্রভৃতি দেশ ও অঞ্চলের ষাট মিলিয়নেরও অধিক জনগোষ্ঠীর ভাষা। ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ ভাষা ইংরেজ শাসনাধীন ভারতীয় উপমহাদেশের রাষ্ট্রীয়-ইসলামি ভাষা ছিল। ইরান ও আফগানিস্তানে বর্তমানেও এটি রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদায় ভূষিত। 'আধুনিক ফারসি ভাষা' বলতে কেবল ইসলামি যুগের পারস্য ভাষাকে বোঝানো হয়। সাসানি যুগে (২২৪-৬৫১ খ্রি.) 'মধ্যযুগীয় ফারসি ভাষা' (পাহলভি ভাষা) ইসলামি জীবন বিধানের অভ্যুদয় পর্যন্ত ইরানে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এ ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ধর্মীয় ও রাষ্ট্রনৈতিক গ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ করা হতো।[২]

ফারসি ভাষার উৎপত্তিগত ইতিহাস অতি প্রাচীন। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ সাল থেকে ২৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব পর্যন্ত প্রাচীন সভ্যতার নির্দশনসমূহে ফারসি ভাষার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্যদের ইরান আগমনের বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজে এর নিদর্শন রয়েছে। আর্যরা ইরানে আগমনের পর প্রাচীন ইরানের মাতৃভাষা তথা প্রাচীন ফারসিকে নিজেদের মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করে। খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ সালে জরথুস্ত্র প্রবর্তিত ধর্মীয় গ্রন্থ আবেস্তার ভাষার সাথে ফারসি ভাষার অনেকাংশে সাজুয্য বিদ্যমান। আবেস্তা বা জেন্দাবেস্তার ভাষা পাহলভি। বিভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে এসে পাহলভি ভাষার সমৃদ্ধি ঘটলেও প্রাচীন ফারসি ভাষা ছিল পাহলভি ভাষার চাইতেও প্রাচীন ও উন্নত। কারণ ফারসি ভাষার কীলকাকৃতি লিখনরীতি (Cuneiform) এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই রীতি পাহলভি ভাষায় পরিলক্ষিত হয় না।[৩]

ফারসি ভাষার উৎপত্তিগত ইতিহাসের মতো এর লিখনশৈলীর উৎপত্তিগত ইতিহাসও অতি প্রাচীন। জাহিলি যুগে 'পাহলভি লিখনশৈলী'র অনুকরণে পারস্যবাসীরা তাদের লেখার কাজ সম্পন্ন করত। পারস্যের ওপর ইসলামের প্রভাব এবং ভাষাগত ও ধর্মীয় কারণে আরবি ভাষা, বর্ণমালা ও লিপিশৈলী পারস্যে প্রবেশের সুযোগ লাভ করে। ফলে পারস্যবাসীরা ক্রমে পাহলভি বর্ণমালা ও লিখনরীতি বর্জনপূর্বক আরবি বর্ণমালার আদলে কয়েকটি বর্ণ বৃদ্ধি করে আরবি লিখনরীতির অনুকরণে একটি স্বতন্ত্র লিখনশৈলী উদ্ভাবন করে, যা 'ফারসি লিখনরীতি' নামে পরিচিত।

আরবি লিপির উৎপত্তি ও বিকাশধারার প্রাথমিক পর্যায় যদিও আরবদের হাতে সম্পন্ন হয়, এর উৎকর্ষ সাধিত হয় পারস্যবাসীদের মাধ্যমে। পারস্যবাসীদের মাঝে

www.pathagar.com

লিখনশিল্পের যে বিভিন্ন প্রক্রিয়া, রীতি ও কৌশল ব্যাপকতা লাভ করে, তা অন্য কোনো জাতির মধ্যে লক্ষ করা যায় না। রোজার ফ্রাই বলেন,

> আমার মনে হয় যে, আরবি লিপিমালার অসাধারণ সম্ভাবনার মাধ্যমে চিত্রকর্ম এবং সাহিত্যিক বিষয়াদির সংমিশ্রণে পারস্য প্রতিভার উদ্ভাবনী শক্তি ও কৌশলের যে স্ফুরণ ঘটেছে, তার চেয়ে অধিকতর আকর্ষণীয় আর কিছু নেই।[৪]

উল্লেখ্য যে, বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে হস্তলিপি নিছক মনের ভাব প্রকাশ, ধরে রাখা বা লিপিবদ্ধ করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসেবে পারস্যবাসীদের সূক্ষ্ম শিল্পচেতনাই অন্যান্য সূক্ষ্ম শিল্পের মতো এই লিখনরীতিকে শিল্পে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ফারসি হস্তলিপি দেশটির শিল্প-সৌন্দর্যের স্মারক হয়ে আছে। পারসিক লিপিশিল্পীগণ বিভিন্ন যুগ ও শতাব্দীতে তাঁদের সৃজনশীল মেধা ও প্রতিভার সাহায্যে এই শিল্পকে বিশেষ রং ও দীপ্তি প্রদান করেছেন। তাঁরা এই শিল্পসম্পদকে তার বিবর্তনের ধারায় দিনের পর দিন পরিশীলিত, বিকশিত ও সমৃদ্ধ করেছেন এবং আজকের দিন পর্যন্ত তার সংরক্ষণ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, পারস্যবাসীর হাতে লিপিকলার এ বিকাশের পেছনে পারস্যের ম্যানিকিয়ান রীতির প্রভাব ছিল সর্বাধিক। এর অসামান্য প্রভাবের ফলেই লিপিকলা শিল্পকর্মের উচ্চমার্গে পৌঁছতে পেরেছিল। আরবরা যখন পারস্য জয় করে, তখনও শিল্পী ধর্মগুরু মনির[৫] অনুসারীরা তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ অপূর্ব লিপিকলার মাধুর্য ও লালিত্য দ্বারা অনুলিপি প্রস্তুত করত। জিয়াউদ্দীন বলেন,

> যেখানে প্রায় সমস্ত নবি সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে প্রত্যাদেশ লাভ করেন, সেখানে একমাত্র মনিই তাঁর নিকট থেকে প্রেরিত দৈব বাণীর রূপায়নে চিত্রকলার ঐশ্বরিক ক্ষমতা লাভ করেন। একমাত্র তিনিই ছিলেন একাধারে ধর্মগুরু এবং প্রথিতযশা শিল্পী। মানব জাতিকে মনির শিল্পকর্ম ভিত্তিক ধর্মের নিগড় থেকে রক্ষার জন্য পারস্যে যখন জরথুস্ত্র ধর্মের আবির্ভাব হয় তখন মনির আসমানি গ্রন্থ ধর্মগুরুর সামনেই আগুনে পোড়া হয়। কথিত আছে যে, লেলিহান শিখা যখন তাঁর ধর্মগ্রন্থসমূহ গ্রাস করেছিল তখন সেগুলো থেকে সোনার নহর প্রবাহিত হয়।[৬]

বহু যুগ ধরে নির্যাতনের পরেও মনির অনুসারীরা আব্বাসীয় খিলাফতে বসবাস করতে থাকে এবং চিরাচরিত শিল্পরীতির মাধ্যমে তাদের গ্রন্থাবলি সুচারুরূপে অলংকৃত করতে থাকে। এমনকি আজ পর্যন্ত পারস্যে মনির গ্রন্থের অপরিসীম আলংকারিক সৌকর্য এবং তার সূক্ষ্ম ও বলিষ্ঠ লিপির মাধ্যমে ঈশ্বরের নৈকট্য ও সৌন্দর্য লাভের প্রয়াস সর্বজন বিদিত। মনি সিরিয়াকের সাথে 'এস্ট্রানজেলো'র সংমিশ্রণ ঘটিয়ে একটি নতুন লিপিকলা আবিষ্কার করেন। তাঁর রচনাবলি এ নতুন রীতিতে লিপিবদ্ধ করা হয়, যার মূল আকর্ষণ অলংকার।[৭]

অপর পৃষ্ঠায় ফারসি লিপিকলার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার একটি বিবরণ উপস্থাপন করা হলো :

www.pathagar.com

ফারসি লিপিকলার উৎপত্তির পটভূমি

ইরান বরাবরই সেমিটিক সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আসছে। আক্কাম্যানীয় যুগে (৫৫০খ্রিষ্টপূর্ব-৩৩০ খ্রিষ্টপূর্ব) এতে অ্যাসিরিয়া সভ্যতার ছোঁয়া লাগে। আশকানি (২৭৯ খ্রি.পূর্ব-২২৬ খ্রি.) ও সাসানি আমলে (২২৬-৬৫১ খ্রি.) এটি আরামীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। মুসলিম সভ্যতার মাধ্যমে তা অর্জন করে আরব সভ্যতা। এখনও ইরান সেই আরব সভ্যতার প্রতিভূ হিসেবে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।[৮]

বর্তমানে ইরানে 'আধুনিক ফারসি ভাষা' প্রচলিত রয়েছে, যাকে 'ইসলামি ফারসি' নামেও অভিহিত করা হয়। পূর্বে এখানে আরো দুটি ভাষার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল।

এক. 'প্রাচীন ফারসি ভাষা' : এটি আক্কাম্যানীয় যুগে প্রচলিত ছিল। কীলকাকৃতিতে লিখিত 'প্রাচীন ফারসি' এ ভাষার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন (দ্র. চিত্র-১)।

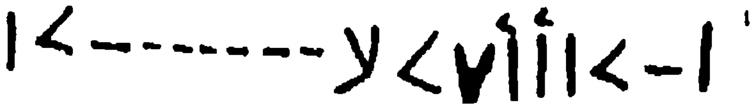

চিত্র-১

দুই. 'মধ্যযুগীয় ফারসি': এটি 'পাহলভি' নামে পরিচিত। আশকানি ও সাসানি আমলে এটি প্রচলিত ছিল। পারস্যে পাহলভি ভাষার প্রচলনকালীন সময়ে মেসোপটেমিয়ার চতুষ্পার্শ্বে প্রায় সর্বত্রই সেমিটিক ভাষাসমূহের মধ্যে 'আরামীয় ভাষা' জনসাধারণের ভাষা হিসেবে প্রচলিত ছিল।[৯] তখন আক্কাম্যানীয় সম্রাটগণ সরকারি রেজিস্টার ও সাধারণ লিপিসমূহে তাঁদের কীলকাকৃতি লিখনরীতির পরিবর্তে আরামীয় ভাষার লিখনপদ্ধতি ব্যবহার করতেন। অধিকন্তু আরামীয় লিখনরীতি দ্বারা ফারসি ভাষার লেখার কাজও সমাধা করা হতো। কারণ তাঁদের কীলকাকৃতি লিখনরীতি যে কোনো লিপিতে ব্যবহার করা সহজসাধ্য ছিল না। পরবর্তীকালে এই আরামীয় লিখনপদ্ধতি থেকে পাহলভি লিখনপদ্ধতির উদ্ভব হয় এবং তা ইরানের জাতীয় লিপির মর্যাদা লাভ করে।[১০]

বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামপূর্ব যুগ পর্যন্ত ফারসি ভাষা তিনটি প্রধান লিখনরীতি অবলম্বনে লিখিত হতো। এক. কীলকাকৃতি লিখনরীতি, দুই. পাহলভি লিখনরীতি, তিন. যন্দ বা আবেস্তা লিখনরীতি।

১. কীলকাকৃতি লিখনরীতি (খত্তে মিখি)

সর্বপ্রথম ব্যাবিলন ও গ্রিসে এই লিখনপদ্ধতির প্রচলন হয়। প্রাচীন পারস্যবাসীরা ব্যাবিলনবাসীদের কাছ থেকে এটি গ্রহণ করে এবং এর পরিধিকে আরো প্রসারিত করে। এই রীতির বর্ণগুলো কীলক বা দণ্ডের মতো দেখায় বলে এটি 'খত্তে মিখি' বা 'কীলকাকৃতি লিখনরীতি' হিসেবে পরিচিত (দ্র. চিত্র-২)।

www.pathagar.com

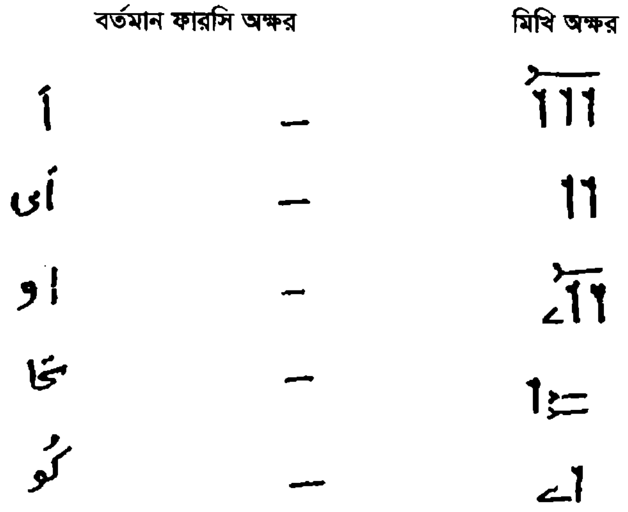

চিত্র-২

সাধারণত আক্কামানীয় যুগে লৌহখণ্ডে, বড়ো বড়ো পাথরের ফলকে, কাঠের টুকরায় এবং দেয়াল ও পাথরের গায়ে এ লিখনরীতি ব্যবহার করা হতো। বর্তমানেও এর কিছু নির্দশন বিদ্যমান রয়েছে। শিরাজ নগরীর অদূরবর্তী তখতে জমশিদের দেয়ালে রক্ষিত কীলকাকৃতি লিপির নমুনা নিম্নরূপ :

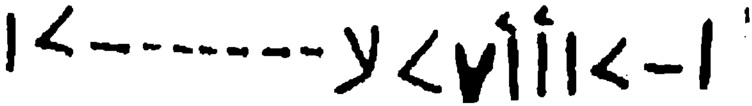

এর বর্তমান ফারসি রূপ হলো :

داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها بر گشتاسب مخانشی که این قصر را ساخت (از تخت جمشید)

দারিউশ একজন রাজাধিরাজ, অসংখ্য রাজ্যের সম্রাট, আক্কাম্যানীয় যুগের গাশতাসবের পুত্র, যিনি এই রাজপ্রাসাদ তৈরি করেছেন।

এ ছাড়াও শিরাজ শহরের ৬০/৬৫ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে 'নকশে রুস্তম'[১১] নামক স্থানে পাহাড়ের গায়ে কীলকাকৃতি রীতিতে খোদাইকৃত তিনজন আক্কাম্যানীয় বাদশাহের পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

খত্তে মিখি বা কীলকাকৃতি লিখনরীতিতে মোট ৩৬টি বর্ণ ছিল এবং সেগুলো ডানদিক থেকে বামদিকে লেখা হতো। এর উচ্চারণ অনেকটা আরবির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মি. ব্রাউন জার্মান লেখক ডারমিডির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "এই প্রকার লিখনপদ্ধতিতে সর্বমোট ৪০০ এর বেশি শব্দ ছিল না।"[১২]

২. পাহ্লভি লিপি

পাহ্লভি ভাষায়[১৩] মোট ১৪টি বর্ণ বিদ্যমান। এর প্রত্যেকটি বর্ণ ৭টি ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে উচ্চারিত হয়। প্রত্যেক অক্ষরের অনিশ্চিত উচ্চারণ ছাড়াও এতে এমন কতকগুলো হেঁয়ালিপূর্ণ চিহ্ন রয়েছে, যা পৃথক অক্ষরে প্রকাশ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের পঠনের ফলে এতে অর্থের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।[১৪] প্রত্যেকটি বর্ণের দুটি করে আকৃতি রয়েছে। একটি সাসানিয়ান পাহ্লভি ও অপরটি অ্যারামিয়ান পাহ্লভি (দ্র. চিত্র-৩)।

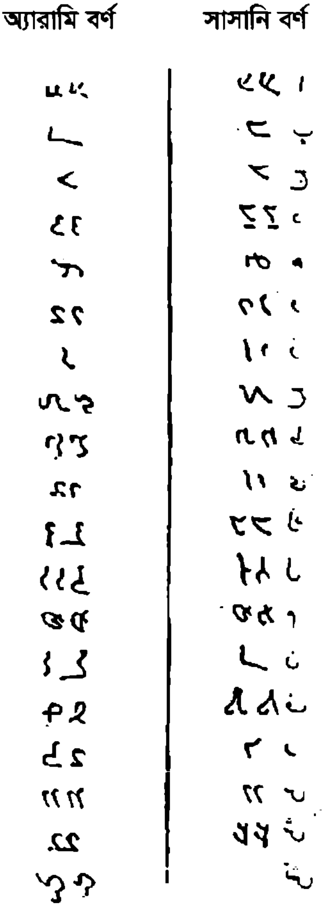

চিত্র-৩

এ ছাড়াও তার বহুবিধ শাখা-প্রশাখা রয়েছে। প্রত্যেকটি শাখা অন্যটির তুলনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। মুদ্রায় উৎকীর্ণ পাহ্লভি বর্ণ পাথরে খোদিত বর্ণের চাইতে পৃথক, আবার তা গ্রন্থাদিতে ব্যবহৃত বর্ণের চাইতে স্বতন্ত্র।[১৫]

পাহ্লভি লিখনশৈলীর সবচেয়ে জটিল দিক হচ্ছে, অনেক পাহ্লভি শব্দ অ্যারামীয় ভাষায় লিখে ফারসি ভাষায় উচ্চারণ করা হতো। উদাহরণস্বরূপ অ্যারামীয় ভাষায় রুটিকে 'লাহ্মা' বলা হয়। কেউ এর ফারসি প্রতিশব্দ 'নান' লিখতে ইচ্ছে করলে পাহ্লভি লিখনপদ্ধতি অনুযায়ী 'লাহ্মা' রূপে লিখে 'নান'ই উচ্চারণ করত। অনুরূপভাবে অ্যারামীয় ভাষা রাজাধিরাজকে 'মালকান মালকা' বলা হয়। কেউ এর ফারসি প্রতিশব্দ 'শাহানে শাহ' লেখার ইচ্ছা করলে পাহ্লভি লিখনপদ্ধতি অনুযায়ী 'মালকান মালকা' লিখে 'শাহানে শাহ' উচ্চারণ করত। এই ভাষায় ক্রিয়াবাচক শব্দের বিভিন্ন রূপে শব্দের শেষাংশে (যা দ্বারা পুরুষ ও বচন নির্ধারণ করা হয়) ফারসি ভাষার শব্দ প্রকরণের নিয়মমাফিক লেখা হতো।[১৬] তবে কোনো কোনো বিশেষ শব্দের ব্যাপারে তারা পঠন ও লিখন উভয় ক্ষেত্রে একই শব্দ ব্যবহার করত।

ইংরেজি ভাষায়ও এই রীতি লক্ষ করা যায়। ল্যাটিন ভাষায় ব্যবহৃত অনেক সংক্ষিপ্ত শব্দ ইংরেজি ভাষায়ও প্রচলিত আছে। ল্যাটিন Videlicet (namely) শব্দের পরিবর্তে Viz, ল্যাটিন Versus (against or in opposition) -এর পরিবর্তে V.S. এবং ল্যাটিন idest (that is) -এর পরিবর্তে i.e প্রভৃতি শব্দ ইংরেজি ভাষায় বহুল ব্যবহৃত। এসব শব্দ আমরা তার ইংরেজি রূপেই উচ্চারণ করে থাকি। পাহ্লভি ভাষায় এই বৈশিষ্ট্য 'হুজবারিশ' বা 'জওয়ারিশন' প্রথা নামে পরিচিত। এ প্রথা ভাষাগত কৌতূহল ছাড়া আর কিছু নয়। Reuben Levy বলেন,

> In a peculiar form the alphabet only and not the language itself- it survived during the reign of the native Persian dynasty of Sasanians (224-651). Pehlevi, as this kind of script was called, provided an Aramaic cover for Persian words. Roughly this meant the documents apparently written in Aramaic were in fact in Persian, the characters containing ideograms of Persian words. The script was Aramaic while vocabulary, construction and syntax were Persian.[১৭]

পরবর্তীকালে সাসানীয়রা আরবদের সংস্পর্শে এসে পাহ্লভি বর্ণগুলোকে আরবি বর্ণমালার রূপ দান করে। এতে মোট ১৮ থেকে ২৫টি অক্ষর ছিল। এগুলো ডানদিক থেকে বামদিকে লেখা হতো। নিম্নে পাহ্লভি ভাষার কয়েকটি অক্ষরের রূপ দেখানো হলো[১৮] :

বর্তমান ফারসি   পাহ্লভি অক্ষর

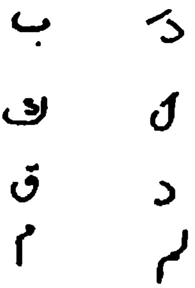

www.pathagar.com

৩. যন্দ লিপি

সম্ভবত আশকানি যুগের শেষের দিকে 'যন্দ লিপি'র প্রচলন শুরু হয়। পাহলভি লিপিরীতির উল্লিখিত জটিলতা ও ত্রুটির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এ লিপির সৃষ্টি হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র বাক্যগুলো বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করা। এ যন্দ পদ্ধতিতে জরথুস্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থ 'আবেস্তা' (اوستا) , 'ইয়াসনা' (یسنا), ও 'খোরদেহ আবেস্তা' (خورده اوستا) প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করা হয়। ফলে এটি ইরানের 'ধর্মীয় লিপিরীতি'র মর্যাদা লাভ করে। বলা হয়ে থাকে, সমসাময়িক যুগে পৃথিবীতে এর মতো সুন্দর হস্তলিপি অন্য কোনো ভাষার ছিল না। উক্ত যন্দরীতির বর্ণমালায় ৪৪টি অক্ষর রয়েছে। তন্মধ্যে ৩০টি ব্যঞ্জণবর্ণ ও ১৪টি স্বরবর্ণ। তবে কোনো কোনো গবেষকের মতে— তাতে ৪৮টি অক্ষর ছিল। এই প্রকার লিপি ডানদিক থেকে বামদিকে লেখা হতো। এতে প্রত্যেক বর্ণই পৃথকভাবে লেখা হয়। প্রাচীন কুফি বর্ণমালার সাথে এ যন্দ বা আবেস্তা লিপির বর্ণমালার প্রচুর সাদৃশ্য রয়েছে[১৯] (দ্র. চিত্র-৪)।

উক্ত অক্ষরগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো—এগুলো দ্বারা সকল প্রকার উচ্চারণ সম্ভব। উক্ত লিখনপদ্ধতিতে অ্যারামীয় শব্দের পরিবর্তে ইরানি প্রতিশব্দগুলো অধিক ব্যবহৃত হয়। এভাবে এ লিখনপদ্ধতিতে লিখিত পাহলভি ভাষায়ও ইরানি বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য দেখা যায়। তবে পাহলভি ভাষা লেখার ক্ষেত্রে জরথুস্ত্রীয় ধর্মশাস্ত্র ব্যতীত অপরাপর ক্ষেত্রে এ রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি।

যন্দরীতির বিস্তৃতির সীমাবদ্ধতা এবং বহুবিধ শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট পাহলভি লিখনরীতির ত্রুটি ও জটিলতার কারণে পারস্যবাসীরা একটি সহজ ও সাবলীল লিখনপদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে উপলব্ধি করে। ফলে ৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে আরবদের পারস্য বিজয়ের পরপরই তারা নিজেদের লিখনরীতি বর্জন করে আরবি লিখনপ্রণালি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

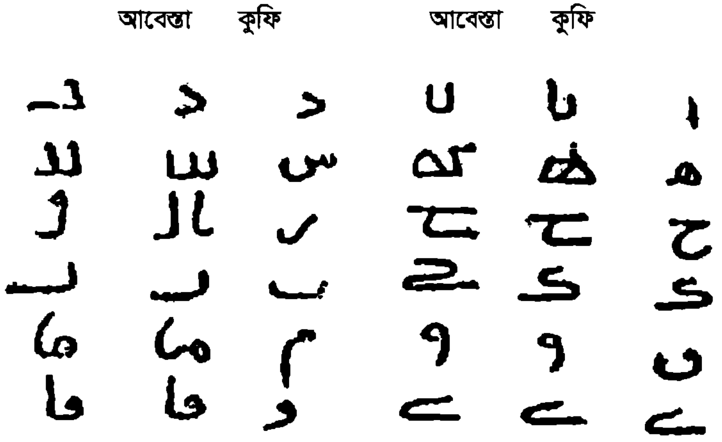

চিত্র-৪

www.pathagar.com

আরবদের পারস্য বিজয় ও আরবি ভাষা চর্চা

আরবদের পারস্য বিজয়ের পর সেখানে এক সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধিত হয়। ধর্ম তথা সমাজ, রাজনীতি, চিন্তাধারা, সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় ইসলাম সেখানে এক নতুন জীবনের গোড়াপত্তন করে। ফলে রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির অঙ্গনে নতুনত্বের আমেজ পরিস্ফুট হয়। পারস্যবাসীদের ইসলাম গ্রহণের পর আরবি সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা তাদের জন্য অপরিহার্যরূপে দেখা দেয়। কুরআন, হাদিস, ধর্মবিদ্যা, আইন ও অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহন হিসেবে আরবি ভাষা এখানকার সর্বত্র ব্যবহৃত হতে থাকে। পারস্য বিজয়ের মাত্র দুশো বছরের মধ্যে আরবি সাহিত্য পারস্যের পণ্ডিতগণকে আকৃষ্ট করে এবং তাঁরা অতি উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। এমনকি পারসিক কবিগণ প্রায় পরবর্তী দু-শতক ধরে কেবল আরবি ভাষায় কবিতা রচনা করতেন।[২০]

আধুনিক ফারসির অভ্যুদয় ও আরবি লিপির চর্চা

আরবি ভাষার প্রতি পারস্যবাসীদের এ আগ্রহের ফলে পাহলভি ভাষার চর্চা ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে এবং অফিস, আদালত ও সাহিত্য প্রভৃতিতে আরবি ভাষা তার স্থান দখল করে নেয়। এতদ্‌সত্ত্বেও জরথুস্ত্রীয় ধর্মশাস্ত্রে এর ব্যবহার আরো কিছুদিন অব্যাহত ছিল।[২১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আরবি ভাষার সাথে আরবি লিপিও অবলীলাক্রমে পারস্যে প্রবেশ করে, যা পাহলভি রীতির তুলনায় অনেকটা সহজ। ফলে পাহলভি লিপির জটিল রীতি এবং পারস্যবাসীদের নতুন ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগের কারণে দেশের সর্বত্রই পাহলভির পরিবর্তে আরবি লিপি সমাদৃত হয়। তবে সাসানীয় রাজবংশের পতন-পরবর্তী আরো কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ইরানের কোনো কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চলে, বিশেষত জরথুস্ত্রীয় ধর্মশাস্ত্রে পাহলভির ব্যবহার অব্যাহত ছিল।[২২] এভাবে পাহলভি লিপি অদৃশ্য হওয়ার পর পাহলভি ভাষাও প্রায় তার অস্তিত্ব হারিয়ে বসে। ফলে 'আধুনিক ফারসি' নামে এক নতুন ভাষার অভ্যুদয় হয়। পারস্যে ইসলাম প্রবেশের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে এ আধুনিক ফারসির উদ্ভব হয়। এ ভাষা মূলত বিপুল পরিমাণ আরবি শব্দের সমন্বয়ে পুরাতন পাহলভি ভাষার পরিবর্তিত রূপ।[২৩] উল্লেখ্য যে, এ নতুন ভাষার প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ শব্দ আরবি থেকে এসেছে এবং এগুলো ক্ষেত্র বিশেষে পরিবর্তিত উচ্চারণে এ ভাষায় মিশে আছে। মুসলমানদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও পারস্যের স্বাধীনতা অর্জনের সুবাদে এ ভাষা উন্নতি লাভ করে এবং এটি সাহিত্যের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। R. Levy বলেন,

> The political severance from the caliphate as the culmination of national rebirth was naturally accompanied by the gradual restoration of the Persian tongue in the new form enriched by Arabic, as a language which might be used for works of literature.

তিনি আরো বলেন,

> With the political independence of the country practically achieved, the Persian tongue was coming into its own alongside Arabic as the idiom of literature.[২৪]

www.pathagar.com

মূলত আধুনিক ফারসির জন্ম ও উৎকর্ষ সাধিত হয় ইসলামি আবহাওয়ায় ও পরিমণ্ডলে। কিন্তু গঠন প্রণালি ও অন্যান্য দিক দিয়ে তা ইরানি ভাবধারায় সিক্ত। ফলে ইরানি বাক-বিন্যাস এবং মধ্যযুগীয় ফারসিতে ব্যবহৃত সহজ ও সরল শব্দগুলোই আধুনিক ফারসিতে অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান।[২৫]

ফারসি লিপিকলার অভ্যুদয়

৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে কাদিসিয়ার যুদ্ধে সাসানীয় রাজবংশের পতনের পর নবদীক্ষিত ইরানি মুসলমানরা আরবদের লিপিকলা ও চারুশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তারা আরবদের লিপি ও চারুকলার অনুসৃত পদ্ধতি গ্রহণ করে এতে নতুন নতুন পদ্ধতি ও কৌশল সংযোজন করে এর প্রভূত উন্নতি সাধন করে। আরবি লিপির উৎপত্তি ও প্রাথমিক বিকাশ যদিও আরবদের হাতে সম্পন্ন হয়, তা চরম উৎকর্ষ লাভ করে পারস্যবাসীদের হাতে। তারা লিখনশিল্পে যে বিভিন্ন পদ্ধতি-রীতি ও নিয়ম-কানুন উদ্ভাবন করে, তা আরবি লিপিকলাকে সর্বাধিক সুষম, সাবলীল ও গতিময় লিপিতে পরিণত করেছে। নিম্নে আরবি লিপির বিভিন্ন পদ্ধতি সৃষ্টি ও নতুন নতুন ফারসি রীতি উদ্ভাবনে তাদের অবদান আলোচনা করা হলো।

কুফি লিপিশৈলীর অনুশীলন ও পারসীয় কুফিরীতির উদ্ভব

ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবদের মাঝে কৌণিক অবয়বের কুফিরীতির বহুল প্রচলন ছিল। আল-কুরআন, হাদিস ও অন্যান্য ধর্মীয় কিতাব উক্ত লিপিরীতি অবলম্বনে লেখা হতো (দ্র. চিত্র-৫)।

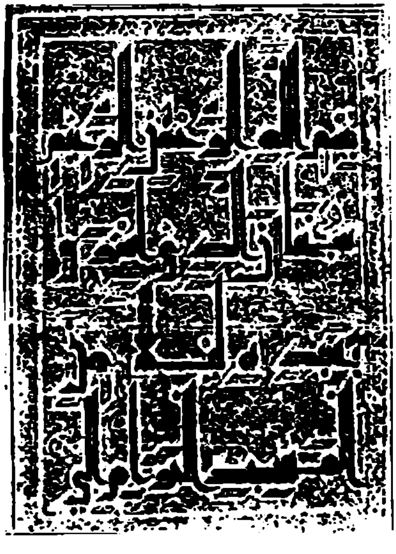

চিত্র-৫: কুফি কুরআন, ৫৬৬ হি.

www.pathagar.com

আরবদের পারস্য বিজয়ের পর 'কুফিরীতি' পারস্যে প্রবেশ করে। ইরানের নতুন মুসলমানরা ধর্মীয় গ্রন্থাদি, বিশেষত আল-কুরআন ও হাদিস কুফিরীতিতে লিপিবদ্ধ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে কুফিরীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে উক্ত কুফিরীতি ইরানে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং তা পাহলভি লিপির পরিবর্তে ইরানের জাতীয় লিপির মর্যাদা অর্জন করে।[২৬] উক্ত কুফিরীতি পারস্যবাসীর হাতে প্রভূত উন্নতি লাভ করে। তারা সর্বপ্রথম কৌণিক অবয়বের 'আব্বাসীয় কুফিরীতি' থেকে অন্য একটি লিপিশৈলী উদ্ভাবন করে, যেখানে অক্ষরসমূহ অধিকতর বড়ো কোণবিশিষ্ট। এটি 'পারসীয় কুফিরীতি' নামে খ্যাত (দ্র. চিত্র-৬)। এ পদ্ধতি অবলম্বনে লিখিত একটি আল-কুরআনের সুরার শিরোনাম নিউইর্য়ক মেট্রোপলিটন জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।[২৭]

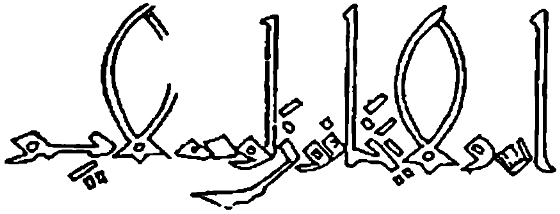

চিত্র-৬: পারসীয় কুফিরীতি

দশম শতাব্দীর শেষদিকে পারস্যবাসীদের হাতে পারসীয় কুফিরীতির প্রভাবে অন্য একটি পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। আদর্শ কুফিরীতির (Standard Kufic) চাইতে এর কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ লিপিপদ্ধতিতে উপরের দিকে চলমান দীর্ঘ রেখাসমূহ অত্যন্ত উলম্বরূপে অবস্থান করে। আর ছোট রেখাসমূহ বামদিকে ঢালু কিংবা বাঁকানো হয়। এ কারণে পাশ্চাত্যের গবেষকগণ একে Bent Kufic (বক্রাকৃতির কুফি) নামে আখ্যায়িত করেছেন। এ রীতিতে রেখাসমূহ আদর্শ কুফির রেখাসমূহের তুলনায় অধিকতর লম্বা ও সুচারু। কোনো কোনো বর্ণের বড়ো আকারসমূহ অনুভূমিক বাহুর দিকে বিস্তৃতভাবে নিম্নগামী (দ্র. চিত্র- ৭)।

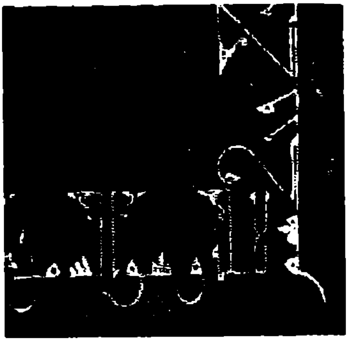

চিত্র-৭: প্রাচ্যীয় অলংকৃত কুফিরীতি

www.pathagar.com

পারস্যবাসীদের হাতে উৎকর্ষপ্রাপ্ত এ প্রাচ্যীয় কুফি (Eastern Kufic) আদর্শ কুফির গতিহীন শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করে মার্জিত ও সুচারু রীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এটি কিছুকাল পূর্বেও কুরআনের শিরোনামের আলংকারিক লিপি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[২৮]

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে 'ইরানি কুফিরীতি' সেলজুকদের (১০৩৭-১১৫৭) হাতে প্রভূত বিকাশ লাভ করে। উল্লেখ্য যে, আব্বাসীয় শাসনামলে কুফি লিপির উন্নয়ন প্রায় চরম শিখরে পৌঁছলেও সেলজুকদের হাতেই এর চূড়ান্ত উন্নয়ন সাধিত হয়। তারা 'আলংকারিক কুফি' (Ornamental Kufic) নামে নতুন একটি কুফিরীতি উদ্ভাবন করে। এতে যে সমস্ত হরফের মাথা গোল সেগুলোকে ফুল ও লতাপাতা দিয়ে অলংকরণ করা হয় এবং নিচের ঢালগুলোকে গোলাকৃতি করা হয়। তাদের আমলে অলংকৃত মুসহাফসমূহ (কুরআনের অনুলিপি) উক্ত রীতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন (দ্র. চিত্র-৮ ও ৯)।

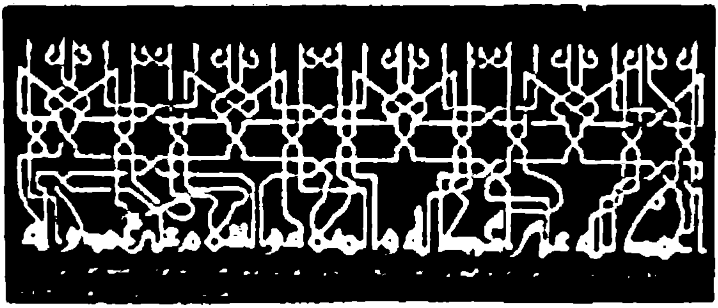

চিত্র-৮: সেলজুকীয় অলংকৃত কুফিরীতি

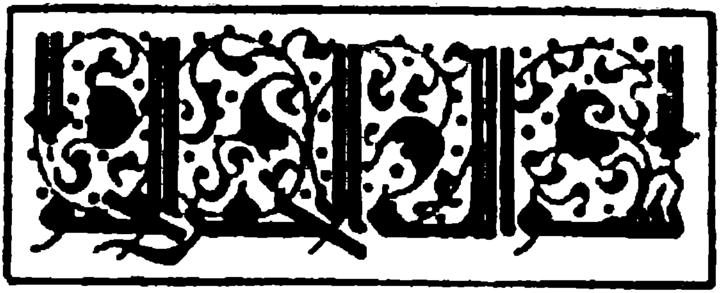

চিত্র-৯: সেলজুকীয় অলংকৃত কুফিরীতি

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে লিপিকার কাসিম ইবনু ইবরাহিম কর্তৃক ৪২৭ হি./ ১০৩৬ খ্রিষ্টাব্দে সেলজুকীয় অলংকৃত কুফিরীতিতে লিখিত ডালপালা ও লতাপাতার সমন্বয়ে অলংকৃত ও সুসজ্জিত কুরআনের কয়েকখানা পৃষ্ঠা রয়েছে। এ ছাড়াও নিউইয়র্ক মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামে ৪৪৫ হি./১০৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ইরানীয় কুফি পদ্ধতিতে ও অভিনব আলংকারিক উপাদান সম্বলিত সেলজুকীয় রীতিতে লিখিত কুরআন শরিফের দুই পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

সংরক্ষিত আছে। এক পৃষ্ঠায় রকমারি রং মিশ্রিত স্বর্ণাক্ষরে লিখিত সুরার শিরোনাম চিত্রিত করা হয়েছে। অন্যটিতে কয়েকখানা আয়াত কেবল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়েছে। আয়াতসমূহ অতিশয় অলংকৃত কুফিরীতিতে উৎকীর্ণ। এর লম্বসমূহের শেষ প্রান্তে ডালপালার অভিনব অলংকরণ বিদ্যমান এবং অনুভূমিক বাহুগুলোকে সোনালি ফুল, লতাপাতা ও শাখা-প্রশাখা দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে।[২৯]

প্রধান প্রধান ফারসি লিপিশৈলী

পারস্যবাসীরা তাদের স্বভাবজাত শৈল্পিক প্রতিভার ফলে লিপিশিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধন করে; কিন্তু তাদের প্রাচীন লিপির নিদর্শনাবলির স্বল্পতার কারণে ফারসি লিখনশিল্প ও তার বিভিন্ন শৈলীর বিকাশে ফারসি লিপিকারদের অবদানের যথাযথ মূল্যায়ন অত্যন্ত দুরূহ। ফারসি লিপিকলার বিকাশে নজমুদ্দীন আবু বকর মুহাম্মদ আল-রাওয়ান্দির অবদান বিপুল। তিনি লিখনশিল্পে প্রায় ৭০ প্রকার লিখনপদ্ধতির জ্ঞান রাখতেন।[৩০]

খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত পারস্যবাসীদের স্বতন্ত্র কোনো লিখনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। তারা কুফি ও অন্যান্য রীতির অনুকরণে তাদের লেখার কাজ চালিয়ে যেত। তবে লিপিকলার উৎকর্ষ সাধন ও নতুন নতুন লিখনশৈলী উদ্ভাবনের জন্য তারা নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। এর ফলস্বরূপ তারা খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে তিনটি নতুন লিপিরীতি উদ্ভাবন করে। এসব লিপিরীতিতে ইরানীয় ছাপ পুরোপুরি বিদ্যমান ছিল। এমনকি পাহলভি ও আবেস্তায়ী তথা তাদের জাতীয় ও ধর্মীয় লিপিশৈলীর প্রভাবও সেখানে প্রতিভাত।

এ তিনটি লিপিশৈলীতে যদিও আরবি লিপির বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ অনেকাংশে বিদ্যমান, তা সত্ত্বেও সামগ্রিক অর্থে তা হচ্ছে ফারসি লিপি। আরবি বর্ণমালার সাথে এ তিনটি লিপিরীতির বর্ণমালার যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে, যদিও তা আরবি লিপির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। উক্ত তিনটি লিপিশৈলী হচ্ছে এক. তালিক, দুই. নাস্তালিক ও তিন. শিকাস্তা। এই শৈলীত্রয় লিপিকলার ইতিহাসে স্বতন্ত্র ফারসি লিপিশৈলী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পারসীয় লিপিকারদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উক্ত শৈলীত্রয় মুসলিম লিপিকলাকে সর্বোচ্চ সৌন্দর্য ও মাধুর্য দান করে। ফলে তা তুরস্ক, ভারত ও মিসর প্রভৃতি দেশেও প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[৩১]

ক. তালিক লিপিশৈলী

তালিক ফারসি লিপিকলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লিপিশৈলী। হিজরি ৭ম/খ্রিষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে পারসীয় লিপিশিল্পীগণ প্রাচীন পাহলভির সংস্কার সাধনপূর্বক আরবি বর্ণমালার ছকে এ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এটাই ফারসি লিপিকলার স্বতন্ত্র রূপ হিসেবে স্বীকৃত। কোনো কোনো লিপি বিশেষজ্ঞ যদিও এ লিখনশৈলী হি.৭ম/ খ্রি. ১৩শ শতাব্দীতে উদ্ভব হয় বলে মত প্রকাশ করেন; কিন্তু তথ্য প্রমাণ এ কথার সাক্ষ্য বহন করছে যে, এটি উপর্যুক্ত সময়ের পূর্বে, বর্ণনান্তরে একাদশ শতাব্দীতে উৎপত্তি লাভ করে। তবে এটি পূর্ণতা লাভ করে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে।[৩২]

www.pathagar.com

'তালিক' শব্দের অর্থ ঝোলানো (hanging)। আলংকারিক পদ্ধতিতে এই লিপি তির্যকভাবে লিখিত হয় বলে এটি ঝুলন্ত মনে হয়। তাই এটি 'তালিক' নামে অভিহিত।

আরব ঐতিহাসিকদের মতে, 'তালিক' খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্যন্ত 'খত্তুল কুরআন' হিসেবে ব্যবহৃত গোলাকৃতির আরবি লিখনপদ্ধতি 'ফিরামুজ' (যা কুফিরীতি থেকে উৎপন্ন) থেকে উদ্ভূত। কিন্তু সাধারণ অভিমত হচ্ছে, 'তালিক' নবম শতাব্দীতে প্রচলিত 'রিয়াসি' শৈলীর পরিবর্তিত রূপ। এ লিপিতে 'রিকা' এবং 'তাওকি' লিপিশৈলীর প্রভাব খুবই স্পষ্ট।[৩৩] লিপিবিশারদ উবাদাহর মতে, প্রাচীন পাহলভির প্রভাবে আরবি লিপি পারস্যবাসীদের হাতে তালিক লিখনরীতির রূপ পরিগ্রহ করে।[৩৪] রিফা'ঈর মতে, আজদুদ্দৌলা আল-দায়লামির কাতিব হাসান আল-ফারিসি নাসখ, রিকা ও সুলুস লিখনশৈলীসমূহের সমন্বয়ে তালিক পদ্ধতির প্রাথমিক রীতিমালা উদ্ভাবন করেন।[৩৫] মতান্তরে, আকলামুস্ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত তাওকি ও রিকার সংমিশ্রিত পদ্ধতি থেকে তালিক পদ্ধতির উদ্ভব হয়।[৩৬]

এ ক্ষেত্রে আরব ঐতিহাসিকদের মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ তালিকের পূর্বে পারস্যে কুফিরীতির বহুল প্রচলন ছিল। তারা কুরআন ও অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ কুফিরীতি থেকে উৎপন্ন 'ফিরামুজ' লিপিপদ্ধতি অবলম্বনে লিপিবদ্ধ করত। তবে এ কথা সত্য যে, তালিক উৎকর্ষ ও বিকাশ লাভের পথে তাওকি, রিকা, রিয়াসি ও নাসখ প্রভৃতি শৈলীসমূহের কিছু বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

লিখনরীতি

তালিক লিপির গঠন প্রক্রিয়া এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যে, তা নাসখ এবং নাস্তালিক লিপিপদ্ধতির মধ্যবর্তী স্থানে বিরাজমান। এটি আলংকারিক পদ্ধতিতে তির্যকভাবে লিখিত হয় (দ্র. চিত্র-১০)।

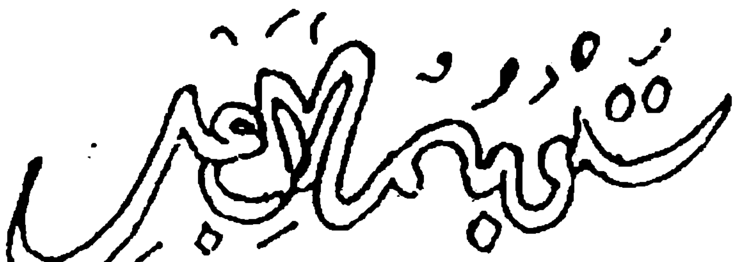

চিত্র-১০: প্রাচীন তালিক, ঝুলন্ত প্রকরণ

এ পদ্ধতিতে সরল ও ঋজু দণ্ডের ব্যবহার অপ্রতুল। উপরন্তু খাড়া ও লম্বা দণ্ডের সারি আনুপাতিক হারে কম। এ ছাড়াও এ লিপিশৈলী ডানদিক থেকে বামদিকে এবং ওপরের দিক থেকে নিচের দিকে ধাবমান। উক্ত ধাবন কেবল কিছু প্রান্তিক বর্ণের (যেমন با, بب, بت, بث, بف, بق, بك) দীর্ঘায়িতকরণে প্রভাব সৃষ্টি করেনি; বরং س ও ش বর্ণদ্বয়ের আকার পরিবর্তন করে লম্বা তির্যক রেখার আকৃতিতে পরিণত

www.pathagar.com

করে এবং অপরাপর বর্ণসমূহের পরস্পরের মাঝে সংযোগের জন্য বর্ণসমূহের আকার-আকৃতির সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ রেখা সৃষ্টি করে।[৩৭] দ্রুততার উদ্দেশ্যে এ পদ্ধতিতে হরফগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। সেজন্য এতে উল্লম্ব রেখা ছেড়ে কোনাকুনি রেখা অঙ্কনের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয় (দ্র. চিত্র-১১, ১২ ও ১৩)।

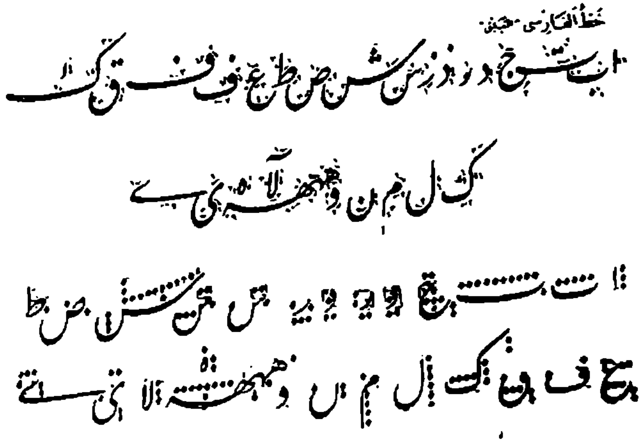

চিত্র-১৩: তালিক বর্ণমালা

চিত্র-১২: তালিক রীতির নিদর্শন

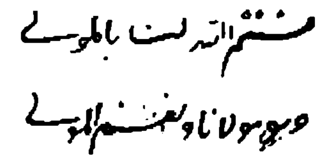

চিত্র-১১: তালিক লিপি

www.pathagar.com

বিকাশধারা

ষোড়শ শতাব্দীতে সাফাভি শাসনামলে (১৫০২-১৭৩৬ খ্রি.) তালিক লিপিশৈলীর চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। শাহ ইসমাইল (১৫০২-১৫২৪ খ্রি.) ও শাহ তাহমাসপ (১৫২৪-১৫৭৬ খ্রি.) সরকারি লিপি হিসেবে তালিকের প্রচলনে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এর উদ্ভাবন ও প্রাথমিক বিকাশে বিশেষ অবদান রাখেন তাজ-ই-সালমানি ও আবদুল হাই। আবদুল হাই তাঁর পৃষ্ঠপোষক শাহ ইসমাইলের নির্দেশে উক্ত রীতির মৌলিক নীতিমালা প্রণয়ন করেন।[৩৮] উক্ত রীতির খ্যাতনামা লিপিকার হচ্ছেন ইখতিয়ার উদ্দীন মুনশি গনাবাদি।

তালিক লিখনরীতি কেবল পারস্যের জনগণের সমাদর লাভ করেনি; বরং রাজা-বাদশাহদের ফরমান ও চিঠিপত্রে এ রীতি স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠা করে। উল্লেখ্য যে, আরব দেশে তালিকের সার্বজনীন ব্যবহার না হলেও পারস্য, তুরস্ক ও মোগল শাসিত ভারতে এই রীতি জাতীয় লিপিশৈলীর মর্যাদা লাভ করে। পারস্যের বিখ্যাত লিপিশিল্পী মির ইমাদ আল-হুসায়নির তালিক লিপিকর্ম সর্বত্র সমাদৃত হয় (দ্র. চিত্র-১৪)।

চিত্র-১৪: মির ইমাদ আল-হুসায়নির তালিক লিপি

পারস্য লিপিশিল্পীরা খুব দ্রুত তালিক রীতির পরিবর্তন সাধন করে 'নাস্তালিক' নামে অন্য একটি অধিকতর সুষম, গতিময় ও প্রাণবন্ত রীতি উদ্ভাবন করে। তা সত্ত্বেও স্মারক লিপি হিসেবে এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে তারা এর ব্যবহার অব্যাহত রাখে। এ ছাড়া তালিক শৈলীর মৌলিক নীতিমালা তুর্কি লিপিশিল্পীদের সুদৃঢ় মনোযোগ আকর্ষণ করে। তালিক রীতির পরিবর্তিত রূপ নাস্তালিক রীতির আবির্ভাবের পর তারা একে গ্রহণ করে বটে; কিন্তু উক্ত রীতিকে তারা তালিক নামেই অভিহিত করতে থাকে।[৩৯]

www.pathagar.com

তালিক রীতির প্রাথমিক নিদর্শনসমূহ

ফারসি লিখনপদ্ধতি তালিক রীতিতে লিখিত প্রাচীনতম নিদর্শন হচ্ছে ৪০১ হি./ ১০১০-১০১১ খ্রিষ্টাব্দে সম্পাদিত একটি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। ডি.এস. মারগলিউথ ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে রয়েল এশিয়েটিক ম্যাগাজিনে এটি প্রকাশ করেন। এতে প্রাথমিক তালিক রীতির নিদর্শনাদি সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়।[৪০] ফারসি লিপিশৈলীর দ্বিতীয় প্রাচীনতম নিদর্শন ইমাম বায়হাকি (রা.) (মৃ. ৪৫৮হি./১০৬৬ খ্রি.)-এর স্বহস্তে লিখিত 'কিতাবুল বায়হাকি'। নিশাপুরে প্রাপ্ত এই লিপির গ্রন্থখানি ৪৩১ হি. সনে প্রণীত বলে অনুমিত হয়। এতে পরবর্তী তালিক রীতির চিহ্নাদি বিদ্যমান। ৪৪৭ হি./১০৫৫-৬ খ্রিষ্টাব্দে বিরচিত মুওয়াফ্ফক আল-হারভির 'كتاب الأبنية' ফারসি লিপিশৈলীর অপর একটি প্রাচীন নিদর্শন। আল-হারভি পারসীয় কুফিরীতিতে তাঁর গ্রন্থখানি লিপিবদ্ধ করেন। বস্তুত হিজরি ৭ম শতকের শেষদিকে/ খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সরকারি রেজিস্টার, দলিল-দস্তাবেজ ও কাব্যগ্রন্থ প্রভৃতিতে ফারসি লিপিশৈলী প্রকাশ লাভ করে। তবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মীয় গ্রন্থাদি, বিশেষ করে কুরআন, হাদিস ও অন্যান্য ধর্মীয় কিতাবসমূহ পূর্বের ন্যায় নাসখ রীতির বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনে লেখা হতো। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, আল-কুরআনের ছত্রসমূহের মধ্যবর্তী অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসমূহ এবং তার পার্শ্বস্থ ও প্রান্তদেশীয় টীকা-টিপ্পনীর অধিকাংশই তালিক লিপিশৈলীতে লেখা হতো।[৪১]

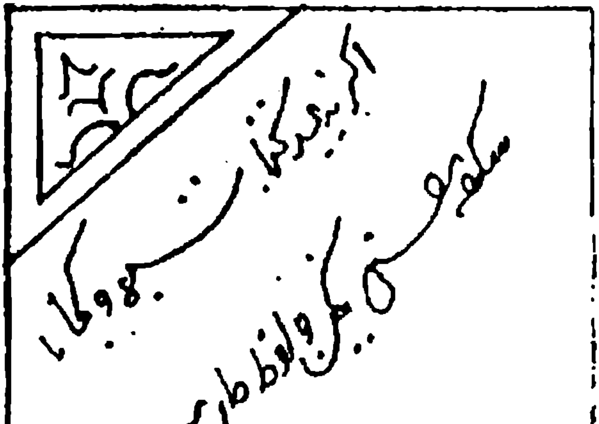

চিত্র-১৫: মির আলী সুলতান আত-তাবরিজি, নাস্তালিক লিখনশৈলী

খ. নাস্তালিক লিপিশৈলী

'নাস্তালিক' মুসলিম লিপিশিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই লিখনরীতিকে 'হস্তলিপি শিল্পের বধূ' নামে আখ্যায়িত করা হয়।[৪২] এটি ফারসি লিপিকলাকে উন্নতির স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দেয়। পারসীয় লিখনশিল্পীদের প্রচেষ্টায় উক্ত লিখনপদ্ধতির উদ্ভব ও বিকাশ

সাধিত হয়। নাস্তালিক লিখনপদ্ধতি কোনো লিখনপদ্ধতির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অস্তিত্বে আসেনি। কুফি ও নাসখি লিখনপদ্ধতি যেমন আরবি লিখনপদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে, নাস্তালিক লিখনপদ্ধতি অনুরূপ স্বতন্ত্রভাবে পারস্যের পাহ্লভি লিখনপদ্ধতির এক বিশিষ্ট রূপ হিসেবে উদ্ভাবিত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ফারসি তালিক লিপিশৈলীর সংস্করণই বিবর্তনের নিয়মানুসারে নাস্তালিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়। আরব ঐতিহাসিকদের মতে, আমির তাইমুরের (১৩৭০-১৪০৪ খ্রি.) সমসমিয়িক তাবরিজের প্রখ্যাত লিপিশিল্পী মির আলী আত-তাবরিজির (মৃ. ১৪১৬ খ্রি.) প্রচেষ্টায় খ্রিষ্টীয় চর্তুদশ শতাব্দীর শেষভাগে নাস্তালিক পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। লিপি বিশেষজ্ঞদের মতে, তিনিই এ লিপিশৈলীর প্রথম প্রচলন করেন। তিনি মুসলিম লিপিকলার সর্বোৎকৃষ্ট ও সুষমামণ্ডিত শৈলীর গঠন ও ছন্দ বিন্যাসের জন্য কতিপয় নিয়ম প্রবর্তন করেন (দ্র. চিত্র- ১৫)। সাফাদি বলেন,

> All important sources agree that the Persian calligrapher Mir Ali Sultan al-Tabrizi was the founder of this script and he is also credited with devising the complex rules which govern it.[৪৩]

মির আলী আত-তাবরিজি কর্তৃক উক্ত লিখনশৈলী উদ্ভাবনের পেছনে এক অতি প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পৃক্ত করা হয়। একদা তিনি স্বপ্নযোগে আলী (রা.) কর্তৃক আদিষ্ট হন যে, তিনি যেন তাঁর কলম দিয়ে বর্ণগুলোকে এমন সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিন্যস্ত করেন, যাতে সেগুলো একটি সুন্দর উড়ন্ত পাখির সুষমামণ্ডিত পালকের ন্যায় মনে হয়। অতঃপর তিনি এ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তিনি খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফারসি লিপিশিল্পের প্রখ্যাত লিপিকারপ্রবর ও গুণীজনদের শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হন।[৪৪]

মির আলী আত-তাবরিজিকে নাস্তালিক রীতির উদ্ভাবক মনে করা হলেও কোনো কোনো লিপিবিশারদ মনে করেন, মির আলীর অনেক পূর্বেই এই রীতির উদ্ভব হয়।[৪৫] তাঁদের মতে, আমির তাইমুরের পূর্বে নাস্তালিক লিখনপদ্ধতির প্রয়োগ সত্য এবং এ ব্যাপারে নাস্তালিক লিখনপদ্ধতির প্রভূত উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। অতএব প্রাপ্ত উপকরণের ভিত্তিতে বলা যায় যে, আব্বাসীয় আমলের সম্ভবত দশম বা একাদশ শতাব্দীতে পারস্য লিখনশিল্পীদের হাতে নাস্তালিক রীতির উদ্ভব হয়। তবে তা ফারসি লিপিশৈলী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে মির আলীর হাতে। কারণ খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত স্বতন্ত্র কোনো ফারসি লিপিশৈলী প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি।

নাস্তালিক শব্দের ব্যাখ্যা ও নামকরণ

'নাস্তালিক' (نستعليق) শব্দটি 'নাসখ' (نسخ) ও (تعليق) তালিক' শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। আরবি লিখনপদ্ধতি নাসখ ও ফারসি লিখনপদ্ধতি তালিকের সমন্বয়ে 'নাস্তালিক' একটি স্বতন্ত্র লিখনপদ্ধতির রূপ লাভ করে।[৪৬] প্রাথমিক পর্যায়ে এ লিপিপদ্ধতিকে 'نسخ تعليق' (নাসখ-ই-তালিক) নামে অভিহিত করা হতো। পরবর্তীকালে শব্দটি বহুল ব্যবহারের ফলে نستعليق (নাস্তালিক)এ রূপান্তরিত হয়।[৪৭]

নাস্তালিকের নামকরণের ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়। এক. আরবি নাসখ এবং ফারসি তালিক পদ্ধতিদ্বয়ের সমন্বয়ে এটির উদ্ভব হয়েছে বলে এই পদ্ধতিকে নাস্তালিক

www.pathagar.com

বলা হয়। এই কারণে এ লিপিপদ্ধতিকে ‘الخط الفارسي المنسوخ’ নামেও আখ্যায়িত করা হয়। দুই. নাসখ-ই-তালিকের শব্দগত অর্থের প্রতি লক্ষ রেখে একে নাস্তালিক শব্দে রূপান্তরিত করা হয়েছে। নাসখের আভিধানিক অর্থ রহিতকরণ। সুতরাং এর অর্থ হলো তালিক লিপিরীতিকে রহিত করে তাকে একটি নতুন ফারসি লিপিরীতিতে রূপদান, যা নাসখ-ই-তালিক বা সংক্ষিপ্তরূপে নাস্তালিক নামে পরিচিত।[৪৮]

লিপিরীতি

আরবি নাসখ ও ফারসি নাস্তালিক পদ্ধতির মধ্যে গোলাকার বর্ণের পরিমাপ বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। নাস্তালিক পদ্ধতিতে শব্দে ব্যবহৃত বর্ণের গোলাকার পরিসরকে বিস্তৃত করা হয় ও বাঁকসমূহ ঢালু করা হয় এবং তা বিশেষত শব্দ ও বর্ণের শেষ প্রান্তে লক্ষ করা যায় (দ্র. চিত্র-১৬)।

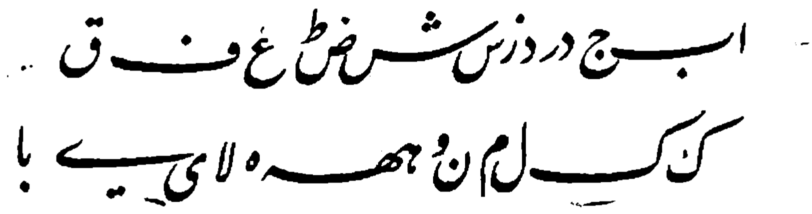

চিত্র-১৬: নাস্তালিক বর্ণমালা

এই লিপিমালাকে উত্তাল তরঙ্গের মধ্যভাগের ঢালু পরিসরের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এম. জিয়াউদ্দীন বলেন,

> এ পদ্ধতিতে লম্বসমূহ দীর্ঘ এবং সোজা তরবারি বা খড়গের আকৃতিতে তীব্রভাবে সুচালো হয়। সোজা সমতল বা তরবারির ন্যায় ক্রমবর্ধমান সামান্য বাঁক তার লম্বসমূহে সহজভাবে মাঝখানে ধাবিত হয়[৪৯] (দ্র. চিত্র-১৭)।

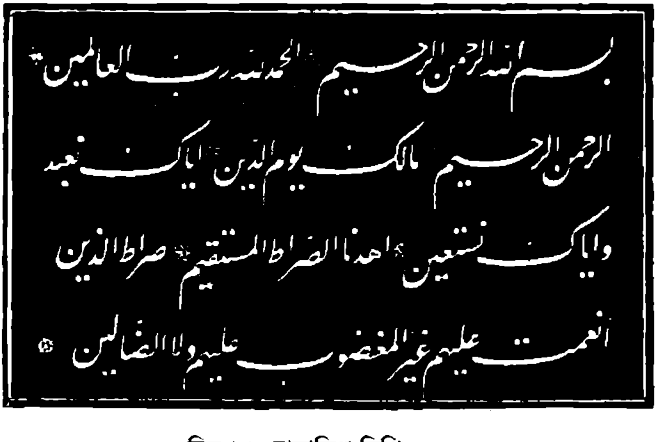

চিত্র-১৭: নাস্তালিক লিপি

www.pathagar.com

উপরন্তু সরলীকরণের মাধ্যমে কোনো বর্ণের দাঁত লোপ করে কলম এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যে, তার ক্রমশ ঢালু রূপ লেখার ত্বরিত গতিতে সহায়তা করে। এ পর্যায়ে س ও ش বর্ণের উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। সাধারণভাবে লেখার সময় س ও ش অক্ষরদ্বয়ে তিনটি খাড়া দাঁত থাকে। কিন্তু নাস্তালিক লিখনপদ্ধতিতে দাঁত তিনটি লোপ করে ঢালুভাবে উক্ত বর্ণদ্বয়ের এভাবে س ও ش বিন্যাস করা হয়। বর্ণের এই ঢালু বিন্যাসকে অনেক সময় আঁকা-বাঁকা ও তরঙ্গায়িত বলে মনে হয়।[৫০] এ পদ্ধতিতে বক্রাকার রেখাগুলো গোলাকার। আর তা এভাবে সম্পূর্ণরূপে গোলাকার রূপ ধারণ করে যে, তা এক ফালি চাঁদ বা ডিমের আকার ধারণ করে। বক্রাকার রেখাসমূহ বিস্তার করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ রেখাকে একই কলমের টানে হঠাৎ সম্ভাব্য সরুতম রেখায় পরিণত করা যায়।[৫১] কুণ্ডলাকৃতি মেঘের আবরণে নাস্তালিক (দ্র. চিত্র-১৮) এবং সমান্তরাল দুটি লাইনে লিপিবদ্ধ নাস্তালিক (দ্র. চিত্র-১৯) বিশেষভাবে আর্কষণীয়।

চিত্র-১৮: মেঘকুণ্ডলীর আবরণে নাস্তালিক

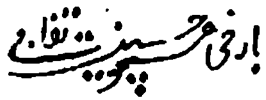

চিত্র-১৯: দুই লাইনে নাস্তালিক

এ ছাড়া নাস্তালিক লিপির সৌন্দর্য, গতিময়তা, স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীল ভঙ্গি সহজেই লক্ষণীয়। বর্ণসমূহের পূর্ণ গঠন এবং গোলাকার আকৃতি এই লিপিশৈলীকে মাধুর্য দিয়েছে। এম. জিয়াউদ্দীন বলেন, "এর পরিপূর্ণ সমান্তরাল রেখাকৃতি আরবদের পারস্য বিজয়ের বহু পূর্বেই পাহলভি লিপি দীর্ঘকাল লিখনের ফলে সম্ভবপর হয়েছিল।"[৫২]

বিকাশধারা

নাসখ ও তালিক লিপিপদ্ধতির মার্জিত ও সর্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ হিসেবে, বিশেষত কুফির কোণাকৃতি ও নাসখির বিপরীতে সাবলীল, বক্রাকার, স্বাচ্ছন্দ্যময় লীলায়িত ছন্দের প্রকাশে নাস্তালিক সর্বজনীন জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বিশেষ করে এই রীতি পারস্য ও ভারত উপমহাদেশে সমধিক সমাদৃত হয়। পারস্যের সাফাভি শাসনামলে (১৫০২-১৭৩৬ খ্রি.) এবং ভারতীয় উপমহাদেশের মোগল আমলে (১৫২৬-১৮৫৮খ্রি.) উক্ত রীতির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়।

পারস্যের সাফাভি সুলতান শাহ্ তাহমাসপের আমলে (১৫২৪-১৫৭৬ খ্রি.) নাসখির পরিবর্তে নাস্তালিক রাজকীয় লিপির মর্যাদা লাভ করে। কাব্য, মহাকাব্য ও অন্যান্য

www.pathagar.com

সাহিত্যকর্মের অনুলিপি তৈরি করার ক্ষেত্রে তা স্বাভাবিক লিপিতে পরিণত হয়। শাহ আব্বাসের শাসনামলে (১৫৮৮-১৬২৯ খ্রি.) নাস্তালিক সর্বজনীন পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। বিশেষত ক্ষুদ্র চিত্র সম্বলিত সুমার্জিত ফারসি লিপিতে তার ব্যবহার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আরব ও তুর্কি মুসলমানদের মধ্যে এর ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করেনি। কারণ তাদের লিপিশৈলীসমূহের, বিশেষত নাসখির গতিশীল বিকাশে এর প্রভাব ছিল সামান্য। আরব ও তুর্কি লিপিকাররা উসমানীয় সাম্রাজ্যে তালিকের নিকটবর্তী 'ক্ষুদ্র নাসখি', যাকে যথার্থ অর্থে 'উসমানীয় নাসখি' নামে আখ্যায়িত করা যেতে পারে, তা থেকে এক প্রকার নতুন সংকর বা দো-আঁশলা রীতি (hybrid style) উদ্ভাবন করে এবং তারা তা সাহিত্যকর্মের লিখন ও অনুলিপি প্রস্তুতকরণে ব্যবহার করে।[৫৩]

আল-কুরআনের অনুলিপি তৈরির ক্ষেত্রে তালিকের মতো নাস্তালিক রীতি কচিৎ ব্যবহৃত হয়। জানা মতে, নাস্তালিক রীতিতে কেবল আল-কুরআনের একটি পরিপূর্ণ অনুলিপি লিপিবদ্ধ করা হয়।[৫৪] ১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দে শাহ মাহমুদ নিশাপুরি শাহ তাহমাসপের জন্য এই সুন্দর অনুলিপিটি প্রস্তুত করেন (দ্র. চিত্র-২০)।

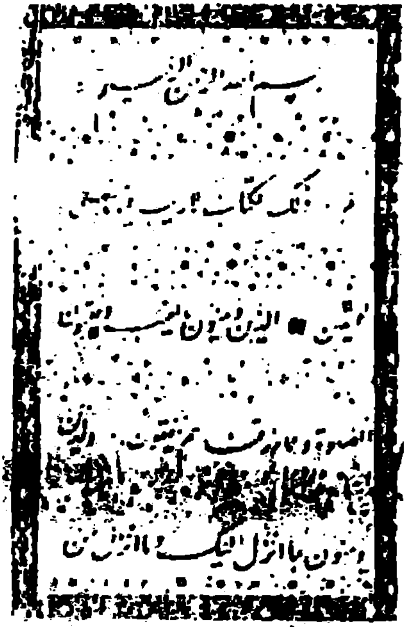

চিত্র-২০: নাস্তালিক, কুরআন, শাহ মাহমুদ নিশাপুরি

তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, আল-কুরআন যদিও নাস্তালিক রীতিতে লেখা হতো না; কিন্তু তালিকের মতো এর দুই ছত্রের মধ্যভাগ ও পৃষ্ঠার প্রান্তদেশে অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনীসমূহ নাস্তালিক রীতিতে লেখা হতো। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত রীতি বিকাশের প্রথম স্তর থেকেই পারস্যবাসীদের কাছে নাসখ অপেক্ষা অধিকতর সমাদৃত হয়।[৫৫]

www.pathagar.com

মির আলীর পর অনেক মুসলিম লিপিশিল্পী, বিশেষত পারসীয় লিপিকারদের প্রচেষ্টায় নাস্তালিক রীতির চরম উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়। সুলতান আলী আল-মাশহাদি নাস্তালিক রীতির প্রভূত সুষমা ও মাধুর্য বৃদ্ধি করেন (দ্র. চিত্র-২১)। উক্ত রীতির সৌন্দর্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাঁকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। অতঃপর সুলতান মুহাম্মদ খন্দান (দ্র. চিত্র-২২), মির আলী হারভি (দ্র. চিত্র-২৩), ইখতিয়ার উদ্দীন মুনশি (দ্র. চিত্র-২৪), আবদুর রহমান আল-খাওয়ারিজিমি ও তাঁর দুই পুত্র আবদুর রহমান আল-আমসি ও আবদুল করিম পাদশাহ, জাফর আল-বয়সনকরি, আযহার তাবরিজি, সুলতান মুহাম্মদ নুর ও ইব্রাহিম সুলতান ইবনে শাহরুখ প্রমুখ প্রাথমিক পর্যায়ে নাস্তালিক রীতির বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে অনন্য অবদান রাখেন।

চিত্র-২১: নাস্তালিক, সুলতান আলী আল-মাশহাদি   চিত্র-২২: নাস্তালিক, সুলতান মুহাম্মদ খন্দান

শাহ আব্বাসের শাসনামলকে নাস্তালিক রীতির স্বর্ণযুগ বলা হয়। তাঁর আমলে অসংখ্য লিপিকার নাস্তালিক লিপিশৈলী চর্চা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। যেসব খ্যাতনামা লিপিকার তাঁর আমলে উক্ত রীতিতে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন তাঁদের মাঝে কাসেম সাদি, শাহ কবির ইবনে ওয়াইম আল-আরদাবিলি, কামালুদ্দীন হিরাতি, গিয়াসুদ্দীন ইস্পাহানি, মাহমুদ নিশাপুরি, আলী রেযা আব্বাসি, মুহাম্মদ হুসায়ন আল-ইমাদ (দ্র. চিত্র-২৫), বিশেষ করে মির ইমাদ আল-হুসায়নি উল্লেখযোগ্য। আল-হুসায়নি তাঁর জীবনকালে শ্রেষ্ঠ লিপিকার হিসেবে কিংবদন্তিতে পরিণত হন। তিনি নাস্তালিক লিপিরীতির অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী ছিলেন। তাঁর লিপিচিত্র ছিল খুবই উন্নতমানের

www.pathagar.com

ও শৈল্পিক চাতুর্যময় (দ্র. চিত্র-২৬ ও ২৭)। তাঁর পৃষ্ঠপোষক শাহ আব্বাস তাঁকে মহাকবি ফেরদৌসির (৯৩২-১০২০ খ্রি.) 'শাহনামা' গ্রন্থটির অনুলিপি করতে বলেন এবং সম্মানী বাবদ ৭০ তুমান প্রদান করেন।

চিত্র-২৩: নাস্তালিক, মির আলী হারভি

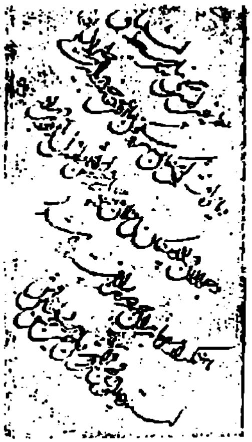

চিত্র-২৪: নাস্তালিক, খাজা ইখতিয়ার উদ্দীন মুনশি

এক বছর পর শাহ তাঁর নিকট গ্রন্থটি চেয়ে পাঠালে তিনি পত্রবাহককে বৃহৎ 'শাহনামা' মহাকাব্যের প্রথমদিকের ৭০ লাইন লিপিবদ্ধকৃত কাগজটি হস্তান্তর করে বলেন যে, শাহ যে অর্থ দিয়েছিলেন তা দিয়ে ৭০ পঙ্‌ক্তির বেশি লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। এ কথা শুনে শাহ তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হন এবং তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেন।[৫৬] শাহজাহান মির ইমাদের লিপিকলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং কেউ তাঁর লিপিকলার নিদর্শন তাঁকে প্রদান করলে তিনি তাঁকে 'ইয়াক-সাদি' (Yak-Sadi) উপাধিতে ভূষিত করতেন।[৫৭]

চিত্র-২৫: নাস্তালিক, মুহাম্মদ হুসায়ন আল-ইমাদ

চিত্র-২৬: নাস্তালিক, মির ইমাদ আল-হুসায়নি

www.pathagar.com

চিত্র-২৭: নাস্তালিক , মির আল-ইমাদ আল- হুসায়নি

মোগল ভারতে নাস্তালিকের প্রসার

মোগল আমলে সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতবর্ষে আরবি লিপিকলার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়, বিশেষ করে পারস্য লিপির অনুকরণে নাস্তালিক লিপিশৈলী বিশেষ আঙ্গিক ও লিখনরীতির রূপ পরিগ্রহ করে। উপরন্তু, ভারতীয় মুসলমানরা নাস্তালিককে জাতীয় লিপির মর্যাদা দান করে এবং উর্দু ভাষা লেখার ক্ষেত্রেও তারা তা বহুলাংশে ব্যবহার করে।[৫৮] মূলত ভারতবর্ষে মোগলদের আগমনের পর নাস্তালিক লিখনশৈলীর প্রসার ও বিকাশ সাধিত হয়। ভারতের লিপিশিল্পীগণ মোগল শাসনের পূর্বেও উক্ত লিপিশৈলী সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। তবে মোগল আমলেই এই লিপিশৈলীর চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। যেহেতু মোগলরা এ রীতিকে অত্যধিক গুরুত্ব ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছে, তাই এটি অপরাপর সকল লিপিরীতির ওপর রাজ্যের সর্বক্ষেত্রে একচ্ছত্র প্রাধান্য পায়। অলংকরণ মোটিফ বা কৌশল হিসেবে মোগল আমলের ইমারত গাত্রে অন্যান্য লিখনপদ্ধতির চেয়ে নাস্তালিক পদ্ধতি উৎকীর্ণ করার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। রাষ্ট্রীয় রেজিস্ট্রার, সরকারি চিঠিপত্র, বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি, শিলালিপি, এমনকি মুদ্রার গাত্রেও উক্ত রীতি ব্যবহার করা হতো। ফারসি ছিল তখনকার সময়ের রাষ্ট্রীয় ভাষা। আর তা লেখা হতো নাস্তালিক রীতিতে। ফলে স্বাভাবিকভাবে উক্ত রীতির ব্যবহার ও গুরুত্ব মোগল আমলে বেড়ে যায়। তবে আরবি ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাসখি শৈলীতে লেখা হতো। কিন্তু এমন অনেক আরবি

www.pathagar.com

শিলালিপিও পাওয়া যায়, যা নাস্তালিক রীতিতে উৎকীর্ণ। যেমন সিন্ধুর বাহকর নগরীতে অবস্থিত মাসুম খান পরিবারের গোরখানা নামে পরিচিত সমাধিস্থলের আরবি শিলালিপিসমূহ নাস্তালিক পদ্ধতিতে লিখিত।

মোগল আমলে আরবি ও ফারসি ভাষায় প্রণীত কিছু ধর্মীয় গ্রন্থে লিপিকারগণ আরবিকে নাসখি রীতিতে এবং মূল আরবির ফারসি ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনীকে পৃষ্ঠার প্রান্তদেশে ও উভয় পার্শ্বে নাস্তালিক রীতিতে লিখেছেন। উদাহরণস্বরূপ, হিজরি একাদশ শতাব্দী/ খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল আমলে লিখিত কুরআনের একটি অনুলিপিতে কুরআনের আয়াতসমূহ পৃষ্ঠার মাঝখানে নাসখি রীতি অবলম্বনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং পৃষ্ঠার উভয় পার্শ্বে ফারসি ভাষার টীকা-টিপ্পনীগুলো লেখার ক্ষেত্রে নাস্তালিক রীতি ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তীকালে ভারত উপমহাদেশের ধর্মীয় গ্রন্থাদিতে আরবি ভাষার মতনসমূহ নাসখি রীতিতে এবং ফারসি, উর্দু বা এ জাতীয় অন্য যে কোনো স্থানীয় ভাষায় প্রণীত অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনীসমূহ নাস্তালিক রীতিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। ফলে পাঠকদের জন্য মূল পাঠ ও ব্যাখ্যার মাঝে পার্থক্য নিরূপণ সহজ হয়।[৫৯]

সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামল (১৬০৫-১৬২৭ খ্রি.)-কে মোগল চিত্রকলা ও লিপিশৈলীর স্বর্ণযুগ বলা যায়। তিনি ছিলেন ফারসি ভাষায় একজন সুলেখক। সম্রাট শাহজাহান ইমাদ উদ্দীন আল-হুসায়নি প্রচলিত নাস্তালিকের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এবং এই শৈলীতে প্রণীত পাণ্ডুলিপিকারদের তিনি পুরস্কৃত করতেন। এই লিপিশৈলীর অনুসরণকারীরা তাঁর নিকট একশ ঘোড় সওয়ারের মর্যাদা পেত। সম্রাট শাহজাহানের আমলে (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রি.) শ্রেষ্ঠ লিপিকার ছিলেন আগার আবদুর রশিদ। তিনি মির ইমাদের ভাতিজা ও ছাত্র ছিলেন। তিনি শাহজাহানের রাজত্বের সময় ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং যুবরাজ দারাশিকোহ ও রাজকুমারী জেবুন্নেসার উস্তাদ নিযুক্ত হন। তিনি তাদের নাস্তালিক রীতির প্রশিক্ষণ দেন। তিনি লিপিশিল্পের একটি স্কুল স্থাপন করে মোগল ভারতে লিপিকলার উৎকর্ষ সাধনে অবদান রাখেন। তাঁর লিপিকর্মের যথেষ্ট সমাদর ছিল। তাঁর ক্যালিগ্রাফি এতই দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান ছিল যে, যাদের নিকট তাঁর কোনো নিদর্শন ছিল এবং হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা তা প্রদর্শন করত না।

মোগল আমলের খ্যাতনামা লিপিকারদের মধ্যে 'জরিন কলম' উপাধিতে ভূষিত মুহাম্মদ হুসায়ন কাশ্মীরি (দ্র. চিত্র-২৮), আবদুর রহিম খান-ই-খানান (দ্র. চিত্র-২৯), মুল্লা মির আলী ও তাঁর ছাত্র মওলানা আব্দুল বাকি, মুহাম্মদ আমিন মাশহাদি, মির খলিলুল্লাহ, শাহি বাদশাহি কলম, মওলানা আবদুল হাই, মাওলানা দাওরী, কাতিবুল মুলক সুলতান বায়েজিদ, মাওলানা আবদুর রহিম আনবারি কলম, আলী চমন কাশ্মীরি, নুরুল্লাহ কাসেম আরসালান, আবদুস সামাদ মিয়াজি, মুজাফ্ফর আলী, মির মাসুম, মুহাম্মদ আসগর ওরফে আশরফ খান, মির আবদুল্লাহ তাবরিজি, আবদুস সামাদ শিরিন কলমের পুত্র মুহাম্মদ শরিফ, শিকাস্তা লিপিতে পারদর্শী মির্জা মুহাম্মদ হুমায়ুন, মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক হারভি, মির সৈয়দ আলী তাবরিজি, মির আবদুল্লাহ, মির সালেহ, আবদুর রশিদ দায়লামি, মুহাম্মদ আফজাল ও মির্জা ফজলুল্লাহ প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.) লিপিকলা চর্চার অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান ছিল। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত লিপিশিল্পী। তিনি লিপিকারদের রাজকীয় সম্মান দিতেন। তাঁর মৃত্যুর পর ব্যাপকভাবে মোগল লিপিচর্চার অবনতি ঘটে। কিন্তু ফারুখ সিয়ারের আমলে হাজি নামদার ও মির্জা খাতিম বেগ লিপিকার হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। মুহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে যেসব লিপিকার খ্যাতি অর্জন করেন মুহাম্মদ আফজাল আল-হুসায়নি, মুহাম্মদ আসলাম, মুহাম্মদ সাদিক, আবদুল্লাহ্ আল-হুসায়নি শিরিন কলম প্রমুখ তাঁদের অন্যতম। মুহাম্মদ মুকিম ও মুহাম্মদ মুসা ইমাদ রীতিতে নাস্তালিক চর্চা করেন। কিন্তু শিকাস্তা লিপিতে মুহাম্মদ সাদিক ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শাহ আমলের শাসনামলে নাস্তালিক রীতিতে আল-কুরআনের বহু অনুলিপি প্রস্তুত করা হয়। তাঁর আমলে লিপিকারগণ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।[৬০] বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের জাতীয় জাদুঘর ও গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত মোগল আমলের নাস্তালিক পদ্ধতিতে লিখিত বিভিন্ন লিপি তৎকালে উক্ত রীতির বহুল প্রচলনের সাক্ষ্য বহন করছে।

চিত্র-২৮: নাস্তালিক, মুহাম্মদ হুসায়ন কাশ্মীরি

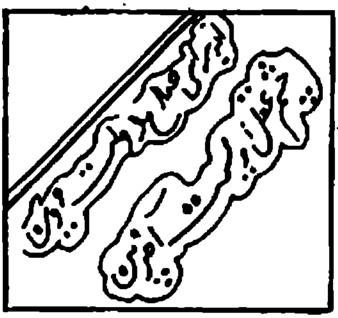

চিত্র-২৯: নাস্তালিক, আবদুর রহিম খান-ই-খানান

বাংলায় নাস্তালিক রীতির প্রসার

ভারতবর্ষে মোগল শাসনের ভিত মজবুত হওয়ার পর সম্রাট আকবরের সময়ে (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) বাংলায় নাস্তালিক লিপিশৈলীর বিকাশ ঘটে। সুলতানি আমলে (১২০৬-১৫৫৫ খ্রি.) বাংলায় উক্ত রীতির নিদর্শন খুবই কম। বাংলাদেশে ঢাকার জাতীয় জাদুঘরে সম্রাট আকবরের আমলের ১০০০হি./১৫৯১ খ্রিষ্টাব্দে উৎকীর্ণ তিনটি লিপিচিত্র সংরক্ষিত আছে। এ চিত্রসমূহ তৎকালীন বাংলার লিখনরীতি নাস্তালিক রীতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। এরপর থেকেই বাংলার অধিকাংশ লিপিচিত্র নাস্তালিক রীতি অবলম্বনে উৎকীর্ণ হয়। পাশাপাশি অন্যান্য রীতি অনুকরণে চিত্র ও শিলালিপিসমূহ উৎকীর্ণ করার রেওয়াজও প্রচলিত ছিল। তৎকালীন নাস্তালিক বর্ণমালার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো– লিপিকারগণ কখনো 'সিন' বর্ণের নিচে তিন নুকতা (বিন্দু) প্রদান করতেন। কোনো কোনো চিত্রে দেখা যায়, ফারসি ভাষার ' ک ' বর্ণটি আরবির ' ع '-এর আকৃতিতে উৎকীর্ণ করা হয়েছে।[৬১]

www.pathagar.com

প্রাক মোগল আমলে নাস্তালিক রীতির নিদর্শন

ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, মোগল ভারতে নাস্তালিক লিখনশৈলীর চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। কিন্তু এর পূর্বেও ভারত উপমহাদেশে এ রীতির বহুল প্রচলন ছিল। ৮৮৮হি./ ১৪৮৩ খ্রিষ্টাব্দে নাস্তালিক রীতিতে উৎকীর্ণ রাজস্থানে নাগুর লিপিচিত্র এবং ৮৮৯ হি./ ১৪৮৫ খ্রিষ্টাব্দে একই রীতিতে উৎকীর্ণ হরিয়ানার সুনাপাত লিপিচিত্র এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ছাড়া এডেনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে ৮৫৪ হি. /১৪৫০ খ্রিষ্টাব্দে নাস্তালিক রীতিতে ফারসি ভাষায় ভারতে লিখিত ইঞ্জিলের পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান রয়েছে। প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগারে 'Biblotheque National'-এ ৮৭০ হি./১৪৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে নাস্তালিক রীতিতে লিখিত تاج المعاصر গ্রন্থের একখানা পাণ্ডুলিপি এবং প্রসিদ্ধ ফারসি কবি শেখ সাদি শিরাজি বিরচিত ৮৫৪হি./১৪৫০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের সুরাট নগরীতে নাস্তালিক রীতিতে লিখিত *গুলিস্তাঁ* ও *বুস্তাঁ* প্রভৃতি গ্রন্থের একটি করে কপি সংরক্ষিত আছে। প্রসিদ্ধ লিপিকার হাসান আরগুনের নাস্তালিক পদ্ধতিতে ৯৩৮ হি./ ১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একটি অভিনব লিপিচিত্র সিন্ধুর সাহওয়ান নগরীতে আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে সেটি করাচির জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরে প্রসিদ্ধ নাস্তালিক লিপিকার সুলতান আলী মাশহাদির ৮৮২ হি./ ১৪৭৮ খ্রিষ্টাব্দে নাস্তালিক রীতিতে লিখিত ' شرح رباعيات ' -এর একটি অনুলিপি এবং খ্যাতনামা লিপিকার মুহাম্মদ আলীর নাস্তালিক রীতিতে লিখিত ও বিভিন্ন রঙের সমন্বয়ে সুসজ্জিত ' مخزن الأسرار' গ্রন্থের আংশিক পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান আছে।[৬২]

নাস্তালিক রীতির অপ্রধান শাখাসমূহ

নাস্তালিক রীতি থেকে কয়েকটি অপ্রধান পদ্ধতির উদ্ভব হয়। নিম্নে এগুলোর ওপর আলোকপাত করা হলো :

এক. শাফিয়া

'শাফিয়া' নাস্তালিক রীতির একটি শাখা পদ্ধতি। তবে এর কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই পদ্ধতির বর্ণমালার বক্র অংশ আধ বাঁক হিসেবে উপস্থাপন করে এমনভাবে তা দীর্ঘায়িত করতে হয়, যাতে সেগুলো কলমের বক্র আঁচড়ের আকৃতিতে পরিণত হয়।[৬৩]

দুই. হিলালি

এটাও নাস্তালিকের একটি শাখা লিপিরীতি। এ পদ্ধতিতে লিপির অক্ষরসমূহকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যেন সেগুলো অর্ধচন্দ্রের প্রতীক হিসেবে প্রতীয়মান হয়।[৬৪]

তিন. তাহরিরি

এর অপর নাম 'তারাসুল' (ترسل)। এটিও নাস্তালিকের একটি শাখা লিপিরীতি। বর্তমানে তা পারস্যবাসীরা চিঠিপত্র লেখার কাজে ব্যবহার করে।[৬৫]

চার. জুলফে আরুস

'জুলফে আরুস' (কনের বেণি) কোনো স্বতন্ত্র পদ্ধতি নয়। এটি নাস্তালিক লিখন-পদ্ধতির একটি অলংকরণ রূপ মাত্র। রায়হানি ও নাস্তালিকের সমন্বয়ে এ রীতির উদ্ভব

www.pathagar.com

হয়। বর্ণমালার সমান্তরাল রেখাগুলোর শেষপ্রান্ত বক্রাকারে কুণ্ডলাকৃতি হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরাতে পরিণত হলে এবং খাড়া দণ্ডগুলো নাতিদীর্ঘ এবং প্রস্থে ক্ষীণ পরিসর গ্রহণ করলে তাকে জুলফে আরুস লিখনপদ্ধতি নামে অভিহিত করা হয়[৬৬] (দ্র. চিত্র-৩০)।

চিত্র-৩০: জুলফে আরুস

গ. শিকাস্তা ও শিকাস্তা আমিয

নাস্তালিকের সৌন্দর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যময় গতি প্রশ্নাতীত ব্যাপার। তবে তার গোলাকৃতি বর্ণগুলোর পূর্ণ রূপ গঠন করতে লিপিকারের যথেষ্ট সময় ও ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। ফলে ক্রমে উক্ত গোলাকার ও ঢালু পদ্ধতি নাস্তালিক থেকে শিকাস্তা লিপির উদ্ভব হয়।

'শিকাস্তা' ফারসি শব্দ। এর অর্থ হলো ভগ্ন বা খাপছাড়া (Broken)। যেহেতু এ লিপিপদ্ধতিতে বর্ণগুলো বিক্ষিপ্ত, খাপছাড়া ও অবিন্যস্তভাবে সেট করা হয়, সেহেতু এ লিপিপদ্ধতিকে শিকাস্তা (Broken Style) নামে অভিহিত করা হয়।

শিকাস্তা মূলত এক ধরনের সংকেত লিপি। দ্রুত লিখনের জন্য উপযোগী এই লিপি নাস্তালিকের ক্ষুদ্র সংস্করণ। নাস্তালিক পদ্ধতির সরলীকরণের মাধ্যমে এই পদ্ধতি লাভ করা যায়। একে নাস্তালিকের শর্টলিপি হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। সাফাদির মতে, তালিক ও নাস্তালিকের সমন্বয়ে এ লিপিপদ্ধতির উদ্ভব হয়।[৬৭] রিফা'ঈ বলেন : তালিক ও দিওয়ানি পদ্ধতিদ্বয় থেকে শিকাস্তা পদ্ধতির উদ্ভব সম্পন্ন হয়।[৬৮] কেউ কেউ মনে করেন, শিকাস্তা রীতি হলো প্রাচীনতম ফারসি লিপিরীতি। এই প্রাচীন ইরানীয় লিপির প্রতি ইরানিদের হৃদয়ে রয়েছে গভীর অনুরাগ। ইরানিদের ছাত্রত্ব গ্রহণ ব্যতীত এর চর্চা ও অনুশীলন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। তারা নিজেদের মধ্যে এর ব্যবহারকে সীমিত রাখার চেষ্টা করে। এ রীতির প্রাণবন্ততা, সুষমা ও স্বাচ্ছন্দ্যময় গতির ফলে ইরানিরা হস্তলিখনের ক্ষেত্রে এর প্রতি নির্ভরশীল ছিল।[৬৯]

www.pathagar.com

শিকাস্তা লিখনশৈলীতে বর্ণসমূহের একটিকে অপরটির সাথে এমনভাবে সংযোগ করা হয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্ণমালার স্বাভাবিক রূপ (যা অপরাপর রীতিতে ব্যবহার করা হয়) অবশিষ্ট থাকে না; বরং সেগুলোকে ভাঙা ভাঙা আকৃতির মনে হয়। এর বর্ণগুলো কচিৎ অসংলগ্ন থাকে। ডান দিকের অক্ষরকে কাগজ হতে কলম পৃথক না করে বামদিকের অক্ষরের সাথে যোগ করে দেওয়া হয় এবং আগাগোড়া লেখার কাজ সমাধা করা হয় (দ্র. চিত্র-৩১)।

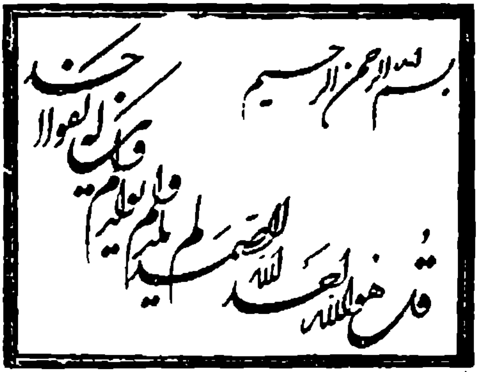

চিত্র-৩১: শিকাস্তা লিপি

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে বর্ণমালায় নুকতা বা স্বরচিহ্ন ব্যবহার করা হয় না। এ লিখনপদ্ধতিতে আলিফ, দাল, বা ও ওয়াওকে তাদের পরবর্তী অক্ষরের সাথে যোগ করে দেওয়া হয়। তাছাড়া বা, আইন, নুন, ইয়া এবং লাম-আলিফ বর্ণসমূহের আকৃতি প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু অবশিষ্ট অক্ষরগুলো নাস্তালিক পদ্ধতির বর্ণের ন্যায় ব্যবহৃত হয়।[৭০] এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে সাফাদি বলেন,

> Sikasteh is characterized by an exaggerated density, resulting from closely connected ligatures and very low and inclined verticals and also be the lack of vowel marks.[৭১]

শিকাস্তা লিপিরীতিতে বর্ণসমূহ অন্যান্য রীতির ন্যায় পরস্পরের সাথে সংযুক্ত নয়। উপরন্তু এর বিক্ষিপ্ত বর্ণসমূহ সমান্তরাল বা লম্বালম্বিভাবে বিন্যস্ত থাকে। মূলত এটি হচ্ছে ওপরের দিকে গতিশীল এক ধরনের ক্ষুদ্রাকৃতির লিখনরীতি। এ পদ্ধতির বর্ণসমূহের মাঝে একটির সাথে অপরটির সংযুক্তি তাকে লিপিশিল্পের যাবতীয় নিয়ম-প্রণালি থেকে আলাদা করে দিয়েছে, যেমন এর নুকতাশূন্যতা এর পঠনকে অতিশয় কষ্টসাধ্যে পরিণত করেছে।[৭২] এ লিপিতে বক্রাকার রেখা কলমের দ্রুত আঁচড়ে অবিন্যস্ত রেখামালায় পরিণত হয়। সুদক্ষ লিপিকার বর্ণগুলোর অংশবিশেষকে দ্রুত লিখনরীতি দ্বারা সুষমামণ্ডিত এক আলংকারিক লিপিতে পরিণত করেন। অবশ্যই পঠনের জন্য তা খুবই জটিল। সম্প্রতি উক্ত লিখনপদ্ধতিতে বেশ সংস্কার সাধন করা

www.pathagar.com

হয়েছে। ফলে এর পঠন-কষ্ট অনেকাংশে লাঘব হয়েছে (দ্র. চিত্র-৩২)। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ জাতীয় লিখনকে অমনোযোগিতার ফসল মনে করলে ভুল করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই পদ্ধতিতে লেখার কাজ সম্পন্ন করতে খুব আগ্রহ ও ধৈর্যের প্রয়োজন।

চিত্র-৩২: শিকাস্তা লিপি

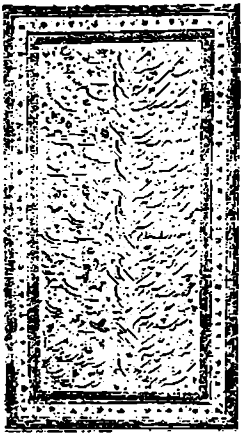

চিত্র-৩৩: শিকাস্তা, দরবেশ আবদুল মজিদ তালিকানি

শিকাস্তা লিপিরীতির খ্যাতনামা লিপিকার ছিলেন আবদুল মজিদ তালিকানি (দ্র. চিত্র-৩৩)। এ ছাড়া প্রসিদ্ধ লিপিকার ওয়ারিস আলী, ইস্পাহানের মুহাম্মদ রেযা ও মোগল ভারতে মুহাম্মদ শাহের আমলের প্রখ্যাত লিপিকার মুহাম্মদ সাদিক উক্ত রীতিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। মোগল ভারতে নওয়াব মুবিদ খানের শিকাস্তা লিপিকর্মও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (দ্র. চিত্র-৩৪)।

চিত্র-৩৪: শিকাস্তা, নওয়াব মুবিদ খান

পারস্যে সাফাভি আমলের শেষ ভাগে সপ্তদশ শতাব্দীতে এই লিখনপদ্ধতির বহুল প্রচলন ছিল। জটিলতা ও অসংলগ্ন রীতি সত্ত্বেও এ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শৈলীতে অতি দ্রুত লেখার কাজ শেষ করা যায়। এ কারণে বিচারালয়, সচিবালয় এবং ব্যক্তিগত ও

www.pathagar.com

ব্যাবসায়িক চিঠিপত্রে শিকাস্তা পদ্ধতিতে লেখার কাজ বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। সাধারণভাবে ফারসি ও উর্দু হস্তলিখনের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়।[৭৩] বর্তমানে এ লিপিরীতির গুণধর শিল্পী ওস্তাদ ইয়াদুল্লাহ কাবুলি খনসরির মাধ্যমে এ লিপিটি সুন্দরতম রূপে উপস্থাপিত হচ্ছে।

শিকাস্তা আমিয

'শিকাস্তা আমিয' শিকাস্তার একটি উপরীতি। এটি প্রায়শ অফিস-আদালতে ব্যবহার করা হয়। এর বর্ণসমূহ মূল রীতির বর্ণ অপেক্ষা দীর্ঘ এবং মাত্রাধিকভাবে অসংলগ্ন। সাধারণত শিকাস্তা আমিয রঙিন বা অলংকৃত কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়।[৭৪]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, মুসলমানদের পারস্য বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত পারস্যবাসীরা তাদের লিখন-কার্য সমাধাকল্পে কখনো কীলকাকৃতি লিপি, কখনো পাহলভি লিপি, আবার কখনো যন্দ লিপির শরণাপন্ন হলেও বিভিন্ন জটিলতা, ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার কারণে এসব লিখনপদ্ধতি তাদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়নি। ফলে তারা সহজ-সরল ও সাবলীল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ লিখনপদ্ধতি অনুসরণের অপেক্ষায় ছিল। আরবদের পারস্য-বিজয় তাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ সুগম করে দেয়। পারস্য সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব এবং ফারসি লিপির তুলনায় সহজ-সরল আরবি লিখনপদ্ধতি তাদের সুদীর্ঘ প্রায় ৩৬৫০ বছরের (৩০০০ খ্রি.পূ.-৬৫০ খ্রি.) অনুসৃত বিভিন্ন লিখনপদ্ধতিকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে। বিলুপ্ত প্রায় পাহলভি ভাষাকে জরথুস্ত্রীয় ধর্মশাস্ত্রের ভাষা হিসেবে টিকিয়ে রাখার ব্যর্থ প্রয়াসের ফলে আরবি ভাষার প্রত্যক্ষ প্রভাবে আধুনিক ফারসি ভাষা অস্তিত্ব লাভ করে। ফলে এ ভাষা আরবি লিপির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। অধিকন্তু, তারা আরবি লিপিকলায় সাবলীলতা ও গতিময়তা দান করে একে আরো আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে উপস্থাপন করে। এর পাশাপাশি তারা ফারসি লিপিশৈলীর উৎকর্ষ সাধনেও আত্মনিয়োগ করে। তালিক, নাস্তালিক ও শিকাস্তা প্রভৃতি ফারসি লিপিশৈলীর উৎপত্তি ও বিকাশ তাদের এই গভীর অভিনিবেশেরই বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং আমরা বলতে পারি, আরব ভূ-খণ্ডে আরবি লিপির সূচনা হলেও এটি সর্বাধিক লালিত্য, সুষমা ও গতিময়তা লাভ করে মুসলিম পারস্যে।

ফারসি বা ইরানীয় ভাষাসমূহে আরবি বর্ণমালার ব্যবহার

উল্লেখ্য যে, ফারসি বা ইরানীয় ভাষাসমূহ আর্য ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এ ভাষাগুলো পারস্য, আফগানিস্তান, কুর্দিস্তান, বেলুচিস্তান ও পামিরে প্রচলিত রয়েছে। আরবি বর্ণমালায় লিখিত এর উল্লেখযোগ্য ভাষাগুলো হলো :

১. আধুনিক ফারসি

'আধুনিক ফারসি' পারস্যে বহুল প্রচলিত একটি ভাষা। এটি ইরান ও আফগানিস্তানে সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি ১৮৩১ খ্রি. পর্যন্ত ভারতে ইংরেজ শাসনামলে মুসলমানদের সরকারি ভাষা ছিল। পরবর্তীকালে উর্দু ভাষা তার স্থান দখল করে নেয়।

তদুপরি মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু এলাকায় বর্তমান অবধি ফারসি সমাজের অভিজাতশ্রেণির লোকদের পত্র যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, পারস্যে ইসলাম প্রবেশের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে এ আধুনিক ফারসির প্রচলন হয়। ইতঃপূর্বে সাসানি যুগে সেখানে পাহলভি কিংবা মধ্যযুগীয় ফারসির প্রচলন ছিল। আধুনিক ফারসি মূলত বিপুল পরিমাণ আরবি শব্দের সমন্বয়ে পুরাতন পাহলভি ভাষার পরিবর্তিত রূপ। এতে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শব্দ আরবি। বস্তুত আধুনিক ফারসির জন্ম ও উৎকর্ষ সাধিত হয় ইসলামি আবহাওয়ায় ও পরিমণ্ডলে। কিন্তু গঠনপ্রণালি ও অন্যান্য দিক দিয়ে তা ইরানি ভাবধারায় সিক্ত। ফলে ইরানি বাক-বিন্যাস এবং মধ্যযুগীয় ফারসিতে ব্যবহৃত সহজ ও সরল শব্দগুলোই আধুনিক ফারসিতে অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান।

আধুনিক ফারসি অভ্যুদয়ের সূচনাকাল থেকেই আরবি বর্ণমালায় লিখিত হয়ে আসছে। সম্ভবত এ ভাষাই সর্বপ্রথমে আরবি বর্ণমালাকে স্বীয় বর্ণমালারূপে গ্রহণ করে। প্রাচীনতম ফারসি পাণ্ডুলিপিসমূহ থেকে জানা যায়, প্রথমদিকে এতে পরস্পর নিকটবর্তী ধ্বনিগুলোর মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখার এবং তদনুসারে এদের প্রত্যেক ধ্বনির জন্য স্বতন্ত্র বর্ণ লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়নি। তবে কিছুকাল পরে এতে আরবি ب, ذ , ج ও ك প্রভৃতি বর্ণসমূহে ঈষৎ পরিবর্তন সাধন করে আরবি বর্ণমালার সাথে ذوات النقط الثلاث (তিন নুকতাবিশিষ্ট) নামে পরিচিত আরো চারটি বর্ণ সংযোজন করা হয় এবং তা ফারসি ভাষার জন্য যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হয়। উক্ত বর্ণ চারটি হলো : ১. 'پ ',এটি ইংরেজি 'P' বর্ণের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ। ২. ' چ' , এটি বাংলা 'চ' (tch) বর্ণের মতো উচ্চারিত হয়। ৩.' ژ ', যা সিরীয় ও মাগরিবি ভাষায় ব্যবহৃত 'ج ' কিংবা ইংরেজি বর্ণ 'J' -এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। ৪. 'گ', যা ইংরেজি বর্ণ ' G ' কিংবা কায়রোতে ব্যবহৃত বাহরাইনবাসীদের 'ج' বর্ণের ন্যায় উচ্চারিত হয়। এভাবে আরবি বর্ণমালার ২৮টি বর্ণের সাথে উক্ত বর্ণগুলো যুক্ত হয়ে ফারসি বর্ণমালায় বর্ণের সংখ্যা দাড়াঁয় বত্রিশে। উক্ত চারটিতে যদিও নুকতার ব্যবহার প্রসার লাভ করে, কিন্তু তা নিয়মতান্ত্রিক ও স্থায়ী ছিল না। কোনো কোনো সময় তাতে নুকতা প্রদান না করেও ঠিকভাবে বর্ণগুলো উচ্চারণ করা হতো।[৭৫] আবার অনেকে ফারসিতে ব্যবহৃত আরবি আলিফ মাম্দুদাহ (آ) -কে একটি স্বতন্ত্র বর্ণের মর্যাদা দানের পক্ষপাতী। কারণ আরবিতে এর উচ্চারণ দীর্ঘস্বরে বাংলা বর্ণ 'আ' -এর মতো হলেও ফারসিতে এর উচ্চারণ বাংলা বর্ণ 'অ'-এর মতো হয়ে থাকে।

২. আফগানি বা পশতু ভাষা

এটি 'পখতু ভাষা' নামেও পরিচিত। এটি আফগানিস্তানের বহুল প্রচলিত ভাষা। এটি নাসখি বর্ণমালার অনুকরণে লিপিবদ্ধ করা হয়। এ ভাষার বর্ণের সংখ্যা আরবি বর্ণমালায় লিখিত ফারসি ও অপরাপর ভাষার বর্ণের চাইতে বেশি। এ ভাষায় বিপুল পরিমাণ ফারসি ও আরবি শব্দ প্রবেশ করেছে। তুলনামূলকভাবে কান্দাহার এলাকার লোকেরা এ ভাষায় বিশুদ্ধরূপে কথা বলে। গদ্য ও পদ্যে লিখিত এ ভাষার প্রচুর রচনা

www.pathagar.com

রয়েছে। খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে আফগানি ভাষায় সাহিত্যের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু এর পর আফগানিদের মধ্যে অনেক সৃজনশীল কবির জন্ম হয়, যারা পারস্য কবিদের অনুকরণ করে কবিতা রচনা করত। তাই খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বেকার আফগানিদের ভাষার ইতিহাস জানা দুরূহ ব্যাপার। এ কারণে কখন থেকে আফগানি ভাষা আরবি বর্ণমালায় লিখিত হয়ে আসছে তা সঠিক করে বলা কঠিন। যা হোক, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আরবদের আফগান বিজয় এবং আফগান অধিবাসীদের মধ্যে ইসলামের বিস্তারের পরেই আফগানি ভাষা আরবি বর্ণমালায় লেখার ধারা শুরু হয়। তবে তাও কয়েক শতাব্দী কাল থেকে।

আফগানরা আরবি বর্ণমালার সাথে তাদের ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের আলোকে আরো ১২টি বর্ণ সংযোজন করে। এগুলো হলো :

১. ٹ অর্থাৎ নিচে বৃত্তযুক্ত 'তা'। এটি দ্বিত্ব 'তা' (tt)-এর মতো উচ্চারিত হয়।

২. ځ অর্থাৎ উপরে দু বিন্দুবিশিষ্ট 'হা'। এটি تز - tz অথবা تس - ts -এর মতো উচ্চারিত হয়।

৩. څ অর্থাৎ উপরে তিন বিন্দুবিশিষ্ট 'হা'। এটি دز - dz অথবা دس - ds -এর মতো উচ্চারিত হয়।

৪. ډ অর্থাৎ নিচে বৃত্তযুক্ত 'দাল'। এটি দ্বিত্ব 'দাল' (dd)-এর মতো উচ্চারিত হয়।

৫. ړ অর্থাৎ নিচে বৃত্তযুক্ত 'রা'। এটি দ্বিত্ব 'রা' (rr)-এর মতো উচ্চারিত হয়।

৬. ږ অর্থাৎ দুই বিন্দুবিশিষ্ট 'যা', তন্মধ্যে একটি উপরে, আর একটি নিচে। এটি شز jz-এর মতো উচ্চারিত হয়।

৭. ښ অর্থাৎ দুই বিন্দুবিশিষ্ট 'সিন', তন্মধ্যে একটি উপরে, আর একটি নিচে। এটি আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ش-এর মতো এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে خ-এর মতো উচ্চারিত হয়। এ কারণে আফগানি ভাষাকে আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমের শহর কান্দাহারে পশতু আর আফগানিস্তানের উত্তর-পশ্চিমের শহর পেশাওয়ারে 'পখতু' নামে অভিহিত করা হয়।

৮. ڼ অর্থাৎ নিচে বৃত্তযুক্ত 'নুন'। এটি দ্বিত্ব 'রা' ও 'নুন' (rn)-এর মতো উচ্চারিত হয়।

অবশিষ্ট চারটি বর্ণ হলো ফারসি ভাষার নতুন চারটি বর্ণ। এসব মিলিয়ে আফগানি ভাষার বর্ণমালার সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০।[৭৬]

পামেরিয়ান উপভাষাসমূহ ব্যবহারকারী লোকেরা লেখার ক্ষেত্রে আরবি বর্ণমালায় আফগানি ভাষা ব্যবহার করে থাকে। সাধারণত তারা তাদের উপভাষাসমূহ লিখত না।[৭৭]

www.pathagar.com

৩. কুর্দি ভাষা

কুর্দি ভাষা কুর্দি অঞ্চলের বহুল ব্যবহৃত ভাষা। এর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আঞ্চলিক উপভাষা রয়েছে। তন্মধ্যে পারস্যে প্রচলিত কুর্দি-ফারসি উপভাষাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুর্দি ভাষায় স্থানভেদে বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন অনেক শব্দ যেগুলো এক অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়, দেখা যায় এগুলো অন্য অঞ্চলে হয়তো একেবারে ব্যবহৃতই হয় না অথবা ব্যবহৃত হয়; তবে পরিবর্তিত রূপে বা ভিন্ন অর্থে। এ ভাষায় আরবি, ফারসি ও তুর্কি ভাষাসমূহের প্রচুর পরিমাণ শব্দ ও বাগধারা অনুপ্রবেশ করেছে। তবে এতে ফারসি শব্দসমূহের তুলনায় আরবি ভাষার শব্দ অনেক বেশি। আর তুর্কি শব্দ আরবি ও ফারসি শব্দগুলোর চাইতে অপেক্ষাকৃত কম। তাছাড়া উপর্যুক্ত তিনটি ভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষারও অল্প কিছু শব্দ তাতে প্রবেশ করেছে।[৭৮]

কুর্দিরা দীর্ঘদিন থেকে আরবি বর্ণমালায় তাদের ভাষা লিখে আসছে। যিয়াউদ্দীন পাশা খালিদি বলেন, "আমরা কুর্দিদের স্বতন্ত্র কোনো লিপিশৈলী দেখতে পাইনি; বরং তারা যা লিখতে চায়, তা-ই দীর্ঘদিন থেকে আরবি লিপিরীতি অনুকরণ করে লেখে।" কুর্দিরা আরবি বর্ণমালার সাথে নিজেদের ভাষার বৈশিষ্ট্যের আলোকে অতিরিক্ত পাঁচটি বর্ণ সংযোজন করেছে। এগুলো হলো : ڤ অর্থাৎ তিন বিন্দুবিশিষ্ট 'ফা'। এটি ইংরেজি বর্ণ v -এর সাথে সাদৃশ্য রাখে। অবশিষ্ট চারটি বর্ণ হলো ইতঃপূর্বে উল্লিখিত ফারসি ভাষার নতুন চারটি বর্ণ। যিয়াউদ্দীন পাশা খালিদি আরো বলেন, "আরবি ভাষায় এমন কিছু বর্ণ রয়েছে, যা কুর্দি ভাষায় পাওয়া যায় না। এ ধরনের বর্ণ হলো তিনটি। যথা: ث ذ ض । অবশিষ্ট আরবি বর্ণগুলো কুর্দি ভাষায়ও রয়েছে। তবে ظ বর্ণটি তারা আরবদের মতো উচ্চারণ করে না; বরং সর্বসাধারণের মতো উচ্চারণ করে। অর্থাৎ জিহ্বাকে দন্তরাজির মাঝখান থেকে বের না করেই উচ্চারণ করে থাকে।"[৭৯]

৪. বেলুচি ভাষা

বেলুচি ভাষা বেলুচিস্তান ও মাকরানে বহুল ব্যবহৃত ভাষা। এটি আধুনিক ফারসি এবং কোনো কোনো কুর্দি উপভাষার একেবারে কাছাকাছি ভাষা। এতে অন্যান্য ভাষার প্রচুর পরিমাণ শব্দ রয়েছে। বিশেষ করে এর ধর্মীয় শব্দগুলো আরবি ভাষা থেকে এবং ব্যবসাবাণিজ্য, বিভিন্ন পেশা ও বৃত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট শব্দগুলো ভারতীয় ভাষাসমূহ থেকে অনুপ্রবেশ করেছে।

বেলুচি ভাষার বর্ণমালায়ও তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অতিরিক্ত সাতটি বর্ণ সংযোজিত হয়েছে। এগুলো হলো : ফারসি ভাষার নতুন চারটি বর্ণ। অপর তিনটি বর্ণ হলো হিন্দি বা ভারতীয়। এগুলো হলো : ১. ٹ অর্থাৎ উপরে চার নুকতাবিশিষ্ট 'তা'। এটি ت ও ط-এর মধ্যবর্তী স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। ২. ڈ অর্থাৎ উপরে চার নুকতাবিশিষ্ট 'দাল'। এটি د ও ض-এর মধ্যবর্তী স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। ৩. ڑ অর্থাৎ উপরে চার নুকতাবিশিষ্ট 'রা'। এটি ر ও غ -এর মধ্যবর্তী স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। এগুলো চার বিন্দুবিশিষ্ট বর্ণ নামে পরিচিত। আবার কেউ কেউ উপর্যুক্ত বর্ণগুলোতে চার বিন্দুর পরিবর্তে ط কিংবা ء -এর মতো একটি চিহ্ন বসিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১ 'পারস্যে আরবি লিপির প্রচলন' শীর্ষক এ অধ্যায়টি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকায় (বর্ষ: ৩৭, সংখ্যা: ১) আমার ও আ.ক.ম. আবদুল কাদেরের যৌথ নামে প্রকাশিত 'ফারসি লিপিকলা : উৎপত্তি ও বিকাশ' শীর্ষক প্রবন্ধের পরিমার্জিত ও বর্ধিত রূপ।

২ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬২।

৩ আবদুস সাত্তার, *ফারসি সাহিত্যের কালক্রম*, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮৭, পৃ ১।

৪ *Persian Art*, Edited by Sir E. Denisan Ross. P -3.

৫ মনি জরথুস্ত্র ধর্মের পূর্বে ম্যানিকিয়ান ধর্মমতের প্রবর্তক ছিলেন। তিনি সম্ভবত পারস্যে খ্রিষ্টীয় ২৭৩-২৭৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সম্ভবত একজন মাজি সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মগুরু ছিলেন, যিনি একটি নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। শুভ ও অশুভ-এর মতো নৈতিক ভাবধারায় পুষ্ট ছিল এই ধর্ম। মনি সম্প্রদায় ইসলামের ইতিহাসে জিন্দিক নামে পরিচিত। ইসলামবিরোধী ধর্মমত প্রচারণার জন্য তাদের ধর্মীয় মতবাদকে আল-মাহদি ৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং আলেপ্পোতে অনেক মনিপন্থিদের ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করেন।

৬ জিয়াউদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪-৫।

৭ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৫।

৮ Browne, E.G., *A Literary History of Persia*, London, 1906, vol.1, P -36

৯ কৃষ্টানসেন, অর্থার, *ইরান ব-'আহদে সাসানিয়া*, ড. মুহাম্মদ ইকবাল অনূদিত, উর্দু সংস্করণ, দিল্লী: আঞ্জুমনে তরক্কী-এ-উর্দু, ১৯৪১, পৃ ৫০; Levy, Reuben. *An Introduction to Persian Literature*, U.S.A., 1969, P 2.

১০ কৃষ্টানসেন, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬; হিলালী, শেখ গোলাম মকসূদ, *ইরান ও ইসলাম*, মুহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন অনূদিত, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৯, পৃ ১৮৪।

১১ নকশে রুস্তম: পারস্য সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। কায়ানি যুগের বীর রুস্তম এখানে বিশাল বিশাল আকৃতির বহু পাথর একত্রিত করে তার ওপর বিভিন্ন শিলালিপি তৈরি করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে এ স্থানটি 'নকশে রুস্তম' হিসেবে পরিচিত হয়।

১২ নূরুল হুদা, মোঃ, *ইসলাম-পূর্ব ইরানি সাহিত্য*, নিউজ লেটার, ৯ম সংখ্যা, ১৮তম বর্ষ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, সাংস্কৃতিক বিভাগ, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, বাংলাদেশ, পৃ ৫৩-৫৪।

১৩ অধ্যাপক ব্রাউন লিখেছেন, পাহলভি ভাষা পারথীয়া বা পার্থুদের ভাষা ছিল। যখন আশকানিরা গ্রিকদের পরাজিত করল, তখন তারা পার্থু শব্দকে পরিবর্তন করল। আশকানিরা পার্থু (پرتو) শব্দের 'রা' বর্ণটি 'হাতে এবং 'তা' বর্ণটিকে 'লাম'-এ পরিবর্তন করে পাহলু (پهلو) শব্দ গঠন করে এবং জাতিগত সম্পর্কের জন্য 'ইয়া' বর্ণ পাহলু শব্দের শেষে যোগ করে পাহলভি গঠন করে।

১৪ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৫।

১৫ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৩৬।

১৬ কৃষ্টানসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৫১; হিলালী, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৮৫; Brown, *op. cit.* P 75-76.

১৭ Levy, *op. cit.*, P 5-6.

১৮ নূরুল হুদা, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪।

১৯ মাসিক হুনর ও মর্দুম, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৬ ; হিলালী, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৮৬-১৮৭।

২০ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৯৭; Levy, *op. cit.*, P15.

www.pathagar.com

২১ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৩১; Levy, *op. cit.*, P15.
২২ *হুনর ও মর্দুম*, ৭২তম সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৬৮, পৃ ২৮; Levy, *op. cit.*, P. 5, 15.
২৩ Levy, *op. cit.*, P 2.
২৪ Levy, *op. cit.*, P 21-22.
২৫ হিলালী, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৯০।
২৬ *মাসিক হুনর ও মর্দুম*, ২৮ তম সংখ্যা, বাহমন, ১৩৪৩, ইনতিশারাতে ওযারাতে ফারহাঙ্গ ও হুনর, তেহরান, ইরান, পৃ ১৬।
২৭ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৯৫।
২৮ Safadi, *op. cit.*, P 12.
২৯ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৯৫।
৩০ উবাদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪-৬৫।
৩১ *হুনর ও মর্দুম*, সংখ্যা-৭২, পৃ ৩১।
৩২ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৯৬; উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬৩।
৩৩ Safadi, *op.cit.* P 27; উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬৩, ২০।
৩৪ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬৩।
৩৫ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৯৭।
৩৬ Abul Fadl, *Ain-Akbari*, vol.-1, Eng. tran.: H. Bluclaaman, Calcutta 1873,P 101; ইয়াকুব আলী, *মুসলিম মুদ্রা*, পৃ ৩১৪।
৩৭ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬৩.
৩৮ Safadi, *op.cit.*, P -27.
৩৯ *Ibid.*
৪০ এম. জিয়াউদ্দীন '*A Monograph on Muslem Calligraphy*' গ্রন্থে এবং রিফা'ঈ '*তারীখুল খাত্তিল 'আরবি*' গ্রন্থে একে নাস্তালিক রীতির সর্বপ্রাচীন লিপি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
৪১ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬৪।
৪২ রাহপেইমা, গোলাম রেযা, ইসলামি সংস্কৃতির উৎকর্ষ বিধানে হস্তলিপি শিল্পের ভূমিকা, *নিউজ লেটার*, প্রাগুক্ত, বর্ষ-২৫, সংখ্যা-১১-১২, নভেম্বর-ডিসেম্বর২০০৩, পৃ ৪১।
৪৩ Safadi, *op.cit.*, P - 27.
৪৪ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৯৬।
৪৫ *হুনর ও মর্দুম*, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১; ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩২২।
৪৬ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬৫; *হুনর ও মর্দুম*, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১।
৪৭ *হুনর ও মর্দুম*, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১।
৪৮ Qadi Ahmad, *Gulistan-i- Hunar*. Eng. Tran. Entitled: Calligraphers and Painters, T. Minnorsky, Washington, 1959, P. 116; Mustafizur Rahman, *op. cit.*, P -9; ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩১৪-৫।
৪৯ Ziauddin, M.A., *A Monograph on Muslem Calligraphy*, Visva Bharti studies, Calcutta, 1969, P-42.
৫০ ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩১৪.
৫১ Safadi, *op.cit.*, P -28; Ziauddin, *op.cit.*, P-42.
৫২ Ziauddin, *op.cit.*, P -42.

www.pathagar.com

৫৩ Safadi, *op.cit.*, P- 28.

৫৪ এর কারণ, আরবিতে উসমানি লিখনপদ্ধতি (الخط العثماني) ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতিতে কুরআন লেখা জায়িজ নয়। তাছাড়া যে-সব ভাষায় উসমানি লিখনপদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে যেমন—ফারসি ও উর্দু প্রভৃতি ভাষার বর্ণে কুরআন লেখার ক্ষেত্রে আলিমদের মতানৈক্য রয়েছে। এ বিষয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো— এ সকল ভাষার বর্ণে পুরো কুরআন লেখা না-জায়িজ। তবে কখনো কখনো দু এক আয়াত লেখা হলে তাতে অসুবিধে নেই। মোট কথা, কুরআন শুধু উসমানি লিখনপদ্ধতি অনুসরণ করেই লিখতে হবে। তবে অনুবাদ ও তাফসির অন্য ভাষায় লেখতে কোনো অসুবিধে নেই। (থানবি, মাওলানা আশরাফ আলী, *ইমদাদুল ফাতাওয়া*, করাচি: মাকতাবা দারুল উলুম, খ ৪, পৃ ৪৪, 'উসমান, যফর আহমদ ও আবদুল করিম, মুফতি, *ইমদাদুল আহকাম*, করাচি : মাকতাবা দারুল উলুম, খ ১, পৃ ২৪০-২৪১)।

৫৫ Ziauddin, *op.cit.*, P -42.

৫৬ Safadi, *op.cit.*, p 28.

৫৭ Ziauddin, *op.cit.*, p 33.

৫৮ Safadi, *op.cit.*, p 29.

৫৯ সিদ্দিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৮৩, ১৮৫ ও ১৯২।

৬০ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৫৫-৫৬; M. Rahman, *op.cit.*, p 92.

৬১ সিদ্দিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৮৫।

৬২ সিদ্দিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৮৪।

৬৩ ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩২৫; Ziauddin, *op.cit.*, p 37.

৬৪ ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩২৫; Ziauddin, *op.cit.*, p 37.

৬৫ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৯৭; উবাদা, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬৬।

৬৬ Safadi, *op.cit.*, p 30; Ziauddin, *op.cit.*, p 44.

৬৭ Safadi, *op.cit.*, p 30.

৬৮ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১০১।

৬৯ *প্রাগুক্ত।*

৭০ M. Rahman, *op.cit.*, p. 9; ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩২৫।

৭১ Safadi, *op.cit.*, p. 30.

৭২ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬৫।

৭৩ Safadi, *op.cit.*, p. 30; Ziauddin, *op.cit.*, p.42.

৭৪ Safadi, *op.cit.*, p. 30.

৭৫ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬২-৬৪।

৭৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬৮।

৭৭ *প্রাগুক্ত*।

৭৮ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬৯

৭৯ *প্রাগুক্ত*।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়
মাগরিবে আরবি লিপির প্রচলন

মাগরিব[1] যুগে যুগে ইসলামি সভ্যতার ঐতিহাসিক ক্রমোন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শিল্পকলায় এখানে একটা পৃথক ঐতিহ্যমণ্ডিত ধারা ও আবহ গড়ে উঠেছিল। বিশেষ করে আরবি লিপি এখানে যথেষ্ট গুরুত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের অভিরুচি, শিল্প-সৌকর্য ও অভিজ্ঞতার আলোকে আরবি লিপি এখানে নতুন রূপে বিকশিত হয়।

মাগরিবে কুফি লিপি থেকে এক ধরনের নতুন লিখনরীতির উদ্ভব হয়, যা কুফির মতো এত খাড়াখাড়াও নয়। আবার নাসখের মতো এত গোল ঢেউ খেলানোও নয়। একে তারা 'মাগরিবি লিপিরীতি' নামে অভিহিত করত।[2] এ লিপিরীতি আরবি লিপির একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীনতম প্রকরণ। এখনও মাগরিবে লেখার কাজে এই মাগরিবি লিপিই ব্যবহার করা হয়। মধ্যযুগে মুসলিম স্পেনেও এ লিপিরীতি বহুলভাবে অনুসৃত হতো (দ্র. চিত্র-১)।

চিত্র-১: মাগরিবি লিপি

এ লিপি আন্দালুসের কসরুল হামরা থেকে গৃহীত। এর মূল বচন হলো:

يا وارث الأنصار لا عن كلالة تراث جلال تستخف الرواسيا

কায়রোয়ানকে 'মাগরিবি লিপি'র উন্নয়নের ভিত্তিভূমি ধরা হয়।[3] এ কারণে মাগরিবি লিপিকে কায়রোয়ানের দিকে সম্বন্ধ করে 'কায়রোয়ানি লিপি' নামেও অভিহিত করা হয়। এ লিপির প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শন ৯১২ খ্রিষ্টাব্দে উৎকীর্ণ।[4] এ লিপি মূলত কুফি লিপির একটি প্রকরণ, যা 'ওয়েস্টার্ন কুফিক' নামে পরিচিত। এটি প্রাচীন কুফি লিপির কৌণিক এবং আয়তাকার কুফি লিপির সমন্বয়ে বিকাশ ঘটে। তাছাড়া এতে বক্র ও অর্ধ গোলাকার কুফি লিপিরও প্রভাব রয়েছে।

ইবনু মুকলার মানসুব পদ্ধতি মাগরিবি লিপির কোনো কাজে লাগতে দেখা যায়নি। অন্যান্য পদ্ধতিও এতে প্রয়োগ হয়নি। ওয়েস্টার্ন কুফিক লিপি কোনো নিয়ম না মেনে সরাসরি স্টান্ডার্ড কুফিক থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, যদিও ইবনু মুকলার মানসুব পদ্ধতি ও ইস্টার্ন কারসিভ লিপির কোনো অংশ সুচিন্তিত বা পরিকল্পিতভাবে গৃহীত হয়নি; তবুও আন্দালুসে সীমিত পরিসরে হলেও সুলুস ও নাসখি লিপির একটা ধারা গড়ে উঠেছিল।

www.pathagar.com

মাগরিবি লিপির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, হরফে হরফে সন্নিবদ্ধতা, শব্দে শব্দে যোগসূত্র এবং বাক্যের মাঝে যে স্বচ্ছন্দ বন্ধন তা একে ব্যতিক্রম করে উপস্থাপন করেছে। এ লিপিতে হরফের উল্লম্ব রেখাগুলো সামান্য হেলে থাকে। যেমন ط, ظ ও ك প্রভৃতি হরফ।[৫]

কুফি লিপিতে মাগরিবি লিপির অলংকরণ ও শৈল্পিক ব্যবহার লক্ষণীয়। কুফি লিপির শিরোনামে বিশেষভাবে এ লিপি ব্যবহার করা হতো। লেখার উপকরণ যেমন- কাগজ, কালি প্রভৃতি মাগরিবি লিপির ক্ষেত্রে বেশ বৈচিত্র্য দেখা যায়। কাগজের মাপ, ধরন, কালির ভিন্নতা এ বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলত। এজন্য বিভিন্ন পরিমাপের লেখা ও কালির ব্যবহার এ লিপিতে উৎকর্ষ এনে দেয়। একটা কথা না বললেই নয়, সাধারণ লেখার জন্য যেমন সাধারণ কাগজ-কালি হলেই হয়, তেমনি মাগরিবি লিপির জন্য বিশেষ ধরনের কাগজ প্রস্তুত এবং দীর্ঘ সময় ধরে এর ওপর ক্যালিগ্রাফি করতে হতো। ১৮ শতক পর্যন্তও এ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল।

যদিও কায়রোয়ানে প্রথম মাগরিবি লিপির গোড়াপত্তন হয়; তথাপি খুব অল্প সময়ের মধ্যে এ লিপি উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা এবং মুসলিম স্পেনে ব্যাপকভাবে প্রসার ও প্রতিষ্ঠা পায়। আর সাধারণ্যে প্রচুর খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতাও লাভ করে। বিচিত্র ধারাসমূহের সৃষ্টি, যদিও মূল স্টাইলকে ঠিক রেখে সামান্য ভিন্নতা আসে এ লিপিগুলোতে, ফলে মাগরিবি লিপির একটি পরিবার গড়ে ওঠে সেখানে।

মাগরিবি লিপির ধারাসমূহ

একটা পর্যায়ে এসে মাগরিবি লিপি কায়রোয়ানি, আন্দালুসি, ফেজি ও সুদানি প্রভৃতি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে।

ক. কায়রোয়ানি লিপিরীতি

এটি বর্তমান তিউনিসিয়ার কায়রোয়ানে বহুল প্রচলিত লিপি। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এটিই ছিল মাগরিবের প্রাথমিক পর্যায়ের লিপি।[৬] এ ধারাটি স্মারকলিপি হিসেবেও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ লিপির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো— বর্ণগুলো লম্বা টান যোগে লিপিবদ্ধ করা হয়[৭] (দ্র. চিত্র-২)।

চিত্র-২: কায়রোয়ানি লিপিরীতিতে লিখিত কুরআনের একটি পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

খ. আন্দালুসি লিপিরীতি

আন্দালুসে মাগরিবি লিপিশৈলী এক নতুন ধরনের পরিচয় ও রূপ লাভ করে। মাগরিবের রাজধানী কায়রোয়ান থেকে আন্দালুসে স্থানান্তরিত হওয়ার পর এখানে আরবি কুফিরীতি থেকে এক ধরনের নতুন ধনুকাকৃতির লিপিশৈলীর উদ্ভব ঘটে। এটি 'আন্দালুসীয়' কিংবা 'কুরতুবি' লিপি নামে পরিচিতি লাভ করে[৮] (চিত্র-৩)। এটি কায়রোয়ানি লিপিরীতি যা সর্বদা লম্বা লম্বা টান যোগে লিপিবদ্ধ করা হয়, তার চেয়ে একটু ভিন্ন। এটি দেখতে অনেকখানি গোলাকার মনে হয়।[৯]

চিত্র-৩: আন্দালুসীয় কিংবা কুরতুবি লিপি

আন্দালুসি লিপিরীতিতে বর্ণ-বাক্য-শব্দের মধ্যে একটা গভীর সন্নিবদ্ধতা রাখা হয়। বহিঃরেখাগুলো সূক্ষ্ম ও সাবলীল করে দেওয়া হতো। খলিল পদ্ধতি, আবুল আসওয়াদ পদ্ধতি সাধারণত এ ধারায় উপস্থাপিত হয়েছে। এতে রঙিন ফোটা, নুকতা, জের, জবর, পেশ, মাদ্দাহ ও হামযা প্রভৃতি ব্যবহার করা হতো। মুসলিম স্পেনের কর্ডোবায় এটি একটি জনপ্রিয় লিপি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মরক্কোতেও এর প্রসার ঘটে এবং ফেজি ধারা কর্তৃক প্রভাবিত হয়। পরে এটি ইবেরিয়ান উপদ্বীপ ও অন্যান্য ভূখণ্ডেও ছড়িয়ে পড়ে। মরক্কোতে এসে এ ধারা প্রাকৃতিকভাবে যেন একটি ধারায় রূপান্তরিত হয়। ঐতিহাসিক ইবনু খালদুন বলেন,

> আরব সাম্রাজ্যের পতন এবং এর পরবর্তী বার্বারদের আধিপত্য শিথিল হয়ে পড়ায় আন্দালুসবাসীরা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষভাবে তাদের ওপর খ্রিষ্টান জাতিগুলোর আধিপত্য বিস্তৃত হলে তারা মাগরিব ও আফ্রিকার সমুদ্র তীরে চলে যায়। এর ফলে এ সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের শিল্পকলার দ্বারা প্রভাবিত হবার সুযোগ লাভ করে এবং তারাও বিভিন্ন সাম্রাজ্যের আশ্রয়ে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এর

www.pathagar.com

ফলে তাদের লিপি আফ্রিকার লিপির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হয় এবং ক্রমশ তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কায়রোয়ান ও মাহদিয়া নগরের সংস্কৃতি ও শিল্পকলার বিস্তৃতির সাথে সাথে তাদের লিপিও বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। সুতরাং তিউনিসকে কেন্দ্র করে তার সন্নিহিত সমুদয় আফ্রিকায় আন্দালুসি লিপিই প্রাধান্য বিস্তার লাভ করল।[১০] এভাবে আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে আন্দালুসি লিপির একটি শোভন সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছিল। কিন্তু পরে মুওয়াহ্হিদিয়া সাম্রাজ্যের ছত্রছায়া কতেকাংশে খণ্ডিত হয়ে পড়লে এবং জনবসতির হ্রাস প্রাপ্তিতে নগর সংস্কৃতি ও বিলাস-ব্যসনে ভাটা দেখা দিলে লিপির অবস্থাও শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায় এবং এর চর্চাও কমে যায়। শুধু সেখানে আন্দালুসি লিপির কয়েকটি নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে, যা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, এক সময়ে সেখানে তার অপ্রতিহত প্রভাব বিদ্যমান ছিল।[১১]

গ. ফেজি লিপিরীতি

আন্দালুসের পর ফেজই হলো মাগরিবের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চার তৃতীয় প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। কায়রোয়ানি লিপি থেকে এখানে যে লিখনরীতিটি সামান্য পরিবর্তন ও সংস্কারসহ উৎপত্তি লাভ করে, তাকে শহরটির দিকে সম্বন্ধ করে 'ফেজি লিপিরীতি' নামে অভিহিত করা হয়। এতে বর্ণ ও লিখনরীতি আয়তাকার ও মাঝারি গড়নের এবং তা চামড়ায় তৈরি কাগজে লেখা হতো। এটা পরবর্তীকালে নাসখি ধারাতে রূপান্তরিত হয় এবং উল্লম্ব রেখাগুলো খাটো করে লেখা হয়। কুরআন শরিফ কপি করতে এ লিপির ব্যাপক ব্যবহার স্বীকৃত।

ফেজিধারা কম সন্নিবদ্ধ ও বড়ো বড়ো হরফে লেখা হয়। তদুপরি হরফগুলো কিছুটা ফাঁকা ফাঁকা দেখা যায়। এ ধারাকে সাধারণত মাগরিবি লিপি বলা হতো। এ ধারাই পরে জ্যামিতিক নকশা, ফুলেল অলংকরণ ও স্মারক লিপিতে উন্নীত হয়।

ঘ. সুদানি লিপিরীতি

সুদানের মুসলমানগণও ইসলামি শিল্প ও হস্তলিপি কলায় নিজস্ব কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। শেখ উসমানের আমলে আরবি লিপিশিল্পীগণ রাষ্ট্রীয় উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। সুদানি ধারার প্রথম উন্নয়ন হয় চিমবাকটুতে।[১২] এ কারণে এ লিপিরীতিকে সুদানি লিপিরীতির পাশাপাশি 'চিমবাকটু লিপিরীতি' নামেও অভিহিত করা হয়।[১৩] সুদানি শব্দটি 'বিলাদুস সুদান' অর্থাৎ 'কালো আফ্রিকানদের ভূমি' টার্ম থেকে নেওয়া হয়েছে। 'বিলাদুস সুদান'কে মৌরিতানিয়া থেকে সুদান পর্যন্ত ইসলামিক বেল্ট হিসেবে ধরা হতো। এ অঞ্চলের বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার হাউদাস ও ফুলানিস এবং অন্য ক্যালিগ্রাফারগণ সাহারার উপ-আঞ্চলিক ক্যালিগ্রাফি হিসেবে এ লিপিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এমনকি, এ লিপি সুদূর দক্ষিণে নাইজেরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এ লিপি পরবর্তীকালে গণলিপি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এর লাইনগুলো মোটা এবং হরফগুলো পরস্পর সন্নিবদ্ধ। আবার কোথাও কোথাও তা অসামঞ্জস্যপূর্ণ। একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এর কোনো সুশৃঙ্খল নীতিমালা এবং লেখার নিয়ম-কানুন ছিল না। যেজন্য সত্যিকার দৃষ্টিনন্দন ক্যালিগ্রাফি হতে পারেনি এটি। শেষ পর্যন্ত হরফের স্বল্প আঁচড়গুলো এলোমেলো হয়ে পড়েছিল।

www.pathagar.com

নিম্নে কায়রোয়ানি লিপির দুটি উপরীতি : সেনেগালি ও সুদানির লিপিচিত্র দেওয়া হলো:

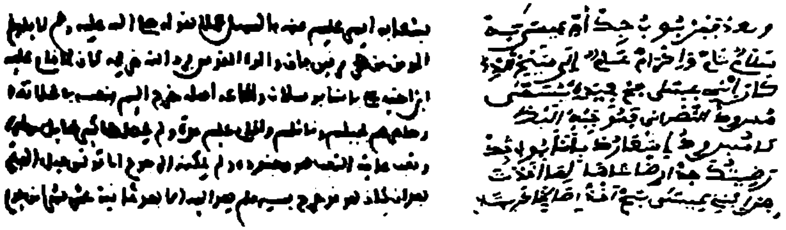

চিত্র-৪: কায়রোয়ানি লিপি : সেনেগালি ও সুদানি

তবে এ কথা বলা যায় যে, সার্থক উত্তর-পশ্চিম মাগরিবি লিপি হিসেবে আন্দালুসি এবং ফেজি লিপির সংমিশ্রণে যে লিপির উদ্ভব হয়, সেটাই উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি পায়। আর মাত্র সুদানি লিপি পশ্চিম আফ্রিকার মুসলিম দেশসমূহে সাহারার উপ-আঞ্চলিক লিপি হিসেবে পৃথকভাবে উন্নতি লাভ করতে থাকে এবং আরবি বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হতে থাকে।[১৪]

বর্তমানে প্রচলিত মাগরিবি লিপিরীতিসমূহ

বর্তমানে আফ্রিকায় মাগরিবি লিপির চারটি প্রকরণ দেখা যায়।[১৫] এগুলো হলো:

ক. তিউনিসি লিপিরীতি

তিউনিসি লিপি মূলত প্রাচ্যীয় লিপির মতোই। তবে এতে ফা ও কাফের নুকতা প্রদানের ক্ষেত্রে মাগরিবি লিপিরীতির ধারা অনুসরণ করা হয়। উল্লেখ্য, মাগরিববাসীরা ف ও ق বর্ণদুটি একই আকৃতিতে লিখে থাকে। তারা ق কেও ف-এর আকৃতিতে লিখে। তবে এর নুকতাটি ف-এর নিচে ڢ এভাবে প্রদান করা হয়।[১৬]

খ. আলজেরীয় লিপিরীতি

আলজেরীয় লিপিরীতিটি সাধারণত সুতীক্ষ্ণ ও কৌণিক। এর পাঠোদ্ধার অনেক সময় কষ্টকর হয়ে পড়ে।

গ. ফেজি লিপিরীতি

ফেজি লিপিরীতির গোলাকার দিকটি তাকে সুস্পষ্টভাবে অন্যান্য মাগরিবি লিপিরীতি থেকে বিশেষত্ব দান করেছে।

ঘ. সুদানি লিপিরীতি

সুদানি লিপিরীতি সাধারণত মোটা ও স্থূল প্রকৃতির। সচরাচর এটি গোলাকৃতির চাইতে অধিকতর কৌণিকাকৃতির হয়ে থাকে। খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে যখন মধ্য আফ্রিকায় কাফ্রি জাতিগুলো, বিশেষ করে হাওসিদের মধ্যে ইসলামের বিস্তার ও প্রসার ঘটতে থাকে, তখন থেকে এ লিপি চতুর্দিকে প্রভূত বিস্তার লাভ করে। পশ্চিমদিকে এটি আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এখানে ল্যাগুস (Lagos) নগর ইসলামের নতুন কেন্দ্রে পরিণত হয়। পূর্বদিকে এটি ওয়াদাই শহর পর্যন্ত পৌঁছে, যেখানে এসে এটি মিসরের নাসখি লিপির সাথে মিলিত হয়।[১৭]

www.pathagar.com

আলজেরীয় ও মরক্কোবাসীরা বর্তমানে আরবদের ব্যবহৃত ভারতীয় সংখ্যাগুলোর পরিবর্তে ইউরোপীয় সংখ্যাগুলো ব্যবহার করে থাকে। এর কারণ, বিভিন্ন রাজ্য বিজয়ের সুবাদে পর্তুগালদের সাথে সংশ্রব ও মেলামেশার প্রভাবে তাদের মধ্যে ইউরোপীয় সংখ্যাগুলোর প্রচলন লাভ করেছিল। অথচ ইতঃপূর্বে তারাও আরবি সংখ্যাগুলো ব্যবহার করত। তারা কবে থেকে ইউরোপীয় সংখ্যাগুলো ব্যবহার করছে, তা সঠিক করে বলা কঠিন; তবে এটা নিশ্চিত যে, তারা কয়েক শতাব্দী ধরে এর ব্যবহার করে আসছে।

আরবি বর্ণমালায় লিখিত মাগরিবের ভাষাসমূহ

ক. বার্বারি সিলহি ভাষা (Silhi)

'বার্বারি সিলহি' একটি হ্যামিটিক ভাষা। এটি মরক্কোর মূল অধিবাসী বার্বারদের ভাষা। শব্দমালা ও গঠন প্রক্রিয়ার দিক থেকে এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা। তবে এতে বহু আরবি শব্দ অনুপ্রবেশ করেছে। এর দুটি প্রকার রয়েছে। এক. উত্তরাঞ্চলীয় সিলহি। এটি 'রিফি' (Rifi)[১৮] নামে পরিচিত। এটি উত্তরের বার্বারদের নিকট প্রচলিত। দুই. দক্ষিণাঞ্চলীয় সিলহি। এটি 'সূসি' (Susi) নামে পরিচিত। এটি দক্ষিণের বার্বারদের নিকট প্রচলিত। এ দুটি উপভাষার মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। এমনকি লেখার নিয়ম ও পদ্ধতির মধ্যেও উপভাষা দুটির মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। মরক্কোর শুলুহ (বার্বার)রা তাদের উপভাষাকে তামাযুগত[১৯] নামে অভিহিত করে। এটি মরুবাসী তাওয়ারিকদের[২০] ব্যবহৃত উপভাষার[২১] সমজাতীয় একটি ভাষা। মরক্কোর আরবি ভাষায় প্রচুর বার্বারিয়ন শব্দ অনুপ্রবেশ করেছে। তবে তা সর্বসাধারণের নিকট বহুল পরিবর্তিত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। আবার অনেকগুলো শব্দের প্রকৃত অর্থও বদলে গেছে। তদুপরি তাতে সাকিন (ساكن), ইশমাম (اشمام), জাযম (جزم) ও তারখিম (ترخيم) প্রভৃতির উচ্চারণ প্রচলন লাভ করে। তাতে ক্রিয়াপদের শেষে একটি বিন্দু যুক্ত করা হয় এবং مضارع-এর শুরুতে ك প্রবেশ করানো হয় যেমন– كنكتب। তখন এটি স্থায়িত্বের অর্থ প্রদান করে। তাছাড়া غائب (নামপুরুষসূচক সর্বনাম)-এর শেষের هاء কে واو দ্বারা পরিবর্তন করে ব্যবহার করা হয়। যেমন كتابه-এর স্থলে كتابو ব্যবহার করা হয়। ذ কে د-এ এবং ث-কে ت-তেও পরিবর্তন করা হয়। এতদসত্ত্বেও বিশুদ্ধ আরবি ভাষাও সেখানে চর্চা করা হয় এবং শিক্ষিতরা তা ব্যবহার করে থাকে। দেশটির দু-তৃতীয়াংশের চাইতেও কম লোক বার্বারি ভাষায় কথা বলে।[২২]

খ. বার্বারি বা কাবাইলি (Kabyli) ভাষা

বার্বারি বা কাবাইলি ভাষাও একটি হ্যামিটিক ভাষা। এটি আলজেরিয়ার মূল অধিবাসী কাবাইল বা বার্বারদের ভাষা। সাধারণত কাবাইল দ্বারা অনারব গোত্রসমূহকে বোঝানো হয়। এরা আলজেরিয়ার পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত উপকূলবর্তী পর্বতসমূহে বসবাস করত।

কাবাইলি ভাষায় প্রচুর পরিমাণে আরবি শব্দ রয়েছে। আলজেরিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বার্বারি ভাষা যতটুকু প্রচলিত রয়েছে, তার চাইতে আরবি ভাষা অধিক

www.pathagar.com

ব্যবহৃত হয়। এর কারণ হলো—বার্বার বংশোদ্ভূত বহু কবিলা ও জনপদ বার্বারি ভাষা ত্যাগ করে আরবিকেই নিজেদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। অপরদিকে আরব গোত্রসমূহের মধ্যে খুব কমই রয়েছে, যারা আরবির পাশাপাশি বার্বারি ভাষাকে নিজেদের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছে।

উল্লেখ্য যে, প্রাচ্যবিদদের সংগৃহীত কতিপয় গল্প ও প্রবাদ-প্রবচন ছাড়া বার্বারি ভাষায় কোনো প্রসিদ্ধ রচনার কথা জানা যায় না। তবে এ ভাষায় কুরআন মজিদের অনুবাদ দেখা যায়। তাছাড়া হাদিস ও ফিকহের অনেক কিতাবও আরবি থেকে বার্বারি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। এগুলো মাগরিব ও আন্দালুসের শাসকগোষ্ঠী মুওয়াহ্হিদিনদের আমলে (৫২৪-৬৬৭ হি.) আরবি লিপিরীতি অনুসরণ করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তবে সেখানকার অনেক বিজ্ঞ ও ধর্মভীরু আলিমই এ কাজকে অপছন্দ করতেন। তাঁরা এসব গ্রন্থকে নষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁরা আরবি ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় কুরআন, হাদিস ও ফিকহের চর্চা করা বৈধ মনে করতেন না।

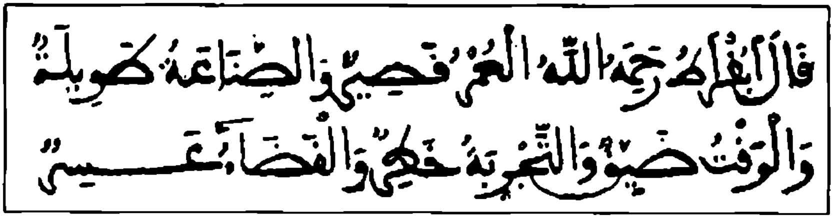

চিত্র-৫: নান্দনিক মাগরিবি লিপি

একে এভাবে পড়তে হবে—

قال أبقراط رحمه الله العمر قصير , و الصناعة طويلة , و الوقت ضيق , و التجربة خطر , و القضاء عسر

মাগরিববাসীরা—চাই তারা বার্বার হোক কিংবা অন্য জাতি—হিজরি প্রথম শতাব্দী থেকে অর্থাৎ যখন তারা সর্বশেষবার ইসলাম গ্রহণ করেছিল তখন থেকেই আরবি লিপিরীতি অনুসরণ করে লিখত। উল্লেখ্য যে, বার্বাররা ছিল একটি কঠোর জাতি। তারাও আরবের যাযাবর গোত্রগুলোর মতো বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। তাদেরকে অনুগত করার জন্য মুসলমানদের চরম কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তারা পরপর কয়েকবার ইসলামধর্ম গ্রহণ করে এবং ত্যাগ করে এবং প্রতিবারই মুসলমানদের সাথে চরম শত্রুতা প্রদর্শন করেছিল। হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে মুসা ইবন নুসাইরের আমলেই তারা সত্যিকারভাবে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে এবং এর ওপর অটল থাকে। মধ্য এশিয়া থেকে ভারত ও চীন পর্যন্ত ইসলামের বিস্তার ও প্রসারে যেমন তুর্কিদের বিশেষ অবদান রয়েছে, তেমনি মধ্য আফ্রিকায় ইসলামের প্রসার ও বিস্তার সাধনে বার্বারদেরও বিরাট অবদান রয়েছে। তারা সত্যিকারভাবে যখন ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়, তখন থেকেই তারা পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলো বিজয়ের জন্য উদ্যত হয়। বস্তুত তাদের মাধ্যমেই সেখানে ইসলামের বিস্তার ঘটে।

www.pathagar.com

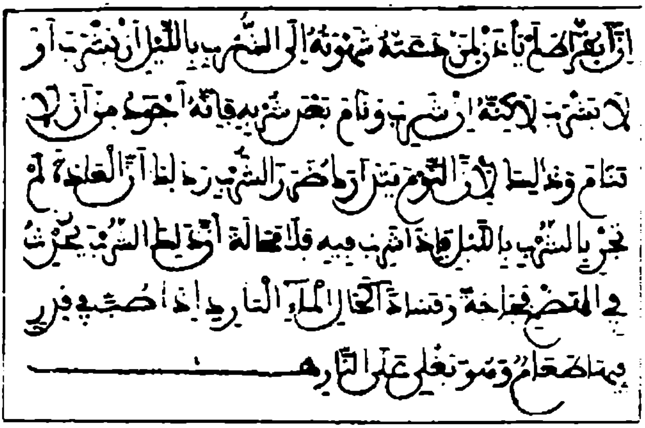

চিত্র-৬: উন্নত মানের মাগরিবি লিপি

একে এভাবে পড়তে হয়—

إن أبقراط لم يأذن لمن دعته شهوته إلى الشرب أن يشرب أو لا يشرب لكنه إن شرب و نام بعد شربه فإنه أجود من أن لا ينام , و ذلك لأن النوم يتدارك ضرر الشرب , و ذلك أن العادة لم تجر بالشرب بالليل فإذا شرب فيه فلا محالة أن ذلك الشرب يحدث في الهضم فجاجة و فسادا كحال الماء البارد إذا صب في قدر فيها طعام و هو يغلي على النار .

মাগরিববাসীরা ق-কেও ف-এর আকৃতিতে লিখে থাকে এবং ف-কে তার নিজস্ব আকৃতিতে লিখে থাকে; তবে তারা এর বিন্দুটি ওপরে না দিয়ে নিচে ڢ এভাবে দিয়ে থাকে। د ও ذ-কে তারা ڎ ڊ এভাবে লিপিবদ্ধ করে থাকে।

তারা আরবি বর্ণমালায় নিম্নের বর্ণগুলো বৃদ্ধি করে থাকে। ১. উপরে তিন নুকতাবিশিষ্ট কাফ ڭ, ২. নিচে তিন নুকতাবিশিষ্ট কাফ ڮ ৩. উপরে তিন নুকতাবিশিষ্ট জিম ڃ ও ৪. ওপরে তিন নুকতাবিশিষ্ট ফা ڤ। এসব বর্ণ ফারসি কাফ (گ) -এর মতো উচ্চারিত হয়। এ বর্ণগুলোকে 'বার্বারি জাফ' (الجاف البربرية) বলা হয় এবং তাদের লিখনরীতিকে বলা হয় 'মাগরিবি লিপিরীতি'। তারাও তুর্কিদের মতো ض-কে ظ-এর দিকে সামান্য ধাবিত করে উচ্চারণ করে।[২৩] প্রাচ্যবাসীদের মধ্যে আরবি বর্ণমালার যে ক্রমবিন্যাস প্রচলিত রয়েছে, তার চাইতে মাগরিববাসীদের ক্রমবিন্যাস সামান্য ভিন্ন, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

গ. নুবি (Nubian) ভাষা

'নুবি' একটি ইসলামি-লিবীয় ভাষা। এটি মিসরের নীল নদের প্রথম ও চতুর্থ জলপ্রপাতের মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহে বসবাসকারী বার্বারদের ভাষা। নুবিরা তিনটি জাতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে। এগুলো হলো: মূল নুবি, আরব ও তুর্কি। এদের সকলের মধ্যে শারীরিক গঠন ও বর্ণগত মিল রয়েছে। মূল নুবিদের সংখ্যা বর্তমানে অতি অল্প। ৭১৭

www.pathagar.com

হি./ ১৩১৮ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানদের হাতে তাদের দেশ বিজিত হওয়ার পরেই তারা ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। তবে তারা নিজেদের ভাষাকে সংরক্ষণ করে চলেছিল। আরব বিজেতাগণও নুবি ভাষাকে বরণ করে নিয়েছিল। তদ্রূপ তুর্কিরাও নুবি ভাষাকে আপন করে নিয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের মধ্যকার আরব ও তুর্কিরা আবছা আরবি কিংবা তুর্কি ভাষায়ও কথা বলত। যেসব আরব নুবি ভাষায় কথা বলত, তারা বিজয়ের অব্যবহিত পর দেশটিকে নিজেদের স্থায়ী বসবাসের জন্য বেছে নেয়। এরাই সংখ্যায় বড়ো অংশ। আর ১৫২০ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান সলিমের হাতে বিজয়ের পর যেসব তুর্কি দেশটিকে নিজেদের স্থায়ী বসবাসের জন্য বেছে নেয়, তারা সংখ্যায় আরবদের চাইতে কম; তবে মূল নুবিদের চাইতে বেশি ছিল। দেশটি মুহাম্মদ আলী পাশার শাসনকাল পর্যন্ত তাদের করতলগত ছিল। ঐতিহাসিক মাকরিযির সময় (৭৬৬-৮৪৫হি./১৩৬৫-১৪৪১খ্রি.) থেকে নুবিদের মধ্যে দুটি ভাষা প্রচলিত ছিল। বর্তমানেও সেখানে দুটি ভাষার প্রচলন দেখা যায়। এক. সক্কুত ভাষা। এটি তৃতীয় ও সপ্তম জলপ্রপাতের মধ্যবর্তী সক্কুত ও মাহাস[২৪] এলাকার নুবিদের ভাষা। দুই. দুনকুলাবাসীদের ভাষা ও কনুযদের ভাষা। 'দুনকুলাবাসীদের ভাষা' দক্ষিণাঞ্চলে 'ফদিদজা' (Fadidza) ভাষা নামে পরিচিত। কনুযদের ভাষা উত্তরাঞ্চলের দুরর অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীদের কনুয ভাষা প্রায় দক্ষিণাঞ্চলের দুনকুলা ভাষার মতোই। তবে এ দুই ভাষার সাথে উক্ত দুই অঞ্চলের মধ্যবর্তী জায়গার ভাষা সক্কুত ও মাহাস ভাষার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে, সক্কুত ও মাহাস এবং দুনকুলা ও কনুয ভাষাদ্বয়ের মধ্যে শব্দগত ও অর্থগত পার্থক্য রয়েছে যেমন ফরাসি ও ইতালি ভাষাদুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত পার্থক্য যেভাবে হোক, নিঃসন্দেহে তাদের সাথে আরব জাতির সংমিশ্রণ ও মেলামেশার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। কেননা আরবদের সাথে নুবিদের সংমিশ্রণের কারণেই আমরা তাদের অধিকাংশকে দেখতে পাই যে, অনারবদের আরবি ভাষায় কথা বলার মতো তারাও আবছা আরবিতে কথা বলত।

নুবি ভাষার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শব্দ আরবি। তারা প্রায় প্রত্যেকটি আরবি শব্দের শেষে 'ك' পদটি বৃদ্ধি করে থাকে। যেমন باب-কে بابكا বলে থাকে এবং حصير-কে حصيركا বলে থাকে। তারা কখন থেকে তাদের ভাষা আরবি লিপিরীতি অনুকরণে লেখা শুরু করেছিল তা সঠিক করে জানা যায়নি। তবে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, আরবি লিপিরীতিতে তাদের ভাষা লিপিবদ্ধ করার এ ধারা তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রসার ঘটার পর এবং আরবদের সাথে তাদের সংমিশ্রণের পর শুরু হয়। তবে এ ভাষায় লিখিত গ্রন্থ একেবারে কম। দু / একটি থাকলে তাও দুর্লভ।

বর্তমানে দুনকুলার ফদিদজা ভাষায় অনূদিত সেন্ট মার্কের ইঞ্জিলের একটি অনুলিপি পাওয়া যায়। এটি আরবি লিপিরীতিতে লিখিত। এ অনুবাদটি মিসরে ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে 'ইংলিশ একাডেমি' ইংরেজ প্রেস থেকে প্রকাশ করে। এখানে এ ভাষার কিছু নুমনা তুলে ধরা হলো—

مرقسن انجيلن – انجيل يسوع المسيحن لن مرقسن قايسين
نقتا– مصر لى طبعكن انكليزن كدن مطبعه لا – كتب مقدس
انكليزن جمعتين صرف لق سنه ১৯০৬م .

দেখা যায় যে, এ অনুবাদে তারা আরবি বর্ণমালায় আরো চারটি বর্ণ বৃদ্ধি করেছে। অনুবাদের শুরুতে তারা এ চারটি বর্ণের কথা উল্লেখ করেছে।[২৫]

ঘ. হাওসি (Hausian) ভাষা

'হাওসি' একটি কাফ্রি (Negro) ভাষা। এটি নাইজার নদী ও শাদ হ্রদের মধ্যবর্তী পশ্চিম সুদানের হাওস বা হাওসা রাজ্যে প্রচলিত রয়েছে। নাইজারদের উপনিবেশ থেকে বের হয়ে ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসার আগে এই ইসলামি রাজ্যের রাজধানী ছিল প্রসিদ্ধ সুকুতু (Sokoto) শহর। এ কারণে এ ভাষাকেও 'সুকুতু ভাষা' নামেও অভিহিত করা হয়। এ ভাষা নিগ্রো এবং হ্যামিটিক কিংবা স্যামিটিক উপজাত দুটি আদি ভাষার সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়। বর্তমানে আফ্রিকার সবচাইতে বড়ো জাতি—হাওসা ছাড়াও লক্ষ লক্ষ লোক এ ভাষায় কথা বলে।

হাওসিরা ফলবুসিদের ডান হাত হিসেবে পরিচিত ছিল। ফলবুসিরা সে-এলাকায় ইসলামের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সাধারণত ইসলামধর্মের সাথে হাওসিদের সম্পর্ক ছিল পুরানো। ইসলামের বিস্তার এবং আরবি ভাষা ও লিপির শিক্ষা অর্জনের প্রতি তাদের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ক্যান্ট হিনরি ডি ক্যাস্টিরি তাঁর *ইসলাম*[২৬] গ্রন্থে বলেন,

> ফলবুসরা প্রচণ্ড যুদ্ধবাজ ও বিজেতা ছিল। তারা পূর্ণ নিরাপত্তা ও শক্তি প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া কোথাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলত না। আর হাওসিরা ছিল সুদানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক। মনে করা হতো যে, তারাই সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সঞ্চিত করে রেখেছে। তবে তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি ছিল অতি সংকীর্ণ। তারা শুধু আরবি ভাষায় লিখতে পড়তে জানত। তবে এটাই প্রতিমাপূজারীদের ওপর তাদের প্রভাব বিস্তারের জন্য যথেষ্ট ছিল। কারণ প্রতিমাপূজারীরা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লেখক ও পাঠকদেরকে উপাস্যের মতো সম্মান প্রদর্শন করত। কাজেই ফলবুসরা ছিল প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সাহায্যকারী আর হাওসিরা তাদের মধ্যে ছিল ওয়ায়েজ এবং ফকিহদের পর্যায়ে।[২৭]

বিখ্যাত পণ্ডিত রবিনসন বলেন,

> হাওসি মূলত একটি মিশ্রিত ভাষা। এটি আরবি ও হাবশি ছাড়া আফ্রিকার অন্যান্য ভাষার সংমিশ্রণে উৎপত্তি লাভ করে। এ ভাষায় ঠিক আরবি ভাষার বর্ণগুলোই ব্যবহৃত হয়। তারা আরবি বর্ণগুলো দিয়ে বিভিন্ন ইতিহাস, গল্প-উপাখ্যান ও কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছে। ইংরেজ শাসকরা এ ভাষার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিল। কারণ তাদের উপনিবেশসমূহে লক্ষ লক্ষ লোক এ ভাষায় কথা বলত। তবে পরবর্তীকালে আফ্রিকার ভাষাসমূহের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে দুর্বল ভাষাগুলো হারিয়ে যায় এবং শক্তিশালী ভাষাগুলো তাদের স্থান দখল করে নেয়। এ প্রতিযোগিতায় আফ্রিকায় কেবল চারটি ভাষাই টিকে যায়। এগুলো হলো: ১. উত্তর আফ্রিকায় আরবি, ২. দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজি, ৩. পূর্ব আফ্রিকায় সাওয়াহিলি ও ৪. পশ্চিম আফ্রিকায় হাওসি। বর্তমানে যদি কেউ হাওসি ভাষার জ্ঞান রাখে, তার পক্ষে আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্ত থেকে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ানো সহজ হবে। সে যেখানেই যাবে সেখানে সে অসংখ্য লোককে এ ভাষায় কথা বলতে দেখতে পাবে।[২৮]

www.pathagar.com

হাওসি ভাষা হাওসা ও তার পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহে বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি তাদের নিকট ইউরোপের ফরাসি ও ইরানের ফারসি ভাষার মতো মর্যাদা অর্জন করেছে। তারা এ ভাষাটি 'মাগরিবি লিপি' থেকে উদ্ভূত প্রসিদ্ধ 'সুদানি কিংবা তাম্বাকতি লিপিরীতি' অনুসরণ করে লিপিবদ্ধ করে।[২৯]

ঙ. সাওয়াহিলি (Swahili) ভাষা

সাওয়াহিলি[৩০] বা জায়রাতি ভাষা বান্তিয়া ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত একটি ভাষা। এটি বান্তুর পূর্বদেশীয় শাখা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত একটি উত্তর দেশীয় শাখা। এটি জাঞ্জিবার[৩১] এবং তার পার্শ্ববর্তী পূর্ব-আফ্রিকার দেশ ও দ্বীপসমূহ (যেমন- ক্যামেরুন) প্রভৃতি এলাকায় প্রচলিত রয়েছে।

আফ্রিকার এ অঞ্চলে ইসলামের বিস্তৃতির ফলে এ ভাষাটি বিভিন্ন দেশে কাবাইলদের মাঝে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। তদুপরি এর কিছু কিছু অংশ সমগ্র পূর্ব আফ্রিকা জুড়ে প্রসার লাভ করে। অধিকন্তু, এটি একটি বাণিজ্যিক ভাষাতে পরিণত হয়। ফলে এটি তার উৎপত্তিস্থল থেকে হাজার হাজার মাইল দূরেও ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে পরিণত হয়। এটি সোমালিয়া, আদন ও মাসকতের উপকূলবর্তী বন্দরসমূহ থেকে দূরের বোম্বাই, নাতাল ও মাদাগাস্কার প্রভৃতি এলাকার বন্দরসমূহে ব্যবহৃত হতো। আফ্রিকার অভ্যন্তরে এটি তাঞ্জানিয়া, নাইস্‌সা, ভিক্টোরিয়া নিয়াঞ্জা ও নিম্ন কঙ্গোর উপকূলসমূহেও ব্যবহৃত হয়। আফ্রিকার এ অঞ্চলে বসবাসকারী কাবাইলদের সাথে যারা এখানে প্রবেশ করতে চায়, তাদের প্রত্যেকের জন্য এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় ভাষায় পরিণত হয়। সাধারণত এটি মধ্য আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলের বহুল প্রচলিত ভাষা।

সাওয়াহিলিরা সংখ্যায় কয়েক মিলিয়নের বেশি নয়। তারা আফ্রিকান জাতিগুলোর মধ্যে ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে সকলের চেয়ে অগ্রগামী ছিল। হিজরি ৮৬ সালে উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকের ভাই হামযার মাধ্যমে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছে। আরবদের সাথে সুদীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ও সম্পর্কের কারণে তারা রীতিনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ধর্মপরায়ণতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আরব প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। সাওয়াহিলি ভাষায় অসংখ্য আরবি ও ফারসি শব্দ অনুপ্রবেশ করে। পরবর্তী সময়ে বেশ কিছু ইউরোপীয় শব্দও তাতে অনুপ্রবেশ করে।[৩২]

চ. মালাগাছি ভাষা

'মালাগাছি' মাদাগাস্কর দ্বীপের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ভাষা। এটি এ দ্বীপের বাইরে অন্য কোথাও ব্যবহৃত হয় না। তদুপরি এটা দ্বীপের কেবল কয়েকটি গোত্রের ভাষা। মাদাগাস্করের প্রায় প্রত্যেক গোত্রের পৃথক পৃথক উপভাষা রয়েছে। তারা নিজ নিজ উপভাষায় কথা বলে। তবে লেখার প্রয়োজন হলে সকলেই মালাগাছি ভাষার শরণাপন্ন হয় এবং তা আরবি লিপিরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়।

পুরো দ্বীপে মালাগাছি ভাষার রূপ ছিল এক ও অভিন্ন। বস্তুত এটি মালয় ভাষার একটি শাখা। এতে সাওয়াহিলি, আরবি ও আফ্রিকার বিভিন্ন উপভাষাসমূহের অসংখ্য শব্দ ও পদ অনুপ্রবেশ করেছে

www.pathagar.com

মালাগাছিরা ইসলামের যেসব কীর্তি ধরে রেখেছে তন্মধ্যে আরবি লিপি হলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আরবদের মাধ্যমে ইসলাম মাদাগাস্করে পৌছার পর সেখানে মুসলমানরা অনেক বড়ো বড়ো কীর্তি রেখেছে, যা দীর্ঘ সময় ধরে ইসলামের সাথে তাদের সুদৃঢ় সম্পর্কের প্রমাণ বহন করে। ইসলাম তাদের ভাষার ওপর সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ করে উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহের উপভাষাসমূহে এর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এগুলো অসংখ্য আরবি শব্দ দ্বারা সমৃদ্ধ।[৩৩] তদুপরি এ ভাষা আরবি লিখনরীতি অনুযায়ী লিখিত হতে থাকে। এ কারণেই এটি 'আরবি-মালাগাছি ভাষা' (Arabic- Malgaches) নামে পরিচিতি লাভ করে। অর্থাৎ আরবি লিখনরীতিতে লিখিত মালাগাছি ভাষা। আরবি লিপি প্রথমত দক্ষিণ-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম উপকূলীয় গোত্রসমূহের মাঝে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। অতঃপর পুরো দ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে। মোদ্দা কথা, মাদাগাস্করের মুসলিম গোত্রসমূহ আরবদের নিকট থেকে কুরআনের বর্ণগুলোর জ্ঞান লাভ করে এবং তা চর্চা করে। এর কারণ, মাদাগাস্করে ইসলাম অনুপ্রবেশের পূর্বে মালাগাছিরা লিখনশিল্প সম্পর্কে জ্ঞান রাখত না। তাদের সাহিত্য ও জ্ঞান-গরিমা সবই অলিখিত ও অসংরক্ষিত অবস্থায় ছিল। সেখানে আরবদের আগমনের পরই লেখার ধারা শুরু হয়।[৩৪]

উল্লেখ্য যে, মালাগাছিরা আরবি বর্ণমালায় বেশ কয়েকটি বর্ণ বৃদ্ধি করেছে। তাছাড়া কোনো কোনো বর্ণের মধ্যে উচ্চারণগত পার্থক্য, আবার কোনো কোনো বর্ণের মধ্যে লেখার ধরনগত পার্থক্য রয়েছে। এ ধরনের বর্ণগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো:

১. আরবি বর্ণের অতিরিক্ত বর্ণসমূহ । যথা: ক. দুই জবরবিশিষ্ট زً কিংবা উল্লম্ব আকৃতির তাশদিদবিশিষ্ট زّ অথবা ওপরে শিরদাঁড়াবিশিষ্ট তাশদিদ যুক্ত رٌ। তারা এটি تر অথবা در -এর মতো উচ্চারণ করে থাকে । খ. নিচে এক নুকতাবিশিষ্ট ط। এটি তারা ت -এর মতো উচ্চারণ করে থাকে।

২. আকৃতিগত মিল রয়েছে, অথচ উচ্চারণের দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে এ ধরনের বর্ণসমূহে। যথা: কঁ. ت একে তারা تس ts -এর মতো উচ্চারণ করে থাকে। খ. ج একে তারা دز dz -এর মতো উচ্চারণ করে থাকে। গ. ض একে তারা ڤ v- এর মতো উচ্চারণ করে থাকে। ঘ. ع একে তারা ن অথবা ڠ -এর মতো উচ্চারণ করে থাকে যেমন মালয়রা তিন নুকতাবিশিষ্ট ڠ-কে উচ্চারণ করে থাকে। ঙ. ف একে তারা ب এর মতো উচ্চারণ করে থাকে। চ. و একে তারা و অথবা ڤ v-এর মতো উচ্চারণ করে থাকে। ছ. ى একে তারা ى অথবা ز z বা دز dz-এর মতো উচ্চারণ করে থাকে।

৩. উচ্চারণগত মিল রয়েছে; কিন্তু আকৃতিগত মিল নাই এ ধরনের বর্ণসমূহ। যথা: ক. د একে তারা এভাবে ڊ লিখে থাকে এবং د -এর মতো উচ্চারণ করে। খ. ص একে তারা ص এভাবে লিখে থাকে এবং ص -এর মতো উচ্চারণ করে।[৩৫] আরবি লিপিরীতিতে লিখিত মালাগাছি ভাষার অনেক প্রাচীন পাণ্ডুলিপি বর্তমানে পাওয়া যায়। এ ধরনের কিছু পাণ্ডুলিপি প্যারিসের পাবলিক লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে।[৩৬]

www.pathagar.com

ছ. হাবশি (Ethiopic) ভাষাসমূহ

হাবশা (ইথিওপিয়া) ও তার পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে ইসলাম প্রসারের সাথে সাথে আরবি লিপিও বিস্তৃতি লাভ করেছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগে অনেক মুসলিম শাসক হাবশায় গমন করেছিলেন এবং সেখানে তারা হুরর, হামাসন, জিমা ও আওয়াসা প্রভৃতি মুসলিম রাজ্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন। তবে এ রাজ্যগুলোর স্বাধীনতা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি; অল্প কিছু দিন পর তা নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু ইসলাম দিন দিন সেখানে প্রসার লাভ করতে থাকে। বর্তমানে সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ১০ মিলিয়নের কাছাকাছি।

সাদিক পাশা আল-মুয়াইয়িদ[৩৭] বলেন, হাবশার মুসলমানগণকে সেখানে 'জাবরতি' (অর্থাৎ মুসলিম হাবশি) বলা হতো। জাবরতিগণ ছিলেন ধর্মপরায়ণ, জাতীয় ও ধর্মীয় রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ব্যক্তিত্ববোধসম্পন্ন ও সাহসী। তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকর্মে রত থাকেন।

হাবশায় মুসলমানরা যদিও খ্রিষ্টানদের কর্তৃত্বাধীন ছিল; তথাপি তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যকলায় তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর ছিল। প্রখ্যাত পর্যটক রুবল ১৮৩৮ সালে তাঁর হাবশা-ভ্রমণ প্রসঙ্গে বলেন: মুসলিম হাবশিরা খ্রিষ্টান হাবশিদের চাইতে অধিকতর কর্মক্ষম, বিদ্বান ও পরিশীলিত ছিল। তদুপরি তাদের জীবন যাপনের মানও ছিল অনেক উন্নত। আরো অনেকেই এ ধরনের মন্তব্য করেছেন। সেখানে মুসলমানরা আজ পর্যন্ত তাদের হাবশি ভাষা ও উপভাষাগুলো হাবশি লিখনরীতির পরিবর্তে আরবি লিখনরীতি অনুযায়ী লিখে আসছে। যেমন শুয়া (Shoa) রাজ্যে[৩৮] মুসলমানরা অ্যামহারিক (Amharic) ভাষা লেখার জন্য আরবি লিপি ব্যবহার করে। অ্যামহারিক ভাষা বর্তমানেও হাবশায় প্রচলিত রয়েছে। তদ্রূপ পূর্ব হাবশার হুরর (Hurar) নগরীর বাসিন্দারাও আরবি লিপিরীতি অনুযায়ী তাদের ভাষা[৩৯] লিপিবদ্ধ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে ড. কাস্ট বলেন, "শুয়ার মুসলমানরা আরবি লিপিরীতি অনুযায়ী অ্যামহারিক ভাষা লিপিবদ্ধ করে এবং হুররিরাও তাদের ভাষা লেখার জন্য এ লিখনরীতি ব্যবহার করে থাকে।"[৪০] ড. লিটম্যান ও (Enno Littmann) হুররিদের ভাষা আরবি লিপিতে লিখিত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, "আমি আরবি লিপিতে লিখিত একটি হুররি ভাষার গান পড়েছি।" হাবশি জাতিগুলোর মধ্যে আরো যাঁরা আরবি লিপিরীতি ব্যবহার করে থাকেন, তাঁদের মধ্যে আগুয়া ও গালা জাতিগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।[৪১]

আফ্রিকায় আরবি লিপির বহুল প্রচলনের আরো একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো, কুশি জাতিগুলোর মধ্যে এর বহুল প্রচলন লক্ষ করা যায়। কুশি জাতিগুলো হলো– ক. বজ্জা জাতি–এরা নুবার দক্ষিণে বসবাস করে। খ. সুহু জাতি–লোহিত সাগরের তীরবর্তী মসুর দক্ষিণাঞ্চল হলো তাদের আবাসস্থল। গ. দুনকুলি জাতি–এদের আবাসস্থলও হলো বাবেল মান্দেব পর্যন্ত লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী এলাকা। ঘ. আগুয়া জাতি–এরা হাবশায় বসবাস করে। এরা হাবশার একটি আদি মানবগোষ্ঠী। ঙ. গালা জাতি[৪২]–এদের আবাসস্থল হলো হাবশার দক্ষিণাঞ্চল। চ. সোমালি জাতি–এদের

www.pathagar.com

আবাসস্থল বাবেল মান্দেব ও আদন উপসাগর থেকে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত।[৪৩] এ কুশি জাতিগুলো প্রত্যেকেই লেখার ক্ষেত্রে আরবি লিখনরীতি ব্যবহার করে থাকে। প্রফেসর জুয়াইদি বলেন,

> কুশি জাতিগুলোর মধ্যে আমরা এমন কোনো জাতিকে দেখতে পাই না, যাদের মধ্যে সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। তাদের নিজস্ব কোনো বর্ণমালাও ছিল না। তাই তারা পড়তও না, লিখতও না। কারো কোনো কিছুর লেখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সে তা আরবি ভাষায় এবং আরবি বর্ণমালায় লিখত।

কুশি জাতিগুলোর মতো গাম্বিয়া নদীর দক্ষিণের মান্দিগুর (Mandingo) অধিবাসীরাও লেখার ক্ষেত্রে আরবি লিপিরীতি ব্যবহার করত।[৪৪]

আফ্রিকায় আরবি লিপিতে লিখিত হয় এ ধরনের আরো বেশ কয়েকটি ভাষা রয়েছে। যেমন ইসলামি রাজ্যের পার্শ্ববর্তী সুদানি গোত্রগুলোর ভাষাসমূহ। তাদের ভাষাগুলো লেখার উপযোগী ছিল না। এ কারণে যখনই তা লিপিবদ্ধ করা হতো, তখন তা আরবি লিপিরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়। ড. কাস্ট বলেন, "আরবি লিপি আফ্রিকার মধ্যভূভাগের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো এলাকার মুসলমানদের ধর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক লেনদেনের একমাত্র মাধ্যম ছিল। তদুপরি আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তের মালয় মুহাজিররাও আরবি লিপি ব্যবহার করত।" বরনু (Bornu)তে আরবি লিপিকে আল-ওয়ারশ (الورش Al-Warash) এবং সেখানকার আরবি উপভাষাকে 'শায়িকিয়্যাহ' (شايقية) বলা হয়।[৪৫]

তথ্যসূত্র

১ মাগরিব: মিসর ছাড়া উত্তর আফ্রিকার সব দেশকে এবং স্পেনের আন্দালুস অঞ্চলকে আরবরা মাগরিব (পশ্চিম) বলে অভিহিত করত। বর্তমানে মাগরিব বলতে মিসর ছাড়া উত্তর আফ্রিকার আর সব দেশকে একত্রে বোঝায় (এবনে গোলাম সামাদ, *ইসলামি শিল্পকলা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ ৬৫)।

২ ইবনে গোলাম সামাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬৬।

৩ মাগরিব আব্বাসীয় খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকে কায়রোয়ানের রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায় এবং এটি আগলবিয়া সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। তদুপরি এটি আরব-মাগরিবের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানে মাগরিবি লিপির প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ লিপিতে এখানে প্রচুর সংখ্যক কুরআন কপি করা হয়েছিল।

৪ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৭৬।

৫ আবদুর রহীম, ইসলামি ক্যালিগ্রাফি : যুগে যুগে, *অগ্রপথিক*, প্রাগুক্ত, বর্ষ-১৫, সংখ্যা-১০, অক্টোবর ২০০০, পৃ ১০৬।

৬ প্রথম দিকে এ লিপি আফ্রিকা বিজয়ী হজরত উকবা ইবন নাফি আল-ফিহরি (রা.)-এর নামানুসারে 'উকবানি লিপি' নামে পরিচিত ছিল (জাব্বুরি, *প্রাগুক্ত*, খ ২, পৃ.৪২৯)।

৭ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১০৫।

৮ *তদেব*।

৯ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৭৭।

www.pathagar.com

১০ তবে আফ্রিকার জারিদ অঞ্চলে লিপির একটি নিজস্ব রীতি বর্তমান ছিল। কারণ তারা আন্দালুসি লিপিকারদের সাথে মিলিত হয়নি এবং তাদের সাহচর্যের প্রভাব গ্রহণ করার সুযোগ পায়নি।

১১ ইবনু খালদূন, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৭৯-৮০।

১২ হিজরি ৬১০/ খ্রিষ্টীয় ১২১৩-১২১৪ সালে মুসলমানদের হাতে নগরটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এটি মাগরিবের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চার চতুর্থ কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানে বড়ো বড়ো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছিল। খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত তার এ গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল।

১৩ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৭৮; আশ-শুকায়রি, ফাহহিয়্যা, *তারীখুল খাত্তিল 'আরবি ওয়া আদাবুহু*, পৃ ১৬।

১৪ আবদুর রহীম, ইসলামি ক্যালিগ্রাফি: যুগে যুগে, *অগ্রপথিক*, প্রাগুক্ত, বর্ষ-১৫, সংখ্যা-১০, অক্টোবর ২০০০, পৃ ১১০।

১৫ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৭৯।

১৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৭৫।

১৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৭৯ ; আল-কুরদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৩৬।

১৮ রিফ অঞ্চলের দিক সম্বন্ধ করে উত্তরাঞ্চলীয় সিলহিকে 'রিফি' নামে অভিহিত করা হয়। রিফ দ্বারা মধ্য শ্বেত সাগরের উপকূলবর্তী সকল মরক্কো অঞ্চলকে বোঝানো হয়, যা প্রায় মালয় থেকে তাতওয়ান পর্যন্ত বিস্তৃত।

১৯ তামাযুগতঃ বার্বার ঐতিহাসিকদের মত হলো—সকল বাবরীয় গোত্রের আদি পুরুষের নাম হলো আমাজিগ বা মাজিগ। এর অর্থ হলো স্বাধীন পুরুষ। গ্রিক ও রোমান ঐতিহাসিকগণ শব্দটি উল্লেখ করেছেন। শব্দটি তাওয়ারিকদের মাঝেই কেবল পরিচিত ছিল। তারা তাদের আদি পুরুষ উশলুহ বা বার্বারকে ভুলে গিয়েছিল। তারা কেবল তামাজুগত শব্দের মাধ্যমে তাদের স্মৃতিকে ধরে রেখেছিল। এ শব্দটি তারা তাদের উপভাষায় আজ অবধি ব্যবহার করে আসছে।

২০ বার্বার গোত্রসমূহের মধ্যে কেবল তাওয়ারিকরাই প্রাচীনকাল থেকে দীর্ঘদিন ধরে বর্ণমালার ব্যবহার করে আসছিল। তারা তাদের বর্ণমালাকে 'তফিনাগ' বা 'তফিনাজ' নামে অভিহিত করত। এটি বার্বারীয় লিপি, যা ন্যূনতম কারতাছার প্রতিষ্ঠাকালের দিকে প্রথম উৎপত্তি লাভ করে। লিপিবিশারদদের ধারণা, এ বর্ণগুলো কারতাছীয় বা ফিনিশীয় বর্ণমালার প্রাচীন রূপ। এগুলো আরবের দক্ষিণাঞ্চলে ব্যবহৃত হিময়ারীয় লিপিতে ব্যবহৃত বর্ণমালার সাথে প্রায় সাদৃশ্যপূর্ণ। ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দেই এগুলো উৎকীর্ণ করা হয়। তবে এগুলো তাদের কাছে অপূর্ণাঙ্গ বর্ণমালা হিসেবে বর্তমানেও রয়েছে।

২১ এটি তামাশুক নামেও পরিচিত।

২২ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৭১-৭৩।

২৩ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৭৫।

২৪ সক্কুতঃ দুশা পর্বত ও হালফার নিকটবর্তী দ্বিতীয় জলপ্রপাতের মধ্যবর্তী বিস্তৃত জায়গা। আর মাহাসঃ তৃতীয় জলপ্রপাত ও দুশা পর্বতের মধ্যবর্তী বিস্তৃত জায়গা।

২৫ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৮০-৮২।

২৬ গ্রন্থটি আহমদ জালাল পাশা আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন।

২৭ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৮৩।

২৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৮৩-৮৪।

২৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৮৪।

৩০ সাওয়াহিলি: সাওয়াহিলের দিকে সম্বন্ধ করে একে সাওয়াহিলি বলা হয়। এটি জাঞ্জিবার রাজ্যের অধীনস্থ একটি দেশ। এর অধিবাসীরা সাহিলি কিংবা সাওয়াহিলি নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

৩১ জাঞ্জিবার: এটি মূলত আরবি শব্দ। এটি زنج ও بار শব্দ দুটির সমন্বয়ে গঠিত হয়। এর আরবি রূপ হলো بر الزنج (জাঞ্জিদের ভূভাগ) বা ساحل الزنج (জাঞ্জিদের উপকূল) এবং এ রূপেই এলাকাটি আরবদের নিকট পরিচিত ছিল। আরবদের গ্রন্থরাজি ও মানচিত্রসমূহে এটি بر الزنج বা ساحل الزنج নামে উল্লেখিত রয়েছে। জাঞ্জিবার শব্দটি তাদের গ্রন্থসমূহে দেখা যায় না। এর দ্বারা বোঝা যায়, এ নামটি নতুন এবং ইউরোপীয় লেখকদের বইগুলো থেকে সংগৃহীত। ইউরোপীয়রা প্রথমত তাদের রীতি অনুযায়ী زنج শব্দটি بر শব্দের আগে নিয়ে আসে। এভাবে শব্দটির রূপ দাঁড়ায় زنجبر। এরপর আরবিতে সহজভাবে শব্দটি উচ্চারণের সুবিধার্থে আলিফ বৃদ্ধি করা হয়। এভাবে শব্দটি زنجبار -এ পরিণত হয়।

৩২ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৮৫।

৩৩ Professor Gabriel Ferrand الإسلام في مدغسكر গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে এ শব্দসমূহের ওপর বিশদ বর্ণনা পেশ করেছেন।

৩৪ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৮৬-৮৭।

৩৫ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৮৭-৮৮।

৩৬ La légende de Raminia d'après un Manuscript Arabo-Malagache, et Notes sur la Transcription Arabo-Malagache, par M. G. Ferrand.

৩৭ তিনি হাবশায় মিশরের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ১৯০৮ সালে তিনি হাবশা থেকে ফিরে এসে رحلة الحبش নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

৩৮ এটি দক্ষিণ হাবশায় অবস্থিত।

৩৯ এটি হাবশার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপভাষা। হুরর নগরীর লোকেরা এ ভাষায় কথা বলে। এ জন্য একে সেদিকে সম্বন্ধ করে হুররি ভাষা বলা হয়। এটি হুরর ছাড়াও অন্য কোথাও প্রচলিত নেই। এর নিজস্ব কোনো বর্ণমালা নেই। আরবি লিপিরীতি অনুযায়ী এটি লিপিবদ্ধ করা হয়। সর্বপ্রথম ক্যাপ্টেন বারটন (Burton) ১৮৫৬ সালে এ ভাষার পরিচয় লাভ করেন এবং পৃথিবীবাসীদের জন্য প্রকাশ করেন। এ শহরে তিনি অল্প সময়ের জন্য অবস্থান করেছিলেন। এ সময় তিনি এ ভাষার একটি অভিধান সংকলন করতে সমর্থ হন। তিনি বলেন: হুররি ভাষা জল্লাভি, সোমালি ও দুনকুলি ভাষাসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি ভাষা। অর্থাৎ এ ভাষা সেমিটিক ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত একটি ভাষা। এর শব্দাবলি ও শব্দের আকার-আকৃতিসমূহ মূল আরবি থেকে সংগৃহীত, যা নিঃসন্দেহে দীন-ই-ইসলামের সাথে সাথে উদ্ভূত হয়েছে।

৪০ Cust, Dr. Robert Neeldham, *The Modern Languages of Africa*, London, 1883.

৪১ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৮৯-৯০।

৪২ গালারা হলো কুশিদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি। এরা হাবশার দক্ষিণাঞ্চলে বসবাস করত। পরে সেখান থেকে বের হয়ে হিজরি দশম শতাব্দীর শুরুতে হাবশায় প্রবেশ করেছিল। তারা প্রতিমাপূজারী ছিল। তাদের কেউ কেউ ইসলামও গ্রহণ করেছিল। আবার তারাই তাদের ভাইদের মধ্যে ইসলামের প্রসার ঘটিয়েছিল। তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোকই কেবল খ্রিষ্টানধর্ম গ্রহণ করেছিল।

৪৩ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সোমালিরা ওপর থেকে নিচে করে আরবি লিপি লিখত এবং পড়ার সময় ডানদিকে বামদিকে পড়ে যেত।

৪৪ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৯০-৯১।

৪৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৯২।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

তুর্কিস্তানে আরবি লিপির প্রচলন

মধ্যযুগে তুর্কিস্তানে আরবি লিপিকলার ব্যাপক চর্চা হয় এবং কয়েকটি নতুন লিপিশৈলীরও উদ্ভব ঘটে। তুর্কি সুলতানগণ বরাবরই আরবি লিপিকলার বিকাশ ও উন্নয়নে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন। চিত্রকলা, হস্তলিপি, পাণ্ডুলিপি তৈরি, নকশা ও স্থাপত্য অলংকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। অধিকাংশ আরব দেশ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন রাজ্য এবং ইউরোপের বিরাট অংশ জুড়ে তাঁদের একচ্ছত্র প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার লাভ করার সুবাদে বিভিন্ন দেশের উন্নত শিল্প-সৌকর্য ও অভিজ্ঞতা সহজেই তাঁদের হস্তগত হয়। তাঁরা বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে আরব ও পারস্যের বহু খ্যাতিমান লিপিকার, চিত্রশিল্পী ও অলংকারশিল্পীদেরকে রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে নিয়ে আসেন। এখানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা শিল্পীগণকে বিভিন্ন শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ন সাধন করতে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে এখানে লিপিশিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয় এবং তার সৌন্দর্য ও লালিত্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তদুপরি আরব লিপিশিল্পীগণ অনেক তুর্কিকেও আরবি লিপির কলাকৌশল শিক্ষা দান করেন। ফলে কালক্রমে তাদের মধ্যে জন্ম নেয় লিপিশিল্পের অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, যাঁরা লিখনশিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সৌন্দর্য আনয়ন করেন। এর পাশাপাশি তাঁরা কয়েকটি নতুন লিপিরীতিও উদ্ভাবন করেন। এভাবে মধ্যযুগে তুর্কিস্তানে আরবি লিপি সর্বোচ্চ সৌন্দর্য ও পূর্ণতা লাভ করে।[১]

বস্তুত আরবি লিপিতে সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে অটোমান লেখকদের বিরাট অবদান রয়েছে। তাঁরা মামলুকদের নিকট থেকে সুলুস ও সুলুসাইন লিপিরীতিদ্বয়ের জ্ঞান লাভ করেন এবং এ রীতিদ্বয়ের উৎকর্ষ সাধন করেন। সেলজুকদের নিকট থেকে তাঁরা পরিপক্ক লিপিরীতি হিসেবে নাসখের শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীকালে এ লিপিরীতি তাঁদের হাতে আরো শ্রী ও লালিত্য অর্জন করে। ইরাকের পারসিক ও আরবদের নিকট থেকেও তাঁরা বিভিন্ন লিপিরীতির শিক্ষা লাভ করেন।[২] বলতে গেলে 'আকলামুস সিত্তা'সহ প্রচলিত সবকটি লিপিরীতি তাঁদের হাতে নতুন মাত্রা লাভ করে।[৩] তদুপরি তাঁরা এ সকল লিপিরীতি থেকে রুক'আ, দিওয়ানি ও দিওয়ানে জলি প্রভৃতি নতুন লিপিরীতিও উদ্ভাবন করেন। তুগরা লিপিরীতি বলতে গেলে তাঁদের হাতেই চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করে।

অটোমানরা মূলত মিসরের ফাতেমি ও মামলুক সুলতানদের নিকট থেকেই ঐতিহ্যসূত্রে লিপি ও লিপিকারদের প্রতি ভালোবাসার শিক্ষা লাভ করে। লিপির প্রতি তাদের অনুরাগ এত বেশি ছিল যে, অনেক অটোমান সুলতানকেও দেখা যায় যে, তাঁরা

www.pathagar.com

সামসময়িক খ্যাতিমান লিপিকারদের[৪] শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। যেমন সুলতান মুস্তফা খান (২য়) ও সুলতান আহমদ খান[৫] (৩য়) লিপিকার হাফিজ উছমানের, সুলতান মাহমুদ খান[৬] (২য়) লিপিকার মুহাম্মদ রাকিমের এবং সুলতান আবদুল মজিদ (২য়) লিপিকার মুহাম্মদ তাহির আফিন্দি ও মুস্তফা ইজ্জতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সুলতান আবদুল মজিদ (২য়) লিপিকার মুস্তফা ইজ্জত থেকে লিপিবিদ্যার সনদও গ্রহণ করেছিলেন।[৬]

চিত্র-১: হিল্ইয়া লিপি, হাফিজ উসমান

অটোমানদের আমলে যেহেতু আরবি লিপিই ছিল মসজিদ, প্রাসাদ, জাদুঘর, হাম্মাম, গহনা ও পোশাক প্রভৃতির অলংকরণ ও সজ্জায়নের প্রধান উপকরণ, তাই এ সময়ে সাম্রাজ্যের প্রায় সব এলাকায় আরবি লিপির বহুমাত্রিক ব্যবহার বিস্তার লাভ করেছিল। কথিত আছে যে, হিজরি ১১শ শতাব্দীতে সেখানে ত্রিশোধিক লিপিরীতির ব্যবহার প্রচলন লাভ করেছিল। তাছাড়া এ আমলেই ক্যালিগ্রাফারগণ নিজেদের চিন্তাধারাকে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে শুরু করেন। প্রখ্যাত লিপিকার হাফিজ উসমান এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। তিনিই সর্বপ্রথম ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে বিমূর্ত ছবি সৃষ্টির চিন্তা করেন (দ্র. চিত্র-১)। তাঁর এ চিন্তাধারা পরবর্তীকালে 'হিল্ইয়া' নামে পরিচিতি লাভ করে।

হিজরি ১৩২৬ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় রাজধানী ইস্তাম্বুলে হস্তলিপি, নকশা ও অলংকরণ শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। তদুপরি এ সময় আরবি লিপি কারিকিউলামের এমন একটি প্রধান বিষয়ে পরিণত হয় যে, হস্তলিপি বিষয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া প্রশাসনের কোনো বিভাগে কোনো কর্মকর্তা নিযুক্ত হতে পারত না।

www.pathagar.com

অটোমানগণ তাঁদের সরকারের পক্ষে প্রচারণার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে আরবি লিপির ওপর বড়ো ধরনের নির্ভর করতেন। স্টক মার্কেটের বড়ো মসজিদে চার বর্গমিটার স্থান জুড়ে اَلسُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ عَلَى الْأَرْضِ (বাদশাহ হলেন পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া) লিপিবদ্ধ করা হয়। তাছাড়া অন্যান্য মসজিদেও اَلْمُلُوْكُ مُلْهَمُوْنَ (রাজা-বাদশাহগণ হলেন প্রত্যাদিষ্ট), دُعَاءُ السُّلْطَانِ سَبَبُ الْغُفْرَانِ (বাদশাহের দু'আ হলো ক্ষমা পাওয়ার মাধ্যম) প্রভৃতি বক্তব্য আমরা দেখতে পাই।

অটোমান খিলাফতের পতনের পর তুরস্কে সর্বপ্রথম কামাল আতাতুর্ক সরকারিভাবে ইসলামি চিন্তা-চেতনা ও তাহজিব-তামাদ্দুনের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হন। তিনিই সর্বপ্রথম আরবি ভাষা ও লিপির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং আরবি ভাষা ও বর্ণ নিষিদ্ধ করে তার পরিবর্তে ল্যাটিন বর্ণে কুরআন লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ জারি করেন।

আরবি লিপির বিশিষ্ট তুর্কি ধারাসমূহ

ক. রুক'আ

হিজরি ৯ম শতাব্দীতে রুক'আ লিপিশৈলীর নিয়মাবলি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তুর্কিরা একক কৃতিত্বের অধিকারী। কেননা নাসখ ও প্রাচীন সূক্ষ্ম দিওয়ানি লিপিরীতিদ্বয়ের সমন্বয়ে উদ্ভূত এক নতুন রীতিতে লিখিত ও ৮৮৬ হিজরিতে উৎকীর্ণ বিভিন্ন প্রাচীন লিপিতে এই লিপিরীতির প্রাথমিক নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। তবে বর্তমান আঙ্গিকে খত্তে রুক'আর বর্ণমালা উদ্ভাবনের কৃতিত্ব আবু বকর মুমতাজ বেগ ইবন মুস্তফা আফিন্দির। তিনি ১২৮০ হিজরি সালে সুলতান আবদুল মজিদের আমলে রাজ্যের কর্মকর্তাদের সকল প্রকার সরকারি চিঠিপত্র, প্রজ্ঞাপন, রেজিস্ট্রার ও লেনদেন লেখার ক্ষেত্রে একই ধরনের লিখনপদ্ধতি চালু করার উদ্দেশ্যে এ লিপিরীতি উদ্ভাবন করেন।[৭]

রুক'আ অর্থ কাগজের ছোট টুকরো। এ ধারার লিপি কাগজের টুকরোতে বেশি লেখা হয় বলে একে এ নামে অভিহিত করা হয়। পূর্বে বর্ণিত রিকা লিপিশৈলীর সাথে এ লিপির কোনো সম্পর্ক নেই। এ লিপির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো: এ ধারার বর্ণগুলো ক্ষুদ্রাকৃতির ও অধিকতর গোলাকার হয় এবং তা অতি সহজে ও দ্রুত লেখা যায়। এ লিপিতে আলিফের পরিমাপ খাড়াভাবে সাজানো তিনটি পৃথক বিন্দু পর্যন্ত। আলিফের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে অন্য বর্ণগুলোর পরিমাপ নির্ধারণ করা হয়।

এ লিপিরীতি যদিও প্রথম পর্যায়ে রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড ও চিঠিপত্র লিপিবদ্ধ করার কাজে ব্যবহার করা হতো; কিন্তু পরবর্তীকালে রাজপ্রাসাদের বাইরেও তার ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে এবং লিপিকার মুহাম্মদ ইজ্জত আফিন্দির (১৮৪১-১৯০৩) হাতে এটি অধিকতর স্বচ্ছন্দ রূপ লাভ করে।[৮] এ সময়ে এ লিপি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং ক্রমে এর সমাদর আরব জগতেও বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে বিশেষ করে আরব দেশসমূহে এ লিপি কিছুটা পরিমার্জিতরূপে চিঠিপত্র লেখার কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অপর পৃষ্ঠায় এ লিপিরীতির বর্ণমালা (দ্র. চিত্র-২) ও একটি লেখার (দ্র. চিত্র-৩) নমুনা পেশ করা হলো।

www.pathagar.com

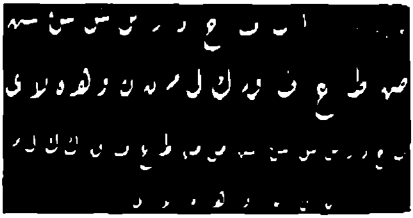

চিত্র-২: মুহাম্মদ ইজ্জতের লিখিত রুক'আ বর্ণমালা

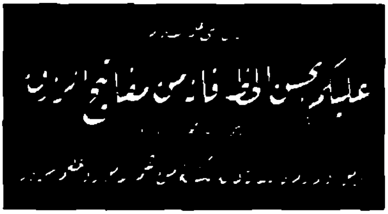

চিত্র-৩: রুক'আ লিপি, মুহাম্মদ আফিন্দি, ১২৪১হিজরি

খ. দিওয়ানি

'খত্তে দিওয়ানি' অটোমান তুর্কি লিপিকারদের সৃষ্ট গোলাকার লিপির একটি প্রকরণ। তবে অনেকে একে একটি প্রাচীন লিপি হিসেবে গণ্য করে। তাদের মতে, এ লিপিরীতি সেলজুকদের আমলে প্রথম উৎপত্তি লাভ করে। তবে এর বিকাশ সাধিত হয় তুর্কিদের হাতে। তুর্কি সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ্ সর্বপ্রথম হিজরি ৮৫৭ সালে এ লিপিরীতি চর্চা করেন। তিনি সুলুস, নাসখ ও রায়হানি প্রভৃতি লিপিরীতিসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একটি সংকর লিখনরীতির জন্ম দেন। রাষ্ট্রের যাবতীয় সিদ্ধান্ত ও প্রচারপত্রগুলো লেখার ক্ষেত্রে তখন এ লিখনরীতির নিয়মকানুনই অনুসরণ করা হতো। তাঁর আমলে এটি সরকারি লিপি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৯] খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুলতান (২য়) মুহাম্মদের আমলে প্রখ্যাত লিপিকার মুহাম্মদ মুনিফ এ লিপির নীতিমালা প্রণয়ন করেন এবং কিছুটা উৎকর্ষ সাধন করেন। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর সুলতান (৩য়) আহমদের আমলে সদরে আযম শাহ্‌লা পাশা এবং প্রখ্যাত লিপিকার হাফিজ উসমানের হাতের ছোঁয়ায় এটি সুষমামণ্ডিত রূপ লাভ করে। পরবর্তীকালে বিখ্যাত লিপিকার শেখ হামিদুল্লাহ একে পরিশীলিত ও সৌন্দর্য প্রদান করেন।[১০] এ ধারার লিপিতে অক্ষরগুলো বক্রাকার এবং মাত্রাধিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। এতে তা'লিকের প্রভাব বেশি। ধারণা করা হয় যে, তা'লিক থেকে এটি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ লিপির নাম থেকে ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায়। এটি তুরস্কের সরকারি অফিস-আদালতে ব্যবহার করা হতো। এজন্য একে দিওয়ানি বলা হয়।[১১] নিম্নের চিত্রসমূহে আমরা এ লিপির বর্ণমালা ও কয়েকটি লিপিচিত্র (দ্র. চিত্র-৪, ৫ ও ৬) দেখতে পাচ্ছি। বর্তমানে আরবদেশগুলোতে শিরোনাম, উপশিরোনাম ও ভূমিকা লেখার কাজে এ লিপি ব্যবহৃত হয়।

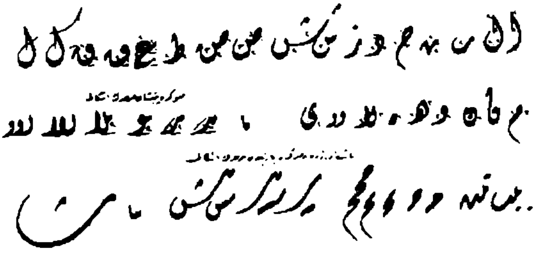

চিত্র-৪: খত্তে দিওয়ানির বর্ণমালা

www.pathagar.com

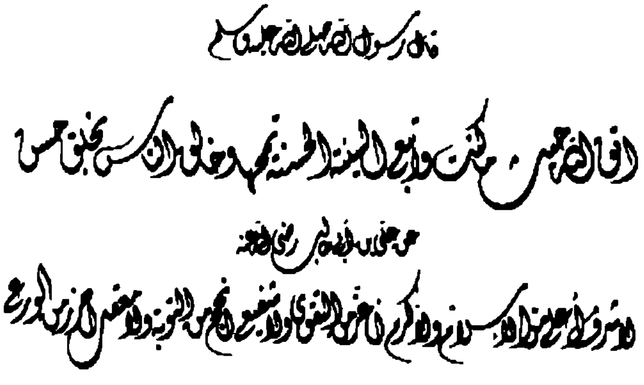

চিত্র-৫: হাশিম বাগদাদির লিখিত দিওয়ানি লিপি

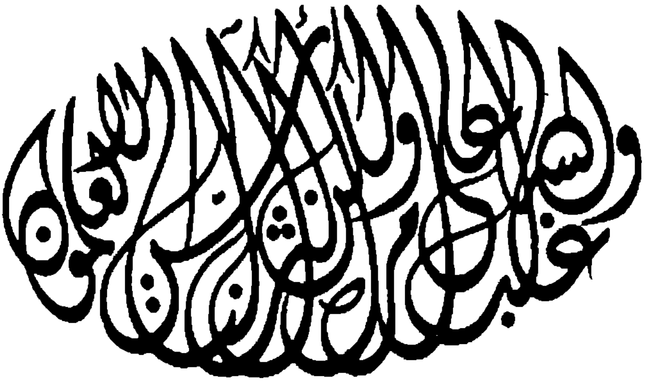

চিত্র-৬: গযলানের লিখিত দিওয়ানি লিপি

এ লিপিকে তাঁর দিকে সম্বন্ধ করে 'গযলানি লিপি' নামেও অভিহিত করা হয়।

গ. দিওয়ানে জলি

'দিওয়ানে জলি' দিওয়ানি লিপিরীতির একটি প্রকরণ। এর অপর নাম হুমায়ুনি বা রাজকীয়। হিজরি ১০ম শতাব্দীর শেষ ও ১১শ শতাব্দীতের শুরুতে সদরে আযম শাহলা পাশা দিওয়ানি লিপি থেকে এটি উদ্ভাবন করেন। জলি অর্থ স্পষ্ট। এ ধারার লেখাতে বর্ণগুলো 'দিওয়ানি' রীতির তুলনায় অধিকতর স্পষ্ট ও স্থুল প্রকৃতির হয়ে থাকে। এজন্য একে 'দিওয়ানে জলি' নামে অভিহিত করা হয়।[১২]

এ লিপিরীতি অটোমান লেখকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। তাঁরা এর বহুল প্রচলনের জন্য চেষ্টা করত। বিশেষ করে তাঁরা সরকারি ডিক্রিসমূহ এবং বিদেশে প্রেরিত চিঠিপত্রগুলো এ রীতিতে লিখত। এ ধারার লেখাতে স্বরচিহ্ন ও আলংকারিক গোলাকৃতির নুকতার প্রয়োগ এবং কিছু কিছু বর্ণের আকৃতির ক্ষেত্রে তার মূল রীতি দিওয়ানির চাইতে কিছুটা তফাত পরিলক্ষিত হয়। এ ধারাতে লিপিকারগণ বর্ণগুলোকে

www.pathagar.com

অভিনব উপায়ে বিন্যস্ত করেন এবং পরস্পর জড়িয়ে অবিস্মরণীয় ধরনের চমৎকার লিপি তৈরি করতে সমর্থ হন।[১৩] নিম্নে আমরা এ ধারার বর্ণমালা (দ্র. চিত্র-৭) ও একটি লিপিচিত্র (দ্র. চিত্র-৮) দেখতে পাচ্ছি।

চিত্র-৭: লিপিকার হালিমের দিওয়ানে জলি রীতিতে লিখিত 'বিসমিল্লাহ'

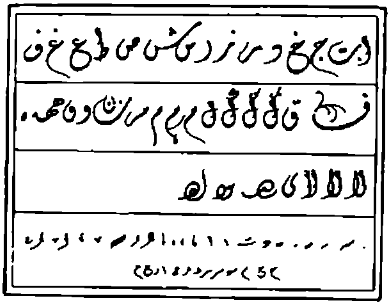

চিত্র-৮: হাশিম বাগদাদির লিখিত দিওয়ানে জলির বর্ণমালা

ঘ. সিয়াকত

'সিয়াকত' অটোমান তুর্কি লিপিকারদের সৃষ্ট গোলাকার লিপির একটি জটিল প্রকরণ। অটোমানরা সরকারি রেজিস্ট্রার, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক চুক্তিপত্র ও লেনদেন লেখার কাজে এটা ব্যবহার করত। সাধারণত যে কারো পক্ষে এ লিপির পাঠোদ্ধার করা দুরূহ ব্যাপার ছিল। এ ধারার লেখাতে বর্ণগুলো অধিকতর অস্পষ্ট ও টানা প্রকৃতির হয়ে থাকে (দ্র. চিত্র-৯ ও ১০)। মিসরেও রোজনামচা লেখার কাজে এ লিপির ব্যবহার প্রচলিত ছিল।[১৪]

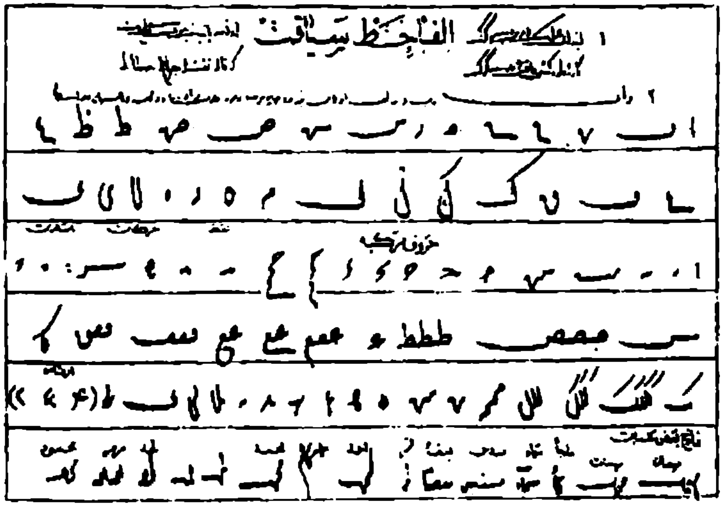

চিত্র-৯ : সিয়াকত লিপির বর্ণমালা

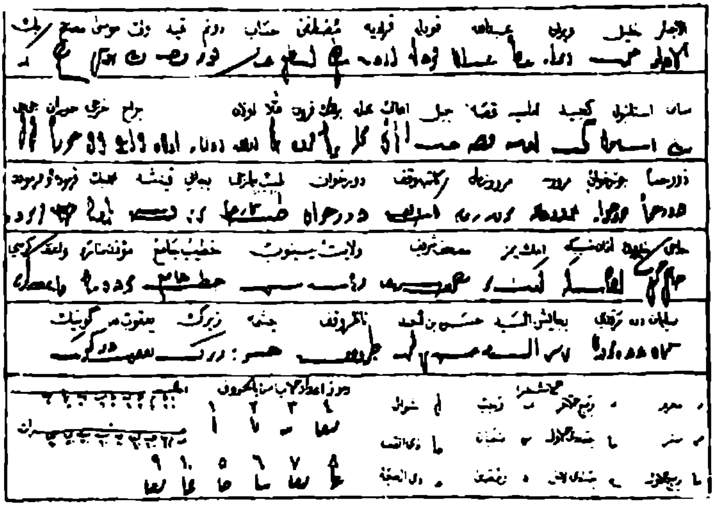

চিত্র-১০: লিপিকার মাহমুদ ইয়াযিরের লিখিত সিয়াকত লিপি

তুর্কি ভাষাসমূহে আরবি বর্ণমালার ব্যবহার

তুর্কি ভাষাসমূহ তুরানি[১৫] ভাষা পরিবারের অন্তর্গত। এগুলো তুরস্ক, রাশিয়া, মধ্য এশিয়া ও ককেসাস অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত রয়েছে। উজবেক, তাতার, তুর্কমান ও অটোমান প্রভৃতি জাতি এ ভাষাগুলোতে কথা বলে থাকে। আরবি লিপিরীতিতে লিখিত তুর্কি ভাষার গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলো হলো—

ক. অটোমান তুর্কি

'অটোমান তুর্কি' অটোমান সরকারের রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল। এটি এশিয়া ও ইউরোপ জুড়ে সুবিস্তৃত অটোমান সাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল। অটোমান সাম্রাজ্যে বসবাসকারী তুর্কি, আর্মেনিয়ান ও কুর্দি প্রভৃতি জাতি এ ভাষায় কথা বলত। তুর্কি ভাষাগুলোর মধ্যে এটিই সর্বাধিক পরিশীলিত, প্রচলিত ও সাহিত্য-সম্ভারে সমৃদ্ধ ভাষা। সর্বসাধারণ একে 'তুর্কি ভাষা' নামে অভিহিত করত। বর্তমানে তুরস্কে যে ভাষা প্রচলিত রয়েছে তা অতীতে প্রচলিত তুর্কি ভাষা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমনকি কেউ যদি অতীতের তুর্কি ভাষায় লিখিত কোনো গ্রন্থ নিয়ে বর্তমানকালের কোনো তুর্কি যুবককে দেখায়, তাহলে সে গ্রন্থটির সামান্য কিছু বুঝলে বুঝতে পারে; কিন্তু তা আদ্যোপান্ত হৃদয়ঙ্গম করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। এর কারণ, পরবর্তী সময়গুলোতে এ ভাষায় বড়ো ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এ সময়গুলোতে এ ভাষা পরিশীলিত হয়, সমৃদ্ধ হয় এবং এমন কিছু রীতিনীতি তাতে যুক্ত হয়, যা এ ভাষাকে পশ্চিমা ভাষাগুলোর সাথে অধিকতর সম্পর্কিত করে তোলে। তদুপরি এ যুগের তুর্কি যুবকরা প্রাচীন তুর্কি ভাষা ও বর্তমানের আধুনিক তুর্কি ভাষার মধ্যকার সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন করতে প্রয়াসী। এ কারণে তারা প্রাচীন তুর্কি ভাষাকে 'তুর্কি ভাষা' নামে অভিহিত করে না; বরং 'অটোমান ভাষা'

www.pathagar.com

নামে অভিহিত করে। এতদসত্ত্বেও এমন অনেক তুর্কি রয়েছে, বিশেষ করে যারা নিজ দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, বাইরে আনাগোনা করে না, তাদের ভাষা তাদের পূর্বপুরুষদের ভাষার প্রায় কাছাকাছি বলা চলে। তদুপরি ইস্তাম্বুলের অধিবাসীরা এ নতুন ভাষাকে নিজেদের জন্য কলঙ্ক মনে করে, যেমন প্যারিসবাসীরা কানাডায় বসবাসকারী ফরাসিদের ভাষাকে খারাপ মনে করে থাকে। অটোমান তুর্কি প্রধান তিনটি ভাষার সমন্বয়ে গড়ে ওঠেছিল। এগুলো হলো: ১. জাগাতাই ভাষা। এটি অটোমান তুর্কি ভাষার মূল উৎস। এ ভাষা সম্পর্কে পরে বিশদ আলোচনা করা হবে। ২. আরবি ভাষা ও ৩. ফারসি ভাষা। অটোমান তুর্কি ভাষায় প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ শব্দ আরবি ভাষা থেকে এবং প্রায় শতকরা পনেরো ভাগ শব্দ ফারসি ভাষা থেকে অনুপ্রবেশ করেছে। বর্তমানে অটোমান তুর্কিতে প্রচুর ইউরোপীয় শব্দ অনুপ্রবেশ করেছে। এদিক থেকে তাকে মাল্টা-আরবি ভাষা[১৬] ও উর্দু ভাষার সাথে তুলনা করা যায়। তদুপরি এতে অন্যান্য ভাষারও প্রচুর শব্দ অনুপ্রবেশের অবারিত সুযোগ রয়েছে। এসব কারণে শব্দের প্রাচুর্য ও ব্যবহারের ব্যাপকতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে একে সমৃদ্ধ ইউরোপীয় ভাষা—ইংরেজির সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

অটোমান তুর্কি ভাষায় আরবি শব্দের আধিক্যের কারণ হলো—হিজরি ৭ম শতাব্দী তথা অটোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে 'অটোমান তুর্কি ভাষা' সাহিত্যের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। এর প্রাচীনতম সাহিত্যরূপ হয়তো ফারসি ভাষা থেকে গৃহীত কিংবা অর্থ ও গঠন প্রকৃতি উভয় দিক থেকে ফারসি ছিল। এর কারণ, অটোমানরা সেলজুকদের সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। আর সেলজুকরা পারসিকদের সাথে একেবারে মিশে গিয়েছিল এবং তাদের সাহিত্যকে নিজেদের সাহিত্যরূপে গ্রহণ করে নিয়েছিল। তাই তখন ফারসি ভাষাই ছিল তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও রাজনীতির ভাষা। এরপর যখন তুর্কিরা ফারসি থেকে নিজেদের সাহিত্যরূপ গ্রহণ করতে থাকে, তখন তারা ফারসি ভাষার পাশাপাশি আরবি ভাষা ও সাহিত্যের অসংখ্য নিদর্শন, শব্দ ও বাগধারা গ্রহণ করতে থাকে, যা ইতঃপূর্বে পারসিকরা আরবদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিল। তদুপরি তুর্কিরা নিজেরাও আরবি ভাষা থেকে অনেক শব্দ ও ধর্মীয় সাহিত্য-নিদর্শন গ্রহণ করেছিল। এ কারণে তুর্কি ভাষায় ফারসি ভাষার শব্দ যতগুলো রয়েছে, তার চাইতে কয়েকগুণ বেশি আরবি শব্দ রয়েছে।

হিজরি ৭ম শতাব্দী থেকে অটোমান তুর্কি ভাষা লেখার সূচনা হয়। আর তখন থেকেই এটি আরবি লিখনরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়। আরবি লিপিতে তুর্কি ভাষার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে লিখিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ হলো 'الإدراك للسان الاتراك'। এটি আন্দালুসের বিশিষ্ট আলিম আছির উদ্দীন আবু হাইয়ান মুহাম্মদ ইবনু ইউসুফ আলগরনাতি (মৃ. ৭৪৫হি.) রচনা করেন। তিনি এটি হিজরি ৭১২ সালে অটোমান সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় লগ্নে সরকারি অটোমান ভাষার নিয়মকানুন প্রণয়নের লক্ষ্যে রচনা করেন। এটি ইস্তাম্বুলে ১৩০৯ সালে প্রকাশ লাভ করে। এরপর ১৩২৫ সালে প্রসিদ্ধ ফরাসি প্রাচ্যবিদ মাসিওঁ লসিঁ বফা এটি প্রকাশ করেন। পরবর্তী সংস্কার যুগে সর্বপ্রথম প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জাওদাত পাশা অটোমান ভাষার নিয়মকানুন প্রণয়ন করেন।[১৭]

www.pathagar.com

তুর্কিরা আরবি বর্ণমালায় আরো পাঁচটি বর্ণ সংযোজন করে। একটি হলো—উপরে তিন নুকতা বিশিষ্ট কাফ (ڭ)। এটি ن-এর মতো উচ্চারণ করা হয়। অপর চারটি হলো—ফারসি ভাষার অতিরিক্ত চারটি বর্ণ। এগুলো সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

খ. কাজানি তুর্কি বা তাতারি ভাষা

'কাজানি তুর্কি' কাজান এবং তার পার্শ্ববর্তী আওফা ও অন্যান্য রুশ প্রদেশের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। এসব প্রদেশের মুসলিম তাতাররা এ ভাষায় কথা বলে। এ ভাষার নিজস্ব মৌলিক সাহিত্য ভাণ্ডার রয়েছে। এ ভাষার গদ্য কি কবিতা কোনোটিই অন্য কোনো জাতি থেকে গ্রহণ করা হয়নি; বরং তাদের কোনো কোনো কবিকে তাতারি ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট আরবি ও ফারসি প্রভৃতি ভাষার কোনো শব্দ ব্যবহার না করে কেবল তাতারি শব্দ নিয়েই কবিতা রচনা করতে দেখা যায়। অধিকন্তু পূর্বসূরিদের মতো বর্তমানেও তাতারিদের একান্ত অভিপ্রায় হলো— ভাষাকে বিদেশি শব্দের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা।

তাতারি ভাষায় আরবি লিপিরীতি অনুযায়ী বহু পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অটোমান তুর্কির মতো এ ভাষায়ও সব ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করা হয়। তাতাররাও আরবি বর্ণমালায় অটোমানদের পাঁচটি বর্ণ সংযোজন করেছেন।[১৮]

গ. কারামি তুর্কি

'কারামি তুর্কি' কারাম উপদ্বীপের কারামি তাতারদের মাঝে প্রচলিত রয়েছে। এটি হিজরি ৯ম শতাব্দীতে দক্ষিণ রাশিয়া ও কারাম উপদ্বীপে আধিপত্যবিস্তারকারী মোগলদের ভাষা ছিল। এতে প্রচুর পরিমাণে আরবি ও রুশ শব্দ অনুপ্রবেশ করেছে।[১৯]

ঘ. নুগাই (Nogai) বা কারাস (Karass) তুর্কি

'নুগাই' বা 'কারাস' তুর্কি একটি তাতারীয় উপভাষা। এটি কারাস ককেসাস প্রদেশ এবং এর পার্শ্ববর্তী কৃষ্ণ সাগরের উপকূলবর্তী এলাকায় প্রচলিত রয়েছে। এসব এলাকার তাতাররা এ ভাষায় কথা বলে। এটি অনেকটা পূর্ববর্তী কারামি তুর্কি ও পরে আলোচ্য আজারি তুর্কির সাথে সাদৃশ্য রাখে।[২০]

ঙ.আজারি[২১] তুর্কি

'আজারবাইজানি কিংবা ট্রান্সককেসীয়[২২] তুর্কি' আজারবাইজানে প্রচলিত একটি ভাষা। এর দুটি উপভাষা রয়েছে। এক. উত্তর আজারি ভাষা। রাশিয়ার অন্তর্গত ট্রান্সককেসিয়ার অধিবাসীরা এ ভাষায় কথা বলে। এ এলাকায় বাকু, তাফলিস, কুতাই ও বাতুম প্রভৃতি রাজ্য রয়েছে। দুই. দক্ষিণ আজারি ভাষা। আজারবাইজানের অধিবাসীরা এ ভাষায় কথা বলে। এ দুটি উপভাষাই আরবি লিপিরীতি অনুসরণ করে লিপিবদ্ধ করা হয়। এ ভাষায় অনেক পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে মির্যা ফাতহ আলী আখন্দ যাদাহ উত্তর আজারি ভাষায় কয়েকটি সুন্দর উপন্যাসও রচনা করেছেন। তদুপরি বেশ কয়েকটি আধুনিক আরবি উপন্যাসও এ

www.pathagar.com

ভাষায় অনূদিত হয়। তন্মধ্যে বাকু প্রদেশের কাজি আখন্দ মির মুহাম্মদ করিমের অনূদিত মুনশি হিলালের বিরচিত উপন্যাস ' عذراء قريش ' অন্যতম।[২৩]

চ. দাগিস্তানি তুর্কি

'দাগিস্তানি তুর্কি' আর্য-তুর্কি ভাষাপরিবারের অন্তর্গত একটি ভাষা। এটি দাগিস্তান ও এর পার্শ্ববর্তী খাযার সাগরের পশ্চিম উপকূলবর্তী এলাকাসমূহে প্রচলিত রয়েছে। এ ভাষা বিশেষ করে সুপ্রসিদ্ধ ককেসীয় সেনাপতি ইমাম শামিলের[২৪] আমলে বিস্তার লাভ করেছিল।

এ দাগিস্তানি ভাষা বিভিন্ন ককেসীয় এলাকায় বেশ পরিচিত হয়ে উঠে। এ ভাষাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আরবি লিপিরীতি অনুযায়ী বহু গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা হয়। এ ভাষায় আরবি বর্ণগুলোর সাথে নিম্নোক্ত বর্ণগুলো বৃদ্ধি করা হয়।

১. چ তারা এটি ফারসি বর্ণ چ -এর এবং چشو মতো উচ্চারণ করে।
২. ژ উপরে তিন নুকতাবিশিষ্ট । এটি তারা tso-এর মতো উচ্চারণ করে।
৩. صّ উপরে তাশদিদযুক্ত ص। এটি তারা تسا -এর মতো উচ্চারণ করে।
৪. ڬ নিচে তিন নুকতাবিশিষ্ট কাফ। এটি তারা خها ' کها 'খা'-এর মতো উচ্চারণ করে থাকে।
৫. كّ উপরে তাশদিদযুক্ত কাফ। এটি তারা حهي ' کی'-এর মতো উচ্চারণ করে থাকে।
৬. ڸ নিচে তিন নুকতাবিশিষ্ট লাম। এটি প্রায় ث -এর মতো উচ্চারণ করা হয়।

এ ভাষায় তুর্কি ও ফারসি শব্দ ছাড়াও অসংখ্য আরবি শব্দ, বিশেষ করে ধর্মীয় শব্দগুলো অনুপ্রবেশ করেছে। অন্যান্য ইসলামি ভাষার মতো এ ভাষায়ও ধর্মীয় শব্দগুলো ভাব, মর্ম ও গঠন প্রভৃতি দিক দিয়ে আরবি রূপ নিয়ে স্ব-মহিমায় বিদ্যমান রয়েছে। দাগিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক লোক বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় কথা বলতে পারে; যদিও সাধারণ দাগিস্তানবাসীরা ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী বিশুদ্ধরূপে আরবি বলতে পারে না। বিখ্যাত পর্যটক রাশাদ বেগ চারকেসিয়ান ও দাগিস্তানিদের ভাষা প্রসঙ্গে বলেন,

> দাগিস্তানি ভাষা ছাড়া তাদের অধিকাংশ ভাষা পড়া ও লেখার উপযোগী নয়। দাগিস্তানিদের ভাষা পড়া যায় এবং এর নির্দিষ্ট লিখনরীতি রয়েছে। এতে ঠিক আরবি বর্ণগুলোই অনুসরণ করা হয়; তবে এর বাইরে নিচে তিন নুকতাবিশিষ্ট লাম ও কাফ-দুটি বর্ণ রয়েছে। প্রাচ্য কিংবা অন্য জায়গার কোনো ভাষার সাথে এ ভাষার কোনো সাদৃশ্য নেই; বরং এটি একটি স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ভাষা। এতে অসংখ্য আরবি শব্দ রয়েছে। পরবর্তীকালে তারা দাগিস্তানের কেন্দ্র—তায়মুর খান শুরায় কয়েকটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করেছিল। এগুলোতে বিশুদ্ধ আরবি ও দাগিস্তানি ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা ছাপা হয়।"

দাগিস্তানবাসীরা ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আরবি লিপিরীতি অনুসরণ করে তাদের ভাষা লিখতে শুরু করে। উল্লেখ্য যে, তারা খ্রিষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে ইসলাম গ্রহণ করে। দাগিস্তানে আরবি লিপিরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়—এ ধরনের অন্য একটি ভাষাও রয়েছে। এটি হলো: কুমুকি (Kumuki)। দাগিস্তানি ভাষার সাথে এর অনেক পার্থক্য রয়েছে।[২৫]

www.pathagar.com

ছ. চেরকেসীয় (Tcherkesses) ভাষা

চেরকেসীয় ভাষা ককেসাস এলাকায় চেরকেসীয় জাতির[২৬] মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। এরা বর্তমানে ফুবান ও তুর্ক নদীদ্বয়ের উপকূল এবং পশ্চিম ককেসাস পাবর্ত্য এলাকায় অবস্থিত চেরকেস ভূখণ্ডে বসবাস করে। চেরকেসরা সকলেই ইসলামধর্মের অনুসারী। তারা আরবি ভাষাতেই আজ পর্যন্ত লেনদেন এবং পত্রযোগাযোগ করে আসছে। তাদের পাঠ্যপুস্তক এবং শরয়ি ও ধর্মীয় গ্রন্থ হলো আরবি। ইসলামের ইতিহাসে তাদের বিরাট কৃতিত্ব রয়েছে। তারা মামলুক আমলে একটি মিসরীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের যে মাতৃভাষা ছিল, তাতে লেখার মতো কোনো বর্ণ ছিল না। এ কারণে লেখার জন্য তারা আরবি ও আরবি বর্ণমালাই ব্যবহার করত।

সম্প্রতি মুহাম্মদ কামাল বেগ চেরকেসি চেরকেসীয় ভাষা লেখার জন্য ফারসি ও তুর্কি প্রভৃতি ভাষার মতো আরবি বর্ণগুলোর আদলে তুর্কি ও ফারসি ভাষাদ্বয়ের অতিরিক্ত বর্ণগুলোর সাহায্য নিয়ে কিছু নতুন বর্ণ উদ্ভাবন করেন। তদুপরি তিনি কয়েকটি আরবি বর্ণকে ওপরে বা নিচে এক বা একাধিক নুকতা প্রদান করে চেরকেসীয় বর্ণে রূপান্তর করেন। তাছাড়া কয়েকটি বিশিষ্ট চেরকেসীয় বর্ণও তৈরি করেন। আরবি, ফারসি ও তুর্কিতে ব্যবহৃত স্বরচিহ্ন—জবর, জের ও পেশের পরিবর্তে তিনি সুনির্দিষ্ট কয়েকটি বর্ণও প্রণয়ন করেন। এ বর্ণগুলোকে তিনি স্বরবর্ণগুলো (حروف العلة)-র সাথে সংযুক্ত করেন। তাছাড়া তিনি চেরকেসীয় ভাষায় ব্যবহৃত অন্য স্বরচিহ্নগুলোর জন্যও কয়েকটি বর্ণ প্রবর্তন করেন। এভাবে এ ভাষায় বর্ণের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৯। তন্মধ্যে আরবি বর্ণ হলো ২৯টি। জবর, জের ও পেশের পরিবর্তে তিনটি বর্ণ, আর চারটি হলো ফারসি ভাষার অতিরিক্ত বর্ণসমূহ। অবশিষ্ট ২৩টি হলো চেরকেসীয় ভাষার নিজস্ব বর্ণ। তন্মধ্যে স্বরবর্ণ হলো ১২টি।[২৭]

জ. আম্বুরগীয় বা কিরগিজীয় তুর্কি

'আম্বুরগীয়' বা 'কিরগিজীয় তুর্কি' একটি তাতারি উপভাষা। এটি রাশিয়ার খাযর সাগরের উত্তরে অবস্থিত ওরেনবুর্গ ও অন্যান্য রাজ্যে এবং সাইবেরিয়ার পশ্চিম এলাকায় প্রচলিত রয়েছে। এটি কিরগিজ ও কাজাখ গোত্রসমূহের ভাষা। 'কাজাখ' একটি তাতারি শব্দ। এর অর্থ হলো নির্ভীক সাহসী অথবা বেদুইন। কাজাখরা ছিল অত্যন্ত শক্তিধর, সাহসী ও বীর যোদ্ধা।[২৮]

ঝ. জাগাতাই (Jagatai) তুর্কি

'জাগাতাই তুর্কি'কে স্ব-ভাষাভাষীরা 'তুর্কি ভাষা' নামে অভিহিত করে থাকে। এ কারণে ইউরোপিয়ানরা কখনো এ ভাষাকে 'প্রাচ্যীয় তুর্কি' (Turc Oriental) নামে অভিহিত করে থাকে। এটি তুর্কমেন এবং মধ্য এশিয়ার খাওয়ারিজিম ও বুখারা প্রভৃতি রাজ্যগুলোর সর্বসাধারণের ভাষা। এ ভাষার কেন্দ্রস্থল হলো মারি শহর। হিজরি ৯ম শতাব্দী থেকে অর্থাৎ যখন থেকে এ ভাষা উইগুরি ভাষার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে তখন থেকে আজ অবধি এ ভাষা আরবি বর্ণে লিখিত হয়ে আসছে। উল্লেখ্য, সেখানে আরবি লিপি উইগুরি লিপির[২৯] (দ্র. চিত্র-১১) স্থান দখল করে নেয়

www.pathagar.com

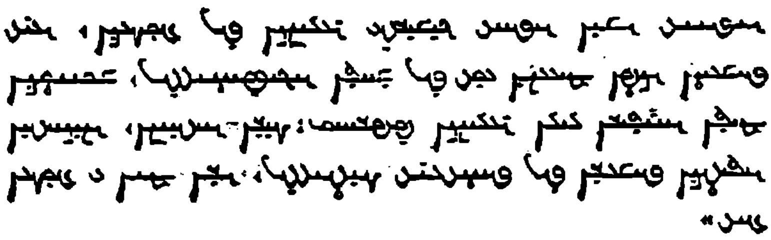

চিত্র-১১: উইগুরি লিপি

জাগাতাই ভাষায় আরবি লিপিতে লিখিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ হলো হিজরি ৯ম শতাব্দীতে প্রণীত মির আলী বানওয়ানির দিওয়ান। এরপর মোগল সম্রাট বাবর (মৃ. ৯৩৭ হি.) এ ভাষায় তাঁর দিওয়ান এবং তাঁর প্রসিদ্ধ আত্মজীবনী 'বাবর নামা'[৩০] লিপিবদ্ধ করেন। এরপর খাওয়ারিযিমের বাদশাহ আবুল মাগাযি (মৃ. ১০৭৪ খ্রি.) এ ভাষায় 'شجرة الترك' নামে তাতারদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন।[৩১]

ঞ. তিক্কি (Tekke Turkman) তুর্কি

'তিক্কি তুর্কি' তুর্কিস্তানের অন্যতম তুর্কমেন গোত্র-তিক্কার ভাষা। লক্ষ লক্ষ লোক এ ভাষায় কথা বলে। তারা অপরাপর তুর্কমেন জাতির মতো লেখার ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত জাগাতাই ভাষাও ব্যবহার করে থাকে।[৩২]

ট. উজবেক (Uzbec) তুর্কি

এটি তুর্কিস্তানের মার্ভে প্রচলিত উজবেকদের ভাষা। এ ভাষার কেন্দ্রস্থল হলো সমরকন্দ। লক্ষ লক্ষ লোক এ ভাষায় কথা বলে।[৩৩]

ঠ. কাশগড় (Kashgar) তুর্কি

'কাশগড় তুর্কি' তুর্কিস্তানের চীন অংশে প্রচলিত। এর কেন্দ্রস্থল হলো কাশগড় নগর। লক্ষ লক্ষ লোক এ ভাষায় কথা বলে।[৩৪]

উপর্যুক্ত ভাষাগুলো ছাড়াও আরো অনেক তুর্কি ভাষা ও উপভাষা রয়েছে, যেগুলো আরবি লিপিরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো: ক. 'বুখারি ভাষা'। এটি বুখারায় ব্যবহৃত হয়। খ. 'সাইবেরীয় ভাষা'। এটি সাইবেরিয়ায় প্রচলিত রয়েছে। গ. 'আনাদুলি ভাষা'। এটি আনাদুলে ব্যবহৃত হয়। ঘ.'বাশকিরি ভাষা'। এটি উরাল পর্বতমালার দক্ষিণে ব্যবহৃত হয়। ঙ. 'কারচি ভাষা' ও চ. 'দবান্দি ভাষা' প্রভৃতি। মোট কথা, সকল তুর্কি ভাষা ও উপভাষা সাধারণত আরবি লিপিরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়। আর এ ধারা মুসলমানদের তুর্কিস্তান বিজয় এবং তুর্কিদের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে শুরু হয়। *Encyclopedia Britannica*-তে তুর্কি ভাষা ও লিপি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

> আরবি বর্ণগুলো ব্যাপকভাবে তুর্কি ভাষাসমূহের লিপিগুলোতে ব্যবহৃত হয়; যদিও রাশিয়ায় কোনো কোনো গোত্র রুশ ভাষার বর্ণগুলো এবং এশিয়ার মাইনরের কিছু কিছু গোত্র আর্মেনীয় ও গ্রিক ভাষার বর্ণগুলো ব্যবহার করে থাকে।[৩৫]

www.pathagar.com

গ্রন্থসূত্র

১ মারযুক, ড. মুহাম্মদ আবদুল আজিজ, *আল-ফুনূনুয যাখরাফিয়্যাহ...*, পৃ ১৭৪-৬।

২ আল-আযাভি, আব্বাস, *আল-খাত্তুল 'আরবী ফী তুরকিয়া*, পৃ ২৯১-২৯২।

৩ দারমান, মুস্তফা আগুর, *ফান্নাল-খাত্ত*, পৃ ৩০-১।

৪ সুলতান আহমদ খান নিজ হাতে কুরআনের চারটি অনুলিপি লিপিবদ্ধ করেন। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন লিপিরীতি অবলম্বনে অসংখ্য লিপিচিত্রও প্রস্তুত করেন (দারমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৯৭)।

৫ সুলতান মাহমুদ খান নাসখ রীতি অবলম্বনে কুরআনের দুটি অনুলিপি লিপিবদ্ধ করেন (আল-জাব্বুরি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ৩৭৫)।

৬ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১০৯; আল-জাব্বুরি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ৩৭০।

৭ জাব্বুরি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ৪২৩; রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১১০।

৮ জাব্বুরি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ৪২৩।

৯ রিফা'ঈ,*প্রাগুক্ত*, পৃ ১১১।

১০ জাব্বুরি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ৪১৬; উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২১।

১১ আল-কুর্দি, মুহাম্মদ তাহির, *তারীখুল খাত্তিল 'আরবী...*, পৃ ১১৩।

১২ নাজি, যায়নুদ্দীন, *মুছাওয়ারুল খাত্তিল 'আরবী, প ৩৮০-২।*

১৩ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২২; জাব্বুরি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ৪১৩-৪; রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১১৩।

১৪ আল-কুর্দি, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১২০; আল-আযাভি, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪১৫; জাব্বুরি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ৪২৫।

১৫ তুরান Touran-এর দিকে সম্বন্ধ করে একে তুরানি বলা হয়। তুরান হলো তুর্কিস্থান। প্রাচীনকালে তুর্কিরা তাদের দেশকে তুরান নামে অভিহিত করত। আর তুর্কিরা পরিচিত ছিল তুর্কমেন নামে। সে-সময় পারসিকরা সভ্য জাতি হিসেবে দুনিয়া জোড়া খ্যাতি লাভ করেছিল। আর তুর্কিরা ছিল বেদুঈন স্বভাবের। যুদ্ধবিগ্রহ ও লুণ্ঠতরাজ ছিল তাদের প্রধান চরিত্র। তারা পারস্য ও পারস্যের বিভিন্ন কাফেলার ওপর আক্রমণ করত। এ কারণে তারা ইরানকে 'আলোর দেশ' এবং নিজেদের দেশ তুরান কিংবা তুর্কিস্তানকে 'অন্ধকারের দেশ' নামে অভিহিত করত।

১৬ মাল্টা ভাষা আরবি এবং ইতালি, বিশেষ করে সিসিলি ও অন্যান্য উপভাষার সমন্বিত রূপ। এর নয়-দশমাংশ শব্দ আরবি এবং অবশিষ্ট এক-দশমাংশ শব্দ ইতালি ও অন্যান্য ভাষা থেকে আগত। এটি আরব-মাগরিবের সাধারণ জনগণের ব্যবহৃত উপভাষা থেকে সৃষ্ট। মাল্টা ও গুদশ দ্বীপের জনসাধারণ এ ভাষায় কথা বলে। পরবর্তীকালে কমিনু ও কমিনুতু দ্বীপের লোকজনও এ ভাষায় কথা বলত। হিজরি ১৫২ সালে আরব কর্তৃক মাল্টা বিজয়ের মাধ্যমে আরবি শব্দ অনুপ্রবেশের ইতিহাসের সূচনা হয়। আর আরবরা যেহেতু সেখানে দীর্ঘ দুই শতাব্দীরও অধিক সময় ধরে অবস্থান করেছিল, তাই তাদের ভাষাটি সেখানে সর্বসাধারণের ভাষায় পরিণত হয়। অধিকন্তু, যখন আরবদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করা হয়, তখন সেখানকার অধিবাসীরা তাদের নিকট থেকে আরবি ভাষা প্রায় রপ্ত করে নিয়েছিল। এভাবে আরবি ভাষা সেখানে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হতে থাকে। তবে তাতে ক্রমে বিজেতাদের এবং নতুন নতুন অভিবাসীদের বিভিন্ন ভাষার শব্দও অনুপ্রবেশ করতে থাকে। কিন্তু ভাষার প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য শরণাপন্ন হওয়ার মতো তখন তাদের না ছিল কুরআন, না ছিল কোনো অভিধান। ফলে তাতে বিভিন্ন সময়ে আপতিত বিভিন্ন পরিবর্তন ও রূপান্তরের ফলে তা জগাখিচুড়িতে পরিণত হয়। কিছুদিন থেকে এ ভাষায় সাহিত্য ও পত্রপত্রিকা রচিত হলেও

www.pathagar.com

একে মিসর ও মাগরিবের ভাষার মধ্যে সংযোগ সৃষ্টিকারী আরবি উপভাষা হিসেবে গণ্য করা হয় না। তদুপরি তা লিপিবদ্ধ করা হয় ল্যাটিন অক্ষরে।

১৭ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৮-৪১।

১৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪১-৪৩।

১৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪৩।

২০ *প্রাগুক্ত।*

২১ আজারবাইজানের দিকে সম্বন্ধ করে একে আজারি বলা হয়।

২২ ককেসিয়া এলাকা দুই ভাগে বিভক্ত। এক. উত্তর-পূর্ব। এটি ইউরোপের মধ্যে পরিগণিত হয়। এর নামঃ সিস-ককেসিয়া (Cis-Caucasia)। দুই. দক্ষিণ-পশ্চিম। এটি এশিয়ার মধ্যে পরিগণিত হয়। এর নামঃ ট্রান্স-ককেসিয়া (Transcaucasia)। প্রথম ভাগে সিবতারুবোলম, কুবান ও তির্ক প্রভৃতি রাজ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে তিফলিস, বাকু, বাতুম ও আরিগান প্রভৃতি রাজ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২৩ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪৪।

২৪ ইমাম শামিলঃ ১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে দাগিস্তানে জন্ম লাভ করে। তিনি ত্রিশ বছরের অধিক সময় ধরে দাগিস্তানে রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং শেষাবধি তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করেন। তিনি ১৮৮০ সালে মৃত্যু বরণ করেন।

২৫ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪৪-৪৭।

২৬ চেরকেসীয়রা নিজেদেরকে 'আদগাহ জাতি' নামে অভিহিত করত।

২৭ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪৭-৪৮।

২৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪৯।

২৯ উগুরি লিপি সুরয়ানি নাস্তুরি লিপিরীতি থেকে উদ্ভূত। নাস্তুরি মিশনারিরা খ্রিষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে এটি আবিষ্কার করেন। এটি ১৪টি বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এর বর্ণগুলো পরস্পর সংযুক্ত। এগুলো বামদিক থেকে ডানদিকে উল্লম্ব অবস্থায় সারিবদ্ধভাবে স্তম্ভাকৃতিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। ফলে এতে বর্ণগুলো উল্টো দেখা যায়। এ লিপিতে উগুরি ভাষায় হিজরি ৫ম শতাব্দীতে সর্বপ্রথম গ্রন্থ "قوتوتغوبيلك" রচনা করা হয়। এর অর্থ হলো রাজনীতি বিজ্ঞান। এরপর এ লিপিতে অন্যান্য বহু গ্রন্থ রচনা করা হয়। বর্তমানে এ লিপিতে চীনের মানগু ভাষা লিপিবদ্ধ করা হয়।

৩০ সম্রাট বাবর তাইমুর লঙ্গের বংশোদ্ভূত একজন প্রসিদ্ধ বিজেতা। তিনি ১৪৮২ খ্রিষ্টাব্দে ফরগানায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩০ সালে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি আফগানিস্তান ও ভারত জয় করেন। তদুপরি তিনি একটি মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যা ভারতে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। তিনি একজন সাহসী ও দক্ষ যোদ্ধার পাশাপাশি জাগাতাই ভাষার একজন সুন্দর হস্তলিপিকারও ছিলেন। তিনি তাঁর দৈনন্দিন ঘটনাসমূহ একটি বিশেষ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। তিনি এ গ্রন্থটির নাম রাখেন 'বাবর নামা'। ঐতিহাসিকদের নিকট এ গ্রন্থের বিরাট সমাদর রয়েছে। এটি তাঁরা ইংরেজিতে অনুবাদও করেন।

৩১ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪৯-৫০।

৩২ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৫১।

৩৩ *প্রাগুক্ত।*

৩৪ *প্রাগুক্ত।*

৩৫ *Encyclopedia Britannica*. vol. XX111, P 661.

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

ভারত ও দূর প্রাচ্যে আরবি লিপির প্রচলন

মোগলরা ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামি লিপি ও শিল্পকলা সংরক্ষণে প্রবল উৎসাহ দেখায়। তাদের সাহায্যে কুরআনের প্রাচীন অনেক পাণ্ডুলিপি ও পারস্যের মহাকাব্য *শাহনামার* অঙ্গ সজ্জিত হয় ইসলামি চিত্রকলার মাধ্যমে।

মোগল আমলে ভারতীয় উপমহাদেশ লিপি ও শিল্পকলাতে ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভ করে। পারস্যে বহুল প্রচলিত আরবি লিপিকলার ধারাসমূহ আফগানিস্তান ও মোগল-ভারতে প্রবর্তিত হয়। বলা বাহুল্য, মোগল ভারতে 'নাস্তালিক' রাজকীয় লিপির মর্যাদা লাভ করে। কুরআন শরিফের অনুলিপি প্রণয়ন আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত মনে করে সুলতানি ও মোগল আমলে বহু শাসক কুরআন নকল করতেন এবং তা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। উদাহরণস্বরূপ মামলুক বংশের নাসিরুদ্দীন মাহমুদ এবং বাদশাহ আওরঙ্গজেবের কথা উল্লেখ করা যায়। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিত লিপিকার। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ বাবর লিপিকলার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং ১৫০৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'খত্তে বাবরি' নামে এক প্রকার হস্তলিপি প্রচলন করেন। মোগল বাদশাহ আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আলমগীরের আমলে মুসলিম লিপিকলার অসামান্য বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধিত হয়।[১] মোগল দরবার ছাড়াও গুজরাট, দাক্ষিণাত্য, সিন্ধু, পাঞ্জাব, কাশ্মির ও বাংলা প্রভৃতি প্রদেশেও আরবি লিপিকলার চর্চা হয় এবং লিপিকারগণ অসামান্য অবদান রাখেন। ভারতীয় লিপি-শিল্পীদের বেশ কিছু শিল্পরুচির নিদর্শন ইরানে এখনো সংরক্ষিত আছে। মোগল আমলের বহু পাণ্ডুলিপি ব্রিটিশ শাসনামলে পাচার করে বা নামে মাত্র মূল্যে ক্রয় করে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হয়, যা লন্ডন মিউজিয়ামে কালের সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

বিহারি লিপিরীতি

বিহারি লিপিরীতি আরবি লিপিকলার একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শৈলী। এটি আফগানিস্তান, ভারত ও বাংলায় প্রচলিত ছিল। আরব বিশ্বে এর ব্যবহার খুব একটা দেখা যায় না। কেউ কেউ মনে করেন, পূর্ব ভারতের বিহার প্রদেশের দিকে সম্বন্ধ করে একে 'বিহারি লিপি' নামে অভিহিত করা হয়। এ লিপির উৎপত্তিকাল ও স্থান সুনির্দিষ্ট করে বলা দুরূহ। বিভিন্ন জায়গায় প্রাপ্ত উপকরণের ভিত্তিতে ধারণা করা হয় যে, এ লিপিরীতি হিজরি ৭ম ও ৮ম শতাব্দীদ্বয়ের মধ্যবর্তী সময়ে ভারত বা এর পার্শ্ববর্তী আফগানিস্তানে উৎপত্তি লাভ করেছিল।[২] সাফাদি বলেন, "A minor script called Behari appeared in India during the fourteenth century."[৩]

এ লিপিরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—এতে অক্ষরগুলো প্রথমে ক্ষীণভাবে শুরু হয়ে ক্রমে ক্রমে মধ্যভাগে এসে মোটা রূপ ধারণ করে; পুনরায় ক্ষীণ হতে শুরু করে এবং

www.pathagar.com

ক্রমে শেষ ভাগে গিয়ে ক্ষীণতর রূপ ধারণ করে। তাছাড়া এতে অনুভূমিক রেখাসম্বলিত বর্ণসমূহ (الحروف الأفقية) যেমন সিন ও ইয়া প্রভৃতির দৈর্ঘ্যকে অন্যান্য রীতির তুলনায় অধিক প্রসারিত করা হয়। তদুপরি এর বর্ণগুলো সুলুস বর্ণগুলোর মতো ধাবমান হয় এবং এর খাড়া বর্ণ যেমন আলিফ ও লাম প্রভৃতির লম্বগুলোকে দীর্ঘ উল্লম্ব রেখায় পরিণত করা হয়। এ লিপিরীতি নাসখি কিংবা নাস্তালিকের তুলনায় একটি হ্রস্ব ছন্দ ও শুষ্ক শৈলী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ জন্য অনেকেই একে কুফিরীতির একটি প্রকরণ হিসেবে গণ্য করেছেন।[৬] (দ্র. চিত্র-১)। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাচ্যের কুফী রীতি (Eastern Kufic), বিশেষত আফগানিস্তানের হিরাত নগরীতে ব্যবহৃত হিরাতি কুফিরীতি (Hirati Kufic)-এর সাথে এ রীতির সাদৃশ্য দেখা যায়। তদুপরি সুদান ও শাদে ব্যবহৃত মাগরিবি লিপির অন্যতম প্রকরণ সুদানি লিপির সাথেও এ রীতির সামান্য সাদৃশ্য রয়েছে। (দ্র. চিত্র-২ ও ৩) এর শেষাংশে 'রায়হানের' মতো সুচাগ্র অথবা নাস্তালিকের মতো ভোঁতা ও স্থূল বিন্দুতে পরিসমাপ্তি ঘটে। সাফাদি মনে করেন যে, বিহার লিপিশৈলী পরবর্তীকালে অটোমান সাম্রাজ্যে 'সিয়াকত' নামে এক লিখনরীতির অভ্যুদয়ে প্রভাব বিস্তার করে[৫] (দ্র. চিত্র-৪)।

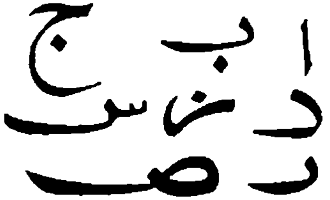

চিত্র-১: বিহারি বর্ণ

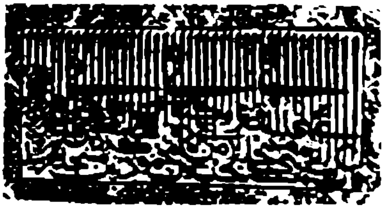

চিত্র-২: বিহারি লিপি, বাংলা, ১৪৬৬ খ্রি.

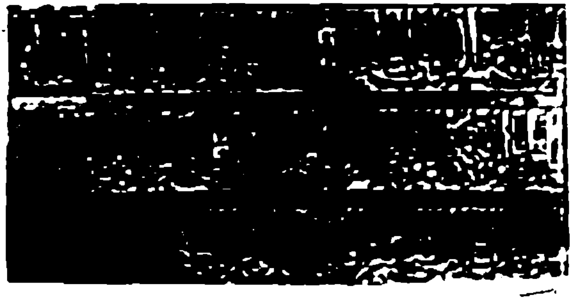

চিত্র-৩: বিহারি লিপি, বাংলা ১৪২৬ খ্রি

(এটি বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘর ঢাকায় সংরক্ষিত আছে)

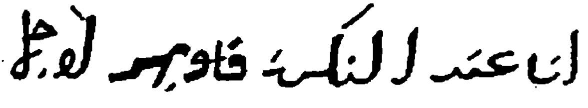

চিত্র-৪: সিয়াকত লিপি, তুরস্ক

www.pathagar.com

এ রীতির অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন হলো আমির সদরুদ্দীন আগা খানের গ্রন্থভান্ডারে সংরক্ষিত কুরআনের একটি অনুলিপি। এটি ৮০১ হিজরি/ ১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের গোয়ালিয়র দুর্গে লিপিবদ্ধ করা হয়। এ ছাড়া আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনের Chester Betty Library-তে এবং ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাদুঘরে এ লিপিরীতি অবলম্বনে লিখিত বেশ কয়েকটি কুরআনের অনুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে। প্রধানত এ রীতি কুরআনের অনুলিপি তৈরির ক্ষেত্রেই সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। এ রীতিতে লিখিত কুরআনের অনুলিপিগুলোতে কালো, লাল, নীল, সোনালি প্রভৃতি রঙের কালির ব্যবহার দেখা যায় (দ্র. চিত্র-৫)। শিলালিপি উৎকীর্ণ করার কাজে এর ব্যবহার খুব একটা দেখা যায় না। এ রীতিতে উৎকীর্ণ শিলালিপিসমূহের মধ্যে হিজরি ৮৫৩/ খ্রি. ১৪৩২ সালে উৎকীর্ণ সুলতানগঞ্জের শিলালিপিটি অন্যতম। এ ছাড়া কলিকাতার ভারতীয় জাদুঘরেও হি. ৯৬৭/ খ্রি. ১৫৬০ সালের একটি আরবি শিলালিপি সংরক্ষিত রয়েছে। এতে বিহারি লিপির প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায় (দ্র. চিত্র-৬)। রাজশাহীর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে একটি শিলালিপি রয়েছে। এ লিপিতে বিহারি লিপিরীতির প্রভাব দেখা যায়। এতে রচনাকাল উৎকীর্ণ করা হয়নি। সম্ভবত এটি মোগল আমলে উৎকীর্ণ করা হয়। কেননা, এতে বাদশাহ শাহজাহানের (১৬২৬-১৬৫৮ খ্রি.) আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়াও গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহের আমলে (১৩১০-১৩২৩ খ্রি.) উৎকীর্ণ উজির বেলডাঙ্গা শিলালিপি (দ্র.চিত্র-৭)-তে বিহারি লিপির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

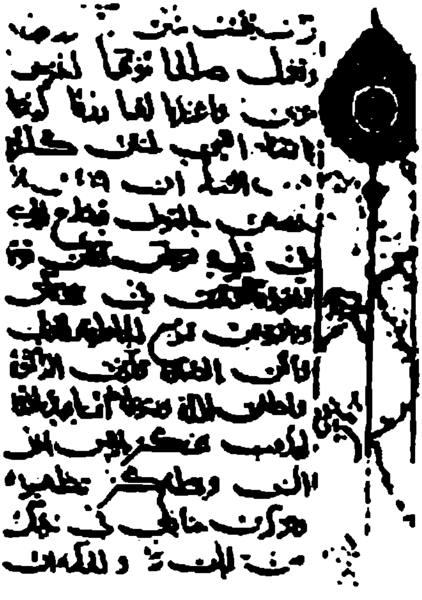

চিত্র- ৫: বিহারি রীতিতে কুরআন

www.pathagar.com

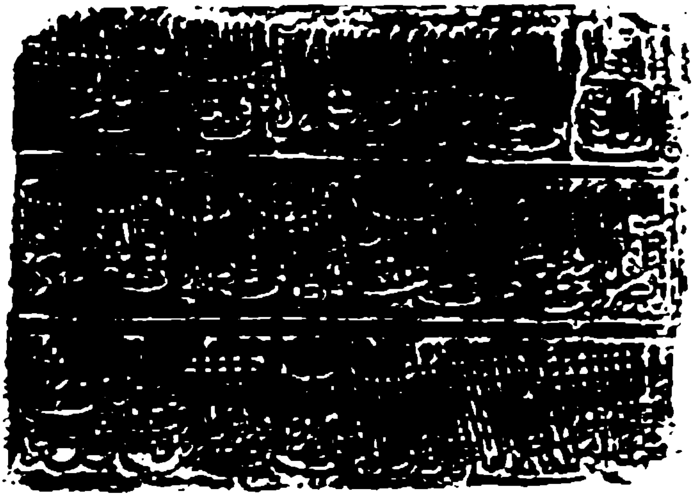

চিত্র-৬: বিহারি লিপি, কলিকাতা, ১৫৬০ খ্রি.

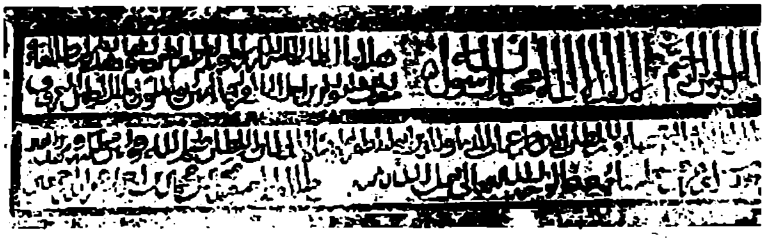

চিত্র-৭: বিহারি লিপি সুলতান বাহাদুর শাহের আমলে (১৩১০-১৩২৩ খ্রি.)

কাশ্মিরি লিপিশিল্প

মধ্যযুগের ভারতীয় ক্যালিগ্রাফির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো কাশ্মিরি ক্যালিগ্রাফি। কাশ্মিরের মুসলিম সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ঔজ্জ্বল্যের অনুপম নিদর্শন হচ্ছে এই ক্যালিগ্রাফি। আশ্চর্যের বিষয় হলো, ক্যালিগ্রাফির এই অত্যাশ্চর্য উত্থান সম্পর্কে তেমন কোনো গবেষণা হয়নি। সে সময়ের অনিন্দ্যসুন্দর অলংকরণ, ক্যালিগ্রাফির ছন্দময়তা আমাদের গৌরবময় ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

উল্লেখ্য যে, কাশ্মিরের প্রাচীন ক্যালিগ্রাফির প্রায় সবটুকু আরবি ক্যালিগ্রাফি এবং এগুলো সমসাময়িক অন্যান্য ক্যালিগ্রাফির সমমর্যাদা ও মানসম্পন্ন। মধ্যযুগে কাশ্মিরের ক্যালিগ্রাফি শুধু আরবি ভাষাকে প্রচার-প্রসার করেনি; বরং একে সুসংহতও করেছে। মুসলিম শাসকদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা ও আগ্রহে ক্যালিগ্রাফি বিস্ময়কর পর্যায়ে উপনীত হয়।

www.pathagar.com

কাশ্মিরের কিছু কিছু ক্যালিগ্রাফার ক্লাসিক ক্যালিগ্রাফিতে প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বিশেষ করে সুলতানি আমল এবং পরবর্তী মোগল শাসনামলে যখন কাশ্মিরি ক্যালিগ্রাফারগণ অমোচনীয় কালি আবিষ্কার করেন, তখন থেকে ক্যালিগ্রাফিতে প্রাকৃতিক প্রতিবেশ সন্নিবেশিত হয়।[৬]

মুহাম্মদ হুসায়ন কাশ্মিরি সম্রাট আকবরের দরবারি ক্যালিগ্রাফারদের অন্যতম ছিলেন। সম্রাট তাঁকে 'জরিন কলম' (স্বর্ণ-কলম) উপাধি দিয়েছিলেন। আবুল ফজল বলেন, "তিনি সেই শিল্পী, যিনি সম্রাটের সিংহাসনের ছায়া ছিলেন। শ্রেষ্ঠ ক্যালিগ্রাফারদের মধ্যে অন্যতম তিনি। মুহাম্মদ হুসায়ন তাঁর ওস্তাদ আবদুল আজিজকেও অতিক্রম করে যান" (দ্র. চিত্র-৮)। তাঁর মাদ্দাত (বিস্তৃতি বা প্রসারণ) ও দাওয়ায়ির (গোলাকার বৃত্ত) উভয়ে একে অপরের পরিপূর্ণ পরিপূরক ছিল এবং ক্যালিগ্রাফির শিল্পরূপটি নিখুঁত ছিল বলে তাঁকে মোল্লা মির আলীর সমকক্ষ ধরা হয়। মোল্লা মির আলীকে 'জাদু রকম' (লেখার জাদুকর) বলা হতো। মুহাম্মদ হুসায়নের এই মহান কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে একটি হাতি উপহার দেন। এই বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার ১০২০/১৬১১ সালে সম্রাট আকবরের মৃত্যুর ছয় বছর পর মৃত্যুবরণ করেন।

চিত্র-৮: মুহাম্মদ হুসায়ন কাশ্মিরি কর্তৃক অঙ্কিত ক্যালিগ্রাফি

আলী চমন কাশ্মিরী অনুরূপ বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার। তিনিও সম্রাট আকবরের দরবারি ক্যালিগ্রাফারদের অন্যতম। কাশ্মিরের ক্যালিগ্রাফির উন্নয়নে তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

মুহাম্মদ মুরাদ কাশ্মিরি সম্রাট শাহজাহানের দরবারি ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। তাঁর ক্যালিগ্রাফির সৌন্দর্য ও নজরকাড়া অলংকরণে মুগ্ধ হয়ে মোল্লা মীর আলী ও সুলতান আলী কর্তৃক তিনি অভিনন্দিত হন। তিনি মোটা, ভারী ও চিকন হালকা উভয় স্ক্রি[illegible] দক্ষ ছিলেন। সম্রাট শাহজাহান তাঁর কাজে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'শিরিন কলম' [illegible] কলম) উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজের মধ্যে কয়েকটি জগদ্বিখ্যাত।

www.pathagar.com

মোল্লা মহসিন, যিনি মুহাম্মদ মুরাদের ছোট ভাই, তিনিও একজন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার। আর তাঁরা উভয়ই প্রসিদ্ধ কবি হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। তাঁদের পিতা ছিলেন কাশ্মিরের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী।

মোল্লা বাকের কাশ্মিরি একজন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার। তিনি সম্রাট শাহজাহানের দরবারি ক্যালিগ্রাফারদের অন্যতম ছিলেন। তিনি নাস্তালিক, তালিক, নাসখ এবং শিকাস্তা প্রভৃতি স্ক্রিপ্টে সুদক্ষ ছিলেন।

কাশ্মিরি ক্যালিগ্রাফারদের মাধ্যমে আমরা দুটি দিকের চিত্র দেখতে পাই। একটি হচ্ছে আরবি ক্যালিগ্রাফির—কুফি, নাসখ, ছুলুস, মাকরামাত, রিকা ও রায়হান। অন্য দিকে ফারসির—নাস্তালিক, শিকাস্তা, গুলজার, নাখুন, শিকাস্তা আমিয ও শাফিয়া প্রভৃতি।[৭]

ভারতীয় ভাষাসমূহে আরবি বর্ণমালা ও লিখনরীতির ব্যবহার

ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে যে ভাষাগুলোতে আরবি বর্ণমালা ও আরবি লিখনরীতি ব্যবহৃত হয় সেগুলো হলো—

ক. উর্দু ভাষা

ইংরেজ আমলে উর্দু ভাষা ভারতে, বিশেষ করে মধ্য-ভারতের দেশসমূহে ব্যবহৃত হতো। এটি মূলত ভারতের মুসলমানদের ভাষা। এতদঞ্চলের অধিকাংশ মুসলমান এ ভাষায় কথা বলে। এটি মূলত হিন্দি ভাষা[৮] থেকে উদ্ভূত। হিন্দি ভাষায় কাল পরিক্রমায় অসংখ্য আরবি ও ফারসি শব্দ অনুপ্রবেশ করেছিল এবং এভাবে তা থেকে অন্য একটি স্বতন্ত্র ভাষা অস্তিত্ব লাভ করে। ভারতের মুসলিম বিজয়কালে এ ভাষার উৎপত্তি হয়। সর্বপ্রথম মুসলমানরা এ ভাষায় কথা বলে। শুরু থেকেই এটি আরবি লিপিরীতিতে লিখিত হয়ে আসছে। Dr. Gustave Le Bon বলেন,

> ভারতীয় ভাষাগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হলো সর্বাধুনিক ভাষা 'উর্দু'। কেননা এর বয়স তিনশত বছরের বেশি নয়। এটি ভারত বিজেতাদের ভাষা ফারসি ও আরবি এবং স্থানীয়ভাবে বহুল প্রচলিত হিন্দি ভাষার সংমিশ্রণে জন্ম লাভ করে। বিজেতা এবং বিজিত উভয়েই অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাদের পূর্বের ভাষা ভুলে যায় এবং নতুন ভাষাটিকে নিজেদের সাধারণ ভাষা হিসেবে বরণ করে নেয়, যা উভয় দলের লোকদের সংমিশ্রণে সৃষ্ট নতুন জাতির জন্য অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।[৯]

এক সময়ে ইউরোপ এবং উত্তর ও পশ্চিম ভারতের লোকদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য এ উর্দু ভাষাই ছিল একমাত্র মাধ্যম। তবে বর্তমানে ইংরেজি ভাষার অধিক প্রচলনের কারণে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে এর ব্যবহার কিছুটা হ্রাস পায়।[১০]

ভারতীয় মুসলমানরা এ ভাষা লেখার জন্য আরবি বর্ণগুলোর সাথে আরো নতুন সাতটি বর্ণ সংযোজন করে। তন্মধ্যে তিনটি বর্ণ হলো ভারতীয়। এগুলো 'চার নুকতাবিশিষ্ট বর্ণ' হিসেবে পরিচিত। এগুলো হলো—১. ٹ ওপরে চার নুকতাবিশিষ্ট া। এটি তা ও তোয়ার মধ্যস্থল থেকে উচ্চারণ করা হয়। ২. ڈ ওপরে চার তাবিশিষ্ট দাল। এটি দাল ও দোয়াদের মধ্যস্থল থেকে উচ্চারণ করা হয়। ৩. ڑ উপরে

চার নুকতাবিশিষ্ট রা। এটি রা ও গায়নের মধ্যস্থল থেকে উচ্চারণ করা হয়। অনেকেই এ বর্ণগুলোতে নুকতা চতুষ্টয়ের পরিবর্তে তোয়া কিংবা হামযার মতো একটি চিহ্ন বসিয়ে থাকে। অপর চারটি বর্ণ হলো পূর্বোক্ত ফারসি ভাষার নতুন চারটি বর্ণ। এভাবে এ ভাষায় বর্ণের সংখ্যা দাড়াঁয় ৩৫। পরবর্তীকালে এতে গুন্নাহযুক্ত নুন (ں) ও ইয়া মাজহুল (ے) নতুন বর্ণরূপে সংযোজিত হয়। তাছাড়া যুক্ত বর্ণসমূহের জন্য এ ভাষা সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালায় একটি অতি মূল্যবান সংস্কার সাধন করত দ্বি চক্ষুবিশিষ্ট 'হা' (ھ) এবং 'হা হাওয়ায' (ہ) এ দুটি বর্ণের উচ্চারণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে।

হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত উত্তর ভারতের প্রাদেশিক ভাষাসমূহের ওপর উর্দু ভাষার অত্যন্ত গভীর প্রভাব রয়েছে। কাশ্মির ও পাঞ্জাব থেকে আরম্ভ করে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূখণ্ডের ভাষাসমূহে উর্দু ভাষার বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য, উত্তর ভারতে উর্দু ভাষা নামে অন্য একটি ভাষাও প্রচলিত রয়েছে। এটি ফারসি লিপিরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়। এটি প্রথমোক্ত উর্দু ভাষার চেয়ে কিছুটা ভিন্ন। মুসলিম ভারতের প্রাচীন রাজধানী দিল্লিই ছিল এ ভাষার কেন্দ্রস্থল।

খ. দখনি ভাষা

দখনি ভাষা 'পশ্চিমা হিন্দি'র একটি উপভাষা। 'পশ্চিমা হিন্দি' ভারতের দাক্ষিণাত্য ও মাদ্রাজে প্রচলিত রয়েছে। এখানে মুসলমান কবিদের দ্বারা ভাষাটি বিশেষভাবে অনুশীলিত হয়েছিল। এ ভাষার সাহিত্যের ভাষাই 'দখনি' নামে পরিচিত। দখনি-জাত হিন্দুস্থানিরই বিভাষা হলো উর্দু। এ ভাষা উর্দু বর্ণমালাকে অনুসরণ করে লিপিবদ্ধ করা হয়।

গ. কাশ্মিরি ভাষা

'কাশ্মিরি ভাষা' ইরানি ভাবধারায় সঞ্জাত ভাষাগুলোর মধ্যে একটি প্রধান ভাষা। এটি কাশ্মির অঞ্চলের মুখ্য ভাষা। এ ভাষায় লক্ষ লক্ষ লোক কথা বলে; তবে তাদের অধিকাংশই হলো মুসলমান। অনেক কাল থেকে কাশ্মিরি ভাষায় সাহিত্য সৃষ্ট হয়ে আসছে। তবে প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শন খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর রচনা-শৈবতন্ত্রাচার্য লল্লার লেখা কয়েকটি কবিতা। পূর্বে এ ভাষা ব্রাহ্মি লিপি থেকে উদ্ভূত শারদা লিপিতে লেখা হতো।[১১] হিজরি ৫ম শতাব্দীর শুরু থেকে অর্থাৎ যখন সেখানে আমিনুদ্দৌল্লাহর হাতে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করে তখন থেকে কাশ্মিরিরা আরবি লিপিরীতি অনুযায়ী ফারসি অক্ষরে তাদের ভাষার লেখার কাজ চালাতে থাকে।[১২]

ঘ. সিন্ধি (Sindhi) ভাষা

'সিন্ধি' পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশ ও কচ্ছের ভাষা। এটি আধুনিক ভারতীয়-আর্য ভাষাসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এর তিনটি উপভাষা রয়েছে। এগুলো হলো :

ক. সিরায়কি (Siraiki) উপভাষা। এটি সিন্ধুর উচ্চ ভূমিতে প্রচলিত রয়েছে।

খ. লারি (Lari) উপভাষা। এটি সিন্ধুর অববাহিকায় প্রচলিত রয়েছে।

গ. থরেলি (Thareli) উপভাষা। এটি থর (Thar) মরু এলাকায় প্রচলিত রয়েছে। এর কেন্দ্রস্থল হলো করাচি (সিন্ধু নদের অববাহিকার নিকটবর্তী নগর)।[১৩]

www.pathagar.com

অন্যান্য ভাষার মতো এ ভাষায়ও অসংখ্য আরবি শব্দ ও বাগধারা অনুপ্রবেশ করেছে। এ ভাষা আরবি লিখনরীতি 'নাসখি' অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়। এ ভাষায়ও লক্ষ লক্ষ লোক কথা বলে।

উল্লেখ্য যে, প্রথমদিকে সিন্ধি ভাষায় উর্দু ভাষার মতো অন্য বর্ণের সাথে দ্বিচক্ষু বিশিষ্ট হা (ھ) বর্ণকে যুক্ত করে বিভিন্ন যুক্ত বর্ণ গঠন করা হতো। পরবর্তীকালে এটা এদেশে ইংরেজ শাসন কায়েম হওয়ার প্রথমদিকে স্বীয় বর্ণমালাকে পর্যালোচনা করে کھ گھ بھ پھ ٹھ تھ ڈھ دھ جھ چھ ইত্যাদি যুক্ত বর্ণগুলোকে একক বর্ণ ধরে এদের প্রত্যেকটির জন্য স্বীয় বর্ণমালায় একেকটি একক বর্ণ সংযোজিত করে। এভাবে সিন্ধি ভাষায় এর নিজস্ব ধ্বনিসমূহের জন্য ব্যবহৃত বর্ণমালা ভিন্ন অতিরিক্ত আট/দশটি নতুন বর্ণ সংযোজিত হয়।[১৪]

ঙ. জাতকি (Jatki) ভাষা

'জাতকি ভাষা' পাকিস্তানের মুলতান ও উত্তর বেলুচিস্তানে প্রচলিত রয়েছে। এর কেন্দ্রস্থল হলো মুলতান নগর। এটি 'মুলতানি (Multani) ভাষা' নামেও পরিচিত। এটি ফারসি বর্ণসমূহের আকৃতিতে আরবি লিপিরীতি অনুসরণ করে লিপিবদ্ধ করা হয়। এটি মূলত পাঞ্জাবি ভাষার দক্ষিণাঞ্চলীয় শাখা, যা দক্ষিণ পাঞ্জাবে ব্যবহৃত হয়। আর উত্তরাঞ্চলীয় শাখা হলো দরজি (Dorgi) ভাষা। এটি উত্তর পাঞ্জাবে ব্যবহৃত হয়। এ ভাষায়ও লক্ষ লক্ষ লোককথা বলে।[১৫]

চ. মালকি বা মালয় ভাষা

'মালকি' বা 'মালয় ভাষা' মালয়-পুলিঞ্জিয়া ভাষা-পরিবারের অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। এটি মালকা উপদ্বীপ ও মালয় (মালয়েশিয়া) দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত রয়েছে। এটি আরবি লিপিরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়। তবে সর্বত্র এর লেখার ধরন ও প্রকৃতি এক নয়। জাভা ও সুমাত্রায় যেভাবে এটি লেখা হয়ে থাকে, মালকায় তার লেখার ধরন তার চাইতে কিছুটা ভিন্ন। এর কারণ হলো: এ ভাষায় বহু ধরনের উপভাষা রয়েছে। মালকি বা মালয় ভাষা বিশেষ করে রাজ্যের দ্বীপসমূহে শুধু বাণিজ্যিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রচলিত রয়েছে। বিভিন্ন সময় বহিরাগতদের সংস্পর্শে আসার ফলে ভাষাটিতে বিভিন্ন বিদেশি ভাষার সুস্পষ্ট প্রভাব পড়ে। বিদেশি ভাষা ও সাহিত্যের অনেক নিদর্শন এ ভাষায় দেখতে পাওয়া যায়। এতে বিশেষ করে সংস্কৃত ভাষার প্রচুর শব্দ অনুপ্রবেশ করেছে। উল্লেখ্য, এ ভাষায় আরবি ভাষার প্রভাব যতটুকু দেখা যায়, তার চাইতে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব অনেক স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। অথচ মালয়রা অসংখ্য ইসলামি শব্দও গ্রহণ করেছে। তাছাড়া দীর্ঘদিন মালয়েশিয়া পর্তুগিজদের আধিপত্যাধীন থাকার ফলে এ ভাষায় অনেক পর্তুগিজ শব্দও অনুপ্রবেশ করেছে।

মালয়রা আরবদের নিকট থেকে আরবি বর্ণগুলো গ্রহণ করে। এরপর নিজেদের ভাষার জন্য সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ধ্বনির জন্য কতিপয় নতুন বর্ণও উদ্ভাবন করে। এ নতুন বর্ণগুলো হলো: ১. তিন নুকতাবিশিষ্ট জিম چ। এটি তারা تشا -এর মতো উচ্চারণ

করে থাকে। ২. তিন নুকতাবিশিষ্ট গায়ন ڠ। এটি তারা نجا-এর মতো উচ্চারণ করে থাকে। ৩. তিন নুকতাবিশিষ্ট ফা ڤ। এটি پا -এর মতো উচ্চারণ করা হয়। ৪. ওপরে এক নুকতাবিশিষ্ট কাফ ڬ। এটি جا-এর মতো উচ্চারণ করা হয়। ৫. ওপরে তিন নুকতাবিশিষ্ট নুন ڽ। এটি نيا -এর মতো উচ্চারণ করা হয়।

মালয় কিংবা মালকি ভাষায় আরবি লিপির ব্যবহার ছিল মালকা ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র একচ্ছত্র। তবে পূর্ব সুমাত্রার মাম্বগে প্রাচীন ব্রাহ্মি অক্ষরে লেখার কাজ সমাধা করা হতো। তবে সংখ্যাগুলো মালয়রা সর্বত্র হিন্দির পরিবর্তে আরবি সংখ্যায় লিখত।[১৬]

আরবি লিপিতে লিখিত ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হলো 'ফিলিপাইনদের ভাষা'। এ সম্পর্কে পরে বিশদ আলোচনা করা হবে।

ছ. জাভি (Javanese) বা পেগন (Pegon) ভাষা

জাভি বা পেগন ভাষা মালয় ভাষার একটি শাখা। এটি জাভা দ্বীপে প্রচলিত রয়েছে। জাভিদের বিভিন্ন উপভাষা রয়েছে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো:

ক. সান্দি (Sundanese) ভাষা। জাভা দ্বীপের পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীরা এ ভাষায় কথা বলে।

খ. মাওদিরি (Mouderese) ভাষা। এটি দ্বীপের পূর্বাঞ্চলের লোকদের ভাষা।

গ. জাভি ভাষা। এটি দ্বীপের মধ্যাঞ্চল ও কয়েকটি এলাকায় প্রচলিত রয়েছে।

এসব উপভাষাতে সর্বদা সংস্কৃত ভাষার প্রভাব দেখা যায়। 'নজুকু' নামে জাভিদের অন্য একটি সাধারণ্যে বহুল প্রচলিত উপভাষা রয়েছে। এটি 'করিমা' নামে পরিচিত বিশুদ্ধ উপভাষা থেকে অনেকটা ভিন্ন। তারা এ বিশুদ্ধ উপভাষা-করিমায় তাদের ঘটনাবলি, কবিতা ও গল্প প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করে থাকে। এ দুটি উপভাষার মাঝে অন্য একটি মধ্যবর্তী উপভাষা রয়েছে। এটি 'মাদিয়া' নামে পরিচিত। জাভাবাসীদের লিপির ধরন ও প্রকৃতি ছিল আরবি; তবে তারা আরবি বর্ণমালায় অতিরিক্ত বিন্দু যুক্ত করে নিজেদের ভাষার প্রয়োজন পূরণ করেছে। নিম্নে তাদের বর্ণগুলোর বিবরণ প্রদত্ত হলো।

১. ا একে তারা 'ইলব' (إلب) উচ্চারণ করে থাকে।

২. ب এতে তারা এক নুকতার পরিবর্তে তিন নুকতা বসিয়ে থাকে। কিন্তু এর উচ্চারণ তারা আরবি ب এবং ইংরেজি b-এর মতোই করে থাকে।

৩. ت

৪. ث

৫. جـ একে তারা মিসরীয় ج এবং ইংরেজি শব্দ God -এর মধ্যস্থিত G -এর মতো উচ্চারণ করে থাকে।

৬. جـ একে তারা সিরীয়দের আরবি বর্ণ ج এবং ইংরেজি শব্দ age -এর মধ্যস্থিত g -এর মতো উচ্চারণ করে থাকে।

৭. حـ একে তারা ح ও هـ এর মধ্যস্থল থেকে উচ্চারণ করে থাকে।

৮. خـ একে তারা সামান্য জেরের দিকে ঝুঁকিয়ে আরবি বর্ণ خ-এর মতো উচ্চারণ করে থাকে।

www.pathagar.com

৯. د
১০. ذ একে তারা ফারসি বর্ণ ج -এর মতো উচ্চারণ করে থাকে।
১১. ر
১২. ژ একে তারা সিরীয়বাসীদের ج-এর উচ্চারণের প্রায় কাছাকাছি ইংরেজি বর্ণ j -এর মতো উচ্চারণ করে থাকে।
১৩. س তারা একে পৃথক অবস্থায় চারটি দাঁত যোগে লিপিবদ্ধ করে থাকে।
১৪. ش
১৫. ص
১৬. ض
১৭. ط
১৮. ظ
১৯. ع একে তারা সামান্য জেরের দিকে ঝুঁকিয়ে আরবি বর্ণ ع -এর মতো উচ্চারণ করে থাকে।
২০. غا আরবি ভাষায় এ বর্ণের উচ্চারণের কোনো নমুনা নেই। এটি তারা জিহ্বাকে খাড়াভাবে নেড়ে কণ্ঠনালির উপরভাগ থেকে উচ্চারণ করে থাকে। এটি একই সাথে আরবি বর্ণ ر , غ ও ن -এর সাথে মিল রাখে। যেমন জাভি শব্দ اورغ (এর অর্থ: মানুষ) -কে তারা اورغان উচ্চারণ করে থাকে।
২১. غ একে তারা আরবি বর্ণ ف -এর মতো উচ্চারণ করে থাকে।
২২. ف একে তারা ইংরেজি বর্ণ v ও p -এর মধ্যস্থল থেকে উচ্চারণ করে থাকে।
২৩. ك একে তারা মোটা স্বরে 'কাব' (كاب) উচ্চারণ করে থাকে।
২৪. ق একে তারা মোটা স্বরে 'ক্বব' (قب) উচ্চারণ করে থাকে।
২৫. ل
২৬. م
২৭. ن
২৮. ها
২৯. و
৩০. لا একে তারা 'লা আলিব' (لا ألب) উচ্চারণ করে থাকে।
৩১. ي

জাভি ভাষায় সংখ্যা বোঝানোর জন্য আলাদা কোনো চিহ্ন ছিল না; বরং তারা বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যাগুলো লিখত। জাভি লিপিরীতির অনুকরণে 'ছুলু উপভাষা' (Solo dialect)ও লিপিবদ্ধ করা হয়। তবে ছুলু লিপিরীতির বর্ণমালা লিখতে প্রায় প্রাচীন হিন্দি বর্ণমালার মতোই। বর্তমানে হল্যান্ড বংশোদ্ভূত জাভিরা এ লিপিরীতিকে বাতিল করে ইংরেজি লিপিরীতি চালু করেছে।[১৭]

সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, উক্ত ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলির অনুবাদে যে শুধু বর্ণের নামসমূহের বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়, তা নয়; বরং 'সংস্কৃত-ফারসি' অভিধান গ্রন্থাবলির যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে, তাতেও সংস্কৃত

www.pathagar.com

শব্দাবলিও আরবি বর্ণমালায় লিখিত রয়েছে। তেলেঙ্গি (তেলেগু) ও কানেড়ী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলি আরবি বর্ণমালায় কমই লিখিত হয়েছে। অবশ্য মুহাম্মদ বাকির আগা কর্তৃক তেলেঙ্গি ভাষায় রচিত ও আরবি বর্ণমালায় লিখিত কিছু সংখ্যক কবিতা পাওয়া যায়। এরূপ আরো কিছু রচনা থাকা অসম্ভব নয়। শ্রীলঙ্কার মুসলমানদের অধিকাংশের ভাষা তামিল। সিংহলি ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে আরবি বর্ণমালা প্রচলিত থাকার বিষয় জানা যায় না।[১৮] পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ভাষা হলো বাংলা। মধ্যযুগে বাংলার মুসলমানরা বাংলা ভাষায় রচিত বেশ কিছু কবিতা ও বিভিন্ন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আরবি অক্ষরে লিপিবদ্ধ করেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালার 'আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংগ্রহ'-এ প্রাগাধুনিক যুগের অনেক পুথিই সংরক্ষিত রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো—এসব পুথি আরবি হরফের সাহায্যে বাংলা ভাষায় রচিত।[১৯]

ফিলিপাইনে আরবি লিপির ব্যবহার

ফিলিপাইনের মুররা অর্থাৎ ফিলিপাইনো মুসলমানরা মিন্দানাও (Migindanao) এবং ছুলু (Sulu) ভাষা লেখার ক্ষেত্রে আজো আরবি লিপি ব্যবহার করে থাকে। মিন্দানাওয়ের ভাষায় এবং আরবি বর্ণে লিখিত তাদের গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ হলো 'الـ اسيل'। এটি একটি কুলজিনামা। সেখানে ১৪৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম প্রবেশ করার পর তারা এটি রচনা করে। এটি রচনার প্রেক্ষাপট হলে—ইসলামপূর্ব তাদের অবস্থা ছিল একেবার কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এখানে ইসলাম পৌঁছার সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার ছোঁয়া লাগে। তখন থেকে তাদের জীবনধারায় ফিরে আসে শৃঙ্খলা, তারা লিখতে শুরু করে তাদের ইতিহাস, জীবনচরিত ও কুলজিনামা প্রভৃতি। এরই সাথে তারা গ্রহণ করে নেয় আরবি বর্ণমালা।

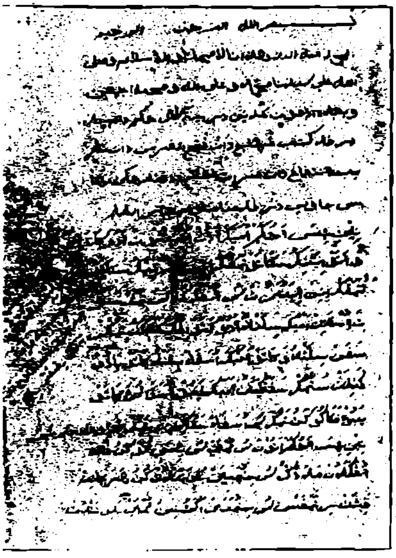

চিত্র-৯: আরবি লিপিতে মিন্দানাও ভাষা। মিন্দানাওয়ের সংবিধানের প্রথম পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

মুররা 'الترسيل' ছাড়াও আরব ও মালয়দের নিকট থেকে গৃহীত যাবতীয় ধর্মীয় গ্রন্থও তাদের ভাষায় এবং আরবি লিখনরীতি অনুযায়ী লিখেছে। তন্মধ্যে কুরআন, হাদিস, ফিকহ, Luwaran নামে অভিহিত বিধিমালা (চিত্র-৯), ছুলু উপভাষায় লিখিত সংবিধান, ঈদ ও জুমুআর খুতবাসমূহ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতে বোঝা যায়, আরবি লিপি মিন্দানাও ও ছুলুর বিভিন্ন প্রান্তে বহুলভাবে প্রচলিত রয়েছে।[২০]

ড. নজিব সলিবি ফিলিপাইন সম্পর্কে লিখিত তাঁর গ্রন্থসমূহে, বিশেষ করে তাঁর '*Studies in Moro History, Law and Religion*' শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

চীনে আরবি লিপির প্রচলন

চীনের মুসলমানরা আরবি ও অনারবি ভাষায় প্রণীত ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ (যেমন কুরআন ও তার অনুবাদগ্রন্থ, হাদিস ও ফিকহ প্রভৃতি) লেখার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে যেমন আরবি লিপি ব্যবহার করে আসছে (দ্র. চিত্র- ১০), তেমনি তারা নিজেদের ভাষায় প্রণীত ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ লেখার ক্ষেত্রেও আরবি লিপিরীতি অনুসরণ করে আসছে। সম্প্রতি প্রফেসর Hartmann 'مختصر الأحكام الإسلامية' শীর্ষক গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপি কাশগড়ে আবিষ্কার করেছেন। এ পাণ্ডুলিপির ভাষা হলো বকিন উপভাষার নিকটবর্তী উত্তর চীনের একটি উপভাষা। এ পাণ্ডুলিপিতে বেশ কিছু আরবি ও ফারসি শব্দ রয়েছে। এটি আরবি লিপিরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়। এ পাণ্ডুলিপিতে ফারসি ভাষার অতিরিক্ত চারটি বর্ণসহ আরো দুটি নতুন বর্ণ দেখা যায়। এগুলো হলো : ضں ও صں প্রফেসর ফারকা এ গ্রন্থটি ইংরেজি অক্ষরে এবং চীনা অক্ষরে প্রকাশ করেন এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠার পাদংশে তিনি জার্মানি ভাষায় এর অনুবাদ সংযোজন করেন।

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والعاقبة
للمتقين والصلوة والسلام على
رسوله محمد وآله أجمعين
أركان الإيمان إقرار

باللسان وتصديق بالقلب
وعمل بالأركان احكام ايمان
واعلم ان احكام الايمان
على ستة انواع خمسة في
الدنيا وواحد في الآخرة

চিত্র-১০: دعوات المسلمين গ্রন্থের দুটি পৃষ্ঠা, এটি চীনের ক্যান্টং থেকে মুদ্রিত হয়

www.pathagar.com

চীনে ইসলাম ও আরবি লিপির পদার্পণ অনেক আগে থেকে হলেও এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান থাকা সত্ত্বেও সেখানে আরবি লিপির প্রাচীন নিদর্শন পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না। সেখানে প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শন হলো ৭৫১হি./ ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দে প্রাচীন ক্যাংটং নগরীর মসজিদে উৎকীর্ণ আরবি লিপি। এ লিপি থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, এটি থান পরিবারের সং কং (Tson-Kwan des Than)-এর আমলে উৎকীর্ণ হয়। চীনে প্রাচীন ব্রোঞ্জের পাত্রসমূহে প্রাপ্ত আরবি লিপিসমূহের উৎকীর্ণের তারিখ নির্ণয় করা কঠিন; তবে সাধারণভাবে এ কথা বলা যায়, এগুলো হিজরি ৯ম শতাব্দীর পূর্বে উৎকীর্ণ নয়। চীনের মুসলমানরা লেখা ও মুদ্রণের কাজ আধুনিক যুগেই শুরু করেছে। তারা মুদ্রণের জন্য প্রাচীন রীতি অনুযায়ী মসৃণ কাষ্ঠফলক ব্যবহার করে থাকে (দ্র. চিত্র- ১১ ও ১২)। এ পদ্ধতিতে মুদ্রিত লিপির চিত্র কখনো সামান্যই পরিবর্তন হয়।[২১]

চিত্র-১১: চীনের ক্যাংটঙে মসৃণ কাষ্ঠফলকে মুদ্রণের রীতি অনুযায়ী আরবি ও চীনা অক্ষরে উৎকীর্ণ একটি পৃষ্ঠা। এ লিপি থেকে বোঝা যায়, আরবি লিপি তাদের হাতে এসে চৈনিক লিপির প্রভাবে ভিন্ন একটি আকৃতি ধারণ করেছে, যাতে আলিফ ও লাম বর্ণসমূহ অনেকটা প্রাচীনকালের কীলকাকৃতি লিপির মতো দেখায়।

www.pathagar.com

চিত্র-১২: চীনের একটি মসজিদ। এতে চীনা মুসলমানদের একটি দলকে তাদের দেশীয় পোশাক পরে নামাজ আদায়রত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। এর স্তম্ভসমূহের গাত্রে আরবি লিপিতে আরবি লেখা ও কুরআনের আয়াতসমূহ উৎকীর্ণ রয়েছে

বর্তমানে চীনে দশটি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী রয়েছে। অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে এদেরকে দুই প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ভাগের শীর্ষে রয়েছে 'আয়োগ্বোর' (বা 'উইগ্বোর') মুসলিম সম্প্রদায়। তারা তাদের শিক্ষায় আয়োগ্বোর, আরবি ও ফারসি ভাষা ব্যবহার করে। এ ভাগের মুসলিম জনগোষ্ঠীগুলো প্রধানত জিনজিয়াং (সিনকিয়াং) প্রদেশে বসবাস করে। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে হুই বা মূল চীনা বংশোদ্ভূত মুসলিম জনগোষ্ঠীসমূহ। তারা ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানে চীনা, আরবি ও ফারসি ভাষা ব্যবহার করে। এ দ্বিতীয় ভাগের মুসলমানরা সমগ্র চীনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।[২২]

তথ্যসূত্র

১ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৫৪-৫৫।

২ সিদ্দীক, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৮৮।

৩ Safadi, *op. cit.*, P 28.

৪ Mustafizur Rahman, *op. cit.* P 47.

৫ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৭।

৬ আবদুর রহীম, ইসলামী ক্যালিগ্রাফী যুগে যুগে, *অগ্রপথিক*, বর্ষ-১৫, সংখ্যা-১২, ডিসেম্বর ২০০০, পৃ ১০৯।

৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১১১-১১৩।

www.pathagar.com

৮ হিন্দি: উত্তর ভারতের ভাষা বিশেষ। এটি বর্তমানে ভারতের রাষ্ট্রভাষা।

৯ গস্টেব লেবন, ড. *সিররু তাতাওওয়ারিল উমাম* (অনূদিত), পৃ ৫৪।

১০ Blandford, Henry F., *Geography of India, Burma and Ceylon*, London, 1894, P 38.

১১ সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৫৪।

১২ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৫৬।

১৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৫৬।

১৪ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ ৯, পৃ ৪৫৬।

১৫ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৫৭।

১৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৫৭-৫৮।

১৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৫৯-৬০।

১৮ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ ৯, পৃ ৪৫৬।

১৯ আরবি অক্ষরে লিখিত মধ্যযুগের বাংলা পুথিসমূহের মধ্যে ৪৩টির হদিস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সৈয়দ হামযা বিরচিত 'আমির হামযার কেচ্ছা', সৈয়দ সুলতান রচিত 'ইদ্রিস নামা' ও 'ওফাত-ই-রসুল', সোলেমান রচিত 'নছিয়াতনামা', মুহাম্মদ ইয়াকুব রচিত 'জঙ্গনামা' ও আলাউলের 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালা)।

২০ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১১৯-১২১।

২১ 'উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১২২-১২৪।

২২ মীরযায়ী, মোহাম্মদ রেযা, চীনে ইসলাম ও মুসলমান, *নিউজ লেটার*, প্রাগুক্ত, বর্ষ-২৬, সংখ্যা-৭-৮, জুলাই-আগস্ট ২০০৪, পৃ ১৮।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়
ইউরোপে আরবি লিপির প্রচলন

স্পেনে আরবি লিপির প্রচলন

স্পেনে ইসলাম প্রবেশ ও বিস্তারের পাশাপাশি অবলীলায় আরবি ভাষা ও লিপির চর্চা শুরু হয়। অন্যান্য দেশের মতো এখানেও আরবি ভাষার সাথে সাথে আরবি লিপিও চরম উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভ করে। তদুপরি এর শিল্প-সৌকর্য ও বিচিত্র ব্যবহার তাকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে। অনেক সুদর্শন আল-কুরআন, অসংখ্য গ্রন্থ, বহু ইমারতগাত্র ও মসজিদ তার বিচিত্র ব্যবহারের আজও সাক্ষী হয়ে আছে (দ্র. চিত্র-১)।

চিত্র-১: আন্দালুসের ইমারতগাত্রে উৎকীর্ণ একটি ঐতিহাসিক কুফি লিপি

এর মূল বক্তব্য হলো :

بسم الله بركة من الله لعبد الله عبد الرحمن أمير المؤمنين أطال الله .

স্পেনে আরবি ভাষা ও লিপি একপর্যায়ে এভাবেই প্রসার লাভ করেছিল যে, স্পেনবাসীরা তাদের নিজেদের মাতৃভাষা ও লিপি একপ্রকার ভুলেই গিয়েছিল। ঐতিহাসিক ডোজি বলেন,

> স্পেনবাসীরা লেখা ও বলার ক্ষেত্রে এমনভাবে আরবি চর্চা করতে থাকে যে, স্পেনে এমন লোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছিল, যারা ল্যাটিন ভাষায় পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ পড়তে পারে; বরং স্পেনের খ্রিষ্টানরা যাতে সহজে পড়তে পারে, তাই সেগুলোকে আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হতো। এমনকি, ১০৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ষষ্ঠ আলফনজোর আশ্রয়ে খ্রিষ্টানদের প্রত্যাবর্তনের পর টলেডো[১] প্রায় দু শতাব্দী ধরে আরবি ভাষার ওপর পুরোই নির্ভরশীল ছিল।[২]

স্থাপত্য শিল্পকে কেন্দ্র করে স্পেনে আরবি হস্তলিপিশিল্পের চরম বিকাশ ঘটেছে। আর তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন 'আল-হামরা প্রাসাদ'।[৩] অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য, জটিল খোদাই কাজ এবং অতি উজ্জ্বল মোজাইকের সাথে মনোরম ও আকর্ষণীয় কুফি ও অন্যান্য স্টাইলের সংমিশ্রণে এর অলংকরণ এক অভিনব রূপ ধারণ করেছে। ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান বলেন,

> লিপিমালা জ্যামিতিক নকশার পেঁচান ব্যাণ্ডের সাথে এমন দক্ষতার সাথে খোদাই করা হয়েছে যে, দর্শকদের নজরে রং-বেরঙের ধাঁধার সৃষ্টি করে। অক্ষরগুলো পরস্পরকে জড়িয়ে এমন সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ করা হয়েছে যে, মনে হবে একটি ফোয়ারা থেকে পানি নির্গত হচ্ছে। আরবি লিপিমালা খুব ঘন ও ঝুলন্ত লতাপাতা

www.pathagar.com

এবং ছোট ডালপালা দ্বারা পরিবেষ্টিত, যা মুরদের শাসনামলে স্পেনে উৎকর্ষের সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল।[৪]

লিপিশিল্প শুধু স্থাপত্যের দৃঢ় পাচিলকেই অমর করে দেয়নি; অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর পদচারণা ছিল। গ্রন্থের অনুলিপি প্রস্তুতকরণ ও চিত্রায়নের ক্ষেত্রে লিপিশিল্প এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। গ্রানাডা, টলেডো এবং রাজধানী কর্ডোবায় অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এবং গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পুস্তকের অনুলিপি প্রণয়নের প্রয়োজন পড়ে। এ ছাড়া হস্তলিপিকে মর্যাদাপূর্ণ পেশা হিসেবে বহু শিল্পানুরাগী মানুষ গ্রহণ করায় সৌখিন বস্তু হিসেবেও এর প্রসার ঘটে। গ্রানাডাতে ১৭টি বড়ো আকারের, ১২০টি ছোট আকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু ছিল। এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিল গ্রন্থাগার। এতে প্রায় চার লক্ষ গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল। গোটা স্পেনে বড়ো ধরনের ৮০টি গ্রন্থাগার ছিল। এসব গ্রন্থাগার অসংখ্য আরবি গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপিতে ভরপুর ছিল। এক্ষেত্রে ৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা মুস্তানসির ইবন আবদুর রহমান আন-নাসিরের আমলে কর্ডোবায় উমাইয়াদের গ্রন্থাগারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে চার লক্ষাধিক ভলিউম পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত ছিল।[৫] স্পেনের দ্বিতীয় শাসক হাকাম ছিলেন শিক্ষা-সংস্কৃতির মহান পৃষ্ঠপোষক। বিভিন্ন জায়গা থেকে মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করার প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি কায়রো, বাগদাদ, দামিশক ও আলেকজান্দ্রিয়া থেকে প্রাচীন ও সমসাময়িক কালের গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ কিংবা অনুলিপি প্রস্তুত করে তাঁর গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছেন। এ কাজের জন্য তাঁকে অনেক লিপিশিল্পী নিয়োগ করতে হয়েছে।[৬]

গ্রানাডার পতন এবং ১৪৯১ খ্রিষ্টাব্দে হামরা প্রাসাদ থেকে সর্বশেষ মুসলিম সুলতান আবদুল্লাহ আস-সগিরের বিদায়ের পর মুসলমানদের ভাগ্যে সামগ্রিকভাবে নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। কেউ প্রকাশ্যে ইসলামি রীতিনীতি পালন করতে পারত না। আরবি বলাও ছিল নিষিদ্ধ। কার্ডিন্যাল জিমেনিস[৭] গ্রানাডার সকল আরবি বইপুস্তক জ্বালিয়ে দেয় এবং মুসলমানদেরকে খ্রিষ্টানধর্ম অবলম্বন করার জন্য চাপ দেয়। তবে মুসলমানরা অত্যন্ত গোপনে নিজেদের ধর্মকে টিকিয়ে রেখেছিল। অধিকন্তু তারা অতি সন্তর্পণে বেশ কিছুদিন ধরে আরবিতে কুরআন, হাদিস ও ফিকহ প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থাদি লিখে যেত। অবশেষে ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট চার্লস এক ডিক্রি জারি করে পারস্পরিক কথাবার্তায় আরবি ভাষার ব্যবহার, আরবি পোশাক পরিধান ও স্নানাগার ব্যবহার প্রভৃতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি এ আইন পুরো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কঠোরতা প্রদর্শন করেননি। তখন যেসব মুসলমান চাপে পড়ে খ্রিষ্টানধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল[৮] তাদেরকে তিনি 'মরিস্কো' (Morisco)[৯] অভিধায় আখ্যায়িত করেন। এরপর তাঁর পুত্র ধর্মোন্মত্ত দ্বিতীয় ফিলিপ ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দে এক কঠিন আইন জারি করেন। এ আইনে মরিস্কোদেরকে তিন বছর কাশতালিয়া ভাষা[১০] শেখার সুযোগ দেওয়া হয়। এরপর তাদের কারো জন্য আরবিতে কিছু বলা, লেখা ও আলাপ করার অনুমতি ছিল না। তদুপরি আরবি ভাষায় কৃত যে-কোনো

www.pathagar.com

লেনদেন কিংবা বাণিজ্যিক চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হতো। বিচার বা অন্য কোথাও আরবি ভাষার ব্যবহার গ্রহণযোগ্য ছিল না। তিনি আরবি গ্রন্থসমূহকে জমা করে জ্বালিয়ে ফেলার এবং তাদেরকে কোট ও হ্যাট পরার এবং গির্জার প্রচলিত রীতিনীতি অনুসরণ করে অনুষ্ঠান পরিচালনা করার নির্দেশ দেন। তাছাড়া মহিলাদের পর্দাপ্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। নিরুপায় হয়ে মুসলমানরা আল-পুক্সরাসের পার্বত্য অঞ্চলে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে; কিন্তু এটা ছিল তাদের বেঁচে থাকার দায়ে এক অসম সংগ্রামে অবতরণ। তিন বৎসর অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর অস্ট্রিয়ার কুখ্যাত ডন জুয়ান (Don Juan) কর্তৃক নৃশংস হত্যা ও ধ্বংসকার্যের দ্বারা এই বিদ্রোহ প্রশমিত হয়।[১১] এভাবে স্পেনের বর্বর খ্রিষ্টানরা ইতিহাসের নজিরবিহীন নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনের সাথে সাথে মুসলামানদের সিংহভাগ কীর্তিও ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। গ্রন্থাগার, মসজিদ, প্রাসাদ, এমনকি কারুশিল্পের সামান্য নিদর্শনগুলোও তারা ধ্বংস করে। এস. পি. স্টকের মতে, খ্রিষ্টান যাজক সম্প্রদায় আরবি লিপিমালাকে ভৌতিক সূত্র বলে ঘোষণা করে এবং আরবি গ্রন্থাবলিকে ম্যাজিকের গ্রন্থ বলে অভিহিত করে। স্পেন থেকে সেগুলো নিশ্চিহ্ন করার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়।[১২] দ্বিতীয় ফিলিপ এমন আদেশও দেন যে, পাথরে খোদিত আরবি লিপিসমূহ যেন টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়।[১৩]

এত আদেশ নিষেধের পরেও খ্রিষ্টান-স্পেন মুসলিম লিপি ও শিল্পকলার প্রভাব মুক্ত হতে পারেনি। মরিস্কোরা কাশতালিয়া, আরবি ও রুমানিয়া প্রভৃতি ভাষার সমন্বয়ে নতুন একটি ভাষা সৃষ্টি করে। তাদের নতুন এ ভাষাকে Aljamiado (الخميادو)[১৪] ভাষা নামে অভিহিত করা হয়। এটি মূলত রুমানি-কাশতালীয় ভাষা, যা আরবি অক্ষরে লেখা হতো। মরিস্কোরা এ ভাষায় তাদের ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশেষ করে তাফসির, হাদিস, ফিকহ ও তাসাউফ প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থগুলো লিপিবদ্ধ করত।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, দ্বিতীয় হাকামের তৈরি কুফিরীতির অপূর্ব লিপি সম্বলিত একটি রুপালি গিল্টির কাসকেট কীভাবে জেরোনার গির্জার প্রধান বেদিতে স্থান পেয়েছিল! উল্লেখ্য যে, আরবি লিপিতে এ কাসকেটের মালিকের প্রতি স্তুতি বাণী ছিল।[১৫]

ইউরোপের অন্যান্য দেশে আরবি লিপির প্রচলন

আরবরা স্পেন বিজয় করে ফ্রান্সেও অনুপ্রবেশ করেছিল এবং তাদের সাথে আরবি ভাষা ও লিপিও সেখানে ঢুকে পড়েছিল। দক্ষিণ ফ্রান্সের পুরোটাই তখন আরবদের অধীনস্থ ছিল। তখন বহু আরব সেখানকার অনেক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। এ সময় দক্ষিণ ফ্রান্সের অনেক অধিবাসীই ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়। সে-সুবাদে তাদের অনেক মেয়েকে আরবরা বিয়ে করে। এ কারণে দক্ষিণ ফ্রান্সের অধিবাসীদের সাথে আরবদের চেহারার অনেক মিল ও সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।[১৬] দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে আরবরা ক্রমে ইউরোপের বিরাট অংশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।[১৭] সেই সাথে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে আরবি লিপির বিস্তৃতি ঘটে। দক্ষিণ ফ্রান্সে, বিশেষ করে মারিশিলিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে আরবি লিপির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। নরবুনের জাদুঘরে আজও এর অনেক নির্দশন ও মৃৎপাত্র দেখতে পাওয়া যায়। সে সময়ে

www.pathagar.com

মুসলমানরা শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাহিত্যে তাদের খ্রিষ্টান প্রতিবেশীদের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত ছিল। তখন ইউরোপিয়ানরা মুসলমান পণ্ডিতদের নিকট গিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা অর্জন করত। লিওনার্ড ছিলেন এ ধরনের একজন ইতালিয়ান বিজ্ঞানী। তিনি আরব পণ্ডিতদের কাছে গণিতের শিক্ষা লাভ করেন। কথিত আছে, তিনিই ইউরোপে সর্বপ্রথম আরবি সংখ্যাগুলো[১৮] পরিচিত করে তোলেন। এ সংখ্যাপদ্ধতি খুব দ্রুত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের বাণিজ্যকে গতিশীল করে তুলেছিল। ইতঃপূর্বে দুই হাজার বছর ধরে সেখানে রোমান সংখ্যা প্রচলিত ছিল। এ সংখ্যার সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলো ছিল বর্ণের আকারে যেমন (LXXVIII)। এ অদ্ভুত আকারটি ৮৮-এর সাঙ্কেতিক চিহ্ন। ফলে হিসাব-নিকাশ হয়ে ওঠে খুবই জটিল। উইলফ্রিড ব্লান্ট লিখেছেন-

> And supposing the tide of Islam had not been stemmed? Nothing so delayed the advance of science in the West as the clumsiness of the Roman numerals. Had the Arabic numerals, which had reached Bagdad from India towards the end of the eighth century, been soon afterwards introduced into and adopted by western Europe as a whole, much of that scientific progress which we associate whith the Renaissance.[১৯]

ইউরোপের অন্যান্য শিক্ষার্থীও লিওনার্ডের পদাঙ্ক অনুকরণ করে বাগদাদ ও স্পেনের মুসলিম মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গিয়ে জ্ঞান অর্জন করত। তদুপরি ইউরোপীয় কবি-সাহিত্যিকগণও আরব কবি-সাহিত্যিকদের অনুকরণে সাহিত্য চর্চা করত। ফ্রান্স ও উত্তর স্পেনের অধিবাসীরা, যারা আরবদের প্রতিবেশী ছিল, তারা তো বলতে গেলে ল্যাটিন কবিতা রচনা করা ছেড়েই দিয়েছিল; বরং এর পরিবর্তে তারা আরবদের কবিতা ও ছড়াগান প্রভৃতি শেখার প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়েছিল। খ্রিষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে তাদের ভিক্ষুকরা দ্বারে দ্বারে ও অলিগলিতে আরবি গান ও প্রশস্তিগাথা গেয়ে ভিক্ষা করত। আর লোকেরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনত এবং তাদেরকে ভিক্ষা দিত। তবে তারা তাদের বক্তব্য বুঝত, তা নয়; বরং তাদের মনোমুগ্ধকর সুর, লহরি ও গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই তাদেরকে ভিক্ষা দিত।

তদ্রূপ আরবি লিপি সিসিলিয়া এবং তার পার্শ্ববর্তী দক্ষিণ ইতালিতে ৮৩২ থেকে ১০৯১ খ্রি. পর্যন্ত প্রায় আড়াই শতাব্দীকাল ধরে প্রচলিত ছিল। এখানে আরবরা শক্ত অবস্থান গড়ে তুলেছিল। তারা ইতালির পথ ধরে দক্ষিণদিক থেকে ইউরোপে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল। এ সময় তারা সিসিলিয়া এবং ইতালির পুরো দক্ষিণ ভাগ ও অনেক শহর জয় করে নিয়েছিল। এসব এলাকায় আরবরা নিজেদের প্রভাব বলয় তৈরি করতে সমর্থ হয়। তারা সেখানে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও কলকারখানাও প্রতিষ্ঠা করেছিল। এভাবে তারা এ সকল অঞ্চলে নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করতে সক্ষম হয়।

বর্তমানে কেউ সিসিলিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহ ঘুরে দেখলে সেখানকার প্রত্যেকটি বস্তুর সাথে আরবদের সম্পর্ক খুঁজে পাবে। সিসিলি ভাষাও বলতে গেলে ইতালি ও আরবি ভাষার সমন্বিত রূপ। এ দ্বীপের বহু জায়গার নামও প্রকৃতপক্ষে আরবি ছিল;

www.pathagar.com

যদিও পরবর্তীকালে তার আরবি রূপকে বিকৃত করা হয়েছে। নিম্নে এ ধরনের কয়েকটি নাম উল্লেখ করা হলো :

Calatafimi এটি قلعة فيمي -এর বিকৃত রূপ, Calatanisetta এটি قلعة النساء -এর বিকৃত রূপ, Calatabellota এটি قلعة البلوط -এর বিকৃত রূপ, Miselmeri এটি منزل الأمير -এর বিকৃত রূপ, Mezzoioso, Mezzojuzo এটি منزل يوسف-এর বিকৃত রূপ, Rasicablo (Rasigelbo) এটি رأس الكلب -এর বিকৃত রূপ ও Mersala এটি مرسى علي -এর বিকৃত রূপ। এ ধরনের আরো অসংখ্য নাম রয়েছে।[২০]

মুসলমানদের সিসিলি বিজয়ের ফলে ইতালিতেও আরবি লিপিরীতির প্রভূত বিস্তার ঘটে। সেখানে আরবি লিপির অসংখ্য নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে মুসলমানদের নির্মিত অসংখ্য সুন্দর সুন্দর মসজিদ, বড়ো বড়ো প্রাসাদ ও অট্টালিকা রয়েছে। পরবর্তীকালে সেখানকার স্থাপত্যশিল্পে এগুলো বিরাট প্রভাব ফেলেছে। তদুপরি সেখানকার বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত তরবারি ও মুদ্রাসমূহ এবং ইতালির জাদুঘরসমূহে সুরক্ষিত বিভিন্ন আরব যন্ত্রপাতি এবং কুফি কিংবা নাসখি রীতিতে লিখিত বিভিন্ন সমাধিফলক এ কথার জোরালো সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সেখানে আরবদের শাসনামলে আরবি লিপি এবং আরব-ইসলামি সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। এমনকি, নর্মেনদের বিজয়ের পরও সে আরব-ইসলামি সংস্কৃতির রূপ-রং কিছুটাও পরিবর্তন হয়নি; বরং সিসিলি ফিরে পাওয়ার পরও দীর্ঘদিন ধরে ইউরোপীয়রা বড়ো বড়ো দালান ও রাজপ্রাসাদে আরবি ভাষায় ও আরবি লিপিতে স্মৃতিফলক উৎকীর্ণ করত। উপরন্তু সিসিলিতে মুসলিম শাসনের অবসানের পরও সম্রাট রোজারস এবং পরবর্তী সম্রাটদের আমলে আরবিই ছিল সরকারি ভাষা।

সে সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন স্মৃতিফলক ও ইমারতগাত্রে আরবি লিপির বহুল প্রচলনের একটি বড়ো প্রমাণ হলো—সিসিলির বালিরমে অবস্থিত সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের সমাধিতে উৎকীর্ণ আরবি লিপি (দ্র. চিত্র-২)। তাছাড়া সিসিলির সম্রাট দ্বিতীয় রোজারসের কাপড়ে উৎকীর্ণ আরবি লিপিও এর আরো একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ (দ্র. চিত্র-৩)। এটি বর্তমানে ভিয়েনার জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

চিত্র-২: সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের সমাধিতে উৎকীর্ণ আরবি লিপি

www.pathagar.com

চিত্র-৩: সম্রাট দ্বিতীয় রোজারসের কাপড়ে উৎকীর্ণ আরবি লিপি

মুদ্রাগাত্রেও আরবি ভাষায় ও আরবি লিপিতে বিভিন্ন লেখা উৎকীর্ণ করা হয়। যেমন বুলগেরিয়া, জার্মানি, নরওয়ে ও চেক প্রভৃতি রাজ্যের অনেক প্রাচীন মুদ্রাসমূহে সুন্দর কুফি লিপির ব্যবহার দেখা যায়। তাছাড়া উত্তর ইউরোপের অনেক দেশে, বিশেষ করে রাশিয়া, জার্মানি ও সুইডেনে আরবি মুদ্রার বিভিন্ন ভাণ্ডার দেখতে পাওয়া যায়। প্রফেসর টরেনবার্গ ১৮৫৭ সালে কেবলে সুইডেনে যেসব স্থান থেকে আরবি লিপিতে উৎকীর্ণ আরব মুদ্রাসমূহ তৈরি করা হতো তা গণনা করেছেন। তিনি এ ধরনের ১৬৯টি স্থান খুঁজে পেয়েছেন। ড. হ্যাল্‌স হ্যান্ড ব্রান্ড ১৮৭৩ সালে কেবল ছোট্ট জটল্যাণ্ড দ্বীপে প্রাপ্ত আরবদের রৌপ্য মুদ্রাগুলো গণনা করেছেন। তিনি সেখানে প্রায় তের হাজারেরও অধিক রৌপ্য মুদ্রা খুঁজে পেয়েছেন।[২১]

আরবি লিপির বিস্তার কেবল স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি ও সিসিলিতে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা ভূমধ্যসাগরের প্রায় সকল দ্বীপ জুড়ে বিস্তার লাভ করেছিল। যেমন বালিয়ার, কারসিকা ও মাল্টা প্রভৃতি দ্বীপগুলো দীর্ঘদিন আরবদের শাসনাধীন ছিল। সে-সময়ে এ বিশাল এলাকা জুড়েও আরবি লিপির বিস্তার ঘটেছিল।

পূর্বদিক থেকে ইউরোপে আরবি লিপির বিস্তার ঘটে অটোমান তুর্কি সুলতানদের আমলে। অটোমানরা সর্বপ্রথম কনস্টান্টিনোপল দখল করে। কনস্টান্টিনোপল ছিল ইউরোপের প্রবেশদ্বার। আরবরা অনেকবার পূর্বদিক থেকে কনস্টান্টিনোপলের পথ ধরে ইউরোপে ঢুকতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক বারেই তারা ব্যর্থ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তা খ্রিষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে তুর্কিদের হাতেই বিজিত হয়। এরপর তুর্কিরা ইউরোপের পূর্ব ভূ-খণ্ডে অনুপ্রবেশ করে সেখানে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। উপরন্তু, তাদের সরকারি ও ধর্মীয় ভাষাগুলো (তুর্কি ও আরবি) লেখার প্রয়োজনে আরবি লিপিও তাদের পাশাপাশি সেখানে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তাদের বিজয়গুলোর সাথে পাল্লা দিয়ে তা সর্বত্র বিস্তার লাভ করতে থাকে। তারা ইউরোপের রাজ্যগুলো একের পর এক জয় করতে করতে পূর্ব ইউরোপের অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল। তারা ভিয়েনাকে অবরুদ্ধ করে এবং বিজয়ী সৈন্যদেরকে ভিয়েনার সীমানায় দাঁড় করিয়ে

রেখে রাজা ফার্ডিন্যান্ড থেকে জিয্য়া গ্রহণ করে ফিরে আসে এবং বলকান ও তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলো দখল করে ক্ষান্ত হয়। এভাবে ইউরোপের যে সকল এলাকা তাদের করতলগত হয় সেখানে আরবি লিপি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং দীর্ঘদিন ধরে তা ব্যবহৃত হতে থাকে। তদুপরি এটিই ছিল প্রায় সাড়ে চার শতাব্দী ধরে সেখানকার রাষ্ট্রগুলোর সরকারি লিপি।

খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অটোমান সাম্রাজ্য বিশাল এলাকা জুড়ে সম্প্রসারিত হয়। উত্তরে তার সীমানা ইউরোপে হাঙ্গেরির সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এ বিশাল মহাদেশে তাদের রাজ্য গ্রিস, এগা সাগরের দ্বীপপুঞ্জ, রুমলি, বসনিয়া, হারজেগোভেনিয়া, সার্ব, কৃষ্ণ পর্বত, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি ও রুমানিয়া এবং পূর্বদিকে হাঙ্গেরির পার্শ্ববর্তী রাজ্য মলদাভিয়া ও কৃষ্ণ সাগরের উপকূল থেকে শুরু করে ককেসাস এলাকা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। এসব রাজ্যে আরবি লিপি ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে কোনো কোনো রাজ্যে আজও তার অনেক নিদর্শন, আবার কোনো কোনো রাজ্যে অল্প কিছু নিদর্শন অবশিষ্ট রয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে যারা ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদের ভাষাগুলো এ লিপিতে লেখা হতো এবং তা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল। অবশেষে যখন রাজ্যগুলো স্বাধীনতা অর্জন করে কিংবা অন্য কোনো রাষ্ট্রের অধীনস্থ হয়ে পড়ে এবং ক্রমশ অটোমান সাম্রাজ্য ইস্তাম্বুল ও অ্যাডর্ন এবং তাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন থেকেই আরবি লিপির বিকাশ ক্রমশ বন্ধ হয়ে পড়ে। তবে যেসব রাজ্য থেকে অটোমানরা বের হয়ে চলে আসে, তাতে তারা অসংখ্য নিদর্শন ছেড়ে রেখে এসেছে। তদুপরি সেসব এলাকার অনেক লোক ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। আজ গ্রিস, ম্যাকডোনিয়া, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, সার্ব, কৃষ্ণ পর্বত, রোমানিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভেনিয়া প্রভৃতি রাজ্যে ৭ থেকে ৮ মিলিয়ন মুসলমান রয়েছে। তাদের মধ্যে আজো বসনিয়ার মুসলমানরা আরবি লিপি ব্যবহার করে থাকে। তাদের মধ্যে অনেক লিপিকার আরবি লিপিশিল্প চর্চা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।[২২]

ইউরোপে মুসলিম শাসনের অবসানের পর বহু মুসলিম কারিগরকে গির্জা ও সমাধি নির্মাণে নিয়োগ করা হয়। তাদের কোনো পারিশ্রমিক দেওয়া হতো না। কেবল সংখ্যালঘুদের দেয় কর থেকে তারা অব্যাহতি লাভ করে। এসব মুসলিম কারিগর খ্রিষ্টানদের উদ্ভাবিত স্থাপত্যরীতিতে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে এবং অমুসলমান ইমারতে আরবি লিপিকলার প্রচলনে সহায়তা করে।[২৩]

উল্লেখ্য যে, আরবি হরফের চ্যাপ্টা সমান্তরাল এবং লম্ব প্রকৃতির কারণে তা বিভিন্ন অলংকরণের সাথে মানিয়ে নিতে সহায়তা করে। তাছাড়া আরবি অক্ষরের একাধিক লিখনপদ্ধতি থাকায় তা আরো সুবিধা প্রদান করেছে শিল্পীদের। শিল্পে আরবি বর্ণের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার মুসলিম শিল্পকলার গুরুত্ব অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এই পদ্ধতি ইউরোপের অমুসলিম শাসক ও শিল্পানুরাগীদের নিকট সমাদৃত হয়েছে। তারা এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মুসলিম ধর্মীয় বিশ্বাসসংক্রান্ত আরবি বাণী নিজেদের মুদ্রা ও স্থাপত্যে উপস্থাপন করেছেন। যেমন অষ্টম শতাব্দীর মরিসাস খ্রিষ্টান শাসক আফফা (৭৫৫-৭৯৬ খ্রি.) তাঁর মুদ্রায় কুফি লিখনপদ্ধতিতে কালিমা উৎকীর্ণ করেন। একইভাবে নবম শতকে ব্রোঞ্জ নির্মিত

একটি আইরিশ ক্রুশের মধ্যস্থলে কুফি লিখনপদ্ধতিতে 'বিসমিল্লাহ' উৎকীর্ণ হয়েছে। সাধু পিটারের গির্জার সুউচ্চ প্রবেশপথের প্রাচীরগাত্রে মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস উৎকীর্ণ হয়েছে। মধ্যযুগের ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন এবং ইংল্যান্ডের স্থাপত্য অলংকরণ প্রক্রিয়ায় আরবি হস্তলিখনশিল্প প্রভূত প্রভাব রেখেছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইউরোপে মুসলিম শাসনের অবসানের ফল খ্রিষ্টীয় স্থাপত্য কলার উদ্ভব ঘটে। ওয়েন জোনস বলেন,

> মুসলমানগণ তাদের ইতিহাসের শুভলগ্নেই তাদের সৃজনশীলতায় পুষ্ট এক ধরনের শিল্পকর্ম উদ্ভাবন ও উৎকর্ষ সাধন করেন। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাবে না যে, দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত খ্রিষ্টধর্ম তার নিজস্ব স্থাপত্যরীতি উদ্ভব করেছিল, যাতে পৌত্তলিকতার কোনো চিহ্ন ছিল না।[২৪]

এম এস ব্রিগথ মন্তব্য করেন,

> "গথিক শিল্পকর্মের শেষ পর্যায়ে আলংকারিক রীতিতে খোদিত শিলালিপি নবম শতাব্দীতে নির্মিত ইবনে তুলুনের মসজিদে দেখা যাবে, কিন্তু কুফি রীতিতে উৎকীর্ণ শিলালিপি মুসলিম শাসনাধীন দক্ষিণ ফ্রান্সে অনুপ্রবেশ করে এবং অলংকরণের অসাধারণ দৃষ্টান্ত এমনকি ইংল্যান্ডেও আরব প্রভাব লক্ষ করা যায়।[২৫]

প্রফেসর লেথাবি মনে করেন যে, লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবির প্রধান বেদির পেছনে যে আলংকারিক ব্যান্ড রয়েছে এবং কতিপয় রঞ্জিত কাচের জানালায় ইংরেজ আলংকারিক শিল্পকলা রয়েছে তা মুসলিম লিপিকলার প্রভাবের প্রতিফলন।[২৬] পাডুয়ার এরেজা গির্জায় লাজারাসের পুনরুত্থান নামক একটি ইতালীয় চিত্রকর্মে যিশুখ্রিষ্টের ডান কাঁধের একটি ফিতা কুফি লিপির অনুকরণে অলংকৃত। ফ্রা এন্জেলিকো এবং ফ্রা লিপ্পি আরবি লিপিমালার প্রতি মোহাবিষ্ট ছিলেন এবং কুমারী মেরির হাতে আস্তিন ও পোশাকের বর্ডারে এ ধরনের অলংকরণে শোভিত করেন। স্মতর্ব্য যে, এ সকল ঘটনা ধর্মীয় কোনো চেতনার প্রতিফলন নয়; শিল্প অনন্যতার প্রতিফলন। এসব আরবি লিপিতে এমন কোনো শৈল্পিক অভিব্যক্তির সর্বজনীন রূপ ছিল, যা শিল্পীর মনকে আন্দোলিত করেছে। আর এ প্রভাব বিস্তারে সবচেয়ে বৃহৎ ভূমিকা রেখেছে মুসলিম স্পেনের সমৃদ্ধ শিল্পকলা। খ্রিষ্টানদের কাছে 'বিসমিল্লাহ' বা কোনো আরবি বচন কোনো ধর্মীয় আবেগ নিয়ে দেখা দেয়নি। তারা নিছক নকশাগত মাধুর্যের জন্যই এর অনুকরণ করেছিলেন।[২৭] অনেকে মনে করেন, গথিক অক্ষরের উদ্ভব ঘটে আরবি কুফি অক্ষরেরই প্রভাবে। গথিক অক্ষর কুফি হরফের মতোই খাড়া এবং বহুল পরিমাণে ছুঁচালো। বিশেষ করে গথিক হরফ ব্যবহার করা হয়েছে স্থাপত্যে। বই বাঁধাই ও বইয়ের মলাটে নকশা করার ব্যাপারেও এক সময় ইউরোপ স্পেনীয় মুসলিম নকশার রীতিপদ্ধতির অনুকরণ করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইউরোপের বিমূর্ত শিল্পের জন্ম মুসলিম লিপিকলাকে কেন্দ্র করেই। ইউরোপের শিল্পীরা ক্যালিগ্রাফি শিল্পে মুগ্ধ হয়ে তার আদর্শেই বিমূর্ত শিল্পের জন্ম দিয়েছেন। বিমূর্ত শিল্পে ফিগার নেই, ফরম এসেছে। শিল্পীরা ক্যালিগ্রাফির আদলে ফরম ব্যবহার করেছেন তাদের চিত্রকর্মে। বিমূর্ত শিল্পের জনক মন্ডিয়ান, কান্ডিনেস্কির চিত্রে ক্যালিগ্রাফির প্রভাব সুস্পষ্ট। শিল্পী পল ক্লির চিত্রকর্মে, যেমন 'ডকুমেন্ট' ছবিটি মূলত আরবি অক্ষরের আদলে কতগুলো আকৃতির সমাবেশ, তার রেখাঙ্কনেও রয়েছে আরবি লিখনপদ্ধতির প্রভাব।[২৮]

www.pathagar.com

ইউরোপে অ্যারাবেস্ক (Arabesque)[২৯]-এর প্রভাব লক্ষণীয়। সেখানে অ্যারাবেস্ক এত জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, তা খ্রিষ্টানদের গির্জায়, দেয়াল, দরজা, জানালা, এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদে ব্যাপক ব্যবহৃত হয়। স্পেন, ইতালি, গ্রিস, মাল্টায় এই অ্যারাবেস্ক কারুকাজ বেশি দেখা যায়।

ইউরোপের ভাষাসমূহে আরবি বর্ণমালার ব্যবহার

অনারবি ভাষায় আরবি বর্ণমালার ব্যবহার শুধু প্রাচ্যের ভাষাসমূহে নয়; বরং পাশ্চাত্যের বহু ভাষায়ও হয়েছে। এ ধরনের ভাষাগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো :

ক. আলজামিয়াড়ু ভাষা

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, স্পেনের মরিস্কোরা কাশতালিয়া, আরবি ও রুমানিয়া প্রভৃতি ভাষার সমন্বয়ে গঠিত Aljamiado (الخميادو) ভাষা আরবি অক্ষরে লিখত। এ ভাষায় তাদের ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশেষ করে তাফসির, হাদিস, ফিকহ ও তাসাউফ প্রভৃতি বিষয়ক বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। আরবি অক্ষরে লিখিত এ ভাষার অনেক গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি স্পেনের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আজও সংরক্ষিত রয়েছে (দ্র. চিত্র-৪)। বর্তমানেও স্পেনের অনেক মুসলমান 'আলজামিয়াড়ু' ভাষা আরবি লিপিরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করে থাকে।

খ. আলজামিয়া-পর্তুগিজ (Aljamia Portuguesia) ভাষা

আরব-মুসলমানরা পর্তুগিজ ভাষাও আরবি লিপিরীতি অনুসরণ করে লিখত। তারা একে আলজামিয়া-পর্তুগিজ (Aljamia Portuguesia) ভাষা নামেও অভিহিত করত।[৩০]

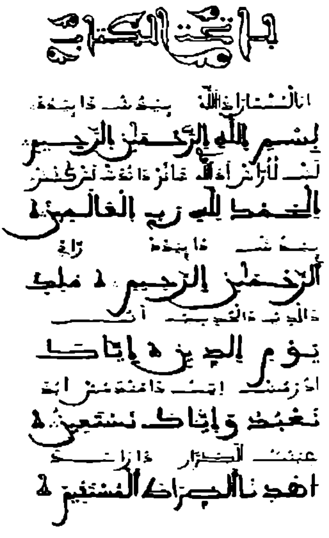

চিত্র-৪: এতে সুরা ফাতিহা আরবিতে এবং এর অনুবাদ অষলধসরধফড় ভাষায় প্রণীত

www.pathagar.com

সম্প্রতি Pablogil প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্পেন ও পর্তুগালের আলজামিয়াদু ভাষার একটি নিদর্শন প্রকাশ করেছেন। এতে আরবি হরকতের অতিরিক্ত কয়েকটি হরকতের সংযোজন লক্ষ করা যায়।[৩১]

গ. হল্যান্ড ভাষা

হল্যান্ড ভাষায়ও আরবি লিপিরীতি অনুপ্রবেশ করেছিল। দক্ষিণ-আফ্রিকার কাব কলোনির মুহাজির মুসলমানরা হল্যান্ড ভাষা আরবি লিপিরীতি অবলম্বনে লিখত। তারা হল্যান্ড ভাষায় প্রণীত অনেক ধর্মীয় গ্রন্থ এ লিপিরীতিতে প্রকাশ করেছিল।[৩২]

ঘ. স্লাভিক ভাষা

স্লাভিক ভাষায়ও আরবি লিপিরীতি অনুপ্রবেশ করেছিল। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনিয়ার মুসলমানরা তাদের মাতৃভাষা 'স্লাভিক' আজও আরবি লিপিরীতির অনুকরণে লিখে আসছে। সেখানে অস্ট্রিয়ার আধিপত্য বিস্তারের আগে তারা আরবি ভাষাতেও লিখত। পাশাপাশি তুর্কিদের সাথে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের সংমিশ্রণের কারণে তুর্কি ভাষায়ও তারা লিখত। তবে এরপর তারা জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যে কেবল তাদের মাতৃভাষাই ব্যবহার করতে থাকে।

পরবর্তীকালে 'খাওজাত'-এর মধ্য ভূখণ্ডে একটি আন্দোলন দানা বাঁধে। এর উদ্দেশ্য ছিল ন্যূনপক্ষে ধর্মীয় বিষয়গুলোর সাহিত্যিক আলোচনা স্লাভিক ভাষা ও আরবি অক্ষরে লিপিবদ্ধ করা। তারা আরবি বর্ণগুলোকে স্লাভিক ভাষার চাহিদা অনুসারে গড়ে তোলে। সারায়েভোর আলিম ও ইমামদের সংগঠন '*ঐক্যফ্রন্ট*'-এর মুখপত্র 'معلم' এ লিপির প্রতিনিধিত্ব করে।[৩৩]

তাছাড়া পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া, ইউক্রেন ও বাইলো রাশিয়ায় বসবাসকারী তাতারি মুসলমানরা যখন তাদের মাতৃভাষা ত্যাগ করে স্থানীয় ভাষাসমূহ গ্রহণ করে, তখন তারা এ ভাষাগুলোর জন্য আরবি বর্ণমালা গ্রহণ করেছিল। তারা তাদের ভাষায় অনূদিত কুরআন মজিদের একটি অনুবাদ-গ্রন্থকে আরবি বর্ণমালায় লিখেছিল। সিসিলি ও প্রভাঁসাল (Provencal) ভাষা দুটিও হয়তো এককালে আরবি বর্ণমালায় লিখিত হতো। সুইজারল্যান্ডের ওপর আরব অধিকার জার্মান ভাষাকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল, তা জানা যায়নি।[৩৪]

তথ্যসূত্র

১ মাদ্রিদের ৬০ মাইল দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিমে আইবেরীয় উপদ্বীপের কেন্দ্রে অবস্থিত একটি শহর।

২ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১০৩।

৩ আলহামরাঃ মুসলিম স্থাপত্যের এক বিস্ময়কর নিদর্শন। নাসিরীয় বংশের প্রথম সুলতান মুহম্মদ ইবনুল আহমার (১২৩২-১২৭৩ খ্রি.) এর ভিত্তি স্থাপন করেন। ১২৪৮ খ্রিষ্টাব্দে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং নানা পর্বে প্রায় দুশত বছর ধরে এ নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকে। এ প্রাসাদ এতই সৌন্দর্যমণ্ডিত যে, চোখে দেখা ছাড়া এর উপযুক্ত বর্ণনা দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব। রাজা ফার্ডিন্যান্ড এবং রানি ইসাবেলা কর্তৃক স্পেনের গ্রানাডা

www.pathagar.com

দখলের পর তারা এর রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। ১৮৭০ সালে এটি স্পেনের জাতীয় ইমারত ঘোষিত হয়।

৪ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৯।

৫ এ পাণ্ডুলিপিগুলো ১০০৯ খ্রিষ্টাব্দে কর্ডোবা নগরীকে অবরোধ করার পর ছিনতাই হয়ে গিয়েছিল এবং ধ্বংস করা হয়েছিল। তবে যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তা আজও পর্যন্ত মাদ্রিদের নিকটবর্তী আস্কোরিয়াল গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে (রিফা'ঈ,*প্রাগুক্ত*, ১০৩)।

৬ ইয়াকুব আলী, ড. এ. কে. এম., *মুসলিম স্থাপত্য*, ইফাবা, ১৯৮১।

৭ জিমেনিস: রানি ইসাবেলার পুরোহিত ছিলেন।

৮ তারা ভয়ে নামেমাত্র খ্রিষ্টানধর্মে দীক্ষিত হলেও তাদের অধিকাংশই ধর্মবিশ্বাসে অটুট ছিল। তারা গোপনে ধর্ম-কর্ম পালন করত। তবে এ নামমাত্র খ্রিষ্টানদের প্রতি স্পেনের শাসকবর্গ অতি সর্তকতার সাথে পাহারা দিত এবং ধর্মভ্রষ্টতার সামান্যতম লক্ষণও তাদের ওপর বিচারসভার দণ্ড আনয়ন করত (আমীর আলী, সৈয়দ, *আরব জাতির ইতিহাস*, অনু: শেখ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃ ৪৭৫)।

৯ মরিস্কো: অর্থ ছোট মুর। রোমানরা পশ্চিম আফ্রিকাকে Maurentania এবং এর অধিবাসীদেরকে Mauri (পশ্চিম দেশীয়) বলত। এখান থেকেই স্পেনীয় Moro ও ইংরেজি Moor শব্দের উৎপত্তি হয়েছে (Hitti. *op.cit.* p. 555)। উল্লেখ্য যে, আরবরা স্পেন জয় করার পর মৌরিতানিয়া থেকে সৈন্য সংগ্রহ করেছিল। তাই আরব ও মৌরতানীয় এবং পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম অঞ্চল থেকে আগত মুসলমানদেরকে স্পেনবাসীরা মুর বলে ডাকত (এবন গোলাম সামাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬২)।

১০ স্পেনের কাশতেলা (castilla) অঞ্চলের ভাষা।

১১ আমীর আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪৭৫।

১২ Scott.S. P., *History of the Moorish Empire in Europe*,vol.III, p...; মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৩।

১৩ Scott. Lanepoole, S. *The Moors in Spain*, p 272-73.

১৪ الخميادو:এটি আরবি শব্দ الأعجمية -এর বিকৃত রূপ। এর নামকরণের রহস্য হলো: আরবরা আরবি নয় এমন প্রত্যেক বিষয়কে أعجمي বলে অভিহিত করে থাকে। তাদের এ রীতি অনুকরণ করে আন্দালুসবাসীরাও কাশতালিয়া ভাষাকে أعجمي নামে অভিহিত করত। অতঃপর এ শব্দটি স্পেনিস ভাষায় ع বর্ণ ছাড়াই স্থানান্তরিত হয়। কারণ ইউরোপীয় ভাষায় ع -এর ব্যবহার নেই। তদুপরি মধ্যবর্তী أ কে বিলুপ্ত করা হয়। ফলে তারা الأعجمي -কে ألجمي হিসেবে উচ্চারণ করতে বাধ্য হয়। অতঃপর শব্দটি সাকিন যুক্ত লামসহ ألجمي হিসেবে লোকমুখে বহুল প্রচলন লাভ করে। স্পেনবাসীরা ج -কে অনেক সময় خ উচ্চারণ করে থাকে। এ কারণে তারা শব্দটিকে الخمي হিসেবেও উচ্চারণ করত। অতঃপর এর সাথে তারা তাদের সম্বন্ধসূচক অব্যয় 'do' যুক্ত করে। ফলে শব্দটি Aljamiado (الخميادو)-তে রূপান্তরিত হয়।

১৫ Scott. *op.cit.*, p 148.

১৬ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১০২।

১৭ এ প্রসঙ্গে ইংরেজ ঐতিহাসিক গিবন বলেন, "আরবরা ইউরোপে জিব্রাল্টার থেকে লিওয়ার নদীর অববাহিকা পর্যন্ত প্রায় তিন শতাধিক স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। এসব তাদের করতলগত ছিল। যদি তারা সামনে অগ্রসর হয়ে আরো তিন শতাধিক স্থানে ছড়িয়ে পড়ত, তাহলে তারা পূর্ব ইউরোপের বলেনিয়ার সীমানা কিংবা ইংল্যান্ডের ইকুস পর্বত

www.pathagar.com

পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারত। এভাবে তাদের পক্ষে জার্মানির রিন নদীও অতিক্রম করা সহজ হয়ে পড়ত, যেমন তারা ফুরাত ও নীল নদী সহজে অতিক্রম করেছিল। অপরপক্ষে মিসর ও সিরিয়ার রণপোত বহর কিংবা তিউনিসীয় রণপোত বহরের মতো ইংরেজদের কোনো রণপোত বহর না থাকায় আরব রণপোত বহর কোনো নৌযুদ্ধ ছাড়াই তিমস নদীতে অনুপ্রবেশ করেছিল।"

ফরাসি সম্রাট শার্ল মার্টেল যখন দেখতে পেলেন, মুসলমানরা সামনে অগ্রসর হচ্ছে এবং প্যারিসে পৌছতে মাত্র ২৩৪ কি.মি. বাকি রয়েছে, তখন তিনি যুদ্ধের জন্য সৈন্যদেরকে জড়ো করলেন। ফলে দুই দলের মধ্যে ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে বুওয়াটির প্রান্তরে তুমুল যুদ্ধ বাঁধে। এ যুদ্ধে প্রথমদিকে মুসলমানরা জয়লাভ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে হেরে যায় এবং তুলুজ ও কারকসুনের পথ ধরে দক্ষিণ ফ্রান্সের নরবুন এলাকায় ফিরে যায়। সেখানে তাদের শক্ত অবস্থান ছিল। সেখান থেকে শার্ল তাদেরকে বিতাড়িত করতে পারেননি।

১৮ উদার আরবরা সংখ্যাগুলো ভারতীয় সংখ্যা হিসেবে প্রচার করত; তবে পাশ্চাত্য জগতে তা আরবি সংখ্যারূপে পরিচিত। এ প্রসঙ্গে ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকার (Vol.-1, P.- 439) ভাষ্য হলো—

Arabic numerals—the numbers 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9; they may have orginated in India but were introduced to the western world from Arabia.

১৯ Blunt. Willfrid. The Times, London, April 2, 1976.

২০ যকি পাশা, আহমদ, عجالة عن بعض المدائن في صقلية, *আল-মু'য়াইয়াদ*, সংখ্যা: ৬৫৯৫, ১৭ সফর, ১৩৩০ হি।

২১ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১০৯।

২২ *প্রাগুক্ত।*

২৩ *The Legacy of Islam*, p 113.

২৪ *The Grammar of Ornament*, 1910. p 57.

২৫ *The Legacy of Islam*, p 178.

২৬ *The Legacy of Islam*, p 178 ; মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৩।

২৭ ইবন গোলাম সামাদ, *ইসলামী শিল্পকলা*, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।

২৮ ইব্রাহিম মণ্ডল, ইসলামী শিল্পকলা, *নতুন কলম*, জুন ১৯৯৬।

২৯ এটি অ্যারাবিক শব্দ থেকে উদ্ভূত। অংকন ও অঙ্গ সজ্জার জন্য যে আরবি লিপি ব্যবহৃত হতো তা-ই হলো 'অ্যারাবেস্ক'।

৩০ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১১৭-১১৮।

৩১ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ ৯, পৃ ৪৫৭।

৩২ উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১১৮।

৩৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১১৮-১১৯।

৩৪ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ ৯, পৃ ৪৫৭।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

লিপিকলার বিকাশ ও সংরক্ষণে ধর্মের প্রভাব

লিপিকলার উদ্ভব, বিকাশ ও সংরক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সর্বদাই ধর্মের বিরাট প্রভাব লক্ষ করা গেছে। যখন জগতে কোনো নতুন ধর্মমতের আবির্ভাব ঘটেছে, তখন সে ধর্মমতকে কেন্দ্র করে লিপিকলা বিশিষ্ট মোড় নিয়েছে। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে ইসলামধর্মের আবির্ভাব পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় এ ধর্মের তুলনা নেই বললেই চলে।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমানদের আরবি লিপির সংরক্ষণ এবং নিজেদের ভাষাগুলো আরবি লিপিতে লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে ইসলাম বিশিষ্ট ভূমিকা রেখেছে। তবে এটি মুসলমানদের জন্য এমন কোনো বিশিষ্ট ব্যাপার নয় যে, যার কোনো নজির অন্যান্য জাতির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না; বরং দেখা যায়, প্রত্যেক যুগে প্রায় প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীরাই নিজেদের লিপিরীতিগুলো সংরক্ষণ করেছে এবং নিজেদের ভাষাগুলো নিজস্ব লিপিরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রথমত ইহুদিদের কথা ধরা যাক। তারা মূলভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত যে দেশেই বসবাস করছে না কেন, তারা সে দেশের ভাষাকে নিজেদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে নিলেও সে ভাষাকে নিজেদের হিব্রু লিপিরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করে থাকে। যেমন তারা বর্তমানে আরবি, ফারসি এবং জার্মানি ও স্প্যানিস প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষাগুলোও হিব্রু লিপিরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করে থাকে।[১] বিশ্বের বহু বড়ো বড়ো শহরে তারা দেশীয় ভাষায় অথচ হিব্রু লিপিরীতিতে লিখে বহু বইপুস্তক ও পত্রপত্রিকা প্রকাশ করেছে। যেমন ইস্তাম্বুলে তারা হিব্রু অক্ষরে স্প্যানিস ভাষায় বেশ কয়েকটি পত্রপত্রিকা বের করে। তদ্রূপ নিউইয়র্কেও তারা হিব্রু অক্ষরে জার্মানি ভাষায় কয়েকটি পত্রিকা বের করে। বর্তমানেও তিউনিসিয়ায় তারা তিউনিসিয়ার সাধারণভাবে বহুল প্রচলিত উপভাষায় কয়েকটি আরবি পত্রিকা বের করে থাকে; তবে তাও হিব্রু অক্ষরে। মিসর ও সিরিয়া প্রভৃতি দেশে অনেক আগে থেকেই তারা হিব্রু অক্ষরে আরবি ভাষা লিখে আসছে। এ ক্ষেত্রে মুসা ইবন মায়মুনের[২] রচনাবলি (দ্র. চিত্র-১) ও সা'ঈদ ফাইয়ুমির তাওরাতের অনুবাদ[৩] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া প্রাচীন তুর্কিস্তানে তারা তুর্কি ভাষা লেখার ক্ষেত্রেও এ হিব্রু বর্ণগুলো ব্যবহার করেছে। এ থেকে বোঝা যায়, ইহুদিরা বরাবরই সব দেশেই নিজেদের লিখনরীতি সংরক্ষণের প্রতি পুরো যত্নবান ছিল; যদিও তারা সব জায়গায় নিজেদের ধর্মীয় ভাষার সংরক্ষণ করেনি।

ইহুদিদের মতো খ্রিষ্টানরাও তাদের সিরিয়ক লিপিরীতি সংরক্ষণের প্রতি যত্নবান ছিল। সিরিয়া ও আরবের খ্রিষ্টান অঞ্চলে যখন ইসলাম প্রবেশ করল এবং আরবি ভাষা

www.pathagar.com

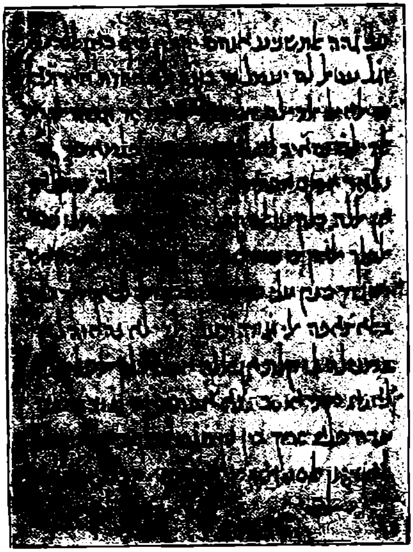

চিত্র-১: মুসা ইবনু মায়মুনের দর্শনবিষয়ক গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠার
ভাষা আরবি, কিন্তু অক্ষর হলো হিব্রু

তাদের ভাষার ওপর একচ্ছত্র প্রাধান্য লাভ করল, তখন তারা কখনো কখনো সিরিয়ক অক্ষরেই আরবি ভাষা লিখত। এ লিখনরীতিকে তারা 'কারশুনি লিপিরীতি (Carshun)' নামে অভিহিত করত। এ রীতির ব্যবহার ম্যারোনাইট ও ইয়াকুবিদের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয়; বরং খ্রিষ্টান রাজা-বাদশাহদের দরবারেও এর ব্যবহার ছড়িয়ে পড়েছিল। এ লিখনরীতি অনুযায়ী তারা বেশ কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেছে। তন্মধ্যে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ 'ইঞ্জিল'ও রয়েছে। নিম্নে এর একটি পৃষ্ঠার লিপিচিত্র (দ্র. চিত্র- ২) দেওয়া হলো। এটি ১৮২৮ সালে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়।

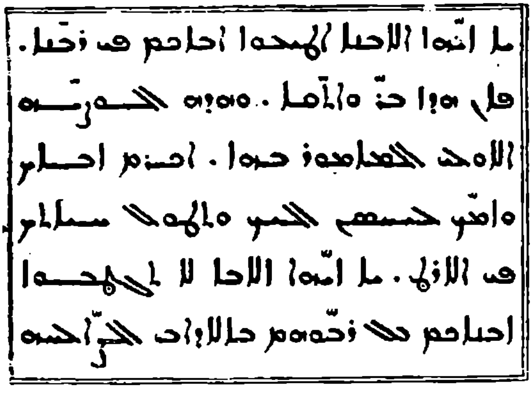

চিত্র-২: কারশুনি লিপি

www.pathagar.com

ইঞ্জিল শরিফের অংশবিশেষ। এর ভাষা আরবি এবং অক্ষরগুলো হলো সুরয়ানি। একে এভাবে পড়তে হবে :

يا أيها الأبناء أطيعوا أباكم في ربنا فإن هذا بر و أتقى , و هذه الوصية الأولى المأمور بها أكرم أباك و أمك ليحسن إليك و تطول حياتك في الأرض ' يا أيها الآباء لا تغضبوا أبناءكم بل ربوهم بالآداب الصالحة .

তদ্রূপ আর্মেনীয় ও গ্রিকরা অটোমান সাম্রাজ্যে, বিশেষ করে ইস্তাম্বুলে বেশ কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিল। তন্মধ্যে কোনোটি দেখা যায় যে, অক্ষর আর্মেনীয় আর ভাষা তুর্কি, আবার কোনোটির অক্ষর গ্রিক আর ভাষা তুর্কি। এর কারণ তারা সকলেই তুর্কি ভাষা জানত। তবে আরবি লিপিরীতির ব্যবহারের প্রতি তাদের অনীহা ছিল। তাই তারা তুর্কি ভাষা লিখতে গিয়ে নিজেদের দেশীয় লিখনরীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, যা তারা ধর্মীয় কারণে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল।

গ্রিক অক্ষরে তুর্কি ভাষার লেখার বহুল প্রচলন আজও পর্যন্ত ইস্তাম্বুলের ধর্মীয় প্রকাশনায় চলে আসছে। এশিয়া মাইনরে বসবাসকারী কার্মালিরা তাদের পবিত্র গ্রন্থসমূহ লেখার কাজে তুর্কি ভাষা ও গ্রিক অক্ষর ব্যবহার করে থাকে। অথচ তাদের ধমনিতে এত বেশি গ্রিক রক্ত নেই, যতটুকু সিরিয়ার রাজপরিবারের সদস্যদের ধমনিতে রয়েছে। তা সত্ত্বেও সাধারণ ধর্মযাজকরা নিজেদেরকে গ্রিক বংশোদ্ভূত বলে পরিচয় তুলে ধরতে আপ্রাণ চেষ্টা করে।

তদ্রূপ বুলগেরিয়ায় বসবাসকারী ল্যাটিন ক্যাথলিকরা সাধারণত বুলগেরীয় ভাষা ব্যবহার করে থাকে। তবে লেখার ক্ষেত্রে তারা বুলগেরীয় অক্ষরের পরিবর্তে ল্যাটিন বর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

প্রাচীনকালে মিসরের প্রতিমা পূজারী ধর্মযাজকরা 'চিত্র লিপি' (হায়ারোগ্লিফিক্স)[৪]-কে পবিত্র বলে জ্ঞান করত। এর সাহায্যে তারা উপাসনালয় বা ধর্মীয় বিভিন্ন নিদর্শনগুলোকে চিত্রিত করত। অথচ তখন চিত্রলিপির চাইতে অনেকখানি সহজ ও সুন্দর লিপি 'ডায়াম্যাটিক্স বর্ণ'ও[৫] ছিল।

বৌদ্ধরাও বর্তমানে উত্তর এশিয়ায় 'তিব্বতি লিপি'কে আর দক্ষিণ এশিয়ায় 'পালি লিপি'কে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

পারস্যে যরথুস্ত্রের অনুসারী অগ্নিউপাসকদের নিকট তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ লেখার জন্য 'পাহলভি লিপি'ই ছিল একমাত্র অবলম্বন, যা যুগ যুগ ধরে তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তদুপরি তারা পাহলভি ভাষাকে তাদের ধর্মীয় ভাষা হওয়ার কারণে 'পবিত্র ভাষা' হিসেবে জ্ঞান করত। তাই তারা পাহলভি ভাষা পাহলভি লিপিরীতিতে লেখাকে অগ্রাধিকার দান করত। আমরা ইতঃপূর্বে ফারসি লিপিরীতির উদ্ভব প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি, পাহলভি ভাষা আরবি ভাষার বিস্তৃতির ফলে ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে এক পর্যায়ে মুখের ভাষা হিসেবে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এতদ্সত্ত্বেও তা গ্রন্থাদি, বিশেষ করে যরথুস্ত্রীয় ধর্মের গ্রন্থাদি লেখার লিপি হিসেবে টিকে থেকেছে।

www.pathagar.com

এ ধরনের প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, অনেক জাতিই, বিশেষ করে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জাতিগুলো তাদের ধর্মীয় ভাষার লিপিকে অত্যন্ত পবিত্র ও বরকতময় মনে করে থাকে। উপরন্তু, তারা একে একটি ধর্মীয় নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করে থাকে; যদিও তারা একে ধর্মের একটি অপরিহার্য অংশরূপে পরিগণিত করে না। তারা যতটুকু না নিজেদের ধর্মীয় ভাষা সংরক্ষণের প্রতি যত্নশীল হয়, তার চেয়ে ধর্মীয় লিপিরীতি সংরক্ষণের প্রতি অধিক যত্নশীল হয়। তাই দেখা যায়, নতুন ধর্ম গ্রহণ করার সাথে সাথে তারা পূর্ব থেকে প্রচলিত লিপিরীতির ব্যবহার পরিহার করে নতুন ধর্মের লিপিরীতিকে অগ্রাধিকার প্রদান করে থাকে। এভাবে পূর্বের লিপিরীতিসমূহ ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে পড়ে।[৬]

এ আলোচনা থেকে স্পষ্টরূপে বোঝা যায়, ধর্ম হলো লিপি ও ভাষাগুলোর উৎপত্তি, প্রসার, বিকাশ ও বিলুপ্তির ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর মাধ্যম। আমরা নিম্নে সেসব লিপিরীতিসমূহের কথা আলোচনা করব, যেগুলো আরবি লিপির বিস্তৃতির ফলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রসঙ্গক্রমে সেসব ভাষার কথাও আলোচনা করব, যেগুলো আরবি ভাষার বিস্তৃতির ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে।

আরবি লিপিরীতির প্রভাবে যেসব লিপিরীতি বিলুপ্ত হয়ে যায়

মুসলমানদের বিজয়ের পূর্বে মুসলিম বিশ্বের অধিবাসীরা নিজ নিজ দেশ ও এলাকার লিপিরীতি অনুসরণ করে লিখত। তারা ইরাক ও সিরিয়ায় সিরিয়ক, অ্যারামাইক ও গ্রিক ভাষায় এবং মিসরে কিবতি ভাষায়, পারস্যে ফারসি ভাষায়, তুর্কিস্তানের মার্ভে তুর্কি ভাষায় ও উত্তর আফ্রিকায় বার্বারি ভাষায় কথা বলত। যখন ইসলামের আবির্ভাব হলো এবং এসব এলাকায় দ্রুত তার প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করে, তখন এসব জাতিসত্তার ওপর আরব জাতিসত্তা প্রাধান্য লাভ করে এবং আরবি লিপি তাদের ব্যবহৃত লিপিরীতিসমূহের ওপর একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। তদুপরি আরবি ভাষাও তাদের ব্যবহৃত ভাষাগুলোর ওপর একচ্ছত্র প্রাধান্য বিস্তার করে এবং ইসলাম এসব এলাকার প্রধান ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফলে আরবি লিপি এসব এলাকার লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং ইরাক, সিরিয়া, মিসর, আফ্রিকা ও সুদান প্রভৃতি রাজ্যে আরবি ভাষা সাধারণ্যে প্রচলিত ভাষারূপে বিস্তৃতি লাভ করে। উপরন্তু এসব দেশ আরব দেশ হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। এ দেশগুলোর জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই হলো মুসলমান। তাই এসব দেশে অনেক আগে থেকে প্রচলিত প্রাচীন লিপিরীতিসমূহ ও ভাষাগুলো এক এক করে ধ্বংস হয়ে যায়। তবে সিরিয়া ও ইরাকের কিছু কিছু প্রত্যন্ত অঞ্চলে যৎসামান্য সিরিয়ক ভাষার অস্তিত্ব অবশিষ্ট রয়েছে। পারস্য, তুরস্ক ও ভারতেও ইসলামের প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করে। এসব এলাকার আলিমদের মধ্যে আরবি ভাষা বহুল প্রচলন লাভ করে; তবে দেশীয় ভাষাগুলো ভাবের আদান-প্রদানের জন্য আজ পর্যন্ত বহাল রয়েছে। কিন্তু আরবি লিপি ইসলামের মাধ্যমে সকলের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে। অপর পৃষ্ঠায় এর প্রসার এবং এর ফলে যেসব লিপিরীতি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে বা আরবি লিপি যেসব লিপিরীতির স্থলাভিষিক্ত হয় সেগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

www.pathagar.com

যখন আরবি লিপি ইসলামের পাশাপাশি আরব দ্বীপে বিস্তৃতি লাভ করে, তখন সেখানে প্রচলিত সকল লিপিরীতির বিলোপ সাধন করে নিজে একাই এসব লিপিরীতির স্থান দখল করে নেয়। এ ধরনের প্রধান প্রধান লিপিরীতিগুলো হলো:

ক. মুসনাদ লিপিরীতি। এর সাহায্যে ইয়ামনে হিমায়ারি ভাষা লিপিবদ্ধ করা হতো।

খ. নাবাতি লিপিরীতি। এর সাহায্যে উত্তর আরবে নাবাতি ভাষা লিপিবদ্ধ করা হতো।

গ. সাফাভি লিপিরীতি। এর সাহায্যে সাফাভি ভাষা লিপিবদ্ধ করা হতো।

আরবি লিপির মতো আরবি ভাষাও দক্ষিণ-আরবের হিমায়ারি ভাষা, হাদরামি ও কাতবানি উপভাষাগুলোর এবং উত্তর আরবের নাবাতি ভাষা, সাফাভি, সামুদি ও লিহয়ানি প্রভৃতি ভাষাগুলোর স্থলাভিষিক্ত হয়।

মিসরে ইসলাম প্রসার লাভ করার পর আরবি লিপি কিবতি লিপির স্থলাভিষিক্ত হয়, যেমন আরবি ভাষা কিবতি ভাষার স্থলাভিষিক্ত হয়। হিজরি ৮৭ সালে মিসরের গভর্নর আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মালিক মিসরের দিওয়ান কিবতি ভাষা থেকে আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। এরপর মিসরের সকল দিওয়ান আরবি ভাষায় ও আরবি লিপিরীতিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। ফলে এখানে কিবতি ভাষা ক্রমে ক্রমে এভাবে ধ্বংস হয়ে যায় যে, মিসরীয়রা কিবতি ভাষা প্রায় পুরোই ভুলে যায়। কয়েকটি কিবতি গির্জা ছাড়া অন্যত্র তার কোনো ব্যবহার ছিল না।

মিসরের কিবতি ভাষা ও লিপির মতো মাগরিবেও (মরক্কো) আরবি লিপি উত্তরের বার্বার গোত্রসমূহের 'বার্বারি লিপিরীতি'র স্থলাভিষিক্ত হয়।

পারস্যে ইসলাম প্রসার লাভ করার পর আরবি লিপি পাহলভি লিপির স্থলাভিষিক্ত হয়, যেমন আরবি ভাষা পাহলভি ভাষার স্থলাভিষিক্ত হয়। পাহলভি ভাষা মুসলমানদের পারস্য বিজয় পর্যন্ত ইরানে প্রচলিত ছিল। এটি 'মধ্যযুগীয় ফারসি' নামে খ্যাত।

সিরিয়ায় ইসলাম প্রসার লাভ করার পর আরবি লিপি সেখানে প্রচলিত সকল লিপিরীতির স্থলাভিষিক্ত হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

ক. রোমান ও গ্রিক লিখনরীতি। এটি সরকারিভাবে প্রচলিত ছিল।

খ. সিরিয়ক ও সামিরি লিখনরীতি।

তাছাড়া স্থানীয় অধিবাসীদের ব্যবহৃত হিব্রু লিপিরীতিও দুর্বল হয়ে পড়ে।

আরবি লিপির মতো আরবি ভাষাও সেখানে সরকারি ভাষা গ্রিক ও ল্যাটিন এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় অ্যারামাইক উপভাষা যেমন সামিরি ও অন্যান্য উপভাষার স্থলাভিষিক্ত হয়।

আরব দ্বীপের বিভিন্ন দেশ ও ইরাকে ইসলাম প্রসার লাভ করার পর আরবি লিপি অ্যারামাইক লিপিরীতিসমূহ, বিশেষ করে সিরিয়ক ও অন্য লিপিরীতিসমূহের স্থলাভিষিক্ত হয়, যেমন আরবি ভাষা সেখানে প্রচলিত সিরিয়ক ও অন্যান্য পূর্বাঞ্চলীয় অ্যারামাইক উপভাষা যেমন ম্যানাইট অ্যারামাইক (মনুর অনুসারীদের ভাষা) ও ব্যাবিলিয়ন-ইহুদি অ্যারামাইক প্রভৃতি ভাষার স্থলাভিষিক্ত হয়। মোদ্দা কথা, আরবি লিপি ও আরবি ভাষা সিরিয়া, ইরাক ও এদের পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলীয় সকল অ্যারামাইক লিপিরীতি ও ভাষার স্থান দখল করে নেয়। যেমন ইতঃপূর্বে

www.pathagar.com

অ্যারামাইক লিপিরীতি পূর্বাঞ্চলীয় প্রাচীন সকল লিপিরীতির (যেমন ফিনিশীয় লিপিরীতি ও অধিকাংশ প্রাচীন রাজ্যে ব্যবহৃত কীলকাকৃতি লিপিরীতি) এবং অ্যারামাইক ভাষা ব্যাবিলিয়ন, আশুরিয়ন, হিব্রু ও ফিনিশীয় প্রভৃতি ভাষার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল।

ভারতেও ইসলাম প্রসার লাভ করার পর আরবি লিপি প্রচলিত অ্যারামাইক লিপি থেকে উদ্ভূত সকল ভারতীয় লিপিরীতির স্থান দখল করে নেয়। এ সকল ভারতীয় লিপি মুসলিম বিজয় পর্যন্ত ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যবহৃত হতো। ইসলাম প্রসারের সাথে সাথে আরবি লিপির প্রসার ও প্রভাবের ফলে এসব লিপিরীতি ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন তুর্কিদের ব্যবহৃত উইগুরি লিপিরীতি আরবি লিপির প্রভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়।[৭]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, আরবি ভাষা আরবদের বিজয়ধারার সাথে সাথে উন্নতি ও প্রসার লাভ করতে থাকে। পৃথিবীর যেখানেই আরবরা পদার্পণ করেছে, সেখানে তাদের সাথে তাদের ভাষাও পদার্পণ করেছে। উপরন্তু, তাদের ভাষা অনেক নতুন দেশের মূল ভাষাকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। আরবি ভাষার পাশাপাশি আরবি লিপিও উন্নতি ও প্রসার লাভ করেছে। তবে তা শুধু আরবি ভাষার সাথেই নয়; বরং ইসলামের সাথে সাথে তা উন্নতি ও প্রসার লাভ করেছে। যেখানে ইসলাম প্রবেশ করেছে, সেখানেই আরবি লিপি প্রবেশ করেছে। উপরন্তু, তা অনেক নতুন ইসলামি দেশের পুরনো লিপিকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। এটি আরবি ভাষা ও আরবি লিপির অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। আর তা সম্ভব হয়েছে ইসলামের বদৌলতে। পৃথিবীতে এমন অনেক জাতিও রয়েছে, বিশ্বসমাজে যারা উন্নতির শীর্ষে পৌঁছেছে এবং বিভিন্ন দেশকে তারা পদানত করেছে; কিন্তু তারা নিজের ভাষা ও লিপির জন্য এমন কোনো বিশিষ্ট মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়নি, আজও যার প্রভাব পুরোদমে বহাল রয়েছে। তাই কবিগুরু আহমদ শাওকি বলেন,

مَا عَلِمْنَا لِغَيْرِهِمْ مِنْ لِسَانٍ   زَالَ أَهْلُوهُ وَهُوَ فِي إِقْبَالٍ
بَلِيَتْ هَاشِمٌ، وَبَادَتْ نَزَارُ   وَاللِّسَانُ الْمُبِيْنُ لَيْسَ بِبَالٍ.

আমরা জানি না, আরব ছাড়া অন্যদের এমন কোনো ভাষা রয়েছে, যার ভাষাভাষীরা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও তা উন্নতি লাভ করতেই আছে। অথচ হাশিম ধ্বংস হয়ে গেছে এবং নজার বিলীন হয়ে গেছে; তবুও 'লিসানুন মুবীন' (অর্থাৎ আরবি ভাষা) ধ্বংস হয়ে যায়নি।

তথ্যসূত্র

১. ইউরোপীয়রা এ ধরনের লিপিকে বিভিন্ন এলাকার ভিত্তিতে বিভিন্ন নামে অভিহিত করে থাকে। যেমন মিসর ও সিরিয়া প্রভৃতি রাজ্যে ইহুদিরা হিব্রু লিপিরীতিতে আরবি ভাষা লিখে থাকে। একে 'Judeo-Arabic' (অর্থাৎ ইসরাইলি-আরবি) নামে অভিহিত করা হয়। পারস্যের ইহুদিরা হিব্রু অক্ষরে 'ফারসি-ইসরাইলি ভাষা' (এটি মূলত ফারসি ভাষা; তবে এতে অল্প কিছু হিব্রু ভাষার শব্দ অনুপ্রবেশ করেছে।) লিখে থাকে। একে 'Judeo-Persian' (ইসরাইলি-ফারসি) নামে অভিহিত করা হয়। জার্মানের ইহুদিরা হিব্রু লিপিরীতি অনুযায়ী জার্মানি ভাষা লিখে থাকে। একে 'Judeo-German' নামে অভিহিত করা হয়। তবে জার্মান সরকার হিসাবপত্রে এবং বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে এ লিপি ব্যবহার করার

www.pathagar.com

ব্যাপারে তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। তুর্কিস্তান ও অন্যান্য দেশে স্পেনিস ইহুদিদের লিপিকে "Judeo-Spanish" নামে অভিহিত করা হয়। তদ্রূপ তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া ও ত্রিপলিতে ইহুদিরা কথ্য আরবি ভাষাকে হিব্রু লিপিরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করে। একে 'Judeo-Tunisian' নামে অভিহিত করা হয়।

২. মুসা ইবনু মায়মুন : একজন বিশিষ্ট ইহুদি পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ১১৩৫ খ্রিষ্টাব্দে কর্ডোবায় জন্মগ্রহণ করেন। ১১৬৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মিসরে চলে আসেন এবং এখানে সুলতান সালাহুদ্দিনের সান্নিধ্যে থেকে জীবন কাটান। তিনি যুগশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন। তা ছাড়া বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানেও তার দক্ষতা ছিল।

৩. সাঈদ ইব্‌ন ইয়াকুবের আরবি ভাষায় অনূদিত তাওরাতের পাঁচটি পুস্তিকা হিব্রু অক্ষরে ইস্তাম্বুল থেকে ১৫৪৬ খ্রিষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। এ প্রকাশনাটি 'ততরাগলূত' নামে খ্যাতি লাভ করে। ধারণা করা হয় যে, এটিই হচ্ছে তাওরাতের প্রাচীনতম আরবি অনুবাদ; কিন্তু রোমের ভ্যাটিকান লাইব্রেরিতে হিব্রু ও সামিরি ভাষায় লিখিত ওল্ড টেস্টামেন্টের একটি অপূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি রয়েছে। এটি সামিরি অক্ষরে আরবি ভাষায় অনূদিত। এটি খ্রিষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ করা হয়। তবে এটি যে ঐ শতাব্দীর অনুবাদ তার কোনো প্রমাণ তাতে নেই।

৪. হায়ারোগ্লিফ্স: এটি একটি গ্রিক শব্দ। গ্রিকরা প্রাচীন মিসরে প্রচলিত লেখার চিহ্ন ও নিদর্শনগুলো বোঝানোর জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করত। এটি هيروس ও غليفاوس - এর সমন্বয়ে গঠিত। هيروس অর্থ পবিত্র বস্তু এবং غليفاوس অর্থ চিত্র। তাই শব্দটির পুরো মর্ম হলো পবিত্র বস্তুর চিত্র কিংবা পবিত্র চিহ্নসমূহ। এ নামটি অদ্যাবধি যথারীতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ লিপিটি মূলত জীবজন্তু ও বস্তুর প্রতিকৃতি ও চিত্রনির্ভর ছিল। তবে এতে সাঙ্কেতিক চিহ্নও ব্যবহার করা হতো। প্রাচীন মিসরীয়রা খ্রিষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীর শুরু থেকে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড সচরাচর বিষয় লেখার জন্য 'হায়ারোটিক্স লিপিরীতি' ব্যবহার করত। এটি হায়ারোগ্লিফ্সের তুলনায় অধিকতর সহজ ছিল। হায়ারোগ্লিফ্সে ব্যবহৃত চিহ্ন ও আকৃতিগুলোকে কাটছাঁট করে এ লিপিপদ্ধতির আবিষ্কার করা হয়।

৫. ডায়াম্যাটিক্স লিপি: এটি সর্বসাধারণের লিপি ছিল। এটি হায়ার‍্যাটিক্সের তুলনায় অধিকতর সহজ-সরল। এটি মিসরে ষোড়শ সম্রাজ্ঞীর আমলে ক্রমে ক্রমে হায়ার‍্যাটিক্সের স্থান দখল করে নেয়। আর গ্রিকদের সময় এটি দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হতো। এ লিপিই থেকে পৃথিবীর সকল জাতি ফিনিশীয়দের মাধ্যমে বর্ণমালার জ্ঞান লাভ করে। মিসরে খ্রিষ্টানধর্ম প্রবেশ করার পর সেখানকার উপর্যুক্ত তিনটি লিপিরীতির ব্যবহার পরিত্যক্ত হয়ে যায় এবং এগুলোর পরিবর্তে কিবতি বর্ণমালার ব্যবহার শুরু হয়। কিবতি বর্ণমালা গ্রিক বর্ণমালা এবং গ্রিক বর্ণমালায় নেই এমন ছয়টি মিসরীয় ধ্বনির প্রতিনিধিত্বকারী ছয়টি বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এর প্রেক্ষাপট হলো- খ্রিষ্টানধর্ম গ্রিকদের মাধ্যমে মিসরে পৌঁছে। ফলে গ্রিকদের ভাষাই অন্যান্য জাতির মতো কিবতিদের কাছেও ধর্মীয় ভাষার মর্যাদা পেয়ে যায়। তাই খুব দ্রুত গ্রিক বর্ণগুলো মিসরীয়দের মাঝে প্রচলন লাভ করে এবং গ্রিক লিপিরীতি তাদের লিপিরীতিসমূহের স্থান দখল করে নেয়। তদ্রূপ দীন ইসলামও আরবদের মাধ্যমে বিস্তৃতি লাভ করে। তাই মুসলিম বিশ্বের সকল এলাকায় আরবিই হলো ইসলামের ভাষা এবং এ ভাষার লিপিই হলো ইসলামি লিপি। যেমন মিসরে আরবি ভাষা ও আরবি লিপি খ্রিষ্টানদের কিবতি ভাষা ও লিপির স্থান দখল করে নেয়। যেমন ইতঃপূর্বে কিবতি লিপি সেখানকার প্রতিমাপূজারিদের হায়ারোগ্লিফ্স, হায়ারোটিক্স ও

www.pathagar.com

ডায়াম্যাটিক্সের স্থান দখল করে নিয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায়, সর্বক্ষেত্রে ধর্মের একটি আশ্চর্য ধরনের প্রভাব রয়েছে। যখন কোনো ধর্ম কোথাও বিস্তার লাভ করে, তখন তা যেমন পূর্ব থেকে প্রচলিত সকল রীতিনীতিকে বিলুপ্ত করে দেয়, তেমনি তার নিদর্শনসমূহ পূর্ববর্তীদের নিদর্শনসমূহকেও মুছে দেয়। দেশের অবস্থাও তাই। আমরা দেখতে পাই, যখন কোনো দেশ অন্য কোনো দেশের ওপর বিজয় লাভ করে, তখন তা সে দেশের সভ্যতার সকল নিদর্শন এক এক করে ধ্বংস করে ফেলে এবং নিজেদের জন্য নতুন নতুন নিদর্শন ও সভ্যতা গড়ে তোলে। এভাবে বিজিত রাজ্যের সকল নিদর্শন ধ্বংস হয়ে যায় আর সে দেশের অধিবাসীরাও বিজেতাদের অনুকরণে নিজেদের গড়ে তোলে। এ হলো সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ পাকের নির্ধারিত সুন্নাত। و لن تجد لسنة الله تبديلا

৬. 'উবাদাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১২৫-১৩২

৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৩৩-১৩৮

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রসিদ্ধ লিপিকারগণ

ঐতিহাসিকগণ লিপিশিল্পের বিভিন্ন অধ্যায়ের বহু খ্যাতিমান লিপিকারের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ লিপির সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও নান্দনিকতা সৃষ্টিতে অবদান রেখেছেন, আবার কেউ কেউ বিভিন্ন নতুন নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। তবে তাঁদের মধ্যে এমন অল্প কয়েকজন লিপিশিল্পী রয়েছেন, যাঁরা নতুন নতুন বিভিন্ন লিপিশৈলী উদ্ভাবন করেছেন এবং যাঁদের অসাধারণ জ্ঞান, ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতার ফলে আরবি লিপিশিল্প চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। ফলে তাঁরা এ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের মহিমান্বিত আসন লাভ করেছেন এবং যুগযুগ ধরে তাঁদের নাম মর্যাদা ও গৌরবের সাথে ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে থাকবে।

শ্রেষ্ঠ লিপিশিল্পীগণ

ক. ইবনু মুকলা

মুসলিম লিপিকারদের শিরোমণি ছিলেন আবু আলী মুহাম্মদ ইবনু মুকলা।[১] তাঁর অসামান্য অবদান মুসলিম লিপিশিল্পকে মহিমান্বিত করেছে। তিনি লিপিশিল্পকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে সর্বপ্রথম নিপুণ জ্যামিতিক পদ্ধতিতে সুবিন্যস্ত করেন এবং বিজ্ঞানসম্মত ধারায় দাঁড় করান।

ইবনু মুকলা আব্বাসীয় খিলাফতের যুগে উজির ছিলেন। তিনি ২৭২হি/৮৮৫-৬ সালে বাগদাদে এক ঐতিহ্যবাহী লিখিয়ে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন[২] এবং পারস্যে ভূমি রাজস্ব আদায়কারী হিসেবে তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করেন। ২৯৬হি/৯০৮ সালে ইবনুল ফুরাতের মন্ত্রিত্ব লাভের পর তাঁকে কেন্দ্রীয় প্রশাসনে সচিবের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সরকারি চিঠিপত্র খোলা এবং প্রেরণের দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর ন্যস্ত। ইবনুল ফুরাতের দ্বিতীয় দফা মন্ত্রিত্বের সময় (৩০৪হি/৯১৭ থেকে ৩০৬/৯১৯) তিনি তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করেন। কিন্তু মনিবের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করার ব্যাপারে তাঁর কোনো বিবেক-যন্ত্রণা ছিল না। এই কারণেই ইবনুল ফুরাতের তৃতীয় দফা মন্ত্রিত্বের সময় প্রশাসনিক সদস্যদের মধ্যে তাঁর অন্তর্ভুক্তি হয়নি। যা হোক, আলী ইবনু ঈসা তাঁর দ্বিতীয় দফা মন্ত্রিত্বের সময়ে (৩০৫-১৬হি/৯১৭-২৮) সরকারি সম্পত্তির দিওয়ানের দায়িত্বে তাঁকে নিযুক্ত করেন। এ সময়েই তিনি প্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক নাসরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করে তাঁর নেক নজরের কল্যাণে ৩১৬হি/৯২৮ সালে মন্ত্রিত্ব লাভ করতে এবং ৩১৮হি/৯৩০ সাল পর্যন্ত এ পদে বহাল থাকতে সক্ষম হন। সে সময় যে অর্থনৈতিক দুরাবস্থা দেখা দিয়েছিল, বেশ সাফল্যের সাথে তার মোকাবিলা করতে সক্ষম হলেও তিনি সামরিক নেতৃবৃন্দের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরসন

www.pathagar.com

করতে পারেন নাই। ফলে তাঁর মন্ত্রিত্বের সময়ে ৩১৭হি/৯২৯ সালে একটি ব্যর্থ প্রাসাদ বিপ্লব হয়, যাতে আল-মুকতাদিরের স্থলে সাময়িকভাবে তাঁর ভাই ক্ষমতাসীন হন। ইবনু মুকলা মন্ত্রী হিসেবে বহাল থাকেন; কিন্তু আলী ইবনু ঈসার উপদেশ অনুসারে কাজ করতে বাধ্য হন। অধিকন্তু আলী ইবনু ঈসা বিশেষভাবে মজালিম (ফৌজদারি) আদালতের দায়িত্বেও নিয়োজিত ছিলেন। অন্যপক্ষে প্রধান সেনাপতি মুনিসের অভিভাবকত্ব হতে মুক্তিলাভে অক্ষমতাও ইবনু মুকলার পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইবনু মুকলা খলিফা আল-কাহির কর্তৃক পুনরায় মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং ছয়মাস (৩২০-২১হি/৯৩২-৩৩সাল) যাবৎ সরকার পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন। কিন্তু পরিস্থিতি বড়োই অনিশ্চিত ছিল এবং তিনি খলিফার বিরোধিতার সম্মুখীন হন। খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হয়ে তিনি পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। অবশ্য কয়েক মাস পর তিনি খলিফাকে সিংহাসনচ্যুত এবং বন্দি করতে সমর্থ হন। নতুন খলিফা আর-রাদির খিলাফতকালে তাঁর তৃতীয়বারের মন্ত্রিত্বের মেয়াদ ছিল ৩২২হি/৯৩৪ থেকে ৩২৪হি/৯৩৬ সাল পর্যন্ত। তাঁর কূটবুদ্ধি সত্ত্বেও তিনি মাওসিলে হামদানি আমিরদের ওপর অথবা ওয়াসিতের গভর্নর হাজিব ইবনু রায়িকের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সমর্থ হননি এবং তিনি অর্থনৈতিক ও আর্থিক সংকটের মুকাবিলা করতেও ব্যর্থ হন। তাঁর এ মর্যাদাহানি প্রকৃতপক্ষে খলিফাদের স্বাধীনতার অবসান সূচনা করে এবং কয়েক মাস পরেই প্রথম আমিরুল উমারা নিয়োগ করা হয়। ইবনু মুকলার প্রচেষ্টা কোনো সাফল্য লাভ করে নাই। অবশ্য ধর্মীয় ব্যাপারে আল-মুকতাদিরের খিলাফতের অবসানের পর যে সুন্নি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তিনি তাতে সাফল্যজনক সমর্থন দিয়েছিলেন।

ইবনু রায়িক আমিরুল উমারা নিযুক্ত হলে ইবনু মুকলা এবং তাঁর যে পুত্র তাঁর দ্বিতীয় দফা মন্ত্রিত্বের সময় দক্ষতার সাথে তাঁর সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করেছিল, উভয়ের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রতিবাদস্বরূপ তিনি নতুন আমিরুল উমারার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং এতে এতদূর অগ্রসর হন যে, খলিফা তাঁকে বন্দি করার ব্যবস্থা করেন এবং ইবনু রায়িক তাঁর দক্ষিণ হস্ত কর্তন করিয়ে দেন।[৩] এ সময় তিনি বলেছিলেন: "যে হাত দ্বারা আমি খলিফাদের সেবা করেছি এবং দু দু বার পবিত্র কুরআন লিখেছি তাকে চোরের হাত কাটার মতো কাটা হলো!" তিনি আরো বলেন :

إذا ما مات بعضك فابك بعضا فإن البعض من بعض قريب

"যখন তোমার কেউ মারা যায়, তখন তুমি অন্যকে কাঁদাও। কেননা প্রত্যেকেই একে অপরের আত্মীয়।"[৪]

কিছুকাল পরে যখন আমির বাজকম বাগদাদ অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন ইবনু মুকলার জিহ্বা কর্তন করিয়ে দেওয়া হয় এবং তিনি অবহেলিত ও বন্দি অবস্থায় ১০ শওয়াল, ৩২৮হি/২০ জুলাই, ৯৪০ সাল তারিখে ইন্তেকাল করেন।

ইবনু মুকলা রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছাড়াও একজন বিখ্যাত হস্তলিপিবিদ ছিলেন। তিনি প্রথম বয়সে তাঁর পিতা এবং বাগদাদের প্রখ্যাত লিপিকার ইসহাক ইবন ইব্রাহিম

আল-আহওয়াল থেকে লিপিশিল্পের জ্ঞান অর্জন করেন।[৫] সমসাময়িককালে তিনি লিপিশিল্পে শ্রেষ্ঠত্বের মহিমান্বিত আসন লাভ করেন। প্রখ্যাত লিপিকার কুতবা আল-মুহাররির আরবি লিপিশিল্পে যে সৌন্দর্য ও নান্দনিকতার অবতারণা করেন, তার সূত্র ধরে তিনি অনেক দূরে এগিয়ে গেছেন। সর্বপ্রথম তিনিই লিপিকলার মৌলিক বিন্যাস-রীতি উদ্ভাবন করেন। কৌণিক লিপিরীতি থেকে বক্রাকার লিপির উত্তরণে তিনি সর্বাধিক অবদান রাখেন। তদুপরি নাসখ লিখনপদ্ধতি তাঁর হাতেই সুষমামণ্ডিত রূপ লাভ করে। আরবি লিপিকলায় তাঁর সর্বোত্তম আবিষ্কার হলো: বর্ণগুলোর জ্যামিতিক পরিমাপ ও মানদণ্ড নিরূপণ। তাঁর এ পরিমাপ ও মানদণ্ডের ভিত্তি ছিল বিন্দু ও বৃত্ত। তিনি একটি আলিফের পরিমাপ নির্ধারণ করেন কতকগুলো খাড়াভাবে সাজানো বিন্দুর সাহায্যে। এগুলো ৫ থেকে ৭ পর্যন্ত ব্যবহৃত হতে পারে। আলিফের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য অন্যান্য আরবি হরফের পরিমাপ নির্ধারিত করা হয় বৃত্তের মাধ্যমে অর্থাৎ একটি আলিফের দৈর্ঘ্য একটি বৃত্তের ব্যাসের সমতুল্য হবে। এভাবে ب ' ف ' ق প্রভৃতি অক্ষরগুলোর বক্রতা নির্ধারিত হয় সামঞ্জস্য, ভারসাম্য ও সাবলীল ছন্দ রক্ষার জন্য।[৬] পরিমাপের একক হিসেবে বিন্দুর ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় তাঁর এ লিপিকে الخط المنسوب (সু-আনুপাতিক লিপি) নামেও অভিহিত করা হয়। লিপিকলার ক্রমবিকাশে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে উদ্ভূত এই কৌশল প্রয়োগ করে ইবনু মুকলা মোট ছয়টি বক্রাকার লিপিশৈলীর উৎকর্ষ সাধন করেন, যা 'আকলামুস সিত্তা' (Six scripts) নামে পরিচিত। এ ছয়টি লিখনপদ্ধতি হলো: সুলুস, নাসখ, মুহাক্কক, রায়হানি, রিকা ও তাওকি। তাছাড়া তিনি 'দারজ' লিপিরীতি নামে নতুন অন্য একটি লিপিরীতিও আবিষ্কার করেন।[৭] তাঁর লেখার নিদর্শনসমূহের মধ্যে বর্তমানে কয়েকটি মুসহাফের হদিস পাওয়া যায়। প্রখ্যাত লিপিকার ইবনুল বাওয়াব শিরাজে বাহাউদ্দৌল্লাহ ইবন আদদুল্লৌহর ভাণ্ডারে ইবনু মুকলার লিখিত একটি মুসহাফ খুঁজে পান। তবে তা কিছুটা অপূর্ণাঙ্গ ছিল। ইবনুল বাওয়াব নিজেই এর পূর্ণতা দান করেন। তাছাড়া আন্দালুসের আশবিলিয়্যাহ শহরের জামি আদ্‌বসেও তাঁর লিখিত একটি মুসহাফ সংরক্ষিত রয়েছে। লিপিবিজ্ঞান সম্পর্কে جمل الخط নামে তাঁর একটি বড়ো গ্রন্থও রয়েছে।[৮]

ইবনু মুকলার লিপির অপূর্ব সৌন্দর্য ও লালিত্য সম্পর্কে অনেকেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। ঐতিহাসিক সালাবি বলেন, "ইবনু মুকলার লিপি সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে প্রবাদ হিসেবে বর্ণনা করা হয়। কেননা তাঁর লেখা ছিল পৃথিবীর সুন্দরতম লিপি। এর মতো অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত ও মনোমুগ্ধকর কোনো লেখা দর্শকরা কখনো দেখতে পায়নি।"[৯]

ইবনুয যানজি বলেন, "লিপিকলায় ইবনু মুকলার অবস্থান নবির মতোই। তাঁর হাতেই লিপিকলা পূর্ণতা লাভ করেছে।"[১০]

সাহিব ইসমা'ঈল ইবনু আব্বাদ (৩২৬/৯৩৮-৩৮৫/৯৯৫) বলেন,

خط الوزير ابن مقلة بستان قلب و مقلة

"ইবনু মুকলার লিপি হৃদয় ও চোখের উদ্যানস্বরূপ।"[১১]

www.pathagar.com

খ. ইবনুল বাওয়াব

আবুল হাসান আলী ইবনু হিলাল বুওয়ায়হি শাসনামলের একজন খ্যাতনামা আরবি হস্তলিপিবিশারদ ছিলেন। তিনি ছিলেন বাগদাদের খলিফাদের দরবারের একজন দারওয়ানের পুত্র। এজন্য তাঁকে ইবনুল বাওয়াব (দারওয়ানের পুত্র) নামেও অভিহিত করা হয় এবং এই নামেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন।[১২] ৪১৩হি/১০২২ সালে, মতান্তরে ৪২৩হি/১০৩২ সালে তিনি বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল (রা.)-এর মাজারের পার্শ্বে দাফন করা হয়।[১৩]

তিনি প্রখ্যাত লিপিশিল্পী ইবনু মুকলার শিষ্য মুহাম্মদ ইবনুস সামসামানি ও মুহাম্মদ ইবনু আসাদ থেকে লিপিশিল্পের জ্ঞান লাভ করেন। তিনি একজন হাফিজে কুরআনও ছিলেন। যৌবনকালে তিনি ঘরবাড়ির সজ্জা ও পেইন্টিংয়ের কাজ করতেন। এরপর তিনি গ্রন্থাদিতে অলংকরণ ও হস্তলিখনকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন।[১৪] তিনি তাঁর জীবদ্দশায় কুরআনের ৬৪টি হস্তলিখিত অনুলিপি প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে একটি রায়হানি লিপিরীতিতে লিপিবদ্ধ ছিল। এটি তিনি তুর্কি সুলতান (১ম) সলিম ইস্তাম্বুলের লালা জামে মসজিদে দান করেন।[১৫] বাগদাদের উজির ফখরুল মুলক আবু গালিব মুহাম্মদ ইবনু খালাফের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতাহেতু সমসাময়িক সরকারি মহলে তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল। তিনি কিছুকাল শিরাজে বুওয়ায়হি বাহাউদ্দৌল্লাহ গ্রন্থাগারের দায়িত্বে ছিলেন। প্রাথমিক যুগের আরব গ্রন্থকারদের মতে—তাঁর খ্যাতির মূল কারণ ছিল, তাঁর একশত বছর পূর্বেকার প্রখ্যাত লিপিশিল্পী উজির ইবনু মুকলা যে লিখনপদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন, ইবনুল বাওয়াব একে পরিমার্জিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন এবং এর চূড়ান্ত রূপ দান করেন।[১৬] পরবর্তীকালে কেবল ইয়াকুত আল-মুস্তাসিমি তাঁকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। এভাবে একটি উল্লেখযোগ্য পন্থায় ইবনুল বাওয়াব الخط المنسوب (সু-আনুপাতিক লিপি)-কে প্রসিদ্ধি দান করেন। তাঁর ৩৯১হি/১০০০-১ সালে লিখিত কুরআনের একটি অনুলিপি আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে Chester Beatty নামক গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত (পাণ্ডুলিপি k. ১৬) রয়েছে। এর সাহায্যে আধুনিককালে আমরা তাঁর হস্তলিপির মূল্যায়ন করতে সক্ষম। এই হস্তলিপি এক রঙিন অলংকারের ন্যায় মনোরম। এতে নাসখি টাইপ ব্যবহৃত হয়েছিল। এর স্টাইল ছিল জ্যামিতিক এবং এর ভূষণ D.S. Rice -এর বহুদিনের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল।[১৭] তাছাড়া তিনি সুলুস, রিকা, রায়হানি ও কুফি প্রভৃতি লিপিরীতিতেও লিখতে পারদর্শী ছিলেন। লেখা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি একটি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি ইয়াকুত মুস্তাসিমির আমল পর্যন্ত চালু ছিল।[১৮] তিনি নতুনরূপে মুহাক্কক লিপিরীতিকে সাজিয়েছিলেন। তাছাড়া নরজিস, মানসুর, মুরাস্‌সা, লুলুয়ি, হাওয়াশি, মুকতারিন ও কাসাস প্রভৃতি লিপিরীতিতে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। সমসাময়িক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবূ হাইয়ান আত-তাওহিদি তাঁর সম্পর্কে বলেন,

> ...ইবনুল বাওয়াব দেখতে পেলেন, ইবনু মুকলা তাওকি ও নাসখকে সুষমামণ্ডিত রূপ দান করলেন বটে; কিন্তু তার পূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়নি। তিনিই তার সৌন্দর্য ও লালিত্যের পূর্ণতা দান করেন। ...তিনি তার উস্তাদ ইবনু আসাদকে দেখতে পেলেন, মুহাক্ককের

> কাছাকাছি রীতিতে লিখতে। তিনিই তাকে দৃঢ়তা দান করলেন। অধিকন্তু তিনি সুনিপুণতার সাথে 'যাহাব' লিপিরীতিতে লিখতে লাগলেন। পাদ কিংবা পার্শ্বস্থ টীকা-টিপ্পনীসমূহে অপূর্ব সৌন্দর্য ও লালিত্য দান করেন। সুলুস ও খফিফুস সুলুসে নৈপুণ্য লাভ করেন। রিকা ও রায়হানি প্রভৃতিতে অপূর্ব সৌন্দর্য আনেন। মতন ও মুসহাফের জন্য পৃথক পৃথক পদ্ধতি ব্যবহার করেন। উপরন্তু তিনি কুফি রীতিতে এমনভাবে লিখতে থাকেন যে, বিগত শতাব্দীকে তিনি ভুলিয়ে দিয়েছেন।[১৯]

তিনি লিখনশিল্প সম্পর্কে একটি শিক্ষামূলক কাব্য এবং একটি সন্দর্ভ রচনা করেছিলেন। নিম্নে তাঁর কবিতাটির কয়েকটি লাইন উল্লেখ করা হলো।

يا من يريد إجادة التحرير　　و يروم حسن الخط والتصوير
إن كان عزمك في الكتابة صادقا　　فارغب إلى مولاك في التيسير
أعدد من الأقلام كل مثقف　　صلب يصوغ صناعة التحبير
و إذا عمدت لبريه، فتوخه　　عند القياس بأوسط التقدير
ا نظر إلى طرفيه، فاجعل بريه　　من جانب التدقيق و التحضير
و اجعل لجلفته قواما عادلا　　يخلو عن التطويل و التقصير
و الشق وسطه ليبقى بريه　　من جانبيه مشاكل التقدير....

হে শিক্ষার্থী, তুমি যদি লিপিশিল্পে উৎকর্ষ সাধন করতে চাও
তোমার যদি ইচ্ছে থাকে সুন্দর হস্তাক্ষর ও সুন্দর অঙ্কনের
যদি সত্যিই লিখনশাস্ত্রে তোমার ইচ্ছা আন্তরিক হয়,
তা হলে তোমার গুরুর কাছে সহজ পদ্ধতি শিখে নাও।
কলম তৈরির জন্য সরল খাগড়া সংগ্রহ করো,
তা যেন শক্ত হয় এবং শিল্পকর্মে দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হয়।
তুমি তাতে নিব সংযুক্ত করতে চাইলে, সূক্ষ্ম করো
তোমার ধারণা মতে, যা সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
তার উভয় দিকে লক্ষ করো; অতঃপর তার নিব
এমনভাবে প্রস্তুত করো, যা সূক্ষ্ম ও সংকীর্ণ।
কলমের নিবের দিকটিকে একটি সুষম আকৃতি দাও,
যা লম্বাও না হয়, আবার খাটও না হয়।
তার মাঝখানে এমনভাবে ফাঁড়, যাতে তার কর্তনটি
দু দিক থেকে সমান আকৃতিতে বিরাজ করে।...[২০]

গ. ইয়াকুত আল-মুস্তাসিমি

জামাল উদ্দীন আবুল মাজ্দ ইয়াকুত ইবন আবদুল্লাহ্ আল-মুস্তাসিমি একজন বিখ্যাত হস্তলিপিবিশারদ ছিলেন। তিনি বাগদাদে শেষ আব্বাসীয় খলিফা আল-মুস্তাসিমের ক্রীতদাস ছিলেন। মুস্তাসিম তাঁকে প্রায় পনেরো বছর বয়সে ক্রয় করে নিজের তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শিক্ষা দেন। এই কারণেই ইয়াকুতের নামের শেষে

www.pathagar.com

আল-মুস্তাসিমি উপনামটি যুক্ত হয়েছে। তাঁর বংশ পরিচয় অজ্ঞাত। তবে অনেকে বলেন, তিনি আমিসিয়া থেকে আনীত একজন গ্রিক।[২১] সম্ভবত অতি অল্প বয়সে তাঁকে এক আক্রমণাভিযানে অপহরণ করে আনা হয়। ৬৫৬হি/১২৫৮ সালে হালাকু খানের হাতে মুস্তাসিম বিল্লাহ নিহত হওয়ার পর হালাকু খান আলাউদ্দিন জুয়াইনিকে ইরাকের গভর্নর এবং গোটা সাম্রাজ্যের প্রধান রেজিস্ট্রার নিয়োগ করেন। এ সময় আলাউদ্দিন জুয়াইনির সাথে ইয়াকুতের গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি আলাউদ্দিন ও তাঁর ছেলেমেয়ে এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শরফুদ্দিন হারুনকে লেখা শেখান। এ সুবাদে তিনি মর্যাদা ও সৌভাগ্যের সোনালি পরশের সাক্ষাৎ পান। আলাউদ্দিন তাঁকে বাগদাদের বিখ্যাত মুস্তানসিরিয়া গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন।[২২] তিনি ছিলেন খোজা। ৬৯৮হি/ ১২৯৮ সনে ৮০ বছর বয়সে তিনি বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। তাঁর এ মৃত্যুসন অনুযায়ী তাঁর জন্মসন ৬১৮হি/১২২১ অনুমান করা হয়।

ইয়াকুত একজন সাহিত্যপ্রেমী লোক ছিলেন। তিনি নিজে বেশ কিছু কবিতাও রচনা করেন। তবে আরব ইতিহাসে তিনি একজন লিপিশিল্পী হিসেবেই সুখ্যাতি লাভ করেন। লোকেরা তাঁর অপূর্ব সুষমা ও লালিত্যমণ্ডিত নান্দনিক লেখার জন্য তাঁকে 'কিবলাতুল কুত্তাব' বা ' কিবলাতুল খত্তাতিন' (চারু হস্তলিপিকারদের মধ্যমণি) বলে অভিহিত করত। তিনি সাফি উদ্দিন আবদুল মুমিন ও শায়খ ইবনু হাবিব থেকে লিপিশিল্পের জ্ঞান লাভ করেন। তিনি মূলত ইবনুল বাওয়াবের ধারা-ঐতিহ্যকে অনুকরণ করে এগিয়ে গেছেন। লিখনশিল্পে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হলো—তিনি কলমের মাথাকে তির্যকভাবে কাটেন। এভাবে তিনি লিখনশৈলীতে ব্যবহৃত কলমের উন্নতি সাধিত করে হরফগুলোকে আরো সাবলীল ও ছন্দময় করে তুলেছেন। কথিত আছে যে, লিপিকলার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও অনুরাগ এরূপ ছিল যে, ১২৫৮ সালে হালাকু খান বাগদাদ ধ্বংস করার সময় তিনি একটি মিনারের শীর্ষদেশে আত্মগোপন করে নিবিষ্টচিত্তে ও নির্বিঘ্নে লিপিচর্চা করতে থাকেন।[২৩] তাঁর এ অত্যাশ্চর্য ঘটনা নিয়ে পরে অনেক মিনিয়েচার তৈরি হয়েছে। তিনি নাসখ, রায়হানি, সুলুস, রিকা, মুহাক্কক, আশআর ও কুফি প্রভৃতি লিপিরীতিতে লিখতেন। তন্মধ্যে কোনো কোনো লিপিরীতিতে তিনি ইবনুল বাওয়াবকেও অনেক অতিক্রম করে গেছেন।[২৪] ধারণা করা হয়, তিনিই হচ্ছেন 'নাসখ' লিপিকারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর হাতের ছোঁয়ায় এ লিপির অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়। তদুপরি তিনি সুলুস লিপির যে স্বতন্ত্র ধারা উপস্থাপন করেন, তাকে 'ইয়াকুতি ধারা' বলা হয়। তিনি একটি হস্তলিপিকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানও ছিলেন। তাঁর সুনাম এত সুদূরপ্রসারী ছিল যে, তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর হস্তলিখিত বিভিন্ন গ্রন্থ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। কথিত আছে, তিনি কুরআনের কিছু কপিও স্বহস্তে লিখেছিলেন। তাঁর হস্তলিখিত কুরআনের কপি বিশ্বের নিম্নবর্ণিত গ্রন্থাগারগুলোতে রক্ষিত আছে: সেন্ট সোফিয়া ৬৫৪/১২৫৬ হামিদিয়া; তুরবে, বাগাচি-কাপু (Constantinople) ৬৬২/১২৬৪; কায়রো (Moritz No. 89), Paris Bibliotheque Nationale, fondes arabe No. 6082; Peytel Collection, 681/1281 ইত্যাদি।[২৫]

www.pathagar.com

বিশিষ্ট লিপিকারগণ

ক. উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগের প্রসিদ্ধ লিপিকারগণ

১. কুতবা আল-মুহারির

কুতবা আল-মুহারিরকে উমাইয়া আমলের শ্রেষ্ঠতম লিপিকার হিসেবে গণ্য করা হয়। আরবি লিপিকলা, বিশেষ করে বক্রাকার লিপিশৈলীর বিবর্তনে তাঁর অবদান রয়েছে।[২৬] তিনি চারটি মৌলিক লিপিশৈলী আবিষ্কার করেন। এগুলো হলো: তুমার, জলিল, নিসফ ও সুলুস। তিনি উমাইয়া খলিফাদের জন্য পবিত্র মুসহাফের বহু অনুলিপি তৈরি করেন।

২. খালিদ ইবন আল-হাইয়াজ

খালিদ ইবন আল-হাইয়াজ খলিফা ওয়ালিদ ইবনু আবদুল মালিকের খিলাফতে দরবারি লিপিকার ছিলেন। তিনি পবিত্র মুসহাফের অনুলিপি তৈরিতে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি মসজিদে নববির মিহরাবে স্বর্ণাক্ষরে সুরা আশ-শামস উৎকীর্ণ করেছিলেন।

৩. মালিক ইবনু দিনার

মালিক ইবন দিনার উমাইয়া আমলের একজন খ্যাতিমান লিপিকার ছিলেন।

৪. রশিদ আল-বাসরি

রশিদ আল-বাসরিও উমাইয়া আমলের একজন খ্যাতিমান লিপিকার ছিলেন।

৫. মাহদি আল-কুফি

মাহদী আল-কুফিও উমাইয়া আমলের একজন খ্যাতিমান লিপিকার ছিলেন।

৬. দাহ্হাক ইবনু আজলান

দাহ্হাক ইবনু আজলান আব্বাসীয় খলিফা মানসুর ও মাহদির আমলের প্রখ্যাত লিপিকার ছিলেন।

৭. ইসহাক ইবনু হাম্মাদ

ইসহাক ইবনু হাম্মাদ আব্বাসীয় খলিফা মানসুর ও মাহদির আমলের প্রখ্যাত লিপিকার ছিলেন।

৮. আহমদ ইবনু ইউসুফ

আব্বাসীয় খলিফা মামুনের লিপিকার ছিলেন।

৯. হাসান ইবন আলী ইবনু মুকলা (২৭৮-৩৩৮ হি.)

হাসান ইবন আলী প্রখ্যাত লিপিশিল্পী ইবনু মুকলার সহোদর। তিনিও তাঁর ভাইয়ের মতো একজন প্রতিভাবান লিপিকার ছিলেন। লিপিশিল্পে নান্দনিকতা সৃষ্টি, বিশেষ করে নাসখ লিপির উন্নতি বিধানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান রয়েছে।[২৭]

১০. আবুল হুসায়ন ইবনু আবি আলী

আবুল হুসায়ন ইবনু আবি আলী প্রখ্যাত লিপিশিল্পী ইবনু মুকলার পৌত্র ছিলেন। তিনিও সমসাময়িককালের একজন শ্রেষ্ঠ লিপিকার ছিলেন।

www.pathagar.com

১১. আবুল আব্বাস আবদুলাহ ইবনু ইসহাক

আবুল আব্বাস আবদুলাহ ইবনু ইসহাক সমসাময়িকদের মধ্যে সুন্দর হস্তলিপিতে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর লেখা ও ইবনু মুকলার লেখার মধ্যে পার্থক্য করাটা কঠিন ছিল।

১২. ইউসুফ আস-সাজযি

অনেকের মতে, ইউসুফ আস-সাজযিই খত্তে জলিল থেকে সর্বপ্রথম 'তাওকি লিপিরীতি' উদ্ভাবন করেন। উজির ফদল ইবনু হারুন তাঁর এ লিপিরীতি দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং সরকারি সমস্ত দপ্তরের লিপি এ রীতি অনুযায়ী লেখার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি এর নাম রাখেন 'রিয়াসি'। তবে সর্বসাধারণ একে তাওকি নামে অভিহিত করে।

১৩. ইবরাহিম আস-সাজযি

ইবরাহিম আস-সাজযি খত্তে জলিল থেকে প্রথমে সুলুসাইন, অতঃপর সুলুসাইন থেকে সুলুস লিপিরীতি উদ্ভাবন করেন।

১৪. আহওয়াল আল-মুহাররির

আহওয়াল ইব্রাহিম আস-সাজযির শাগরিদ ও উজির আবু আলী ইবনু মুক্লার শিক্ষক ছিলেন। সমসাময়িক আমলে তিনি সুন্দর হস্তলিখনের ক্ষেত্রে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। আহওয়াল উস্তাদ ইব্রাহিমের নিকট থেকে সুলুসাইন ও সুলুস লিপি রীতিদ্বয়ের শিক্ষা লাভ করেন এবং এতদুভয় থেকে 'কলমুন নিসফ' নামে অন্য একটি লিখনরীতি উদ্ভাবন করেন। তাছাড়া তিনি 'সুলুসে খফিফ' নামে সুলুসের চাইতে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি লিখনরীতি এবং 'মুসালসাল' নামে ধারাবাহিকভাবে সংযুক্ত এক ধরনের লিখনরীতি আবিষ্কার করেন। এগুলো ছাড়া তিনি গুবারুল হালবাহ, মুআমারাত, কাছাছ ও হাওয়ায়িজি প্রভৃতি লিপিরীতিও উদ্ভাবন করেন। উল্লেখ্য যে, তাঁর লেখার অপূর্ব সৌন্দর্য ও শ্রী সত্ত্বেও গতিময়তা ও দৃঢ়তার অভাবে তাঁর সমসাময়িক অনেকেই তাঁর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও আহওয়ালের গর্বের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তিনি আরবি লিপিশিল্পের এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের জন্ম দেন। তিনি হলেন উজির আবু আলী ইবনু মুকলা। আহওয়াল আরবি লিপিতে যে উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য আনয়নের সূত্রপাত করেছিলেন তিনি তাঁর অনুসরণ করে একে অপূর্ব সুষমামণ্ডিত শিল্পে পরিণত করেন।[২৮]

১৫. আলী ইবনু উবায়দ আর-রায়হানি

আর-রায়হানি আব্বাসীয় যুগের একজন প্রখ্যাত লিপিকার ছিলেন। তিনি 'নাসখ' থেকে অন্য একটি লিপিরীতি উদ্ভাবন করেন, যা তাঁর নামের সাথে সংযুক্ত হয়ে 'রায়হানি' নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৬. উমর ইবনুল হাসান (মৃ. ৫৫২ হি.)

উমর ইবনুল হাসান হিজরি ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রখ্যাত লিপিকার ছিলেন।

www.pathagar.com

১৭. বাহাউদ্দিন আল-কাতিব (মৃ.৬৫২ হি.)

বাহাউদ্দিন আল-কাতিব হচ্ছে লিপিকারের উপাধি। তাঁর আসল নাম হলো আবুল ফদল যুহায়র। তিনিও হিজরি ৭ম শতাব্দীর প্রখ্যাত লিপিকার ছিলেন।

১৮. ইবনুল আদিম (মৃ. ৬৬০ হি.)

ইবনুল আদিমের প্রকৃত নাম কামালুদ্দিন উমর ইবনু আহমদ আল-উকায়লি। তবে তিনি ইবনুল আদিম নামে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি আলেপ্পোর একজন ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস ছিলেন। হস্তলিখনের ক্ষেত্রেও তাঁর বিশেষ নাম ছিল। ইয়াকুত আল-মুস্তাসিমির মতো তাঁকেও একজন প্রসিদ্ধ খুশ নবিস (সুন্দর হস্তাক্ষরবিদ) হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি ইবনু মুকলার খাত্তে মানসুব, বিশেষ করে নাসখি লিপিতে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন।[২৯] সেন্ট পিটার্সবার্গে তাঁর চমৎকার হস্তাক্ষরের নমুনা রয়েছে (Cat. des Mss. et Xylographes orient. de la Bibl. Imp., নং ১৪৭)।

১৯. জামাল উদ্দিন আল-মুস্তাসিমি (মৃ. ৬৯৮ হি.)

জামাল উদ্দিন আল-মুস্তাসিমি হিজরি ৭ম শতাব্দীর একজন লিপিকার ছিলেন। সুন্দর হস্তলিখনের জন্য তাঁর সুনাম ছিল। তিনি ইবনু সিনার কিতাবুশ শিফার একটি অনুলিপি এক ভলিউমে লিপিবদ্ধ করে ভারতের সুলতান মুহাম্মদ তুগলককে উপঢৌকন দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে এর বিনিময়ে এক হাজার মিসকাল স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার প্রদান করেছিলেন।[৩০]

২০. আবদুল মুমিন সাফি উদ্দিন (মৃ.৬৯৩হি.)

আবদুল মুমিন সাফি উদ্দিন প্রখ্যাত লিপিশিল্পী ইয়াকুত আল-মুস্তাসিমির সমসাময়িক ছিলেন। ইবনু মুকলার মানসুব রীতিতে লেখার ক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি আব্বাসীয় খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর দরবারি লিপিকার ছিলেন। তিনি হিজরি ৬৯৩ সালে কারারুদ্ধ অবস্থায় মারা যান।

খ. উমাইয়া ও আব্বাসীয় পরবর্তী যুগের প্রসিদ্ধ লিপিকারগণ

১. আহমদ ইবনু ইউসুফ ইবন মুহাম্মদ দিমাশকি

আহমদ ইবনু ইউসুফ দিমাশকি হিজরি নবম শতাব্দীর প্রখ্যাত লিপিকার ছিলেন। তিনি সমসাময়িককালে সুন্দর হস্তলিখনের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর ডান হাত ছিল অকেজো। তিনি বাম হাত দিয়েই লিখতেন।

২. ইবরাহিম আল-মাকদাসি

ইবরাহিম আল-মাকদাসিও হিজরি নবম শতাব্দীতে সিরিয়ার প্রখ্যাত লিপিকার ছিলেন।

৩. খলিল আল-মাকদাসি

খলিল আল-মাকদাসিও হিজরি নবম শতাব্দীতে সিরিয়ার প্রখ্যাত লিপিকার ছিলেন।

www.pathagar.com

৪. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আল-হামাভি

মুহাম্মদ ইবন আবদুলাহ আল-হামাভি হিজরি দ্বাদশ শতাব্দীতে সিরিয়ার প্রখ্যাত লিপিকার ছিলেন। তিনি হি. ১১৪৮ সালে মাকামাতে হারিরি লিপিবদ্ধ করেন।

৫. মুহাম্মদ আত-তারানি

মুহাম্মদ আত-তারানিও হিজরি দ্বাদশ শতাব্দীতে সিরিয়ার প্রখ্যাত লিপিকার ছিলেন। তিনি সব ধরনের লিপিরীতি অবলম্বনে লিখতে পারতেন।

৬. ইবনু হিলাল আল-হিমসি

ইবনু হিলাল মুহাম্মদ আত-তারানির সমসাময়িক সিরিয়ার প্রখ্যাত লিপিকার ছিলেন।

৭. সাদি আল-উমরি

সাদি আল-উমরি হিজরি দ্বাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত লিপিকার ছিলেন। তিনি দামিশকে জন্মগ্রহণ করেন। হিজরি ১১১৪-১১৪৩ সাল পর্যন্ত তিনি তুর্কি সুলতান (৩য়) আহমদের দরবারি লিপিকার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

৮. আবদুর রহমান ইবনু মুহাম্মদ আল-উমরি

আবদুর রহমান ইবনু মুহাম্মদ আল-উমরি ইবনু মুকলার মানসুব রীতিতে লেখার জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি লেখা শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানও খুলেছিলেন। এখান থেকে অসংখ্য ছাত্র লেখার শিক্ষা লাভ করে বের হয়।

৯. আবদুল লতিফ ইবনু আবদুল কাদির আয-যাওয়ায়িদি

আবদুল লতিফ ইবনু আবদুল কাদির আয-যাওয়ায়িদি আলেপ্পোর জামে খসরুর খতিব ছিলেন।

গ. প্রসিদ্ধ অটোমান তুর্কি লিপিকারগণ

১. শায়খ হামদুল্লাহ আল-আমাসি (মৃ. ১৫২০খ্রি.)

শায়খ হামদুল্লাহ আল-আমাসি তুর্কি খিলাফতে সমসাময়িককালের শ্রেষ্ঠ লিপিকার ছিলেন। তিনি তুর্কি লিপিকলায় সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও সাবলীলতা আনয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন। ইস্তাম্বুলের তোবকাবি জাদুঘরে তাঁর অনেক লিপিচিত্র সংরক্ষিত রয়েছে। তিনি সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদের শিক্ষক ছিলেন। কথিত আছে, তিনি যখন লিখতেন তখন বায়েজিদ হাতে কলমদানি ধরে রাখতেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় কুরআনের ৪৭টি হস্তলিখিত অনুলিপি প্রণয়ন করেন।[৩১]

২. আহমদ কুররা হাসারি (মৃ. ১৫৫৬ খ্রি.)

আহমদ কুররা হাসারি তুর্কি খিলাফতের একজন বিশিষ্ট লিপিকার ছিলেন। তিনি অটোমান সাম্রাজ্যে ঐতিহ্যবাহী ইয়াকুতি লিপিধারাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। এ কারণে লোকেরা তাঁকে 'রুমের ইয়াকুত' নামে অভিহিত করত।[৩২]

৩. ইসমাইল জুহদি (মৃ.১৮০৬ খ্রি.)

ইসমাইল জুহদি তুর্কি রাজ দরবারের প্রসিদ্ধ লিপিকার ছিলেন। সুলতান মুস্তফা (৩য়)-এর আমলে তিনি প্রাসাদে লিপি-শিক্ষকরূপে কাজ করতেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় কুরআনের ৪০টি হস্তলিখিত অনুলিপি প্রণয়ন করেন। তিনি সুলুস জলিতে দক্ষতা অর্জন করেন।[৩৩]

৪. আবদুল্লাহ আজ-জুহদি (মৃ. ১২৯৬ হি.)

আবদুল্লাহ আজ-জুহদি তুর্কি খিলাফতের একজন বিশিষ্ট লিপিকার ছিলেন। তিনি সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের নির্দেশে পবিত্র কাবা শরিফের গিলাফ ও হারামে নববিতে লিখেছিলেন।

৫. সামি আফিন্দি (১৮৩৮-১৯১২ খ্রি.)

সামি আফিন্দি তুর্কি খিলাফতের একজন বিশিষ্ট লিপিকার ছিলেন। তিনি সুলুসে জলিতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। এজন্য তুর্কিবাসীরা তাঁকে দ্বিতীয় রাকিম নামে অভিহিত করত। লেখার লালিত্য ও সৌন্দর্যের পাশাপাশি অপূর্ব বিন্যাস ও যূথবদ্ধতা তাঁর লেখাকে অপরিমেয় মাধুর্য দান করে। এজন্য অটোমান আর্টিস্ট সমিতি তাঁকে 'তুর্কিস্তানের শ্রেষ্ঠতম লিপিকার' হিসেবে গণ্য করত।

৬. মুহাম্মদ নাযিফ বেগ (১৮৬৪-১৯১৩ খ্রি.)

মুহাম্মদ নাযিফও তুর্কি খিলাফতের একজন বিশিষ্ট লিপিকার ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত লিপিকার সামি আফিন্দির শিষ্য ছিলেন। লিপিশিল্পে তাঁর দক্ষতা ও নৈপুণ্য তাঁর উস্তাদের চাইতে কোনো অংশে কম ছিল না। তিনি বর্ণগুলোকে সুন্দরভাবে বিন্যাস করার প্রয়োজনে এদের আকার-আয়তন (Dimension) কে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতেন।

৭. হাফিজ উসমান (১৬৪২-১৬৯৮ খ্রি.)

হাফিজ উসমানও তুর্কি খিলাফতের একজন খ্যাতিমান লিপিকার ছিলেন। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও তাঁর সুখ্যাতি রয়েছে। তাঁর স্বহস্তে লিখিত কুরআনের অনুলিপিগুলো মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুদ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তিনি লিখনশিল্পের পূর্বোক্ত ছয়টি প্রসিদ্ধ ধারাতেই পারদর্শী ছিলেন। গুবার লিপিতে তাঁর অসামান্য দক্ষতা লিপিশিল্পে নতুন একটি প্রবাহ সৃষ্টি করেছে। তিনি মাত্র একটি ডিমের খোলসে পবিত্র কুরআন ও আরো কিছু কথাসহ ৭৭৯৩৪টি শব্দ লেখেন। তদুপরি তিনি ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে বিমূর্ত ছবির প্রচলন করেন। তাঁর এ রীতি পরবর্তীকালে 'হিল্ইয়া' নামে পরিচিতি লাভ করে। বর্তমানে ক্যালিগ্রাফারগণ রং রেখায় যে বিমূর্ত ক্যালিগ্রাফি করছেন সেটা তাঁর সে রীতিরই প্রভাব বলা চলে। তিনি সুলতান দ্বিতীয় মুস্তফা ও সুলতান তৃতীয় আহমদের শিক্ষক ছিলেন।[৩৪]

৮. মুস্তাফা রাকিম (১৭৫৮-... খ্রি.)

মুস্তাফা রাকিম তুর্কি খিলাফতের একজন প্রধান লিপিশিল্পী ছিলেন। একজন সুদক্ষ চিত্রশিল্পী হিসেবেও তাঁর সুনাম ছিল। প্রখ্যাত লিপিকার হক্কি তাঁর সম্পর্কে

www.pathagar.com

মন্তব্য করেন: "মুস্তাফা রাকিম লিপিকারদের মধ্যে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন (Giant) অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁকে চারুশিল্পীদের মধ্যে Mikhael Aeng কিংবা Santi Raphael (1483-1520) সাথে তুলনা করা যায়।"[৩৫]

৯. মুস্তাফা ইজ্জত আফিন্দি (মৃ.১৮৮৯খ্রি.)

মুস্তাফা ইজ্জতকে ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন বড়ো লিপিকার হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি প্রচুর পরিমাণে সরকারি চিঠিপত্র লিখেছিলেন।

১০. মুহাম্মদ শফিক বেগ (১৮৩৭-১৮৮০ খ্রি.)

মুহাম্মদ শফিক বেগ তুর্কি খিলাফতের একজন বিখ্যাত লিপিশিল্পী ছিলেন। তিনি প্রচুর পরিমাণে অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত নান্দনিক লেখার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বর্ণগুলোকে লতাপাতার মতো পরস্পর জড়ানো অবস্থায় লিখতে খুবই পারদর্শী ছিলেন।[৩৬]

১১. হক্কি (১২৯০-১৩৬৫ হি.)

হক্কি তুর্কি খিলাফতের একজন বিখ্যাত লিপিশিল্পী ছিলেন। তিনি তুগরা লিপিরীতিতে লিখতে বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন। এজন্য তাঁকে 'তুঘরাকশ' নামে অভিহিত করা হয়।

১২. আহমদ কামিল (১৮৬১-১৯৪১খ্রি.)

আহমদ কামিলও তুর্কি খিলাফতের একজন বিশিষ্ট লিপিকার ছিলেন। সমসাময়িককালে তিনি শ্রেষ্ঠ লিপিকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর লিখিত শৈল্পিক চাতুর্যমণ্ডিত নিদর্শনসমূহ তাঁর অনবদ্য সৃষ্টির প্রমাণ বহন করে।[৩৭]

১৩. ইউসুফ রসা

ইউসুফ রসাও তুর্কি খিলাফতের একজন প্রসিদ্ধ লিপিকার ছিলেন। দামিশকের জামে উমাইয়াতে তাঁর বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর লিপিচিত্র সংরক্ষিত রয়েছে। তিনি দামিশকের প্রখ্যাত লিপিকার মামদুহ শরিফ ও বাদাভি আদ-দায়রানি প্রমুখের শিক্ষক ছিলেন।

১৪. শায়খ আবদুল আজিজ আর-রিফা'ঈ (১৮৭১-১৯৩৪ খ্রি.)

শায়খ আবদুল আজিজ আর-রিফা'ঈ তুর্কি খিলাফতের একজন বড়ো লিপিকার ছিলেন। তিনি বাদশাহ ১ম ফুয়াদের আমন্ত্রণে কায়রোতে এসে একটি মুসহাফের অনুলিপি প্রণয়ন করেন। এটি তিনি ছয়মাসে লিপিবদ্ধ করেন এবং আটমাসে স্বর্ণাক্ষরে রূপায়িত করেন। তিনি দুটি লিপিকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ছিলেন।[৩৮]

১৫. হামিদ আল-আমিদি (১৮৯১-১৯৮২ খ্রি.)

হামিদ আল-আমিদি বিংশ শতাব্দীর তুর্কি লিপিশিল্পীদের মধ্যে সর্বশেষ ক্ষণজন্মা প্রতিভা। তাঁর প্রকৃত নাম মুসা আজমি। ছোটবেলা থেকে আরবি লিপিতে তাঁর অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। আরবি লিপিশিল্পের প্রতি তাঁর অধীর আগ্রহ ও ভালোবাসা ছিল। এ কারণে তিনি আইন শাস্ত্রের অধ্যয়ন বাদ দিয়ে একাগ্রচিত্তে লিপিশিল্পের চর্চায় রত হন। তিনি প্রথমত আল-আরকান আল-হারবিয়া প্রেসে কাজ

www.pathagar.com

করতেন। এরপর তিনি মানচিত্র অঙ্কনের ওপর ডিপ্লোমা লাভের জন্য জার্মানে গমন করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি দেশের বড়ো বড়ো লিপিকার, বিশেষ করে নাযিফ বেগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং নিজের জন্য একটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এটি তাঁর নামে পরিচিত ছিল। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছরের অধিক সময় ধরে এক নাগাড়ে আরবি লিপির চর্চা ও অনুশীলন করেন। এর ফলে এ ক্ষেত্রে তিনি এক ঈর্ষণীয় স্থান দখল করতে সমর্থ হন এবং তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তুরস্ক, সিরিয়া ও ইরাক প্রভৃতি দেশের আরবি লিপির অজস্র ছাত্র ও শিক্ষক তাঁর নিকট এসে শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে থাকে। এভাবে তাঁর হাতে অনেক আধুনিক আরবি লিপিশিল্পী ও শিক্ষকের সৃষ্টি হয়। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ লিপি নিদর্শনসমূহের মধ্যে তাঁর লিখিত মুসহাফ শরিফ ও জামে আবি আইয়ুব আল-আনসারি (রা.)-তে সংরক্ষিত তাঁর লিপিগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩৯]

ঘ. পারস্যের প্রসিদ্ধ লিপিকারগণ

১. সুলতান আলী মাশহাদি

সুলতান আলী মাশহাদি নাস্তালিক রীতির প্রভূত সুষমা ও মাধুর্য বৃদ্ধি করেন। এজন্য তাঁকে খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

২. মির ইমাদ হুসায়নি

মির ইমাদ আল-হুসায়নি সমসাময়িককালে সর্বশ্রেষ্ঠ লিপিকার হিসেবে কিংবদন্তিতে পরিণত হন। তিনি নাস্তালিক লিপিরীতির অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী ছিলেন। তাঁর লিপিচিত্র ছিল খুবই উন্নতমানের ও শৈল্পিক চাতুর্যময়। তাঁর পৃষ্ঠপোষক শাহ আব্বাস তাঁকে মহাকবি ফেরদৌসির (৯৩২-১০২০ খ্রি.) 'শাহনামা' গ্রন্থটির অনুলিপি করতে বলেন এবং সম্মানী বাবত ৭০ তুমান প্রদান করেন। এক বছর পর শাহ তাঁর নিকট গ্রন্থটি চেয়ে পাঠালে তিনি পত্রবাহককে বৃহৎ 'শাহনামা' মহাকাব্যের প্রথমদিকের ৭০ লাইন লিপিবদ্ধকৃত কাগজটি হস্তান্তর করে বলেন যে, শাহ যে অর্থ দিয়েছিলেন তা দিয়ে ৭০ পঙ্‌ক্তির বেশি লিপি করা সম্ভব নয়। এ কথা শুনে শাহ তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হন এবং তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেন।[৪০] মোগল সম্রাট শাহজাহান মির ইমাদের লিপিকলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং কেউ তাঁর লিপিকলার কোনো নিদর্শন তাঁকে প্রদান করলে তিনি তাঁকে 'ইয়াক-সাদি' (Yak-Sadi) উপাধিতে ভূষিত করতেন।[৪১]

৩. মির আলী সুলতান তাবরিজি (মৃ.১৪১৬ খ্রি.)

মির আলী সুলতান তাবরিজি ফারসি লিপিকলায় এক অনন্য প্রতিভা। ঐতিহাসিকদের মতে—তাঁর প্রচেষ্টায় খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ফারসি লিপিকলার সর্বোৎকৃষ্ট ও সুষমামণ্ডিত লিপিশৈলী 'নাস্তালিক' পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। তিনি এর গঠন ও ছন্দ বিন্যাসের জন্য কতিপয় নিয়ম প্রবর্তন করেন। সাফাদি বলেন,

> All important sources agree that the Persian calligrapher Mir Ali Sultan Al-Tabrizi was the founder of this script and he is also credited with devising the complex rules which govern it.[৪২]

www.pathagar.com

উপর্যুক্ত লিপিকারগণ ছাড়াও পারস্যে অসংখ্য খ্যাতিমান লিপিকারের জন্ম হয়, যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় লিপিকলা সর্বাধিক উৎকর্ষ, সৌন্দর্য ও গতিময়তা লাভ করেছে। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো: কাসিম সাদি, শাহ কবির ইবন উয়াইস আরদাবিলি, আবদুর রহমান আনিসি, কামাল উদ্দিন হিরাতি, গিয়াসুদ্দীন ইস্পাহানি, সুলতান মুহাম্মদ খন্দান, আবদুর রহমান আল-খাওয়ারিজিমি, আবদুর রহিম আল-আমসি, আবদুল করিম পাদশাহ, জাফর বয়সনকরি, আজহার তাবরিজি, ইবরাহিম সুলতান ইবন শাহরুখ, মাহমুদ নিশাপুরি, মুহাম্মদ হুসায়ন আল-ইমাদ প্রমুখ।

ঙ. মোগল আমলে ভারতের প্রসিদ্ধ মুসলিম লিপিশিল্পীগণ

১. জরিন কলম মুহাম্মদ হুসায়ন কাশ্মিরি

মুহাম্মদ হুসায়ন কাশ্মিরি সম্রাট আকবরের রাজ দরবারের একজন শ্রেষ্ঠ ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। সম্রাট তাঁকে 'জরিন কলম' (স্বর্ণ-কলম) উপাধি দিয়েছিলেন। আবুল ফজল বলেন, "তিনি সেই শিল্পী, যিনি সম্রাটের সিংহাসনের ছায়া ছিলেন। শ্রেষ্ঠ ক্যালিগ্রাফারদের মধ্যে অন্যতম তিনি।" মুহাম্মদ হুসায়নের মহান কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে তাকে একটি হাতি উপহার দেন। এই বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার ১০২০/১৬১১ সালে সম্রাট আকবরের মৃত্যুর ছয় বছর পর ইন্তেকাল করেন।[৪৩]

২. শিরিন কলম মুহাম্মদ মুরাদ

মুহাম্মদ মুরাদ কাশ্মীরী সম্রাট শাহজাহানের দরবারি ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। তাঁর ক্যালিগ্রাফির সৌন্দর্য ও নজরকাড়া অলংকরণে মুগ্ধ হয়ে মোল্লা মির আলী ও সুলতান আলী কর্তৃক তিনি অভিনন্দিত হন। তিনি মোটা, ভারি ও চিকন হালকা উভয় স্ক্রিপ্টে দক্ষ ছিলেন। সম্রাট শাহজাহান তাঁর কাজে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'শিরিন কলম' (মধুময় কলম) উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজের মধ্যে কয়েকটি জগদ্বিখ্যাত।

৩. মুশকিন কলম মির আবদুল্লাহ তাবরিজি

মির আবদুল্লাহ তাবরিজি সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিপিশিল্পী ছিলেন।

৪. আবদুর রশিদ

আবদুর রশিদ সম্রাট শাহজাহানের আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ লিপিকার ছিলেন। তিনি লিপিশিল্পের একটি স্কুল স্থাপন করে মোগল ভারতে লিপিকলার উৎকর্ষে অবদান রাখেন। যুবরাজ দারাশিকো ও রাজকুমারী জেবুন্নেসা তাঁর নিকট লিপিকলার সবক গ্রহণ করেন।[৪৪]

৫. ইয়াকুত রকম আবদুল বাকি

তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের গৃহশিক্ষক ছিলেন। তিনি ত্রিশ পাতায় সম্পূর্ণ কুরআন শরিফ নকল করে বাদশাহ শাহজাহানকে উপহার দিলে বাদশাহ তাঁকে 'ইয়াকুত রকম' (রত্ন-লিখনী ধারক) উপাধি দেন।

চ. আধুনিক মিসরের প্রসিদ্ধ লিপিকারগণ

আধুনিক যুগে মিসরে চারজন লিপিকার প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁরা হলেন:

www.pathagar.com

১. নজিব হাওয়ায়িনি

নজিব হাওয়ায়িনি জন্মসূত্রে দামিশকি; তবে তিনি জীবন কাটান মিসরেই। এখানেই তিনি লিপি চর্চা করে 'মিসরের লিপিকার'রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ফারসি লিপিশৈলীগুলোতে তাঁর অসামান্য দক্ষতা ক্যালিগ্রাফিকে সমৃদ্ধ করেছে। ফারসি লিপিতে তাঁর সাবলীল, ছন্দময় ও নান্দনিক হস্তলিখনের জন্য তাঁকে ইরানের প্রসিদ্ধ লিপিশিল্পী হিসেবেও গণ্য করা হয়। তিনি কায়রোর সরকারি ক্যালিগ্রাফি স্কুলে আরবি লিপির শিক্ষক হিসেবে কাজ করতেন।[৪৫]

২. হাসনি আল-বাবা

হাসনি আল-বাবাও মূলত দামিশকি; তবে তিনিও নজিবের মতো মিসরে প্রস্থান করেন। সব ধরনের লিপিরীরিতে তাঁর অসাধারণ দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়; তবে সুলুসে জালিতে তাঁর স্বকীয়তা বেশি মাত্রায় ফুটে উঠেছে। সুন্দর হস্তাক্ষরের পাশাপাশি অপূর্ব বিন্যাস তাঁর লেখামালাকে অপরিমেয় মাধুর্য দান করে। তিনি মিসরেই আশির দশকে মৃত্যুবরণ করেন।[৪৬]

৩. সাইয়িদ ইবরাহিম

সাইয়িদ ইবরাহিমকে মিসরের শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক লিপিশিল্পী হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি কায়রোর সরকারি ক্যালিগ্রাফি স্কুল এবং কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত দারুল উলুমে আরবি লিপির শিক্ষক হিসেবে কাজ করতেন।

৪. মাহমুদ আশ-শাহ্হাত

মাহমুদ আশ-শাহ্হাতও কায়রোর সরকারি ক্যালিগ্রাফি স্কুলে আরবি লিপির শিক্ষাদান করতেন।

ছ. আধুনিক দামিশকের প্রসিদ্ধ লিপিকারগণ

১. মামদুহ আশ-শরিফ (মৃ. ১৯৩২)

মামদুহ আশ-শরিফ প্রখ্যাত তুর্কি লিপিকার ইউসুফ রসার শিষ্য ছিলেন। সুলুস লিপিতে তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অটোমান তুর্কিদের আমলে দামিশকের স্কুলগুলোতে আরবি লিপির শিক্ষকরূপে কর্মরত ছিলেন।[৪৭]

২. বাদাভি আদ-দিওয়ানি (১৮৭৪-১৯৬৭)

বাদাভি আদ-দিওয়ানি আধুনিক সিরিয়ার শ্রেষ্ঠতম লিপিকার ছিলেন। তিনিও প্রখ্যাত তুর্কি লিপিকার ইউসুফ রসার শিষ্য ছিলেন। তিনি তাঁর নিকট নাসখ, সুলুস, দিওয়ানি ও রুক'আ প্রভৃতি লিপিশৈলীর জ্ঞান লাভ করেন। এরপর তিনি লিপিকার মামদুহ আশ-শরিফের সংস্পর্শে সতেরো বৎসর অতিবাহিত করে কুফি ও দিওয়ানে জলি প্রভৃতি লিপিশৈলীর জ্ঞানও লাভ করেন। তাছাড়া তাঁর নিকট নাস্খ ও সুলুসের ওপরও অতিরিক্ত জ্ঞান লাভ করেন। তিনি পঞ্চাশ বছরেরও অধিক সময় ধরে আরবি লিপির চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। বিভিন্ন লিখনশৈলীতে তিনি নিজের দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। অধিকন্তু তিনি ফারসি লিপিতেও পারদর্শী ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত ফারসি লিপিশিল্পী ইমাদ আল-

www.pathagar.com

হুসায়নির আদলে লিপি চর্চা করতেন। তাঁর লেখা লালিত্য ও সৌন্দর্যে অনেক ক্ষেত্রে ইমাদ আল-হুসায়নির লেখার প্রায় কাছাকাছি পর্যায়ের ছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে সিরীয় সরকার তাঁর অসাধারণ দক্ষতার জন্য তাঁর পরিবারকে মরণোত্তর পদক দান করেন।[৪৮]

জ. আধুনিক ইরাকের প্রসিদ্ধ লিপিকারগণ

১. হাশিম মুহাম্মদ আল-বাগদাদি

হাশিম মুহাম্মদ আল-বাগদাদি প্রখ্যাত লিপিকার ছিলেন। তিনি বাগদাদে ১৩৩৮/১৯২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৯১/১৯৭২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি প্রথমে প্রখ্যাত লিপিকার হাসনি আল-বাবা ও সাইয়িদ ইবরাহিম প্রমুখ বড়ো বড়ো লিপিকারের নিকট লিপিশিল্পের ওপর সনদ লাভ করেন। এরপর তিনি ইস্তাম্বুলে গিয়ে সেখানকার শ্রেষ্ঠতম লিপিকার হামিদ আল-আমিদি থেকে সর্বশেষ সনদ লাভ করেন। হামিদ আল-আমিদি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "হাশিম! লিপিশিল্পের যাত্রা শুরু হয়েছে বাগদাদ থেকে। আর তোমার মাধ্যমে আবার তা সেখানে প্রত্যাবর্তন করছে।"[৪৯] তিনি বিশেষভাবে সুলুস রীতিতে নিজের দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। তিনি বাগদাদের চারুকলা ইনস্টিটিউটে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ঝ. আধুনিক লেবাননের প্রসিদ্ধ লিপিকারগণ

আধুনিক লেবাননেও বেশ কয়েকজন লিপিকার সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. বুরহান কব্বারাহ্

বুরহান কব্বারাহ্ বিশেষভাবে কুফি ধারায় লিখতে পারদর্শী ছিলেন।

২. আদিব নশ্‌শাবাহ্

আদিব নশ্‌শাবাহ্ প্রখ্যাত সিরীয় লিপিকার মামদুহ্ আশ-শরিফের সুলুস রীতির অনুকরণে লিখতে দক্ষ ছিলেন।

৩. নসিব মাকারিম

নসিব মাকারিমের এমন কিছু অনবদ্য কীর্তি রয়েছে, যা আধুনিক ক্যালিগ্রাফিতে নতুন আবহ তৈরি করেছে। তিনি অতি সূক্ষ্ম 'গুবার' লিপিতে পারদর্শী ছিলেন। তিনি আংটির পাথর, গম, চাল ও ডিম প্রভৃতির ওপর লেখেন। কথিত আছে যে, তিনি মুরগির ডিমের খোলসে অটোমান সাম্রাজ্যের সংবিধান লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর লিখিত নিদর্শনসমূহ দামিশকের কসরুল আজমে সংরক্ষিত রয়েছে। এগুলো তাঁর গভীর ধৈর্য, দক্ষতা ও শিল্প-সৌকর্যের প্রমাণ বহন করে।[৫০]

ঞ. বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ আরবি লিপিশিল্পীগণ

বর্তমানে বাংলাদেশেও আরবি ক্যালিগ্রাফি চর্চায় অনেক খ্যাতনামা শিল্পী এগিয়ে এসেছেন। তবে এখানে ক্যালিগ্রাফির ট্র্যাডিশনাল শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই বললেই

www.pathagar.com

চলে। ফলে এ দেশে আরবি ক্যালিগ্রাফি চর্চা ও উন্নতির যে সম্ভাবনা রয়েছে তা পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করতে পারছে না। এতদ্‌সত্ত্বেও এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, এখানে আরবি লিপিশিল্পে দ্রুত উন্নতি হচ্ছে; তবে ট্রেডিশনাল ক্যালিগ্রাফির চাইতে ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিংয়ের প্রতিই শিল্পীদের মনোনিবেশ দিতে বেশি দেখা যায়। বিভিন্ন শিল্পকর্ম প্রদর্শনী, মসজিদ ও ধর্মীয় ইমারত গাত্র, ক্যালেন্ডার, বইয়ের প্রচ্ছদ, ভিউ কার্ড ও মনোগ্রাম প্রভৃতিতে তাঁদের দৃষ্টিমুগ্ধ শিল্পকর্ম সম্পর্কে জানা যায়।

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ক্যালিগ্রাফার হলেন: শিল্পী মুর্তজা বশির, চারুকলা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক শামসুল ইসলাম নিজামি, চারুকলা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক ড. আবদুস সাত্তার, চট্টগ্রাম আর্ট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ সবিহ-উল-আলম, অধ্যাপক মির মুহাম্মদ রেজাউল করিম, শিল্পী সাইফুল ইসলাম, শিল্পী ইবরাহিম মণ্ডল, শিল্পী শহিদুল্লাহ, শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী আবদুর রহিম ও শিল্পী জহিরুদ্দীন প্রমুখ।[৫১]

তথ্যসূত্র

১ মুকলা তাঁর পিতার মূল নাম নয়। এটা ছিল তাঁর উপাধি। তাঁর নাম হলো আলী ইবনুল হাসান (ইবনুন নাদিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬৭)।

২ তাঁর পিতা ও দাদা দুইজনেই দক্ষ লিপিকার ছিলেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুন নাদিম তাঁদের দুইজনের লেখা দুটি মুসহাফের কথা উল্লেখ করেছেন (ইবনুন নাদিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬৭; হিলাল নাজি, ইবনু মুকলা : *খাত্তাতান ওয়া আদীবান ওয়া ইনসানান*, পৃ ২৮)।

৩ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৮, খ ৪, পৃ ১০৮-৯।

৪ আল-কায়সি, ড. নুরি হাম্মুদি, মাদরাসাতুল খাত্তিল 'ইরাকিয়্যাহ মিন ইবনি মুকলাহ ইলা হাশিম আল-বাগদাদী, *মাজাল্লাতুল মাওরিদ*, ১৯৮৬, খ ১৫, সংখ্যা ৪, পৃ ৭১-২; রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৩৭।

৫ আল-হামাভি, ইয়াকূত, *মুজামুল উদাবা'*, খ ৩, পৃ ৬১।

৬ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, ৬৯; মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২৭।

৭ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৩৬।

৮ জাব্বুরি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ২০২।

৯ হিলাল নাজি, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৪৮।

১০ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৩৭।

১১ যায়নুদ্দীন নাজি, *বাদাইয়ুল খাত্তিল আরবি*, পৃ ৪৫৮।

১২ তিনি ইবনুস্ সিতরি নামেও পরিচিত ছিলেন। 'সিত্‌র' অর্থ পর্দা। তাঁর পিতা যেহেতু একজন দারওয়ান ছিলেন, আর একজন দারওয়ানকে সর্বদা দরজার পর্দা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয় বলে তাঁকে 'সিতরি' আর তাঁর ছেলেকে 'ইবনুস সিতরি' বলা হতো। (জাব্বুরি, *প্রাগুক্ত*, খ ১ পৃ ২১০)।

১৩ ইবনু খাল্লিকান, *প্রাগুক্ত*, খ ৩ পৃ ২৮; আল-হামাভি, *প্রাগুক্ত*, খ ১৫ পৃ ১২০।

www.pathagar.com

কোনো সূত্র থেকে তাঁর জন্ম তারিখ জানা যায়নি। তবে হিলাল নাজি তাঁর মৃত্যুসনের ওপর ভিত্তি করে তাঁর সম্ভাব্য জন্মসন ৩৫০ হি. সাল উল্লেখ করেছেন (হিলাল নাজি, *ইবনুল বাওয়াব...*, পৃ ৮)।

১৪ আল-আ'জামি, ওয়ালিদ, *জামহারাতুল খাত্তাতিল বাগদাদিঈন*, পৃ ১১৩।

১৫ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৩৮।

১৬ আনওয়ার, ড. এ. সুহায়ল, *আল-খাত্তাতুল বাগদাদী 'আলী ইবনুল হিলাল*, পৃ ৮।

১৭ হিলাল নাজি, *ইবনুল বাওয়াব...*, পৃ ২২-৩; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৮৮, খ ৪, পৃ ৩৩৮-৯।
ইস্তাম্বুলের আগাসোভিয়া গ্রন্থাগারেও তাঁর লিখিত কুরআন-এর অন্য একটি অনুলিপি (নংঃ ৪৯০৪) সংরক্ষিত রয়েছে।

১৮ পরবর্তীকালের লিপিকারগণ (ইয়াকুত আল-মুস্তাসিমির আবির্ভাব পর্যন্ত) প্রায় সকলেই তাঁর অনুসৃত ধারা অনুসরণ করে লিখতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লিপিকারগণ হলেনঃ খালিদ ইবনুল কায়সারানি, ইকবাল ইবন আবদুল্লাহ আল-খাদিম, ফখরুল কুত্তাব হাসান ইবন আলী আল-জুয়াইনি, ইজজুদ্দিন আবুল ফদল আদ-দিমাশকি, ইয়াকুত ইবন আবদুল্লাহ আর-রুমি প্রমুখ (জাব্বুরি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ২১৯-২২১)।

১৯ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৩৮; হিলাল নাজি, *ইবনুল বাওয়াব 'আবকারিয়্যুল খাত্তিল আরবি*, পৃ ৩০-১।

২০ ইবনু খালদূন, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৮১; তাশ কুবরি যাদাহ, *মিফতাহুস সা'আদাহ*, খ ১, পৃ ৮৫।

২১ আল-জাব্বুরি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ২৩৭।

২২ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৪০।

২৩ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২৭-৮।

২৪ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৪০।

২৫ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৬, খ ২২, পৃ ৫।

২৬ Safadi, *op.cit.*, p 17.

২৭ ইবনু খাল্লিকান, *প্রাগুক্ত*, খ ৪, পৃ ২০২; আল-কালকাশান্দি, *প্রাগুক্ত*, খ ৩, পৃ ১৩।

২৮ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬৮-৯।

২৯ আল-আযাভি, *আল-খাত্ত ওয়া মাশাহীরুল খাত্তাতীন ফিল ওয়াতনিল 'আরবি*, পৃ ২৮৬; রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৩১।

৩০ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৩১।

৩১ আগুরদারমান, মুস্তাফা, *ফাননুল খাত্ত*, খ পৃ ১৮৬-৭।

৩২ জাব্বুরি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ৩৮১।

৩৩ *তদেব।*

৩৪ জাব্বুরি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ৩৮৩।

৩৫ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৩২।

৩৬ জাব্বুরি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ৩৯৭।

৩৭ *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ৪০৪।

৩৮ *প্রাগুক্ত*, খ ১,পৃ ৪০২।

www.pathagar.com

৩৯ উত্তরদরমা, মুস্তফা, *ফাননুল খাত্তি*, পৃ ২২৪।
৪০ Safadi, *op.cit.*, p 28.
৪১ Ziauddin, *op.cit.*, p 33.
৪২ Safadi, *op.cit.* p 27.
৪৩ M. Rahman, *op.cit.* p 75.
৪৪ হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৫৫।
৪৫ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৩৪।
৪৬ *তদেব।*
৪৭ জাব্বুরি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ২৯৭; রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৩৪।
৪৮ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৩৪।
৪৯ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৩৫।
৫০ জাব্বুরি, *প্রাগুক্ত*, খ ১, পৃ ৩৪৮।
৫১ আবদুর রহীম, *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, পৃ ৬৯-৭৯।

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

আরবদের লেখার প্রাচীন পত্রসমূহ

জাহিলি ও ইসলামি যুগে লেখার জন্য আরবদের মাঝে কোনো সুনির্দিষ্ট বস্তু বা পত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। উদ্দেশ্য, প্রয়োজন ও সহজলভ্যতার ভিত্তিতে লেখার জন্য তারা বিভিন্ন বস্তুর ওপর নির্ভর করত। এ উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে পশুচর্ম, বস্ত্র, পাথর, হাড়, কাষ্ঠখণ্ড, মৃৎপাত্র, খেজুরগাছের ডাল, ধাতব দ্রব্য ও প্যাপিরাস প্রভৃতি বস্তুর ব্যবহার ছিল। যেমন তারা চিঠিপত্রের জন্য ব্যবহার করত পশুচর্ম ও পার্চমেন্ট এবং কবরগাত্রে লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করত পাথর। নিম্নে তাদের ব্যবহৃত লেখার পত্রগুলোর বিবরণ পেশ করছি।

ক. الجلد (পশুচর্ম): এটা তিন ধরনের ছিল। যথা: ক. الرق (Parchment): অর্থাৎ লেখার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত মেষ, ছাগল অথবা বাছুর বা গজলা হরিণের মসৃণ চামড়া। খ. الأديم (lather): লাল কিংবা পাকা চামড়া। গ. القضيم: সাদা চামড়া।

ইসলাম পূর্বকাল থেকে পার্চমেন্টের ব্যবহার ছিল। আরবদের পূর্বে প্রাচীন ব্যাবিলনীয়দের মধ্যে এবং বিশেষভাবে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে মিসরীয়দের মধ্যে এর প্রচলন ছিল। পরবর্তীকালে এর গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ইথিওপিয়াতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ধর্মীয় ও শিক্ষা-সংস্কৃতিবিষয়ক পাঠসমূহ লেখার উপাদানরূপে পার্চমেন্ট প্রচলিত ছিল।

ইসলামের প্রাথমিককালে দুর্মূল্যের কারণে এর ব্যবহার সীমিত পর্যায়ে ছিল। কেবল কুরআন শরিফ, দলিলপত্র, চিঠিপত্র এবং রেজিস্টারসমূহ লেখার কাজে প্রচলিত দীর্ঘস্থায়ী উপাদানগুলোর একটি হিসেবে পার্চমেন্ট ব্যবহৃত হতো। রাসুলুল্লাহ (সা.) চর্মের পাশাপাশি তাঁর পত্রালাপের জন্য উত্তম রকমের পার্চমেন্ট ব্যবহার করেছেন বলে কথিত আছে। কুরআন নিজেই ঘোষণা করে যে, ﴿وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ. فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ﴾ - "শপথ কিতাবের, যা মেলিয়া ধরা পার্চমেন্টের ওপর লিখিত।"[১] জানা যায় যে, ইসলামের পবিত্র মুসহাফের সংকলন, যার বিভিন্ন অংশের একত্রে সংকলনের কাজ হজরত যায়দ ইবনু সাবিত (রা.) কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল, অবশ্যই তার অনেক অংশ পার্চমেন্টের ওপর লিখিত ছিল।

পার্চমেন্ট প্রস্তুত করার জন্য লোম ও দোষ মুক্ত করে এতে চুন ও সংরক্ষণকারী উপাদান প্রয়োগ করা হয় এবং এর ওপর তাকে কঠিন চাপের নিচে শুষ্ক হতে দেওয়া হয়। এ সকল প্রক্রিয়ার পর চর্মটিকে টানিয়ে একটি ফ্রেমে আটকিয়ে রাখা হয়। এই প্রসারণ এবং চামড়া পাক করার পদ্ধতির অনুপস্থিতি পার্চমেন্ট পাকা চামড়া থেকে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। এর মসৃণতা ও সৌন্দর্য সম্পাদন করা হতো চামড়াটিকে নিখুঁতভাবে পাতলা করে, বুরুশ দ্বারা আঁচড়িয়ে বা ঘষিয়ে অথবা ফাড়িয়ে।[২]

www.pathagar.com

أديم অর্থাৎ লাল কিংবা পাকা চামড়ার ব্যবহারও জাহিলি যুগ থেকে আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় মুসলমানগণ তাতেও পবিত্র কুরআনের বাণী লিপিবদ্ধ করেছিলেন। হজরত উসমান (রা.) বলেন,

فأعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله شيئ لما جاء به, وكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن.

"তোমাদের প্রত্যেকের কাছে পবিত্র কুরআনের যা যা আছে তা যেন অবশ্যই নিয়ে আসে। এ নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে লোকেরা যে যে পত্র ও চামড়াতে কুরআনের বাণী লিপিবদ্ধ করেছিল তা নিয়ে হাজির হয়।"[৩]

قضيم অর্থাৎ সাদা চামড়ার ব্যবহারও আরবদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায়ও পবিত্র কুরআনের বাণী সাদা চামড়ার ওপর লেখা হতো। বিশিষ্ট তাবিঈ শিহাব আজ-জুহরী (রাহ.) বলেন,

قبض رسول الله صلى الله عليه و سلم و القرآن في العسب والقضيم والكرانيف .

-"রাসুলুল্লাহ (সা.) পবিত্র কুরআন খেজুর গাছের ডালপাতা ও ডালের শক্তমূল এবং সাদা চামড়ায় রেখে মৃত্যুবরণ করেন।"[৪]

উল্লেখ্য, দক্ষিণ আরবে, বিশেষ করে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের পর পারসিকদের দক্ষিণ আরব শাসন করার সময় যখন তারা ইয়েমেনে বিভিন্ন ট্যানারি (Tannery) স্থাপন করেছিল, তখন চামড়া পাকা বা পাট করার ব্যবস্থা প্রভূত বিস্তার লাভ করেছিল। তাছাড়া তায়িফ, নাজরান, সাফাদ, জারশ, সান'আ ও যুবায়দ প্রভৃতি শহরও চামড়া শিল্পে খ্যাতি লাভ করেছিল। এসব শহরে বিরাট পরিমাণে পাটজাত চামড়া উৎপন্ন হতো এবং সে সময়ে মসৃণতা ও সূক্ষ্মতার দিক দিয়ে এগুলোর বেশ নাম ছিল।[৫]

খ. القماش (বস্ত্র): এটি রেশম কিংবা কার্পাস বা লিনেনের তৈরি হতে পারে। বস্ত্র থেকে প্রস্তুত লেখার পত্রকে আরবিতে مهرق বলা হয়। দামিশকে উমাইয়া যুগ থেকে লেখার পত্র হিসেবে লিনেনের ব্যবহার দেখা যায়। তবে এর উৎপাদনে বিশেষ কৌশল ও প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিতে হতো বলে এর দাম ছিল চড়া। তাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া অন্যত্র এর বহুল প্রচলন হয়নি। এজন্য ভাষাতত্ত্ববিদ জাহিয (১৬৩-২৫৫হি.) তাঁর কিতাবুল হাইওয়ানে উল্লেখ করেছেন,

لا يقال للكتب مهارق حتى تكون كتب دين أو كتب عهود و ميثاق و أمان.

"কোনো লিপিকে مهارق বলা যাবে না, যতক্ষণ না তা ধর্মীয় বিষয়ের লেখা কিংবা চুক্তি, অঙ্গীকার ও নিরাপত্তাজনিত লিপি না হয়।"[৬]

গ. الحجارة و اللخاف (বড়ো পাথর ও সাদা হালকা পাথর): আরবিতে পাথরের ওপর লিখিত প্রাপ্ত সুপ্রাচীন শিলালিপি হচ্ছে উম্মুল জিমাল, নাম্মারা ও যাবদ প্রভৃতি শিলালিপি। তাছাড়া কবরগাত্রেও পাথরের ওপর লেখার প্রচলন আরবদের মধ্যে ছিল। اللخاف অর্থ সাদা হালকা পাথর। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায়ও পবিত্র কুরআনের কিছু কিছু বাণী সাদা হালকা পাথরের ওপর লেখা হতো। ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) যখন হজরত যায়দ ইবনু সাবিত (রা.)-কে কুরআনের বাণীসমূহ সংগ্রহ করার নির্দেশ দেন, তখন তিনি তা পালন করতে গিয়ে বলেন :

www.pathagar.com

فجعلت أتبعه عن الرقاع و العسب و اللخاف. - "আমি কুরআনের অংশসমূহ পশুচর্ম, খেজুর গাছের ডাল-পাতা ও পাথরের টুকরোতে তালাশ করতে লাগলাম।"[৭]

ঘ. العظام (হাড়): হাড়গুলোর মধ্যে অংসফলকাস্থি (Shoulder blade) ও পাঁজরের হাড় সর্বাধিক প্রচলিত ছিল। পবিত্র কুরআনের কোনো কোনো বাণীও হাড়ের ওপর লিপিবদ্ধ করা হয়। হজরত যায়দ ইবনু সাবিত (রা.) বলেন, "যখন : ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ...﴾ আয়াতটি নাযিল হয় তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) একটি অংসফলকাস্থি সংগ্রহ করে আমাকে ডেকে বললেন, এতে আয়াতটি লেখে নাও।"[৮] লেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে হাড়ের ব্যবহার আব্বাসীয় যুগের প্রথমদিক তথা হিজরি ২য় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত চালু ছিল।

ঙ. الخشب (কাষ্ঠখণ্ড): কাষ্ঠখণ্ডগুলোর মধ্যে উষ্ট্রের কুঁজের পরিমাপের ছোট জিন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হজরত যায়দ ইবন সাবিত (রা.) বলেন, فاتبعت أجمع القرآن من الرقاع و الأكتاف و الأقتاب-"আমি কুরআনের অংশসমূহ পশুচর্ম, অংসফলকাস্থি ও জিনগুলোতে তালাশ করতে লাগলাম।" তাছাড়া লেখার পত্র হিসেবে হাওদার ব্যবহারও আমরা দেখতে পাই। হজরত সা'ঈদ ইবনু যুবাইর (রা.) বলেন,

كنت أسمع عن ابن عمر و ابن عباس الحديث بالليل فأكتبه في واسطة رحلي حتى أصبح فأنسخه .

"আমরা রাত্রে হজরত ইবনু উমর ও ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে হাদিস শুনতাম এবং তা আমার হাওদার দরজায় লিখে রাখতাম। পরে সকালে তা আমি কপি করে নিতাম।" আরবদের মধ্যে কাঠের স্লেটের ব্যবহারও আমরা লক্ষ করি, যা বর্তমান অবধি চলে আসছে।[৯]

চ. العسب (খেজুর গাছের শুষ্ক ডালপালা) ও الكرانيف (কাণ্ডের সাথে যুক্ত ডালের শক্ত ও সুপরিসর মূল): আরবরা লেখার পত্র হিসেবে খেজুর গাছের শুষ্ক ডালপালা ও তার কাণ্ডের সাথে যুক্ত শক্ত ও সুপরিসর শক্তমূলকেও ব্যবহার করত। বর্ণিত রয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে পবিত্র কুরআনের বাণী খেজুর গাছের শুষ্ক ডালপালা ও তার কাণ্ডের সাথে যুক্ত শক্ত ও সুপরিসর শক্তমূলসমূহেও লিপিবদ্ধ করা হতো।

ছ. الفخار (পোড়া মাটি): আরবরা অনেক সময় লেখার জন্য পোড়া মাটি ও মৃৎপাত্রও ব্যবহার করত।

জ. المعادن (ধাতব দ্রব্য): আরবরা অনেক সময় লেখার জন্য লোহা, ব্রোঞ্জ, পিতল, স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু দ্বারা তৈরি যন্ত্রপাতি, বিশেষ করে তরবারি, গহনা ও পাত্রসমূহও ব্যবহার করত ।

ঝ. البردي (প্যাপিরাস): দক্ষিণ মিসরের বরুই বা শরকাণ্ডা জাতীয় এক প্রকারের তৃণ। এই তৃণ চার হাত পরিমাণ উঁচু হয়। এর ডাঁটা বা কন্দ ত্রিধারা বা ত্রিকোণবিশিষ্ট। প্রথমে ঐ ডাঁটাগুলো ৪.৫ থেকে ৯.৫ ইঞ্চি পর্যন্ত টুকরো করা হয়। এর ছাল অথবা ডাঁটা থেকে অল্প চওড়া পাত বা পাট বের করে কোনো আঠালো দ্রব্যের সাহায্যে উক্ত পাত একখানা অপর খানার সাথে সেঁটে দিয়ে লেখার উপযোগী পত্র তৈরি করা হতো। এ পত্র প্রথমে উল্লেখিতভাবে জুড়ে শুকিয়ে নিয়ে হাতির দাঁত কিংবা শঙ্খের সাহায্যে ডলে

www.pathagar.com

ঘষে মসৃণ ও সমান করা হতো। এরপর এর ওপরে লেখা যেত। এভাবে তৈরি পত্রকে ইউরোপীয়রা প্যাপিরাস বলত। উক্ত পত্রের ওপরে বিভিন্ন পুস্তক, চিঠিপত্র এবং প্রয়োজনীয় দলিলও লেখা হতো। এগুলো কিরতাস কিংবা তুমার নামে বেচাকেনা হতো।

আরবরা জাহিলি যুগ থেকে প্যাপিরাস সম্পর্কে পরিচিত ছিল। তবে তারা হিজরি ৮ম সালে মিসরে অনুপ্রবেশের পূর্বে এর ব্যবহার করেছিল কি না, তা সুপ্রমাণিত নয়। তদুপরি আরব দেশে প্রাপ্ত প্রাচীনতম প্যাপিরাস যা আবিষ্কৃত হয়েছে তা হলো হিজরি ২২সালে লিখিত। পৃথিবীতে আরবি ভাষায় লিখিত এবং অদ্যাবধি আবিষ্কৃত প্যাপিরাসের সংখ্যা প্রায় ১৬ হাজারের কাছাকাছি। তন্মধ্যে ৫ হাজার মিসরে সংরক্ষিত রয়েছে। অবশিষ্টগুলো বিশ্বের বিভিন্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

ইরাক মুসলমানদের করতলগত হওয়ার পরও দীর্ঘদিন ধরে সেখানে প্যাপিরাসের ব্যবহার চালু ছিল। অবশেষে যখন তা দুর্মূল্য হয়ে পড়ে এবং কাগজ আবিষ্কৃত হয় ও তার ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে, তখন থেকে সেখানে প্যাপিরাসের ব্যবহার ক্রমশ হ্রাস পেতে শুরু করে। এতদসত্ত্বেও আব্বাসীয় খলিফা মুতাসিম প্যাপিরাস তৈরির জন্য মিসর থেকে কয়েকজন কর্মচারী এনেছিলেন; কিন্তু তাদের তৈরি প্যাপিরাসগুলো মিসরের প্যাপিরাসের মতো উত্তম ছিল না।"[১০]

এঃ. الورق (কাগজ) : কাগজের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। কারণ এটি প্রচলন, মূল্য ও ধারণ ক্ষমতা প্রভৃতি দিক থেকে লেখার সকল পত্রকে অতিক্রম করে গেছে। তাই বিভিন্ন দেশ ও শহর, বিশেষ করে মধ্যযুগে মুসলিম দেশগুলো তা তৈরি করতে প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। পাশাপাশি মুসলিম শাসকবর্গও এক্ষেত্রে প্রভূত উৎসাহ প্রদর্শন করেছিলেন।

যতদূর জানা যায়, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম চীনের সি লিং ১০৫ খ্রিষ্টাব্দে কাগজ আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি টুকরো কাপড়, দড়ি ও শণ থেকে কাগজ তৈরি করতেন। এর পঞ্চাশ বছর পর কাগজ তৈরি কেবল টুকরো কাপড়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক ইবনুন নাদিম (মৃ.৪৩৮ হি.) উল্লেখ করেছেন, চীনের কাগজ ঘাস থেকে তৈরি করা হতো।[১১]

আরবরা ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে সমরকন্দ দখলের পরই চীনাদের কাছ থেকে কাগজ তৈরির পদ্ধতি আয়ত্ত করে নেয়। বর্ণিত রয়েছে, হিজরি ১৩৩ সালে সমরকন্দের শাসক যিয়াদ ইবনু সালিহের সাথে ফরগানার রাজা ইখশিদের তুমুল যুদ্ধ বাঁধে। এ যুদ্ধে ইখশিদকে চীনের সম্রাট তুরাজ নদীর তীরে সৈন্য-সামন্ত দিয়ে সহযোগিতা করেন। মুসলমানরা এ যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং শত্রু পক্ষের বিশ হাজার লোককে কয়েদ করে। মুসলমানরা কয়েদিদেরকে সমরকন্দে নিয়ে আসে। তাদের মধ্যে কাগজ নির্মাণকর্মীও ছিল। সে সময় থেকে সমরকন্দ কাগজ উৎপাদন করতে শুরু করে। তখন এ কাগজ সমরকন্দি বা খুরাসানি কাগজ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। প্রাচীনতম লিখিত কাগজ যা ভিয়েনার সংগ্রহে মজুদ রয়েছে তা হিজরি ১৮০ থেকে ২০০ সালের মধ্যেই লিপিবদ্ধ করা হয়।

ইবনুন নাদিম বলেন, তাঁর সময়কালে ছয় ধরনের কাগজের প্রচলন ছিল। খুরাসানি কাগজ লিনেন থেকে তৈরি করা হতো। কথিত আছে যে, বনু উমাইয়াদের যুগে এর

www.pathagar.com

ইবনুন নাদিম বলেন, তাঁর সময়কালে ছয় ধরনের কাগজের প্রচলন ছিল। খুরাসানি কাগজ লিনেন থেকে তৈরি করা হতো। কথিত আছে যে, বনু উমাইয়াদের যুগে এর নির্মাণ প্রযুক্তি পূর্ণতা লাভ করে। তদুপরি এ কথাও প্রচলিত আছে যে, চীনের কাগজ নির্মাণকর্মীরা চীনা প্রযুক্তি ব্যবহার করে খুরাসানে কাগজ তৈরি করেছিল। তখন এ কাগজের ছয়টি প্রকার ছিল। এগুলো হলো- ১. সুলাইমানি। আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশিদের আমলে খুরাসানের গভর্নর সুলাইমান ইবনু রশিদের দিকে সম্বন্ধ করে একে কাগজে সুলাইমানি বলা হতো। ২. তালহি। খুরাসানের তাহিরিয়া সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় আমির তালহা ইবনু তাহিরের দিকে সম্বন্ধ করে একে কাগজে তালহি বলা হতো। ৩. নুহি। সামানি সাম্রাজ্যের অন্যতম আমির নুহ আস-সামানির দিকে সম্বন্ধ করে একে কাগজে নুহি বলা হয়। ৪. ফিরআউনি। এটি প্যাপিরাসের সর্বশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। ৫. জাফরি। জাফর বার্মাকির দিকে সম্বন্ধ করে একে কাগজে জাফরি বলা হয়। ৬. তাহিরি। খুরাসানের তাহিরিয়া সাম্রাজ্যের অন্যতম আমির দ্বিতীয় তাহিরের (শাসন কাল: ২৩০-২৪৮ হি.) দিকে সম্বন্ধ করে একে কাগজে তাহিরি বলা হতো।[১২] এ ছাড়া তখন আরো বিভিন্ন নামের কাগজও পাওয়া যেত। যেমন–ক. কাগজে জিহানি। খুরাসানের অন্যতম শহর জিহানের দিকে সম্বন্ধ করে একে কাগজে জিহানি বলা হতো। খ. কাগজে মামুনি। আব্বাসীয় খলিফা মামুনের দিকে সম্বন্ধ করে একে কাগজে মামুনি বলা হতো। গ. কাগজে মানসুরি। এটি সমরকন্দের আবুল ফদল মানসুর ইবনু নসর ইবনু আবদুর রহিম আল-কাগজি (মৃ. ৪২৩হি.)-এর দিকে সম্বন্ধকৃত। তখনকার সময়ে এ কাগজে মানসুরির ব্যাপক খ্যাতি ছিল এবং তা ইরাক ও মিসরে তৈরি করা হতো।

সমরকন্দি কাগজের খ্যাতি দিক-বিদিক ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তার নির্মাণ প্রযুক্তি বিভিন্ন মুসলিম দেশে অনুপ্রবেশ করেছিল। যেমন বাগদাদের মধ্যে আব্বাসীয় যুগের বিশিষ্ট মন্ত্রী ফদল ইবন ইয়াহয়া বার্মাকি কাগজ শিল্পের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও উন্নয়ন সাধনের জন্য কাজ করেছেন।

এর কয়েক বছর পর তাঁর ভাই উজির জাফর ইবনু ইয়াহয়া বার্মাকি লেখার ক্ষেত্রে কাগজের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্য আদেশ দেন এবং এর পাশাপাশি পার্চমেন্ট ও এ জাতীয় লেখার পত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। কেননা এ জাতীয় পত্রে সহজে লেখা মুছতে এবং বিকৃতি করতে পারা যায়। এসব কারণে বাগদাদে হিজরি ৪র্থ শতাব্দীতে কাগজ শিল্পে বড়ো ধরনের উন্নতি সাধিত হয় এবং সেখানে বিভিন্ন কাগজের কল ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

বাগদাদের কাগজ ছিল সে সময়কালের সবচাইতে উন্নত ও দামি কাগজ। এটা এক প্রকারের মোটা কাগজ। তবে এর পাশাপাশি তার কোমলতা ও মসৃণতা এবং অংশগুলোর মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য তাকে উৎকৃষ্ট কাগজে পরিণত করে। পবিত্র মুসহাফ লেখার জন্য এটা বেশিরভাগ ব্যবহার করা হতো।

এরপর কাগজ নির্মাণশিল্প সিরিয়া লেবাননে পৌঁছে যায়। এক্ষেত্রে ত্রিপলি ও দামিশক বিরাট অবদান রাখে। দামিশকে কাগজের বড়ো বড়ো কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

গবেষকগণ এখানকার কাগজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তাছাড়া তাবারিয়া, আলেপ্পোও মসৃণ, স্বচ্ছ ও সুন্দর কাগজে তৈরিতে খ্যাতি লাভ করেছিল।

অবশ্যই মিসরে তৈরি কাগজ ইরাক ও সিরিয়া লেবাননের কাগজের মতো উন্নত ছিল না। মিসরীয় কাগজের দুটি ফরমেট ছিল। একটি হলো মানসুরি। এটা অপেক্ষাকৃত বড়ো। এর দুই দিকই খুব কমই স্বচ্ছ ও মসৃণ হয়। অপরটি হলো সাধারণ। এর দুই দিক কখনো স্বচ্ছ ও মসৃণ হয়ে থাকে। এ কাগজকে ঐ সময় 'মাসলুহ' বলা হতো। আবার কেউ কেউ মিসরীয় কাগজকে উন্নত ও মধ্যম দুই ভাগে ভাগ করেছেন। সেখানে 'কাভিয়্য' (قوي) নামে আর এক ধরনের কাগজ ছিল। এটি ছোট ছোট টুকরার হতো এবং কশকশে ও মোটা হতো। এটি লেখার উপযোগী ছিল না। এটি মিষ্টি ও আতর প্রভৃতির জন্য তৈরি করা হতো।

এরপর কাগজ নিমার্ণ শিল্প মাগরিবে পৌছে। সেখানে সিসিলি, মরক্কো ও আন্দালুসে কাগজ তৈরি হতে থাকে। বিশেষ করে আন্দালুসের শাতিবা নগরীটি কাগজ তৈরিতে সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেছিল। এখানে উন্নত মানের কাগজ প্রস্তুত হতো এবং সেখান থেকে বিভিন্ন শহরে কাগজ রপ্তানি করা হতো।

সর্বশেষ আমরা পারস্যের যে শহরটি উৎকৃষ্ট কাগজ তৈরিতে খ্যাতি লাভ করতে দেখি তা হলো খঙ্গ নগরী। এটি জনজান থেকে দুই দিনের দূরত্বে অবস্থিত।[১৩] উল্লেখ্য যে, ইউরোপ মহাদেশ, যা তার আবিষ্কারসমূহের জন্য গর্ব করে থাকে, কাগজ কল আবিষ্কার করে মাত্র দুশো বছর আগে। অর্থাৎ মুসলমানদের ১ হাজার বছর পর ১৭৯৮ সালে ফ্রান্সের রবার্ট লুই নামের ভদ্র লোক কাগজের কল আবিষ্কার করেন।

তথ্যসূত্র

১ আল-কুর'আন, ৫২ (সূরা আত-তুর): ৩।
২ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ ২২, পৃ ১৫৫।
৩ ইবনু আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ ৩৯, পৃ ২৪৩; যাহবি, *তারীখুল ইসলাম*, খ ১, পৃ ৪৫৩; কুর্দি, মুহাম্মদ তাহির, *তারীখুল কুরআনিল করীম*, পৃ ৫০।
৪ আয-যামাখশারি, মাহমুদ, *আল-ফায়িক*, দারুল মা'আরিফাহ, খ ২, পৃ ৪২১।
৫ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৪২।
৬ ইবনুল জাহিয, *কিতাবুল হাইওয়ান*, খ ২।
৭ বুখারি, *আল-জামি*, (কিতাবুল আহকাম), হা.নং: ৬৭৬৮।
৮ বুখারি, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবু ফাদায়িলুল কুর'আন), হা.নং: ৪৭০৪।
৯ দারিমি, আবদুল্লাহ, *সুনান*, হা.নং: ৪৯৫।
১০ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৪৫।
১১ ইবনুন নাদীম, *আল-ফিহরিস্ত*, বৈরূত: দারুল মা'আরিফাহ, ১৯৭৮, খ ১, পৃ ৩১।
১২ *তদেক।*
১৩ রিফা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৪৫-১৪৭।

www.pathagar.com

উপসংহার

বস্তুতপক্ষে ইসলামের উষালগ্ন তথা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সময়কালে থেকেই আরবি লিপির শুভসূচনা হয়। পরবর্তীকালে মুসলমানদের একান্ত প্রচেষ্টায় এটি এক উচ্চশ্রেণির শিল্পের আসন লাভ করে। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী যুগযুগ ধরে মুসলমানদের এ শ্রেষ্ঠ কীর্তির জন্য স্মরণ করবে। আজ এ মুসলিম লিপিকলা আর শুধু মুসলিম জাতির গৌরবের বিষয়ই নয়; বরং শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, যার প্রভাব অমুসলিম শিল্পীদের উপরও পড়ছে। বিখ্যাত শিল্পী পলাক্সির 'ডকুমেন্ট' ছবিটিতে ক্যালিগ্রাফির প্রচ্ছন্ন প্রভাব লক্ষ করা যায়।

আমাদের দেশে হাজারো বছর থেকেই লোকজ ধারায় ক্যালিগ্রাফি চর্চা হয়ে আসছে। সরকারি ফরমান, দলিল-দস্তাবেজ, দাওয়াতনামা, কুরআনের কপিকরণ, মুদ্রা ও শিলালিপি লেখাতে ক্যালিগ্রাফির মূল কার্যক্রম দেখা যায়। তাছাড়া মসজিদ, মাদরাসা, ধর্মীয় ইমারত এবং কখনো বাসগৃহেও শিল্পসম্মত ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার হয়েছে। গ্রাম বাংলায় গৃহবধূরা সূচিকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ, মুহাম্মদ, বিসমিল্লাহ ও কালিমা প্রভৃতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে। বর্তমানে আরবি ক্যালিগ্রাফি চর্চার আবহ তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্যালেন্ডারে, ভিউকার্ডে ও বইয়ের প্রচ্ছদে ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রে যেমন- ব্যাগ, তৈজসপত্র, ফুলদানি, এমনকি টি শার্টেও ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার শুরু হয়েছে। তবে দিনদিন যেভাবে ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেভাবে তা জনগণের মাঝে প্রচার ও পরিচিতি পাচ্ছে না। মূলত শিল্পী ও শিল্পবোদ্ধাদের মধ্যেই এর সঞ্চরণ। আমাদের দেশে এ বিষয়ে ব্যাপক লেখালেখিও তেমন হয়নি। বলতে গেলে বাংলা ভাষায় দুই একটি পুস্তিকা ছাড়া এ বিষয়ের ওপর কোনো সমৃদ্ধ গ্রন্থ পাওয়া যায় না। তদুপরি ক্যালিগ্রাফির শৈল্পিক, নান্দনিক দিকটি এতই জটিল যে, একে সাধারণভাবে বর্ণনা করা সহজসাধ্যও নয়। তবু আমাদেরও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের এ ঐতিহ্যমণ্ডিত উপাদানটির প্রতি আগ্রহী পাঠকদের চাহিদাকে সামনে রেখে আমি আমার এ গ্রন্থটিতে লিপিশিল্পের উৎপত্তি-কাল থেকে শুরু করে যত ধরনের স্টাইলে এবং পৃথিবীর যেখানে যেখানে মুসলিম ক্যালিগ্রাফি হয়েছে, তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি। আমাদেরকে এর গৌরবময় অধ্যায় সামনে রেখে এগুতে হবে। আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নান্দনিকতা আনতে হলে মুসলিম ক্যালিগ্রাফিকে বিবেচনায় আনার প্রয়োজন রয়েছে।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুরআন

ইবনু কাছির, ইসমা'ঈল, *তাফসিরুল কুর'আনিল 'আজিম*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪০১হি.

আল-হাদিস

বুখারি, মুহাম্মদ ইবনু ইসমা'ঈল, *আল-জামি*, বৈরুত : দারু ইবনি কাছির, ১৯৮৭

আবু দাউদ, সুলায়মান, *আস-সুনান*, বৈরুত : দারুল ফিকর

তিরমিজি, আবু 'ঈসা মুহাম্মদ, *আল-জামি'*, বৈরুত : দারু ইহ্য়া'ইত্ তুরাছিল আরবি

আহমদ, ইবনু হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৪৯

হাকিম, আবু 'আবদুলাহ, *আল-মুস্তাদরক*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০

দারিমি, 'আবদুল্লাহ, *আস-সুনান*, বৈরুত : দারুল কিতাবিল 'আরবি, ১৪০৭ হি.

তাবারানি, আবুল কাসিম,*আল-মু'জামুল কবির*, মাওসুল : মাকতাবাতুজ যাহরা', ১৯৮৩

আরবি, ফারসি ও উর্দু সহায়ক গ্রন্থ

আনওয়ার, ড. এ. সুহায়ল, *আল-খাত্তাতুল বাগদাদি 'আলি ইবনুল হিলাল*

আন-নুওয়াইরি, শিহাবুদ্দীন আহমদ, *নিহায়াতুল আরাব ফি ফুনূনিল আদাব*, বৈরুত : দারুল কিতাবিল মিসরিয়্যাহ

'আফিফি, ফাওজি সালিম, *নাশ'আতু ওয়া তাতাওয়ারুল কিতাবতিল খাত্তিয়া*

আবু সিক্কিন, 'আবদুল হামিদ, *ফিকহুল লুগাহ*, কায়রোঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৯৮১

আল-'আযাভি, 'আব্বাস, *বাগদাদ 'আসিমাতুল খাত্তিল 'আরবি*

আল-'আযাভি, 'আব্বাস, *আল-খাত্তুল 'আরবি ফি তুরকিয়া*

আল-'আযাভি, *আল-খাত্ত ওয়া মাশাহিরুল খত্তাতিন ফিল ওয়াতনিল 'আরবি*

আল-মুনজিদ, ড. সালাহুদ্দীন, *দিরাসাতুন ফি তারিখিল খাত্তিল 'আরবি মুনজু বিদায়াতিহি ইলা নিহায়াতিল 'আছরিল উমভি*, বৈরুত : দারুল কিতাবিল জাদিদ, ১৯৩২

আজ-জারাকশি, মুহাম্মদ,*আল-বুরহান ফি 'উলূমিল কুর'আন*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮৮

আজ-জামাখশারি, আবুল কাসিম মাহমূদ, *আল-ফা'ইক*, বৈরুত : দারুল মা'আরিফাহ, ২য় সংস্করণ

আল-আ'জামি, ওয়ালিদ, *জামহারাতুল খাত্তাতিল বাগদাদিঈন*

আল-আসাদ, নাসিরুদ্দীন, *মাছাদিরুশ শি'রুল জাহিলি*, কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৬

আল-কাত্তান, মন্না, *'মাবাহিছু ফি 'উলূমিল কুর'আন*, রিয়াদঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪১৩ হি.

আল-কুরতুবি, আবু 'উমর ইউসুফ, *আল-কসদ ওয়াল উমাম*, কায়রোঃ মাকতাব আল-কুদসি, ১৩৫০ হি.

আল-কুরদি, মুহাম্মদ তাহির, *তারিখুল খাত্তিল 'আরবি*

www.pathagar.com

আল-জাহিজ, আবু উসমান 'আমর, *কিতাবুল হাইওয়ান*, বৈরুত : দারুল জিল, ১৯৮৮
আল-হামদ, গানিম কুদুরি, *রাসমুল মুসহাফ*
আল-হামভি, ইয়াকুত, *মু'জামুল উদাবা'*, বৈরুত : দারু ইহ্য়া'ইত তুরাছিল 'আরবি, ১৯৮৮, *মু'জামুল বুলদান*, বৈরুত : দারু সাদির, ১৯৫৭
আশ-শুকায়রি, ফাহহিয়্যা, *তারিখুল খাত্তিল 'আরবি ওয়া আদাবুহু*
আস-সাবুনি, মুহাম্মদ আলি, *আত-তিবয়ান ফি 'উলূমিল কুর'আন*, বৈরুত : 'আলমুল কুতুব, ১৯৮৫
আস-সালিহ, ড. সুবহি, *'উলূমুল হাদিস ও মুস্তালাহুহু*, বৈরুত : দারুল 'ইলম লিল-মালায়িন, ১৯৯১
আস-সালিহ, ড. সুবহি, *মাবাহিছু ফি 'উলূমিল কুর'আন*, বৈরুত : দারুল মালাঈন', ১৯৭৯
ইব্ন 'আব্দ রাব্বিহি, আহমদ আন্দালুসি, *আল-'ইকদুল ফরিদ*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৯৮৭
ইবনু কাছির, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, বৈরুত : মাকতাবাতুল মা'আরিফ
ইবনু কুতায়বা, আবু 'আবদুল্লাহ, *আল-মা'আরিফ*
ইবনু খাল্লিকান, শামসুদ্দীন আহমদ, *ওফায়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আনবাউ আবনায়িজ জমান*, তাহকিক : ড. ইহসান 'আব্বাস, বৈরুত : দারুছ্ছাকাফাহ, ১৯৬২
ইবনু মানজুর, আবুল ফদল জামালুদ্দীন, *লিসানুল আরব*, ইরান : নাশরু আদবিল হাওজা, কুম, ১৪০৫ হি.
ইবন খালদুন,'আবদুর রহমান, *আল-মুকাদ্দমা*, (অনু. গোলাম সামদানি কোরায়শি), ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮১
ইবনুন নাদিম, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, *আল-ফিহরিস্ত*, বৈরুত : মাতবা'আতুল খয়্যাত, ১৯৭২
ইবনুন নাদিম, *আল-ফিহরিস্ত*, বৈরুত: দারুল মা'আরিফাহ, ১৯৭৮
ইবনু হিশাম,'আবদুল মালিক, *আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ*, বৈরুত : দারু ইহ্য়া'ইত তুরাছিল 'আরবি, ১৯৯৭
ইবনুল আছির, *উসদুল গাবাহ*, তিহরান : আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ
ইবনুল আম্বারি, *কিতাবু ঈদাহিল ওয়াকফি ওয়াল ইবতিদা*, দামিশক : ১৯৭১
ইরানী, আবদুল মুহাম্মদ খান, *পয়দায়েশে খত্ত ও খত্তাত্তাঁ*, তিহরান, ১৩৪৬ হি.
উগুরদরমা, মুস্তফা, *ফাননুল খাত্তি*
'উবাদাহ, 'আবদুল ফত্তাহ, *ইনতিশারুল খাত্তিল 'আরবি ফিল 'আলিমিশ শারকি ওয়াল গারবি*, মিসর : মাতবা'আ হিন্দিয়্যা বিল-মুসিকি, ১৯১৫
'উসমানি, যফর আহমদ ও আবদুল করিম, মুফতি, *ইমদাদুল আহকাম*, করাচি : মাকতাবা দারুল 'উলুম
ওয়াফি, ড.'আলি, 'আবদুল ওয়াহিদ, *'ইলমুল লুগাহ*, কায়রো : মাকতাবাতু নাহদাতি মিসর, ১৯৬২
ওয়াফি, *ফিকহুল লুগাহ*, কায়রো: দারু নাহদাতি মিসর, ১৯৭৩
কালকাশান্দি, আবুল 'আব্বাস আহমদ, *সুবহুল আ'শা*, কায়রো : আল-মাতবা'তুল আমিরিয়্যা, ১৯১৬
কাশগড়ি, 'আবদুর রহমান, *আল-মুফিদ*, ঢাকা, ১৯৬১
কৃস্টানসেন, অর্থার, *ইরান ব-'আহদে সাসানিয়া*, ড. মুহাম্মদ ইকবাল অনূদিত, উর্দু সংস্করণ, দিল্লি: আঞ্জুমনে তরক্কি-এ-উর্দু, ১৯৪১

www.pathagar.com

জাওয়াদ 'আলি, *আল-মুফাস্‌সল ফি তারিখিল 'আরব কাবলাল ইসলাম*, বৈরুত : দারুল 'ইলম, ১৯৭১
জাব্বুরি, মাহমুদ শুকুর, *আল-মাদরাসাতুল বাগদাদিয়্যা ফিল খাত্তিল 'আরবি*, বাগদাদ, ২০০১
জাদুল হক, 'আলি, *বয়ানুল লিন্নাসি*, আল-আজহার
জুমু'আ, ড. ইব্রাহিম, *দিরাসাতুন ফি তাতাওয়ারিল কিতাবাতিল কুফিয়্যা*
তাশ কুবরি জাদাহ, আহমদ ইবনু মুস্তফা, *মিফতাহ আস-সা'আদাহ ওয়া মিসবাহুস সিয়াদাহ*, হায়দ্রাবাদ : মাতবা'তু দায়িরাতিল মা'আরিফ আল-'উসমানিয়্যা, ১৯৮০
থানবি, মাওলানা আশরাফ আলি, *ইমদাদুল ফাতাওয়া*, করাচি : মাকতাবা দারুল 'উলুম
দারমান, মুস্তফা আগুর, *ফান্নাল-খাত্ত*
নাজি, যায়নুদ্দীন, *বদা'ইয়ুল খাত্তিল 'আরবি*
নাজি, যায়নুদ্দীন, *মুছাওয়ারুল খাত্তিল 'আরবি*
ফরিহা, আনিস, *আল-খাত্তুল 'আরবি : নাশ'আতুহু ও মাশকিলাতুহু*, বৈরুতঃ দ্যা আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব বৈরুত, ১৯৬১
বালাজুরি, আবুল হাসান আহমদ, *ফুতুহুল বুলদান*, মিসর : আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ, ১৯৫৯
মাকরিজী, তকি 'উদ্দীন আহমদ ইবন 'আলি, *আল-খুতাত*, কায়রো : মুওয়াসসাতুল হালভি ওয়া শারিকাহু, ১৩৭০ হি.
মারজুক, ড. মুহাম্মদ 'আবদুল 'আজিজ, *আল-ফুনূনুয যাখরাফিয়্যাহ...*
মারজুক, ড. মুহাম্মদ আবদুল 'আজিজ, *আল-মুসহাফুশ শরিফ*
জয়দান, জুরজি, *তারীখু আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যা*, বৈরুত : দারু মাকতাবিল হায়াত, তা.বি.
জয়দান, জুরজি, *তারিখুদ তামাদ্দুনিল ইসলামি*, বৈরুত : দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৬৭
জয়্যাত, আহমদ হাসান, *তারিখুল আদাবিল 'আরাবি*, বৈরুত : দারুল মা'রিফা, ১৯৯৩
জলজল, বশারা, *তানভিরুল আজহান ফি 'ইলমি হায়াতিল হাইওয়ান ওয়াল ইনসান*
রাগিব ইস্পাহানি, আবুল কাসিম হুসায়ন, *আল-মুফরদাত ফি গরিবিল কুর'আন*, মিসর : দাফ্‌তরু নাশরিল কিতাব, ১৪০৪ হি.
রিফা'ঈ, বিলাল, *আল-খাত্তুল 'আরবি : তারিখুহু ওয়া হাদিরুহু*, বৈরুত : দারু ইবন কাছির, দামিশক, ১৯৯০
শাওকি, আহমদ, *আশ-শাওকিয়াত*, বৈরুত : দারুল কিতাবিল 'আরবি
সুয়ুতি, জালালুদ্দীন 'আবদুর রহমান, *আল-মুজহির ফি 'ইলমিল লুগাতি ওয়া আনওয়া'ইহা*, বৈরুত : দারুল ফিকর *আল-ইতকান ফী 'উলূমিল কুর'আন*, কায়রো : আল-হাইয়াতুল মিসরিয়্যাতুল 'আম্মাহ.., ১৯৭৪
হাজি খালিফা, মুস্তফা ইবনু 'আবদুল্লাহ আর-রুমি, *কাশফুজ জুনুন*, বাগদাদ : মাকতাবাতুল মুছন্না, ১৯৪১
হিলাল নাজি, ইবনু মুকলা : *খাত্তাতান ওয়া আদিবান ওয়া ইনসানান*
,, , *ইবনুল বাওওয়াব 'আবকারিয়্যুল খাত্তিল আরবি*
হুফনি বেগ নাসিফ, *তারিখুল আদাব ওয়া হায়াতুল লুগাতিল 'আরাবিয়্যা*
আল-কামুসুল জাদিদ লিত্‌ তুলাব, আশ-শারিকাতুত তিউনিসিয়্যা লিত্‌ তাওজি', আল-মুওয়াসসাতুল ওয়াতানিয়্যা আল-জাজায়িরিয়্যাহ, ১৯৮৮

www.pathagar.com

আল-মু'জামুল ওয়াসিত, (মাজমা'উল লুগাতিল 'আরাবিয়্যা, কায়রো), ইউ.পি. : কুতুবখানা হুসায়নিয়্যা, দেওবন্দ

দায়িরাতুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়্যা, ইনতিশারাতেহাঁ তেহরান, ১৩৫২ হি./১৯৩৩ খ্রি., ১ম সংস্করণ

আল-কুর'আন ফি কুল্লি লিসান, দাক্ষিণাত্য : হায়দরাবাদ, ১৯৪৬

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ

Abbott, Nabia, *Rise of the North Arabic Script*, Chicago University, Chicago, 1939

Abul Fadl, *Ain-Akbari*, vol.-1, eng. tran. : H. Bluclaman, Culcutta, 1873

Ahmed, Shamsuddin, *Inscription of Bengal*. Rajshahi, 1960

Annemari Schimmel, *Islamic Calligraphy*, Leiden, E.J. Brill, 1970

Blandford, Henry F., *Geography of India, Burma and Ceylon*, London, 1894

Browne, E.G., *A Literary History of Persia*, London, 1906

Cust, Dr. Robert Neeldham, *The Modern Languages of Africa*, London

David James, *Islamic Art*, London: Hamlin Publishing Group, 1974

Desai, Dr. Z. A., *An Early Thirteenth Century Inscription from West Bengal*, E.I.A.P.S. 1975

Drangor, D., *Alphabet*, Newyork, 1948

Fekete, L., *Einfuhrung in die Osmanischturkische Diplomatic*, Bodapest, 1916

Grohmann, A., From the World of Arabic Papayri

Hasan, Jafar, *Muslim Calligraphy : Indian Art and Letters*, London, 1935

Hitti, Philip.K., *History of the Arabs*, London : Macmillan, 1968

Levy, Reuben, *An Introduction to Persian Literature*, U.S.A., 1969

Mustafizur Rahman, P.I.S., *Islamic Calligraphy in Medieval India*, University Press Limited, Bangladesh, 1979

Papadopoulo, A., *Islam & Muslim Art*, London, 1980

Qadi Ahmad, *Gulistan-i-Hunr*, eng. tran. entitled : Calligraphers & Painters, T. Minor Sky, Freer Gallery of Art, Washington, 1959

Safadi, Yasin Hamid, *Islamic Calligraphy*, London, 1978

Scott, Lanepoole, S. *The Moors in Spain*

Scott, S. P., *History of the Moorish Empire in Europe*

Siman, Khalil, *Linguistics in the Middle ages*, Lieden: A.J. Brill, 1968

Skeleton, Robert and Francis, Mark, ed : *Arts of Bengal, The Heritage of Bangladesh and Eastern India*, London, White Chapel Art Gallery. 1979

An Introduction to Persian Art, 1930

www.pathagar.com

Catalogue of Arabic and Persian Manuscripts in the Oriental Public Library of Bankipur
Encyclopedia of Islam
Encyclopedia Britannica, London : William Benton
Gospel in Many Tongues, London : Bibel Socity, 1948
Persian Art, edited by Sir E. Denisan Ross

বাংলা সহায়ক গ্রন্থ

আবদুর রহীম, মুহাম্মদ, *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, ঢাকা : যোগাযোগ পাবলিশার্স, ২০০২
আবদুস সাত্তার, *ফার্সী সাহিত্যের কালক্রম*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭
আমীর আলী, সৈয়দ, *আরব জাতির ইতিহাস*, অনু. শেখ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫
আযহারী, ড, মুকতাদা হাসান, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, (সম্পাঃ ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান), রাজশাহী : মুহাম্মদী সাহিত্য সংস্থা , ১৯৮৫
ইয়াকুব আলী, ড. এ.কে.এম., *মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প* , ঢাকাঃ অনন্যা, ২০০১
ইয়াকুব আলী, *আরব জাতির ইতিহাস চর্চা*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২
ইয়াকুব আলী, *মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা*, ঢাকাঃ সঞ্চিতা, ২০০১
এবনে গোলাম সামাদ, *ইসলামী শিল্পকলা*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯
চৌধুরী, হাসান আলী, *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকাঃ আইডিয়াল লাইব্রেরী, ২০০৪
জিয়াউদ্দীন, মুহাম্মদ, *মুসলিম লিপিকলা*, (অনুবাদঃ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান), ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪
মাহমুদুল হাসান, ড. সৈয়দ, *মুসলিম লিপিকলা*, ঢাকাঃ ছাত্রবন্ধু পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫
মুস্তাফিজুর রহমান, ড. মুহাম্মদ, *কুর'আন পরিচিতি*, ঢাকাঃ নুবালা পাবলিকেশন্স, পৃ.২১১
সেন, শ্রী সুকুমার, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, কলিকাতাঃ ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৭১
হামীদুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ, *Introduction to Islam*, (অনুঃ মুহাম্মদ লুতফুল হক), ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৯৫
হিযবুল্লাহ, ড. হাফেজ মাওলানা এ.বি.এম., *বাংলা-ইংরেজী উচ্চারণে কুর'আন বিকৃতির অপপ্রয়াস*, ঢাকাঃ দিপালী প্রেস, ২০০২
হিলালী, শেখ গোলাম মকসূদ, *ইরান ও ইসলাম*, মুহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন অনূদিত, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৯
হীরাচাঁদ ওঝা, গৌরী শংকর, *প্রাচীন ভারতীয় লিপিমালা*, (অনু. ও সম্পা.: অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্র নাথ মজুমদার), ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯
ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৯
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিশালা

সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকা

বাংলা

আবদুর রহীম, "ইসলামী ক্যালিগ্রাফিঃ যুগে যুগে" (ধারাবাহিক), অগ্রপথিক, ইফাবা, ঢাকা, ২০০০-১

www.pathagar.com

আবদুর রহীম, মোহাম্মদ, "ইসলামিক ক্যালিগ্রাফিতে খুলুথ লিপি", *দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকা*, ৩ এপ্রিল ১৯৯৮

আহমদ আলী, "হাদীস ইসলামী শরী'আতের একটি প্রামাণ্য দলীল: একটি পর্যালোচনা", *জার্নাল অব আর্টস*, চ.বি. খণ্ড ১৪ জুন ১৯৯৮

ইব্রাহীম মণ্ডল, "ইসলামী শিল্পকলা", *নতুন কলম*, জুন ১৯৯৬

নূরুল আমীন, মুহাম্মদ, "লিপিকলায় মুসলমানদের অবদান", *অগ্রপথিক*, ইফাবা, ১৪বর্ষ ২সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯

নূরুল হুদা, মোঃ, "ইসলাম-পূর্ব ইরানী সাহিত্য", *নিউজ লেটার*, ৯ম সংখ্যা, ১৮তম বর্ষ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, সাংস্কৃতিক বিভাগ, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, বাংলাদেশ

মীরযায়ী, মোহাম্মদ রেযা, "চীনে ইসলাম ও মুসলমান", *নিউজ লেটার*, প্রাগুক্ত, বর্ষ-২৬, সংখ্যা-৭-৮, জুলাই-আগস্ট ২০০৪

রাহপেইমা, গোলাম রেযা, "ইসলামী সংস্কৃতির উৎকর্ষ বিধানে হস্তলিপি শিল্পের ভূমিকা", *নিউজ লেটার*, প্রাগুক্ত, বর্ষ-২৫, সংখ্যা-১১-১২, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০০৩

আরবি

আল-কায়সি, ড. নুরি হাম্মুদি, মাদরাসাতুল খাত্তিল 'ইরাকিয়্যাহ মিন ইবনি মুক্লাহ ইলা হাশিম আল-বাগদাদি, *মাজাল্লাতুল মাওরিদ*, ১৯৮৬, খ.১৫, সংখ্যা ৪

নামী, ড. খলীল ইয়াহয়া, আসলুল খাত্তিল আরবি ওয়া তাতাওয়ারুহু ইলা মা কাবলাল ইসলাম, *মাজল্লাতু কুল্লিয়াতিল আদাব, আল-জামি'আতুল মিসরিয়্যা*, ১৯৩৫, খ.৩, সংখ্যা.১

বাদাভি, মাহমুদ সিবাওয়াইহ, আল-মাছাহিফুল উছমানিয়্যা, *মাজাল্লাতু কুল্লিয়াতিল কুর'আনিল করিম ওয়াদ দিরাসাতিল ইসলামিয়্যা*, আল-জামি'আতুল ইসলামিয়্যা, আল-মদিনাতুল মুনাওয়ারা, ১৪০২-৩ হি. সংখ্যা-১

রশিদ রিদা, শায়খ মুহাম্মদ, কিতাবাতুল মুসহাফ, *মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যা*, সংখ্যা-৬

সিদ্দিক, মুহাম্মদ ইউসুফ, আল-খাত্তুল আরবি ওয়া আছরুহুল হাদারি, আল-জামি'আতুল ইসলামিয়্যা, *আল-জামি'আতুল ইসলামিয়্যা লিল 'উলুমিল ইসলামিয়্যা*, লন্ডন, বর্ষ-১, সংখ্যা-২, এপ্রিল-জুন ১৯৯৪

কিতাবাতুল মুসহাফ, *মাজাল্লাতুল বুহুছিল ইসলামিয়্যা*, রিয়াদ: গবেষণা, ইফতা, দাওয়া ও ইরশাদ বিভাগ

আদ-দিরাসাতুল আদবিয়্যাহ, আল-জামি'আতুল লুবনানিয়্যা, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৬০

ইংরেজি ও অন্যান্য

Ganam, N.M., "Development of Muslim Calligraphy in India", Paper presented in South Asian Workshop on Epigraphy, Mysore, Department of Epigraphy, March, 25.31.1985

Hasan, S.M., "Islamic Calligraphy: Bangladesh Perspective", Bangladesh Quarterly, Vil.7, December, 1987

„ , "Islamic Calligraphy vis a vis Bengal Style", Bangladesh Quarterly , Vil. 12, June, 1992

www.pathagar.com

Ziauddin, M., "A Monograph on Moslem Calligraphy", Visva- Bharti Studies, No.6, V-B-Q, NS Vol.1 Part- 1V, Vol.11, Part 1&11, Calcutta, 1963

তাওকান, ফাওয়াজ আহমদ, আরবি রসমুল খত্ত কা আগাজ আওর ইরতিকা, (অনু.: গোলাম হায়দর আলি), *ফিকর ওয়া নজর*, ইসলামাবাদঃ ইদারায়ে তাহকিকাতে ইসলামি, খ.৭, সংখ্যা-১০, এপ্রিল ১৯৭০

আলি, *তুঘরা-ই হুমায়ুন* (তুর্কি ভাষা), T.O. E.M., খ.৮, (১৯১৭-১৯১৮), সংখ্যা-৪৪

(মাহনামা) হুনর ও *মর্দুম*, ২৮ তম সংখ্যা, বাহমন, ১৩৪৩, ইনতিশারাতে ওযারাতে ফারহাঙ্গ ও হুনর, তেহরান, ইরান

www.pathagar.com